ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

# মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ফারসি কাব্যের প্রভাব

## (Influence of Persian Poetry on the Medieval Bengali Literature)

467580

**তত্ত্বাবধায়ক**

প্রফেসর ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান

ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা

**যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক**

প্রফেসর ড. তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী

ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা

Dhak University Library

467580

বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

**গবেষক**

মো. আবুল হাসেম

রেজি. নং ১২০/২০০৮-০৯

ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা

২০১৪

# ঘোষণাপত্র

আমি মো. আবুল হাসেম এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, ‘মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ফারসি কাব্যের প্রভাব’ শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার একক মৌলিক গবেষণাকর্ম। এ অভিসন্দর্ভটির কোনো অংশ কোথাও সনদ লাভ বা প্রকাশের জন্য জমা দেইনি।

467536

গবেষক

০১/১২/২০১৪

(মো. আবুল হাসেম)
পিএইচ.ডি. গবেষক
রেজি. নং ১২০/২০০৮-০৯
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

# প্রত্যয়নপত্র

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব মো. আবুল হাসেম কর্তৃক পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভের জন্য রচিত 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ফারসি কাব্যের প্রভাব' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি একান্তই আমাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে। এটি তাঁর একটি একক মৌলিক গবেষণাকর্ম।

গবেষককে তাঁর গবেষণা অভিসন্দর্ভটি পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভের জন্য জমা দানের অনুমতি প্রদান করছি।

467536

তত্ত্বাবধায়ক

০১.১২.২০১৪

(প্রফেসর ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান)
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

Professor
Dept. of Persian Language & Literature
University of Dhaka.

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

*Dhaka University Institutional Repository*

# প্রত্যয়নপত্র

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব মো. আবুল হাসেম কর্তৃক পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভের জন্য রচিত 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ফারসি কাব্যের প্রভাব' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি একান্তই আমাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে। এটি তাঁর একটি একক মৌলিক গবেষণাকর্ম।

গবেষককে তাঁর গবেষণা অভিসন্দর্ভটি পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভের জন্য জমা দানের অনুমতি প্রদান করছি।

যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক

০৯/১১/২০১৪

( প্রফেসর ড. তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী )
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

Dr Tarique Ziaur Rahman Sirazi
Professor
Dept of Persian Language and Literature
University of Dhaka

*Dhaka University Institutional Repository*

# সূচিপত্র


| | |
|---|---|
| ভূমিকা | i- ix |
| **প্রথম অধ্যায় :** রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট | ০১-৫৪ |
| **দ্বিতীয় অধ্যায়:** ফারসি ও বাংলা ভাষার সম্পর্ক পর্যালোচনা | ৫৫-৯৯ |
| **তৃতীয় অধ্যায়:** বঙ্গীয় অঞ্চলে পারস্যের ধর্ম-সংস্কৃতি | ১০০-১২৫ |
| **চতুর্থ অধ্যায়:** বঙ্গে ইসলাম প্রবেশ ও সুফি মতবাদ প্রচার | ১২৬-১৪৩ |
| **পঞ্চম অধ্যায়:** বঙ্গে আগত ইরানি সুফিদের পরিচয় | ১৪৪-১৫৬ |
| **ষষ্ঠ অধ্যায়:** ফারসি কবি ও তাঁদের কাব্য-সম্ভার | ১৫৭-২০৫ |
| **সপ্তম অধ্যায়:** বাংলা কাব্যে ফারসি কাব্যের নন্দনতত্ত্বের প্রভাব | ২০৬-২২৫ |
| **অষ্টম অধ্যায়:** ফারসি কাব্য-প্রভাবিত মধ্যযুগের বাঙালি কবি | ২২৬-২৬২ |
| **নবম অধ্যায়:** অনূদিত বিশেষ কয়েকটি বাংলা কাব্যগ্রন্থ | ২৬৩-২৮৬ |
| **দশম অধ্যায় :** ফারসি কাহিনীকাব্য অবলম্বনে বাংলা পদ্যরচনা | ২৮৭-৩০৩ |
| **একাদশ অধ্যায়:** ফারসি কাব্য ধারায় মধ্যযুগের সাহিত্যচর্চা | ৩০৪-৩১৮ |
| উপসংহার | ৩১৯- ৩২২ |
| গ্রন্থপঞ্জি | ৩২৩-৩৪১ |

Dhaka University Institutional Repository

# মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে
# ফারসি কাব্যের প্রভাব

*Dhaka University Institutional Repository*

# ভূমিকা

ভারতীয় উপমহাদেশে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালটি নানা দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রবেশ ও প্রচার লাভ এবং মুসলমান শাসনের গোড়াপত্তন হয় এ সময়ে। এ সময়কালটি ভারতীয় ইতিহাসের মধ্যযুগ বলে অভিহিত হলেও মুসলমানদের ভারত বিজয় থেকে শুরু করে ইংরেজদের আর্বিভাবের মধ্যবর্তী সময়কালকে মুসলমান শাসনের যুগ বুঝানো হয়ে থাকে।[১] বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধির সময়কালটিও মধ্যযুগ। নানা কারণে এ যুগটির অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসারের যুগটিও এটি। মধ্যযুগেই বঙ্গীয় অঞ্চলসহ গোটা ভারতে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা সাধারণ পর্যায়ে ছিল। গ্রাম, শহর, মসজিদ ও মক্তব তথা সকল স্থানে হিন্দু কী মুসলমান সকলেই ফারসি ভাষার চর্চা করতেন। ফারসি ছিল সরকারি ভাষা। তখন এ ভাষার মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সকলেই অবগত ছিলেন। সাধারণের মধ্যে ফারসি ভাষার 'রোস্তম-সোহরাব', 'সেকান্দর বাদশাহ', 'শিরীন-ফরহাদ', 'ইউসুফ-জোলেখা', ও 'ইমাম হাসান-হোসেন' কাহিনী প্রচলিত ছিল। ধীরে ধীরে বাংলা ভাষায় ফারসির মজাদার কাহিনী ও নীতিধর্মীমূলক রচনার উদ্ভব হয়। মুসলমান বাঙালি কবি সাহিত্যিকগণ তাঁরা এসব বিষয়ে কাব্য রচনা করেন। তখন কোনো বাঙালি ফারসি ভাষা জানতো না এমন ব্যক্তি খুব কমই পাওয়া যেত।

বাঙালিদের মধ্যে পূর্বের ন্যায় এখন আর ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা বেগবান নেই। যে কারণে ফারসি ভাষার অনেক রচনা অযত্ন ও অবহেলায় বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে।[২] এসব রচনার অনুপস্থিতির কারণে অনেক অনূদিত বাংলা কাব্যরচনা নাকি মৌলিক তা নির্ণয় করাও কঠিন হয়ে পড়ে। অপরদিকে অনেক ফারসি রচনার ন্যায় বাংলা কাব্যরচনাও বিলুপ্ত হয়েছে। মূলত এসব কারণে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য আমাদের মাঝে ঘন কুয়াশার ন্যায় অস্পষ্টই থেকে যায়। তেমনি ফারসি কাব্যের প্রভাবের বিষয়টি অনেক বাংলা রচনায় লেখক কর্তৃক লিপিবদ্ধ না থাকায় প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। যেসব বাঙালি কবি তাঁদের রচনায় ফারসি ভাষায় রচিত কাব্যের কথা স্বীকার করেছেন তাঁদের ব্যাপারেও একটি ন্যায়গত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সহজ নয়। বাংলা ভাষায় রচিত কাব্যটি ফারসি কাব্যের অনুবাদ না বিষয়-

Dhaka University Institutional Repository

ভাব গ্রহণ হিসেবে রচিত হয়েছে বা এটি কোন্ কবির ফারসি কাব্যরচনা অবলম্বনে রচিত তা পরিস্কার করে উল্লেখের দাবি রাখে।

এ কথা সত্য যে, বহু বাঙালি লেখক ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের সেবক ছিলেন এবং ফারসি কাব্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। আর যারা রচনার কোনো স্থানেই ফারসির প্রভাবের কথা উল্লেখ করেননি অথচ রচনায় ফারসি কাব্যের প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে ফারসি কাব্যের প্রভাব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া অধিকতর জটিল বিষয়। মূল ফারসি রচনা উপস্থিত না থাকার কারণেও বাঙালি কবির উপর ফারসি কাব্যের প্রভাবের বিষয়টি নির্ণয় করা সঠিক হবেনা। বলা বাহুল্য যে, তথ্যের অভাবে এখনও বহু বাঙালি লেখকের কর্মজীবন অস্পষ্ট রয়ে গেছে। রচনাকালও অনুমানের উপর নির্ভর করে উল্লেখ করতে হয়। এ কারণে আমরা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে শুধু রচনার পদ্ধতি (Stylystics) ও ভাষাগত ভিত্তিতে বিচার করা যথেষ্ট মনে করিনা। রচয়িতাদের জীবনী, রচনার বিষয় ও সময়-অবস্থার কথা বিবেচনায় এনে বাংলা কাব্যসাহিত্যের মান নির্ণয় করা উচিৎ। এ গবষণার বিষয়টি এ সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য দিতে সহায়তা করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

উপস্থাপিত 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ফারসি কাব্যের প্রভাব' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ একটি নতুন বিষয়। এ গবেষণার মাধ্যমে বিষয়টি আরো পরিস্কার হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। কেননা, এ গবেষণাটি অনেকটা ইতিহাস ও তথ্যনির্ভর হয়েছে। ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের মৌলিক গ্রন্থের পাশাপাশি ইতিহাস গ্রন্থের আশ্রয় নেয়া হয়। বস্তুত ভারতীয় উপমহাদেশের ফারসি ভাষার অনেক রচনা বিদ্যমান নেই, যেগুলো দেখা সম্ভব হয়নি। বাংলা সাহিত্যের অনেক সমালোচক অকপটে ফারসির প্রভাবের বিষয়টি বলে গিয়েছেন। সত্য বলতে, পুরনো দিনের অনেক ফারসি রচনা আমাদের মাঝে অনুপস্থিত। তবুও চেষ্টা করা হয়েছে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রকৃত অবস্থান তুলে ধরতে। অনেক ফারসি রচনা বঙ্গীয় বা ভারতীয় অঞ্চলের সৃষ্টি। অথচ অনেকে অনুমান করে বলে দিয়েছেন যে, এগুলো ইরানি লেখকদের রচনা।

বাংলা রচনায় ইসলামি ভাব রয়েছে তা কেউ অস্বীকার করেননা। সেই ইসলামি ভাবে ও রসে ফারসি কাব্যের কোন্ রচনাটি প্রভাব রেখেছে সে বিষয়টি স্পষ্ট করা খুবই জটিল বিষয়। প্রভাবের বিষয়টি অনায়াসে বলে যাওয়া আর প্রমাণ এক বিষয় নয়। প্রভাবিত বাংলা কাব্যসাহিত্যটি প্রমাণের জন্য প্রয়োজন ফারসি রচনা। সেই ফারসি রচনা খুঁজে না পাওয়া গেলে গবেষণাটি যে অপূর্ণতা রয়ে যাবে তা বোধ করি সবার জানা আছে। তদুপরি চেষ্টা চালানো হয়েছে যেন প্রকৃত অবস্থানটি পরিস্কার করা সম্ভব হয়।

Dhaka University Institutional Repository

অত্র গবেষণায় মুসলিম বাংলা কাব্যের একটি চিত্র যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাতে শুধু বাংলা সাহিত্যের পাঠকগণ লাভবান হবেন এমন চিন্তা করেনি। যারা ফারসি সাহিত্যের পাঠক ও গবেষক তাঁদের কাছেও বিষয়টি নতুন মনে হবে। এ গবেষণায় আমার উদ্দেশ্য হল, ফারসি ও বাংলা ভাষার উভয় শ্রেণির পাঠক ও গবেষকগণ যাতে মধ্যযুগের ফারসি ও বাংলা ভাষা সাহিত্যের পরস্পর অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারেন।

বাংলা ভাষার পাণ্ডুলিপির মধ্যে অনেকগুলো পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করেছেন ড. আহমদ শরীফ, ড. এনামুল হক ও আরও অনেকে। তাঁরা সম্পাদনাকালে রচনাটি মৌলিক না অনুবাদ তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। বস্তুত ফারসি রচনাদির উপস্থিতি বা ফারসি কাব্যের সাথে তুলনা করে সে বিচারটি করা হয়নি। যে কারণে বাংলা সাহিত্যে একটা সমস্যা রয়ে যায়। সে সমস্যাটি যে আদৌ সমাধানযোগ্য নয় এমনটি ভাবা সমীচীন হবে না। এ ক্ষেত্রে ফারসি রচনাদির অনুপস্থিতিও সমাধানের অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। এ অঞ্চলের অনেক ফারসি রচনাবলি আলোর মুখ না দেখার কারণে অনেক তথ্য অনুমানের উপর নির্ভর করে গঠিত হয়েছে। ইরানের ফারসি রচনাগুলো সম্মানজনক অবস্থানে পাওয়া গেলেও ভারত, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশের রচনাবলি অবহেলিত অবস্থায় থেকে যায়। এ অঞ্চলের অনেক সমৃদ্ধ রচনা প্রকাশ হয়নি। রচনা প্রকাশ পেলে সেগুলো অনেক গ্রন্থাগারে আজো সংরক্ষিত আকারে পাওয়া যেত। সে দিক দিয়ে বলতে গেলে এ গবেষণায় প্রচুর মৌলিক তথ্যের অভাব রয়েছে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ফারসি কাব্যের প্রভাব বিষয়ে মৌলিক গবেষণা নেই। এর অন্যতম কারণ হল, সাধারণের মনে ফারসির প্রভাবের বিষয়টি পরিস্কার ছিল। কেউ হয়ত ভাবেননি যে, বিষয়টির রচনা ও গবেষণার প্রয়োজনীয়তা আছে। ফারসি কাব্যসাহিত্য সম্পর্কে জানা না থাকলে প্রভাবের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা যায়না। মধ্যযুগের অনেক ফারসি কাব্যরচনার হদিস মেলা ভার। বিশেষ করে বাংলাদেশ ও ভারতের রচনাগুলো অযত্ন ও অবহেলায় বিনষ্ট হওয়ায় সে অভাব তীব্রতর হয়েছে। শুধু যে ইরানের কবিদের রচনা বাংলা সাহিত্যে প্রভাব রেখেছে- তা ভাবা ঠিক হবেনা। অনেক ফারসি গ্রন্থ ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীরাও রচনা করেছেন। সেগুলোও কোনো না কোনোভাবে বাংলা সাহিত্যে প্রভাব রেখেছে। অথচ এ সকল রচনা এখন হাতে পাওয়া এক বিরল ঘটনা। অনেক বাঙালি কবি ফারসি কাব্যের অনুরূপ কাব্যরচনা করেছেন সেটি খুবই স্বাভাবিক। তাঁরা মুল ফারসি রচনার গদ্য নাকি পদ্য থেকে গ্রহণ করেছেন সে বিষয়ে কোথাও উল্লেখ করেননি। মূলত এ বিষয়ে আমাদের অনেক কিছুই অজানা ছিল। এ গবেষণার ফলে সে বিষয়গুলো জানা যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়টি হল রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট। নিশ্চয় এত তাড়াতাড়ি ফারসি সাহিত্যের প্রতি বাঙালিদের দৃষ্টি পড়েনি। গোটা ভারতীয় উপমহাদেশে ফারসি ভাষা চর্চার একটি অবস্থান গড়ে ওঠেছিল। এ অঞ্চলের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি না হলে কখনই বাঙালি ফারসি সাহিত্যের প্রতি ধাবিত হতনা। সে প্রেক্ষাপটেই বাংলা সাহিত্যে ফারসি কাব্যের প্রভাবের যোগসূত্রতা সৃষ্টি হয়। তাই ফারসি ভাষা চর্চার অবস্থান ও বাংলা সাহিত্যে প্রভাবের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম অধ্যায়ে এ বিষয়টির যথা ভাবে আলোচনা করা হয়। যদিও বিষয়টির পরিধি অনেক বড় তাই গুরুত্বসহকারে সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরাই যুক্তিযুক্ত ভেবেছি। এতে বর্তমানের ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের ফারসি সাহিত্য নিয়ে একটি সামগ্রিক পরিচয় দেয়া হয়েছে। তবে বাংলাদেশের অবস্থানের কথা বেশি করে তুলে ধরা হয়। তুর্কিরা বাংলাদেশ জয় করার পরই ফারসি ভাষার সাথে সম্পৃক্ত হতে থাকে। বিশেষ করে মুঘল যুগে বাঙালিরা এ ভাষায় অবদান রাখতে এগিয়ে আসেন। এ ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান সামান্য নয়।[৩] এ ভাবেই তাঁরা ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের সাথে বেশি পরিচিত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ফারসি ভাষার সাথে বাংলা ভাষার কোন্ ধরণের সম্পর্ক রয়েছে সে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়। উৎপত্তিগতভাবে ফারসি ভাষার সাথে বাংলা ভাষার একটি সম্পর্ক রয়েছে। যে সম্পর্কটি আলাদা করে দেখার অবকাশ নেই। অবশ্য সম্পর্কের অন্যান্য দিকও রয়েছে। যেমন–দুই ভাষার শব্দ, বাক্য, গঠন কাটামোর মধ্যে সম্পৃক্ততা। এ দু'টি ভাষার মধ্যে কী ধরণের মিল রয়েছে সে বিষয়টি আলোচনা অনেক গুরুত্ব রাখে। জাতিগতভাবে বাঙালি ও ইরানি জাতি পৃথক দ'ুটি জাতি। সে বিষয়টিও এখানে উত্থাপিত হয়েছে। অবশ্য শুধু একটি সম্পর্ক থাকার উপর ভিত্তি করেই বাংলা ভাষায় ফারসি শব্দের প্রবেশ ঘটেনি। এ অধ্যায়ে সম্পর্কের অন্যান্য দিকগুলো আলোচনায় নিয়ে আসা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনার বিষয়বস্তু হল, বঙ্গীয় অঞ্চলে পারস্যের ধর্ম-সংস্কৃতি। এ ধর্ম সংস্কৃতি সতের ও আঠার শতকে বাংলার জনসাধারণকে বেশি প্রভাবিত করে। সমাজে দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তনের জন্য ধর্মীয় সংস্কৃতিকে প্রধান একটি বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়।[৪] যে কোনো ভাষার প্রসার ও উন্নতির জন্য ধর্ম একটি বড় মাধ্যম। প্রাচীন ইরানের *আবেস্তা* একটি ধর্মীয় গ্রন্থের নাম। তেমনি একটি ভাষার নামও 'আবেস্তা'। ধর্মই এ ভাষাকে এক হাজারেরও অধিক সময় বাঁচিয়ে রেখেছিল। ধর্মীয় ভাষা যে কোনো জাতির উপর সহজভাবে প্রভাব রাখতে সক্ষম। তদ্রুপ সংস্কৃতি যে কোনো জাতির উপর প্রভাব রাখার জন্য একটি বড় বিষয় হিসেবে দেখা হয়ে থাকে। এ অধ্যায়ে পারস্যের

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃতি ও ধর্ম নিয়ে বাস্তবধর্মী একটি ব্যাখ্যা দেয়া হয়। পারস্যের কোন্ সংস্কৃতি বঙ্গীয় অঞ্চলে প্রভাব রেখেছে এবং বঙ্গের ধর্ম-সংস্কৃতিই বা কী ছিল! বর্ণনার ধারা প্রসারিত না করে সংক্ষিপ্ত পরিসরে তা আলোচনা করা হয়।

চতুর্থ অধ্যায়টি যদিও সাহিত্যের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ততা রাখেনা। তবে বঙ্গে ইসলাম প্রবেশ ও সুফি মতবাদ প্রচারের বিষয়টি অনেকাংশেই গুরুত্ব রাখে। বিশেষ করে সুফি কবিদের কবিতা, নসিহত, উপদেশ ও মন্তব্য কোনোভাবেই ইসলাম প্রচারকদের থেকে আলাদা ছিলনা। এ অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচারকালীন সময়ে সুফিরা তাঁদের নীতিধর্মী বক্তব্য প্রদানের সময় ফারসি ভাষা অবশ্যই ব্যবহার করতেন। এটা সত্য যে, বহু সুফি-সাধক ফারসি ভাষায় বক্তব্য রাখতেন। এ কারণে বিষয়টি গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত থাকায় আলোচনায় রাখা হয়েছে। এ অঞ্চলে ইসলাম আগমনের পূর্বে বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের অধিবাসীরা বসবাস করত। এ দেশে ইসলাম ধর্ম বহু শ্রেণি ও গোষ্ঠীর মাধ্যমে বিকাশ লাভ করেছে। তন্মধ্যে সুফি সাধকরা ছিলেন অন্যতম একটি গোষ্ঠী। ইসলাম ধর্ম প্রচার ও প্রসারে তাঁদের অবদান অনেক। মুসলিম জাতি হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকার প্রতিষ্ঠার পিছনে সুফিরা যেভাবে তাঁদের কার্যক্রম পরিচালনা করে একটি ইসলামি সুফিভাবাপন্ন দেশ হিসেবে গঠন করে গিয়েছেন তা কম গুরুত্ব রাখেনা। এ অধ্যায়ে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়টি একটি ব্যতিক্রমধর্মী অধ্যায়। বঙ্গে আগত ইরানি সুফিদের পরিচয় আমরা জানিনা। এ দেশে ইসলাম প্রচারের সময় ইরান ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে বহু সুফি ও দরবেশ আগমন করেছিলেন। তাঁদের পরিচয় খুব কমই সংরক্ষিত হয়েছে। বহিরাগত সুফিদের ভাষা নিশ্চয়ই বাংলা ভাষা ছিলনা। প্রত্যেকেই তাঁদের নিজ নিজ অঞ্চলের ভাষা ব্যবহার করেছেন। তবে এ দেশে আগমনকারী সুফি একমাত্র আরব ও মিসর ব্যতীত সবাই ফারসি ভাষা বলতেন। বিশেষত পারস্য অঞ্চলের অধিবাসীরা কখনই ফারসি ভাষা পরিত্যাগ করে অন্য ভাষা ব্যবহার করতেননা। তবে ইসলাম ধর্মের প্রতি ভালবাসা থাকায় তাঁরা আরবি ভাষাও প্রয়োজনে ব্যবহার করতেন। এ অধ্যায়ে বর্তমান ইরান ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসী সুফিদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে রয়েছে ফারসি কবি ও তাঁদের কাব্য-সম্ভার নিয়ে আলোচনা। এ বিষয়টি গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে মর্যাদা রাখে। কেননা, এ অধ্যায়টির মধ্যে শুধু ফারসি কবি ও তাঁদের সাহিত্যকর্ম নিহিত রয়েছে। এতে যদিও কবিদের আলোচনা করা মুখ্য উদ্দেশ্য, তবুও সংক্ষিপ্ত

Dhaka University Institutional Repository

পরিসরে কাব্যসাহিত্যের কিছু সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এতে প্রসিদ্ধ ও নির্বাচিত কবিদের আলোচনাই অনেক স্থান করে নিয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে রয়েছে গজল, মসনবি, কসীদা, মর্সিয়া ও ফারসি কাব্যশৈলী বাংলাকাব্যে প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা। এটিতে বাংলা কাব্যে ফারসি কাব্যের নন্দনতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়। ফারসি কাব্যের অলঙ্কার ও কাব্যশৈলীর বিচার বিশ্লেষণ নিয়ে বহু ফারসি গ্রন্থ রচিত হয়েছে। সেসব গ্রন্থ থেকে কলা কৌশলগুলো বের করে মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের ধারার সাথে মিলানো হয়। অবশ্য ফারসি কাব্যের ন্যায় মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের গঠন-কাঠামো ও অলঙ্কার বিষয়ে রচিত গ্রন্থের সংখ্যা অনেক কম এবং কাব্যগুলোর ছন্দ ও অলঙ্কার বিচার-বিশ্লেষণ যথেষ্টভাবে করা হয়নি। এ সময়ের বাংলাকাব্যের সকল কাব্যই পুথি সাহিত্যের সাথে একীভূত করে দেয়া হয়। পুথি সাহিত্যের মধ্যে একটি অন্যতম বিষয় হল যে, কাব্যের নাম ও বিষয়বস্তু ফারসি কাব্যের অনুরূপ। বাংলা কবিতাগুলোর ধরণ রীতিও ফারসি কাব্যের সাথে মিল রয়েছে অথচ আমরা অবহিত নই। এ অধ্যায়ে তা পরিস্কারভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়টি হল, ফারসি কাব্য-প্রভাবিত মধ্যযুগের বাঙালি কবি। এটি আলোচনার একটি প্রধান বিষয়। মধ্যযুগের অধিকাংশ বাঙালি মুসলমান কবিই ফারসির উপাদান নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন।[৫] এ কথা সত্য যে, খ্রিস্টীয় তের ও চৌদ্দ শতকে বাঙালি কবিদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়নি। যে কারণে মধ্যযুগের প্রথম শতকগুলোতে ফারসি প্রভাবিত বাঙালি কবি কম পাওয়া গিয়েছে। তবুও মধ্যযুগের বাঙালি কবির সংখ্যা যে অনেক তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। এ অধ্যায়ে প্রসিদ্ধ ক'জন কবির কাব্যরচনা ও তাঁদের সময়কাল সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে যথাভাবে উপস্থাপনের প্রচেষ্টা চালানো হয়।

বাংলা কাব্যসাহিত্য অনুবাদের উপর কতটুকু নির্ভরশীল ছিল? এ প্রশ্নটি বাংলা গবেষকদের মাঝে বার বার উত্তাপিত হওয়া স্বাভাবিক। এ প্রসঙ্গে আধুনিক গবেষক ওয়াকিল আহমদ বলেন, 'মুসলমান কবিগণ স্বীয় সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধির ও বিকাশের চেতনা থেকে আরবি ফারসির অনুবাদ করেন।'[৬] এ থেকে অনুমান করা যায় যে, মুসলমান কবিরা ফারসি ভাষার রচনা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদের জন্য উদগ্রীব ছিলেন। তাঁদের কতক কাব্য ফারসি কাব্যের অনুবাদ আবার কতক কাব্য এর ব্যতিক্রম। তবে মধ্যযুগের বাঙালি কবি অনুকরণ ও অনুসরণ ব্যতীত কাব্যরচনা করেননি। নবম

*Dhaka University Institutional Repository*

অধ্যায়ে ফারসি কাব্য থেকে অনূদিত মধ্যযুগের বিশেষ কয়েকটি বাংলা কাব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

মধ্যযুগে কাহিনী চিত্রনের মাধ্যমে বহু বাংলা কবিতা রচিত হয়েছে। বাঙালি কবিরা রোমান্টিক কবিতা লিখেছেন। কাহিনীকাব্য রচনার জন্য বাঙালি কবিদের আদর্শ কী ছিল? এর উত্তরও স্বাভাবিক। তাঁরা পারস্যের কবি নিজামি ও আবদুর রহমান জামির রোমান্টিক কাব্য অবলম্বনে কাব্যরচনা করেছেন।[৭] উক্ত বিষয়ে দশম অধ্যায়ে ফারসি কাহিনীকাব্য অবলম্বনে বাংলা পদ্যরচনা শিরোনামে আলোচনা করা হয়। মধ্যযুগে ইসলাম ধর্মের কাহিনী সবচেয়ে বেশি বাঙালি কবিদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিল। প্রসিদ্ধ কোনো কবিতাই ধর্মের বিষয় থেকে আলাদা নয়। ফারসি কাব্যের কাহিনীগুলো ইসলাম ধর্মের সাথে পুরোপুরিভাবে সম্পৃক্ত। যদিও প্রেম ও বিরত্বমূলক কাব্য মুসলিম কাহিনীর অবয়বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

একাদশ অধ্যায়টি হল, ফারসি কাব্য ধারায় মধ্যযুগের সাহিত্যচর্চা। এটিতে যথাভাবে ফারসি কাব্যের প্রভাবের বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়। কেন বাঙালি কবি ফারসি কাব্যের প্রতি মনোনিবেশ করেছিলেন? কেনইবা বাংলা সাহিত্যের বিষয়গুলো ফারসি কাব্যের সাথে মিশ্রণ ঘটেছে! এ অধ্যায়ে ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোচনা করা হয়।

উপসংহারে এ গবেষণাটির সংক্ষিপ্তাকারে ফলাফল বর্ণনা করা হয়েছে। এতে বর্তমান সময়ে এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের কথাও উল্লেখ করা হয়। নিজস্ব অভিমত ও বাস্তবধর্মী বক্তব্য ব্যতীত বিভিন্ন গ্রন্থের সহায়তা নেয়া হয়।

এ সময়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। বিশ শতকে বাংলা সাহিত্যের যেসব গ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছে তন্মধ্যে *মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি*, *মধ্যযুগের মুসলিম সাধনা*, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান*, *ইসলামি বাংলা সাহিত্য*, *মধ্যযুগে বাঙলা সাহিত্য* ও *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-মধ্যযুগ* উল্লেখযোগ্য। অপরদিকে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থগুলো হল, *বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফার্সী শব্দ*, *বাংলা ভাষায় ফার্সীর প্রভাব* ও *বাংলায় আরবি-ফার্সি উপাদান* প্রভৃতি। সে দিক দিয়ে এ গবেষণাকর্মটি ব্যতিক্রম।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান গবেষণাকর্মটির আলোচনা বিস্তৃত ও সারগর্ভ। অধ্যায়গুলোতে নতুন বিষয় সংযোজিত হয়েছে যা ইতিপূর্বে কোনো গবেষক আলোচনা করেননি। বলতে গেলে আলোচনার বিষয়-পরিধি, গবেষণার তথ্য-উপাত্ত ও উপস্থাপনা পূর্ববর্তী সকল গ্রন্থের চেয়ে একেবারে ভিন্ন। বাংলা সাহিত্যের উপর প্রভাবের বিষয়টি সার্বিক বিবেচনায় এনে বাংলা ও ফারসি তথ্যাদির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। এটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, প্রতিটি অধ্যায়ে প্রভাব সম্পর্কে আলোচনার পাশাপাশি ফারসি ভাষার মৌলিকত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরা হয়। যাতে বাংলা সাহিত্যে ফারসি কাব্যের প্রভাবের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ গবেষণা পদ্ধতিটি ইতিহাস ও বিশ্লেষণধর্মী। অর্থাৎ প্রভাবের সাথে সম্পৃক্ত বিষয় ইতিহাসের আলোকে বর্ণনা করা হয়। বাংলা বানানে বাংলা একাডেমী বানান পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। শুধু মাত্র যেসব ফারসি শব্দ *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে* নেই সেসব শব্দ *ফার্সী-বাংলা- ইংরেজী অভিধান* -এর নিয়ম অনুযায়ী ব্যবহৃত হয়। আশা করি আমাদের প্রচেষ্টা বাংলা ও ফারসি শিক্ষার ক্ষেত্রে সুযোগ বয়ে আনবে এবং এটি গবেষণায় নতুন মাত্রা যোগ করবে।

গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে গিয়ে সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও সমালোচকদের উক্তি ও তাঁদের ভাষ্য গ্রহণ করা হয়েছে। তথ্য-উপাত্ত প্রয়োগের ক্ষেত্রে মৌলিক ও আনুসাঙ্গিক গ্রন্থের ব্যবহার গভীরভাবে অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয়। গবেষণায় ফারসি, বাংলা, ইংরেজি ও উর্দু বই থেকে তথ্য-সূত্র ব্যবহৃত হয়েছে। তবে সাহিত্যের বিষয়গুলো পর্যালোচনার ক্ষেত্রে যেসব রচনাবলির সাহায্য নেয়া হয় তা মৌলিক, প্রসিদ্ধ ও গ্রহণ পর্যায়ের। সেই সাথে কয়েকটি বাংলা পাণ্ডুলিপি ও বহু ফারসি পাণ্ডুলিপির সহায়তা নেয়া হয়।

বহুদিন ধরেই এ বিষয়ে গবেষণা করার একটি স্বপ্ন ছিল। তবে আমরা সব সময় ফারসি গ্রন্থ রচনানাদির অভাব অনুভব করেছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আমার স্কলারশীপ মঞ্জুরের পর পরই তাঁদেরকে আমার ভারতে যাওয়ার জন্য একটি চিঠি প্রদান করি। বর্তমানে কোনো গবেষকের বিদেশে গিয়ে গবেষণার অনুদান না থাকায় তাঁরা আমাকে যেতে অনুমোদন দেয়নি এবং আমিও নিজ খরচে যেতে পারিনি। এটি আমার গবেষণা কাজের একটি বড় ব্যর্থতা। যেতে পারলে 'খুদা বখশ'[৮] গ্রন্থাগার ও কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগারের ন্যায় ভারতের কয়েকটি গ্রন্থাগার আমার দেখা হত। তাতে মধ্যযুগের ভারতীয়দের ফারসি রচনা ও কিছু তথ্য সংযোজন করাটা সহজ হত। তবে গবেষণাকালীন সময়ে আমি ফারসি ভাষা চর্চার কেন্দ্রভূমি ইরানে গিয়েছিলাম। সে সুবাদে গবেষণার বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত অনেকগুলো ফারসির বই ক্রয় করি। অবশ্য ভারতে যেতে পারলে আমার গবেষণার বিষয়টি তথ্যে আরো সমৃদ্ধ হত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও পাণ্ডুলিপি বিভাগ, এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার, ঢাকাস্থ ইরান কালসারাল সেন্টার গ্রন্থাগার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও দুষ্প্রাপ্য শাখা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর গ্রন্থাগার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে আমার গবেষণার জন্য অনুসন্ধান করেছি। ঐসব প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মচারীবৃন্দ আন্তরিকতার সাথে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। বিশেষ করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক জনাব আবু তাহিরের নিকট আমি বিশেষভাবে ঋণী। এ ছাড়া ঢাকাস্থ ইরান কালসারাল সেন্টার গ্রন্থাগারের জনাব আলমগীর হোসেন ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থগারের জনাব মো. ইসহাক চৌধুরী, জনাব মো. আলি আসগর ও মো. বাবর আলি তাঁরা আমাকে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাঁদেরকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

গবেষক, মো. আবুল হাসেম

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. আহমদ, ওয়াকিল, *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা ১ম খণ্ড*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ১।

২. ইংরেজ শাসনামল শুরুর পর থেকেই ফারসি ভাষার রচনার কদর কমে যাওয়ায় প্রকাশনার উপর গুরুত্ব থাকে নি। যে কারণে উনিশ শতকে ফারসি গ্রন্থ সমাজে প্রভাব ফেলেছে কম। যেসব রচনা হাতে লিখনের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছিল এসব রচনা কালের আবর্তে ধক্ষংসে পরিণত হয়। দেশের কয়েকটি বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয় ও গ্রন্থাগারে সামান্যই ফারসি ভাষার রচনাদি সংরক্ষিত আছে। অথচ আধুনিক যুগেও ফারসি গ্রন্থাদির উপস্থিতি বেশি থাকার কথা ছিল।

৩. দ্রষ্টব্য–আবদুস সাঈদ, সুলতানী আমলে বাংলাদেশে ফারসি চর্চা, *প্রফেসর আবদুল করিম সংবর্ধনা গ্রন্থ*, বাঁশখালী গুণীজন সংবর্ধনা পরিষদ, চট্টগ্রাম, ২০০৩, পৃ. ১৫৭-৬০।

৪. সরকার, শ্রী যদুনাথ, মুসলমান-যুগের ভারতের ঐতিহাসিকগণ, *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*, ৪৬ বর্ষ ২য় সংখ্যা, ১৩৪৬, পৃ. ৭৭।

৫. আহমদ, ওয়াকিল, *বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত*, খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানী, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১২২।

৬. আহমদ, ওয়াকিল, তদেব, পৃ. ১২২।

৭. তদেব, পৃ. ২৪০।

৮. খুদা বখশ: মুসলিম ভারতের একজন গ্রন্থপ্রিয় ব্যক্তির নাম। তাঁর নামানুসারে পাটনায় একটি ওরিয়েন্টাল পাবলিক গ্রন্থাগার রয়েছে। তিনি ছিলেন এ গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাতা। এতে আরবি ও ফারসির প্রচুর পাণ্ডুলিপিসহ ভারত অঞ্চলের বিভিন্ন প্রকার ফারসি গ্রন্থের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এটি গবেষকদের জন্য এ সময়ের একটি মূল্যবান গ্রন্থাগার।–সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ ১০ম খণ্ড, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ১২৯।

Dhaka University Institutional Repository

# প্রথম অধ্যায়: রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট

ফারসি ভাষা ইরানের জাতীয় ভাষা। এ ভাষার সাহিত্য প্রথমে ইরানি জাতি লালন করেছেন। ইরান ভূ-খণ্ড থেকে সে সাহিত্য আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশে সম্প্রসারিত হলে অন্যেরাও এ ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করেন। এসব অঞ্চলেও ফারসি ভাষা ও সাহিত্যচর্চার উন্নতি ঘটেছে। বলা বাহুল্য যে, মধ্যযুগে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের একটি অবস্থান গড়ে ওঠেছিল। তখনি ফারসি কাব্যসাহিত্য বাংলা সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে।

## ১. পারস্য ও ভারতীয় অঞ্চলের সম্পর্ক

### সাংস্কৃতিক বিনিময়

প্রাচীনকাল থেকেই ভারত অঞ্চলের সাথে আরবদের একটি সম্পর্ক ছিল। দু'টি দেশের সমুদ্র একই দিকে অবস্থিত হওয়ায় তাঁদের মাঝে আদান-প্রদান ও ব্যবসা-বাণিজ্য চলত প্রচুর। সে সুবাদে উভয় দেশের জনসাধারণ নির্বিঘ্নে আসা যাওয়া করত। সেমিটিক ও এরিয়ান –এ দু'টি ভিন্ন গোষ্ঠী হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে ভাব বিনিময় ও বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠালাভ ছিল সু সম্পর্কেরই ফল। রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে তখনকার সময়ে পারস্য ছিল মধ্যস্থতাকারী একটি দেশ। সে থেকেই ভারত অঞ্চলের সাথে পারস্যের সম্পর্ক বহু দিনের।[১] পারস্যের খসরু নওশিরওয়ান এবং খসরু পারভেজের সময়ে বহু ইরানি পণ্ডিত ও জ্ঞান-গৌরবের অধিকারী ব্যক্তিগণ ভারতে ভ্রমণ করেছিলেন। তখন তাঁদের শুধু নিছক ভ্রমণই উদ্দেশ্য ছিলনা, তাঁরা তখন ভারত থেকে সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উত্তম চরিত্রমূলক গ্রন্থ সাথে করে নিয়ে যান। সেগুলোর অনুবাদ পাহলবি ও ফারসি ভাষায় করা হয়।[২] বহু খোরাসানি সে সময় ভারতে জ্ঞান অন্বেষণের জন্য হিজরত করেছেন। বিশেষত বাদশাহ নওশিরওয়ান (৫৩০ খ্রি.-৫৭৮ খ্রি.) এক চিকিৎসককে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, তিনি যেন পাক-ভারত থেকে ডাক্তারি বিষয়ের উপর সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থ আনয়ন করে পাহলবি ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। ভারত

Dhaka University Institutional Repository

থেকে সংস্কৃত ভাষার সাহিত্যমূলক যে পুস্তিকাটির পাণ্ডুলিপি পারস্যে এসেছিল এটির নাম *কালিলে ওয়া দিমনে*[৩]। এটি পারস্যে প্রথমে পাহলবি ও পরে ফারসি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। সে থেকে জ্ঞান আহরণের মাধ্যম হিসেবে সংস্কৃত ভাষা ফারসি সাহিত্যে স্থান করে নেয়। ফারসি সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসারের ক্ষেত্রে এসব সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থ ইতিহাসে কম গুরুত্ব রাখেনা। ভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির উপর ফারসির প্রভাবের বিষয়টি এভাবেও দেখা যেতে পারে। বহুদিন ধরেই ভারতীয়রা ফারসি ভাষার সাথে সুগভীর সম্পর্ক রেখে চলেছেন। পারস্য থেকে আগত যেসব শ্রেণির মানুষ এ অঞ্চলে বসবাস করত তাঁদের সংশ্রবে ভারতীয়রাও ধন্য হত। বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলেও তাঁদের আসা-যাওয়া ছিল প্রচুর।

ইসলাম পূর্বযুগে জরথুস্ত ধর্মের অনুসারীগণ বিভিন্ন সময় ভারতের পশ্চিম অঞ্চলে হিজরত করেছিলেন। অনেক পর্যটকদের নিকট স্পষ্ট যে, ভারতবাসী আর্য সম্প্রদায়ের সাথে পারস্যের অগ্নি উপাসকদের মধুর সম্পর্ক ছিল। তখন তাঁরা ভারতে কিছুদিন অবস্থান করার পর কান্দাহার ও পারস্যে বসতি গড়ে তুলেন।[৪] তাঁদের নির্মিত অগ্নিমন্দির পবিত্র স্থান ও উপাসনালয় হিসেবে প্রসিদ্ধ। গুযরাট, মুম্বাই ও করাচিতে অগ্নিমন্দির বিদ্যমান থাকায় তাঁদের বংশধর এ এলাকায় বসবাসের প্রমাণ মিলে। জরথুস্ত অনুসারীদের ভারত ও পাকিস্তানে 'পারশি' বলে অভিহিত করা হয়।[৫] এ থেকেও এ অঞ্চলের সাথে পারস্যের প্রাচীন সম্পর্কের কথা জানা যায়। পারস্যের সাথে বঙ্গীয় অঞ্চলের সম্পর্ক বহু পূর্ব থেকেই বিদ্যমান রয়েছে। মধ্যযুগের ভারত তথা বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সাথে বর্তমান যোগাযোগের সূত্র ধরেই তা অনুমান করা যেতে পারে। বোখারা, বালখ, খোরাসান, ফারেস ও আফগানিস্তান থেকে বহু পর্যটক ও ব্যবসায়িক ভারতের উত্তর পশ্চিমের ঘিরিপথ দিয়ে এ অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম উপকূলের বন্দর দিয়েও তাঁদের প্রচুর যাতায়ত ছিল।[৬] এ সময় তাঁরা বাংলাদেশের সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থান করত। বহু পারস্য অধিবাসী চট্টগ্রামে বসবাস করার সময় স্থানীয়দের সাথে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করেও জীবন-যাপন করেছেন। এ অঞ্চলের মানুষ বর্হিজগতের সাথে সম্পর্কের কারণে যেমনিভাবে ধর্মীয় সংস্কৃতিতে জড়িয়ে পড়ে তেমনি তাঁদের শিক্ষা ও সাহিত্যের সাথে যোগসূত্রতা সৃষ্টি করতে তৎপর হয়ে ওঠে। বিশেষ করে এ অঞ্চলে ইসলামের আলো ছড়িয়ে যাবার পর পারস্যের যুগশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, ফকিহ, আলেম, সুফি-সাধকদের সাথে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতার মাধ্যমে সে সম্পর্কের মাত্রা অধিকহারে বৃদ্ধি পায়। তখনকার পারস্যের রাজকর্মচারীরাও এখানে বসবাস করতে অপারগতা দেখাননি। মোঙ্গলদের পারস্য আক্রমণের সময় অনেক পারস্য অধিবাসী নিজ বাসস্থান পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হন। এসময় বহু পারস্যের নাগরিক

ভারতে আশ্রয়গ্রহণ করেন। সে সুবাদে কিছুসংখ্যক নাগরিক বাংলাদেশেও বসবাস করেন।[৭] বাংলাদেশ তাঁদের নিকট একটি পরিবেশ সম্মত দেশ ছিল। এ দেশের প্রতি তাঁদের অধিকতর স্নেহ, মমতা ও ভালবাসা থাকায় পরস্পরের মধ্যে একটি সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

## ইসলাম ধর্মের যোগসূত্রতা

পারস্যদের ধর্মের সাথে নিবিড় সম্পর্ক বহু পূর্ব থেকেই বিদ্যমান রয়েছে। পারস্যের সাসানি বাদশাহ তৃতীয় ইয়াযদেগারদ ( ৬৩২ খ্রি.-৬৫২ খ্রি.) নিহতের মাধ্যমে সাসানি রাজত্বের অবসান হয়। তারপর থেকে পারস্য একটি ইসলামি দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য অগ্রসর হতে থাকে। আরবরা পারস্যের বিভিন্ন অঞ্চল জয়ের মাধ্যমে তাঁদেরকে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দেয়। ২৫৪ হিজরি সালে ইয়াকুব লাইস সাফফার পারস্যকে একটি স্বতন্ত্র দেশ হিসেবে পরিণত করেন। এ সময় তিনি ফারসি দারিকে পারস্যের জাতীয় ভাষা হিসেবে ঘোষণা দেন।[৮] বলা বাহুল্য যে, সাসানি রাজত্বের অবসান ও সাফ্‌ফারি শাসনের ভিত্তির মধ্য দিয়ে পারস্যের ভাষা ও সাহিত্যের পরিবর্তন সূচিত হয়। এ সময় পারস্যে জরথুস্ত ও মানি ধর্ম সম্প্রদায়ের আদান প্রদানের ভাষা মধ্য ফারসি এবং মুসলমানদের আরবি ছিল। ধর্মীয় ভাষা আরবি চালু থাকার কারণে আরবির অনেক শব্দ ফারসি ভাষায় প্রবেশ লাভ করে। ২৬১ হিজরি সালে নাসর বিন আহমদ সামানি একটি সামান সম্প্রদায় শাসিত দেশের ভিত্তি স্থাপন করেন। এ সময় সামানি শাসকের রাজত্বের কেন্দ্রবিন্দু ছিল বোখারা অঞ্চল। তখন বোখারায় ফারসি দারি সরকারি ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।[৯] সামানি শাসকগণ ফারসি ভাষার উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য সীমাহীন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। এ সময়কালকে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের সূচনাকাল হিসেবে অভিহিত করা হয়। পারস্যের সামানি শাসকের পতনের পর তুর্কিরা দেশ পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তখন ভারতের সাথে তুর্কিদের একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে ছিল। সে সময় শাসন ও রাজ্যক্ষমতা গ্রহণের জন্য প্রয়োজন হত যুদ্ধের। সে ভিত্তিতেই সর্বপ্রথম গজনি রাজবংশ ভারতে আক্রমণ করেন। ৩৫১ হিজরি মোতাবেক ৯৬২ খ্রিস্টাব্দে আলপ্তগিনের অধীন আফগানিস্তানের অর্ন্তগত গজনিতে একটি স্বাধীন দেশের ভিত্তি স্থাপিত হয়। আলপ্তগিন রাজ্য শাসনের জন্য গজনিকেই মনোনিত করেছিলেন। তাঁর সময়ে গজনি প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল এ অঞ্চলের রাজধানীরূপে।[১০] অপরদিকে সাবুক্তগিন ছিলেন আলুপ্তগিনের জামাতা এবং গোলাম। আলুপ্তগিনের মৃত্যুর পর জামাতা সাবুক্তগিন ৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে গজনির সিংহাসনে আরোহণ করেন। গজনি অঞ্চলের পরিধি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল যুগ উপযোগী। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন মাহমুদ ছিলেন সাবুক্তগিনের ছেলে। তিনি ৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করার পর ভারতের সাথে গজনির মিশ্রণ ঘটান।[১১] এ সময়ে ফারসি দারি ভাষা

হিন্দুস্তানে প্রসার পায় এবং এ ভাষাটির বিকাশ লাভ ঘটে। তাঁর সহযোগিতা ও বদান্যতার কারণে গণিতজ্ঞ ও জ্যোর্তিবিদ আবু রায়হান বিরুনি, দার্শনিক ফারাবি, ঐতিহাসিক বায়হাকি ও কবি উনসুরি বহুদিন ভারতে বসবাস করেছিলেন। সুলতান মাহমুদের সময়ে ভারতীয় অঞ্চলে পারস্যদের আসা-যাওয়া অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ৪২৯ হিজরি সালে জাফর বেক ও তাঁর ভাই তুগরুল বেক সালজুকি রাজত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সালজুকি যুগের সূচনা করেন। সালজুকি বাদশাহগণ এশিয়ার বিস্তৃত অঞ্চলের শাসনভার গ্রহণ করে তাঁদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। তাঁদের শাসন দক্ষতা ও কাজের মাধ্যমে ফারসি ভাষা গোটা মধ্য এশিয়ায় বিস্তার লাভ করে।[১২] সালজুকি যুগের পতনের পর ৬৯৯ হিজরি সালে উসমানীয় শাসকরা ক্ষমতা গ্রহণ করলে নতুন চিন্তা-চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এ সময় উসমানি শাসকরা ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ায় রাজত্ব কায়েম করতে এগিয়ে আসেন। তাঁদের এই শাসনকার্য ১৩৪২ হিজরি পর্যন্ত বলবৎ ছিল। তারাও ভারতীয় উপমহাদেশে ফারসি ভাষার প্রচার ও প্রসারে যথেষ্ট তৎপর ছিলেন। এমনকি তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ফারসি কবিতা আবৃত্তি করতেন। সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ ও সুলতান সেলিম (প্রথম) ছিলেন অন্যতম। ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির এই গজনভি ও সালজুকি যুগে তুর্কি ভাষার অনেক শব্দ ফারসি ভাষায় প্রবেশ করে। কারণ এই যে, তুর্কি সৈনিকরা মাতৃভাষা তুর্কি না বলে ফারসি ভাষার চর্চা করতেন এবং তাঁদের ফারসি ভাষার প্রতি পৃথক ভালোবাসা ছিল।[১৩] ভারতের মুঘল বংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবুর (১৪৮৩খ্রি.-১৫৩০খ্রি.) ফারসি ভাষাকে এ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের পথকে আরো সুগম করে দেন।[১৪] তবে এ কথা সত্য যে, ভারত উপমহাদেশে ফারসি ভাষার স্থায়িত্ব লাভে এটি একদিকে যেমন উর্দু ভাষার উদ্ভব ঘটেছে তেমনি আঞ্চলিক ভাষার উপর প্রভাব ফেলেছে। যার ফলে ভারতের অন্যান্য ভাষার মধ্যে ফারসি শব্দের প্রবেশ ঘটেছে বিপুলহারে। এমনকি বাংলা ভাষায় ফারসি শব্দ প্রবেশের সময়ও ছিল এটি।

গজনভি যুগে ভারতে ফারসি ভাষা প্রবেশের সূচনাকাল ছিল বলা যায়। এ সময় গজনিদের ফারসি দরবারি ভাষাও সাহিত্যের ভাষা হয়ে ওঠে। রাজ-দরবারে ফারসি ভাষা ব্যতীত অন্য কোনো ভাষায় কবিতা পাঠ হতো না।[১৫] সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে, মুহাম্মদ বিন কাসেম একজন আরব সৈনিক ছিলেন। তিনি ভারতে ইসলাম প্রচারের জন্য অভিযানের পূর্বে পারস্যের শিরাজে ছয় মাস অবস্থান করেন। ভারতে আক্রমণের জন্য তাঁর যাবতীয় রসদ সামগ্রীর প্রয়োজন ছিল। যুদ্ধের রসদ সামগ্রী সরবরাহের পর তিনি সাগর পথে সিন্ধু প্রদেশে যাত্রা করেন। তাঁর এই অভিযানের সময় বহু ইরানি সৈনিক সাথে ছিল।[১৬] ইতিহাসে ইরানি সৈনিকদের মাধ্যমে তাঁর ভারত বিজয়ের কথা উল্লেখ

নেই। এসব ইরানি সৈনিক যে নিঃসন্দেহ ভারতে ফারসি ভাষা ব্যবহার করেছিলেন তা বলা যায়। বিশেষত ভারত উপমহাদেশের এই সিন্ধু নগরীতে প্রথম বার দলে দলে ইরানি সৈনিকরা ফারসি ভাষা ব্যবহার করেছেন। এটি ভারতে ইসলাম প্রচারের সময় ফারসি ভাষা ব্যবহারের উজ্জ্বল প্রমাণ।[১৭] ইতিহাসের সূত্র মতে, ভারত ভূখণ্ডে ইসলাম আগমনের প্রথম পর্যায়ে বিভিন্ন সময় ইরানীয়রা হিজরত করেছেন। ভারতের শাসনকালে গজনভি, মুঘল ও সাফাভি শাসনকাল অন্যতম। উক্ত সময়কালে ভারতের সাথে পারস্যের সম্পর্ক অনেক উন্নত ছিল। উল্লেখ্য যে, ১৫৪১ খ্রিস্টাব্দে বাদশাহ হুমায়ুন ইরানে সফর করেছিলেন। তিনি সফর শেষে দেশে ফিরে এলে তাঁর সাথে বহু সৈন্য, আলেম, বুদ্ধিমান ও পরামর্শদাতা সঙ্গে ছিল। তাঁর সফরের পর থেকে ইরানের সাথে হিন্দুস্তানের সম্পর্ক অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে।[১৮] এ থেকেও আমরা ভারতীয় অঞ্চলে ফারসি ভাষার একটি সুবিশাল ক্ষেত্র স্থানের ধারণা পেতে পারি।

## ইরানিদের আগমন

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে শের শাহের সাথে যুদ্ধে পরাজয়ের পর পরই বাদশাহ হুমায়ুন ইরান সফর করেছেন। তিনি ইরান সফর শেষে ফেরার পর ভারতে বিস্তৃত পরিসরে ইরানি নাগরিকদের বৃদ্ধি ঘটেছে। ইরানের প্রসিদ্ধ কবি উরফি, নাজিরি, চিত্রশিল্পী খাজা আবদুস সামাদ, মীর আলি ফারাহ ও পরামর্শক আলি মুরদান আশক খান তাঁর সময়ে ভারতে এসেছিলেন।[১৯] তখন তাঁরা বিভিন্ন সময় সভা-মজলিস, বৈঠক ও সাহিত্য সংস্কৃতির আসরে ফারসি ভাষায় বক্তব্য প্রদান করতেন। ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন ওয়াজ-মজলিসে যে সব বক্তব্য প্রদান করা হতো তা ছিল ফারসি ভাষায়। সুর করে কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে মানুষকে ধর্ম ও সুফিদের পথে আকর্ষণ করা ছিল তাঁদের অন্যতম দায়িত্ব। বিশেষত মুঘল আধিপত্যকালীন সময়ে ইরানিদের সবসময় ভারতে প্রবেশ ও তাঁদের আসা-যাওয়া স্বাভাবিকভাবেই প্রমাণ করে যে, তখন ভারত অঞ্চলে ফারসি ভাষার উন্নতি কোন্ পর্যায়ে ছিল। এ কথা সত্য যে, ফারসি ভাষার চর্চা কোনো সময়েই একটি নির্দিষ্ট স্থানে একই গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিলনা। ধর্ম সভা, শিক্ষাকেন্দ্র, মসজিদ-মক্তবে এবং রাজনৈতিক সভায় ফারসি ভাষার আলোচনা ও কথোপকথন ছিল একটি প্রধান বিষয়। যে কোনো আলোচনা সভায় শুধু দেশের পরিস্থিতি বা সমস্যা নিয়ে আলোচনা হতো না সেখানে কবিতা পাঠ, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিষয় নিয়েও আলোচনা হত। এসবের কোনো না কোনো স্থানে ইরানিদের অংশগ্রহণ ছিল খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। সে সুবাদে ভারতীয় অঞ্চলে ফারসি ভাষার চর্চার প্রসঙ্গটি সহজেই এসে যায়। বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলেও এর প্রভাব ছিল ঈর্ষাণীয়। কবিতা প্রচারের যে বড় মাধ্যম ছিল বাদশাহদের রাজকীয় দরবার, সে স্থানটি

সীমাবদ্ধ থাকেনি। যে কোনো বয়সের ও শ্রেণির লোকেরা রাজদরবারে ফারসি চর্চা করতে পারত। তখন ব্যক্তিকেন্দ্র ও বিভিন্ন ধরনের জলসায় ফারসি কবিতা পাঠ হত। কবিতা পাঠে যশ-খ্যাতি ছিল এবং দরবারে কবিতা পাঠের পর কবিকে পুরস্কার ও সাহায্য দেয়া হত।[২০] এটিও ফারসি ভাষায় কাব্যচর্চাকে অধিকতর গতিময় করে তোলেছে। কাব্য সাহিত্যের সমৃদ্ধি ও প্রসারের ক্ষেত্রে কবিদের কাব্যচর্চা আঞ্চলিক ভাষায় বড় প্রভাব রাখে। এ ছাড়া আশ্রয়কেন্দ্র ও খানকায় কবিতা পাঠ হতো প্রচুর। সে স্থানে সুফি ও আরেফগণ কবিতা পাঠ করতেন। সেখানে যারা যাতায়াত করতেন তাঁদের হৃদয়চক্ষু পরিপূর্ণতায় সিক্ত হত।[২১] এ ভাবেই গোটা ভারত অঞ্চলে ফারসি ভাষার প্রসার ও চর্চা এগিয়ে যায়। মুসলিম শাসনের শুরু থেকেই ইরানি কর্মচারিরা এ দেশে শাসনকার্যের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তাঁরা রাজকার্যের বিভিন্ন পদে থেকে দায়িত্ব পালন করে যেতেন এবং ফারসির চর্চা করতেন।[২২] ইরানীয়দের কাব্যচর্চার ধারাটি কখনো গতিহীন ছিলনা। তাঁদের চর্চার মধ্য দিয়ে অনেকের পত্র রচনা, প্রবন্ধ ও ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি পড়েছিল। কাব্যচর্চার এই চক্রের মধ্যেও ইতিহাসের বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এটি ছিল সাহিত্য চর্চার একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত। ফারসি পদ্যরচনার চেয়ে গদ্যরচনার পরিসর বৃদ্ধি পেয়েছিল মুঘল আমলে। মুঘল আমলে ফারসি ভাষা চর্চার উন্নত পরিবেশ সৃষ্টিতে একদিকে কবি সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে অন্যদিকে ঐতিহাসিকদের ইতিহাস চর্চা বিশেষ সাফল্য রাখে।[২৩] ইতিহাসের রচনাগুলো একটি সমৃদ্ধ ও গুণগত মানে পৌঁছেছিল বলে ইতিহাসভিত্তিক গদ্য রচনাগুলো অনেকাংশেই শ্রেষ্ঠ ও তথ্যবহুল হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও অনেক পণ্ডিত লেখক ইরানি বা ইরানি বংশের ছিলেন।

## বহিরাগত মুসলমানদের প্রভাব

বাংলার সাথে পারস্য উপসাগর ও ইরাকের বহুদিন ধরেই যোগাযোগ ছিল। এ যোগাযোগের ফলে বাংলার মুসলমানদের আচার-আচরণ ও শিল্প সাহিত্যে সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রভাব পড়ে। মুঘল-পূর্ব সময়কালে বাংলার সামাজিক জীবনে যে পরিবর্তন সূচিত হয় তা ছিল মূলত বহিরাগত মুসলমানদের প্রভাব। বিভিন্ন প্রকার ফারসি পুস্তকের উপস্থিতি ও ভাষা-সংস্কৃতির উন্নয়ন অন্যতম প্রমাণ। এ সময়ে শিক্ষা ও অনুশীলন কেন্দ্রে ব্যাপকভাবে ফারসি চর্চা হত। বাংলার অধিবাসীগণ ফারসি ভাষা শিক্ষার প্রতি আগ্রহী ছিলেন। বিশেষ করে ফারসি কাব্যসাহিত্য তাঁদেরকে বেশি প্রভাবিত করেছে। বখতিয়ার খলজির বংগ বিজয়ের পর থেকে বিভিন্ন অঞ্চলের অনেক ফারসিভাষী শিক্ষিত পণ্ডিত, আলেম, দরবেশ, সুফি, ব্যবসায়ি ও সাধারণ শ্রেনির অগণিত জনসাধারণ বাংলায় প্রবেশ করেছে।[২৪] তাঁরা যে উদ্দেশ্যই প্রবেশ করুক না কেন তাঁরা বাংলায় ফারসির ব্যবহার ও চর্চায় লিপ্ত ছিলেন। ইস্পাহানি,

বোখারি, সামারকান্দি, খোরাসানি ও তাবরিজি উপাধিধারী লোকেরা এখানে এসে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। কেউ কেউ বসতি স্থাপন করার পর নিজের দেশে আর ফিরে যাননি। অসংখ্য ইরানি, আফগানি, বাংলায় বসবাস করেছিল। যাদের পরিচয় জানা একেবারে অসম্ভব হলেও বিষয়টি প্রমাণের জন্য একটি হিসেব উল্লেখ করা প্রয়োজন। ঐতিহাসিক এম. এ রহিমের একটি গবেষণামুখী তথ্যে তা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় যেসব মুসলমান বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছেন তাঁদের নিয়ে একটি বাস্তবমুখী আলোচনা তাঁর ইতিহাসমূলক গ্রন্থে উপস্থাপন করেছেন। মূলত বাংলার অধিবাসী কারা ছিল এবং আদি বসতি হিসেবে কাদেরকে মূল্যায়ন করা যেতে পারে, সে বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। এটা সত্য যে, বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলেই মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে সবচেয়ে অধিক। তাঁর আলোচনায় আগত মুসলমানদের সংখ্যাটি হল নিম্নরূপ।

আগত মুসলমান জনসংখ্যা[২৫]

| আরব | ইরানি | খলজি-তুর্কি | ইলবারি-তুর্কি | কররাণি | আবিসিনীয় | আফগান | মুঘল |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৬৪,০০০ | ১,৯৮,০০০ | ১৬,০০,০০০ | ৪,২০,০০০ | ১,২০,০০০ | ৩২,০০০ | ৮,০০,০০০ | ৩৭,৫০০ |

এ তথ্যে বাংলায় আগত মুসলমানদের মধ্যে ইরান ও পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের একটি বিশাল সংখ্যা ফুটে ওঠেছে। তাতে আরবীয় মুসলমানদের সংখ্যা একেবারেই কম। মাতৃভাষা ফারসি ও তুর্কি ভাষার মধ্যে বিশাল একটা প্রভেদ নেই। এ ছাড়া আরব ব্যতীত আফগান ও মুঘল নাগরিক ফারসি ভাষায় কথা বলতে পারদর্শী ছিলেন।[২৬] এতে অনুমান হয় যে, আগত এই বিশাল জনসংখ্যার দ্বারাই বাংলাদেশে ফারসি চর্চার ধারা বেগবান হয়েছে। মুঘলদের আগমনের পূর্বেও বহিরাগতদের মাধ্যমে ফারসি ভাষা চর্চার ধারা অব্যাহত ছিল। গবেষক আবদুর রহিম বাংলায় বসবাসকারী ইরানি পণ্ডিত ও বিদ্বান ব্যক্তিদের একটি নামের তালিকা তুলে ধরেছেন। যেমন– মুহম্মদ আল মুদাবেদ আলি, শাহ মুহম্মদ হাসান, সৈয়দ মুহাম্মদ আলি, হাজি বদিউদ্দিন, মীর মুহাম্মদ আলি ফজল, নকি আলি খান, মীর মুহম্মদ আলিম, মৌলভি মুহাম্মদ আরিফ, মীর রোস্তম আলি, শাহ মুহাম্মদ আমিন, শাহ আদম, হায়বৎ বেগ, শাহ খিজির, সৈয়দ মীর মুহাম্মদ সাজ্জাদ, সৈয়দ আলিম উল্লাহ, শাহ হায়দরি, মীর মুহাম্মদ আলি, জায়ের হোসেন খান, হাজি আবদুল্লাহ, আলি ইব্রাহিম ও হাজি ইব্রাহিম মুহাম্মদ খান প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। এসব ফারসিবাসী মুসলমানদের বাংলায় অবস্থানের ফলে ফারসি ভাষার চর্চা ও প্রসার লাভ হওয়া ভিন্ন কোনো বিষয় নয়। তাঁদের আগমনের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় যে অনায়েসে ফারসি ভাষা প্রবেশ করেছে সেটিও বাংলাদেশে ভাষা সংস্কৃতির একটি পরিবর্তনীয় লক্ষ করা যায়। অবশ্য

Dhaka University Institutional Repository

শাসকগোষ্ঠীর উৎসাহদান ও সহযোগিতা ছিল এ চর্চার অন্যতম বড় সাফল্যময় দিক।[২৭] তবে এ কথা নিশ্চিত সত্য যে, প্রথম দিকে বাংলাদেশে বহিরাগতদের দ্বারায় ফারসি চর্চা অব্যাহত থাকলেও পরবর্তীতে স্থানীয়রাও ফারসি চর্চার প্রতি এগিয়ে আসেন।

## প্রভাব ও অনুকরণ

ভারতীয় অঞ্চলে পারস্যের একটি প্রভাব সব সময় ছিল। এটি ভাষা, ধর্ম, সাহিত্য সংস্কৃতি –সকল ক্ষেত্রেই বিরাজমান থাকে। দেশের সম্ভ্রান্ত ও বুনিয়াদি মুসলিম পরিবার পারস্যের ভাষা-সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ইসলামের ভাষা হওয়ার কারণে ফারসি ভাষাটির প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধাশীল হওয়া অন্যতম কারণ। মুসলমান সম্ভ্রান্ত পরিবারের ব্যক্তিরাই তাঁদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষার জন্য মক্তব বা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[২৮] সোনারগাঁয়ে শেখ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা ও পাণ্ডুয়ার শেখ নুর কুতুব আলমের মাদ্রাসা অন্যতম প্রমাণ রাখে। অনেক মাদ্রাসা, মসজিদ ও খানকা প্রতিষ্ঠার জন্য সুলতানগণ জমি বরাদ্দদান ও সহযোগিতা করেছেন। যদিও এসবের অনেক তথ্য বর্তমানে নেই। এসব প্রতিষ্ঠানে ফারসি ভাষা দেদার চর্চা হত।

আধুনিক হিন্দু পণ্ডিতগণ স্বীকার করে নিয়েছেন যে, মুসলমানরা তুর্কি, পশ্‌তো, আরবি ও ফারসি ভাষা আনয়ন করেছে। অথচ শুধু ফারসি ভাষাই একটি সর্ব্বোচ্চ স্থান দখল করে নিতে সক্ষম হল। এর কারণ হিসেবে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন

> ইহার কারণ এই যে, এ দেশে তুর্কী ও পশ্‌তো যখন চলিত, তখন এই দুই ভাষা ঘরোয়া ভাষা হিসাবেই বিজেতা তুর্কী ও পাঠানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল;-ভারতের মুসলমান বিজেতাদের পোষাকী বা দরবারী ভাষা গোড়া হইতেই ফারসী ছিল। ফারসী-ভাষী মুসলমান অধিক পরিমাণে ভারতে না আসিলেও ফারসীর ছাপ সিন্ধী, পঞ্জাবী, হিন্দী, বিহারী, বাঙ্গালা ও মারাঠীতে যতটা পড়িয়াছে ততটা আর কোনও বিদেশী ভাষার নয়।[২৯]

তাঁর এই মন্তব্যে প্রত্যক্ষভাবে ভারতীয় ভাষায় ফারসি ভাষার প্রভাব পরিস্কার হয়ে ওঠেছে। এটা স্পষ্ট যে, ফারসি ভাষা ভারতীয় সংস্কৃতিতে প্রবেশের কারণে একটি পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। তখন হিন্দু সংস্কৃতির ব্যক্তিরাও আরবি, ফারসি, তুর্কি ও উর্দু ভাষাকে মুসলমান সভ্যতার বাহন হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছিল। যদিও প্রথমদিকে হিন্দুরা রাজভাষা ফারসিকে তেমন গুরুত্ব সহকারে মূল্যায়ন করত

Dhaka University Institutional Repository

না। তাঁদের নিকট ফারসি ছিল মুসলমানি ভাষা। এ ভাষা শিক্ষালাভ করলে জাত ও মান উভয়ই ভেস্তে যাবে। তবু তারা মুসলমানদের অনুসরণ করে চাকুরি লাভের জন্য ফারসি শিক্ষালাভ করত। এ কথা সত্য যে, মুসলমান আমলে সবার নিকট ফারসি ভাষা গ্রহণীয় পর্যায়ে ছিল।

## ২. বাদশাহ ও শাসক শ্রেণির ফারসি চর্চা

### রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ

ভারতীয় উপমহাদেশে শাসন, সমাজ, ধর্ম ও সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে উত্তরাধিকার মুসলমান শাসকরা রেখে গিয়েছেন ভারতীয়রা সে অংশের আলোকেই পরবর্তী সময়ে পথ চলতে সহায়ক হয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশে তাঁদের সেই অবদানগুলো পরিস্ফুট।[৩০] গজনভি যুগ (৩৫১ হি.-৫৮২ হি.), তুঘলকি যুগ (৭২০ হি.-৮১৫ হি.), খলজি যুগ ও লোদি সময়কাল (৮০১ হি.-৯৩০ হি.) কোনোটিই ইরানি সংস্কৃতি ও ফারসি চর্চার সীমারেখার বাইরে ছিলনা। বিশেষ করে বাংলায় সুলতানি আমল (১২০৪ খ্রি. -১৫৭৫ খ্রি.) ও মুঘল আমল (১৫৭৬ খ্রি.-১৭৫৭ খ্রি.)- এর শাসক ও রাজা-বাদশাহগণ তুর্কি, মুঘল বা ইরানি বংশোদ্ভূত ছিলেন। তাঁদের শিক্ষা, মেধা ও জ্ঞান ভারতীয় সমাজকে পূর্ণতা দানের ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে। শিক্ষা-সংস্কৃতিতে অবদানের জন্য তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও ঐতিহ্য ছিল। সে ঐতিহ্য ফারসি ভাষার লালন ও চর্চাকে পৃথক করে নয় বরং সমৃদ্ধির মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলা যায়। এটি এমন একটি সময়কাল যে সময়ের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। সেখানে অনেকের আবদান এত বেশি যে, তা দু' কলম লিখে আদৌ সমাপ্ত করা সম্ভব নয়।

সুলতান মাহমুদ গজনভি ছিলেন একজন তুর্কি বংশোদ্ভূত শাসক। অথচ তাঁর রাজধানি যখন আফগানিস্তানের গজনিতে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা হয়, তখন এটি ফারসি চর্চার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে।[৩১] তাঁর যুগে (৯৯৭ খ্রি.-১০৩০ খ্রি.) ভারতীয় উপমহাদেশে ফারসি ভাষার চর্চা ও প্রসারের একটি সুন্দর অবস্থান সৃষ্টি হয়েছে। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন যে, এই ভারতীয় উপমহাদেশে বিজয়বেসে ইসলাম ও ফারসি ভাষাকে একটি গ্রহণযোগ্য স্থানে রেখে যেতে সমর্থ হন। তাঁর চেষ্টা ও চিন্তার কারণেই উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে দ্রুত ফারসি ভাষার প্রসার ঘটেছে।[৩২] ফারসি ভাষার ভিত্তি ইরানের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে কখনই দুর্বল ছিলনা। কিন্তু তিনি ভারতে তাঁর রাজত্ব সুদৃঢ় করতে গিয়ে ফারসি ভাষাকেও অধিকতর শক্তিশালী ও প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর সম্পর্কে ইংরেজি লেখক J. Rypka বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

> The earlier phase of Islamic contact with India goes bsck to the eighth century; but it was little more than prelude. In fact Islam began to take root only with Mahmud of Ghazna whos Indian policy was continued by his successors and, later, members of other dynasties; though all were Turkish, they brought the Persian Language and customs of India with their courts,[33]

এ উক্তিতে এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, সুলতান মাহমুদের রাজকৌশল যেমন ছিল অত্যন্ত শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তেমনি ফারসি ভাষার প্রসার ও উন্নয়নে এ বাদশার ভূমিকা ছিল সুদুর প্রসারী। তাঁর সময়কালে দেশের শাসক ও দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি থেকে শুরু করে প্রশাসনের সবাই ফারসি ভাষার প্রতি উদার ছিলেন। তাঁর যুগ থেকেই প্রশাসনিক ও দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ফারসির প্রচলন শুরু হয়। প্রশাসনের অনেক কর্মকর্তা মধুর ও ভালবাসার টানেই ফারসি ভাষা শিক্ষালাভ করতেন। রাজ্যের কথ্য ও লেখ্য ভাষা হিসেবে ফারসি ভাষার প্রচলন শুরু হওয়া এটি তাঁর এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ।[৩৪] এ কথা সত্য যে, সুলতান মাহমুদের দরবারে যেমনি জ্ঞানী-গুণীদের সম্মান জানানো হত তেমনি তাঁদের জীবন-যাপনের জন্য প্রচুর ধন-দৌলত উপহার প্রদানে কমতি ছিলনা। তাঁর দরবারে কবিদের শুধু উপস্থিতিই নয় নিয়মিত কবিদের আসর ও কবিতা চর্চার মিলনমেলা বসত। কবিরা যে ফারসি ভাষায় কবিতা রচনা করে তৃপ্তিলাভ করতেন, সেটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়! এটি একটি সুলতান মাহমুদের অবদানের মূল্যায়িত বড় আলোচিত বিষয়। এটা ঠিক যে, অনেক কবি তাঁর প্রশংসায় কবিতা আবৃত্তি করতেন। তখন সুলতান মাহমুদ খুশি হয়ে তাঁদের এনাম দিতেন।[৩৫] যেসব কবি তাঁর দরবারকে মুখরিত করে রাখত এসব কবির একটি বর্ণনা বহু গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। আব্বাস ইকবাল আশতিয়ানি *তারিখে ইরান পাস আয ইসলাম* গ্রন্থে তদ্রুপ কবিদের নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন–কবি উনসুরি বালখি, ফররুখি সিস্তানি, উসজুদি মারওয়াজি, যায়নাবি উলুভি, ফেরদৌসি তুসি, মানসুরি সামারকান্দি, কাসায়ি মারওয়াজি, গাযায়েরে রাযি প্রমুখ।[৩৬] তাঁর রাজদরবারে সবসময় অসংখ্য কবির উপস্থিতি ও কবিতা আবৃত্তি ভারতীয় অঞ্চলের সাহিত্য সংস্কৃতি উন্নয়নের বড় দিক। এসব কবি শুধু গজনি বা সিন্ধের অধিবাসী ছিলেননা হেরাত, বালখ, খোরাসান, রেই, ইত্যাদি অঞ্চল থেকেও সমবেত হতেন। সে সময়ে ইরানের জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ ভারতে আগমন করেন। তন্মধ্যে আবু রায়হান বিরুনি ছিলেন অন্যতম পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি ১০১৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সাথে ভারতে এসেছিলেন।[৩৭] এ সময় ইরান ও ভারতের মধ্যে ভাষা-সংস্কৃতি উন্নতির যুগান্তকারী সূচনা ঘটেছিল। ভারত অঞ্চলে ধর্ম ও ভাষা সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে পণ্ডিত ব্যক্তিদের আগমন বিশেষভাবে প্রভাব রাখে। তিনি ভারতের সাথে পারস্যের ব্যবসা-বাণিজ্য নতুন করে সৃষ্টির লক্ষে যাতায়াত ব্যবস্থার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তাঁর সময়ে পারস্যের নিশাপুর ও খোরাসান থেকে বহু ইরানি ভারতের

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন অঞ্চলে অবাদে আসা যাওয়া করত।[৩৮] যদিও তাঁদের আগমনের কারণ ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য ও দু' দেশের মাঝে সুসম্পর্ক স্থাপন করা।

ফারসি ভাষা চর্চার উন্নতি ও বিকাশ লাভে সুলতান শাহাব উদ্দিন মুহাম্মদ ঘোরির অবদান অনেক। দ্বাদশ শতকে মুসলমানদের ভারত জয়ের সাথে ফারসি ভাষার চর্চার ধারা অব্যাহত ছিল। তিনি হিন্দু রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে উত্তর ভারতে মুসলমান রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন– এটি তাঁর একটি বড় কৃতিত্ব। তাঁর দরবারে যেসব কবি ও সাহিত্যিকের সমাবেশ ঘটত তন্মধ্যে অন্যতম হলেন– তাজ উদ্দিন হাসান, রোকনুদ্দিন হামযাহ, শিহাব উদ্দিন মুহাম্মদ, রাশিদ নাযাকি, মারাগি ও কাজি হামিদ বালখি অন্যতম। তাঁদের কাব্যচর্চা শুধু রাজ-দরবারকে মুখরিত করে তুলেনি অন্যান্য কর্মমুখর স্থানেও প্রভাব পরত।[৩৯] সুলতান ফারসি ভাষাকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দিতেও অসাধারণ ভূমিকা রাখেন। তাঁর অন্যতম বড় কৃতিত্ব হল, তাঁর সিপাহসালার বখতিয়ার খলজি বাংলা বিজয়ের মাধ্যমে ফারসি ভাষাকে বাংলায় প্রতিষ্ঠা করেন।

ফিরোজ শাহ তুঘলুক (১৩৫১ খ্রি.-১৩৮৮ খ্রি.) ছিলেন একজন সাহিত্যসেবী সুলতান। তাঁর ইতিহাস চর্চার প্রতি অনুরাগ ছিল বেশি। সেসময়ে যারা সাহিত্য চর্চা করতেন তাঁদেরকেও বিভিন্ন সময় সহযোগিতা করতে দ্বিধাবোধ করতেননা। ঐতিহাসিক জিয়া উদ্দিন বারানি ও আফিফ তাঁর সময়ে ইতিহাসের দু'টি বই রচনা করেছেন। উল্লেখ্য যে, তাঁর আদেশে সংস্কৃত ভাষার বহু গ্রন্থ ফারসি ভাষায় অনুবাদ হয়।[৪০] বস্তুত ফারসি ভাষা ও সাহিত্যচর্চা তার আমলেও একটি গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে বিদ্যমান ছিল।

বাদশাহ সিকান্দর লোদি (১৪৮৯ খ্রি.-১৫১৭ খ্রি.) একজন কবি হিসেবে খ্যাত। স্বভাবত কবিতা আবৃত্তি ও কবিদের প্রতি উদার দৃষ্টি তাঁর এ গুণকে অধিক গুণে আখ্যায়িত করেছিল। কবিদের কবিতা রচনায় অনুপ্রেরণা ও পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনেক। এ বাদশাহ'র কবি নাম ছিল গুলরুখ। এ নামে তিনি পুরনো ধারায় কবিতা রচনা করতেন।[৪১] তাঁর দরবারে যেসব জ্ঞানী, পণ্ডিত ও কবিদের সমাগম হত তন্মধ্যে মাওলানা জামালি, মাওলানা শোয়াইব ছিলেন অন্যতম। তিনিই সর্বপ্রথম হিন্দুদের ফারসি শিক্ষার ব্যবস্থা করে ছিলেন। তাঁর সময়ে ভারতের হিন্দুরা ফারসি শিক্ষার প্রতি উৎসাহ পেয়েছিল। তিনি হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সকলের জন্য ফারসি শিক্ষা একটি উপযোগী শিক্ষা হিসেবে চালু করেন। হিন্দুদের মধ্যে ব্যাপক ফারসি চর্চা তাঁর শাসনামল থেকেই শুরু হয়।[৪২]

একজন কর্মট, পরিশ্রমী ও জ্ঞানপিপাসু বাদশাহ হিসেবে জহীর উদ্দিন মুহম্মদ বাবুরের (১৫২৬ খ্রি.-১৫৩০ খ্রি.) অবদান অনেক। বলা যেতে পারে যে, জ্ঞান ও শিক্ষা তাঁর মর্যাদাকে অনেক উঁচুতে সমুন্নত করেছে। তিনি আরবি, তুর্কি, ফারসি ও হিন্দি ভাষা সমানভাবে জানতেন। তবে তাঁর ফারসি কাব্যের সাথে গভীর সম্পর্ক ছিল। তিনি ফারসি ভাষায় কবিতা আবৃত্তিতে স্বাচ্ছন্দবোধ করতেন। তাঁর কয়েকটি নীতিধর্মীমূলক মসনবি রীতির কবিতা পাওয়া যায়।[৪৩] তিনি যাদের পরামর্শ ও জ্ঞান-শিক্ষা গ্রহণ করতেন তন্মধ্যে শেখ মাজিদ, খোদাই বারদি, বাবা কুলি খান, মাওলানা আবদুল্লাহ কাজি অন্যতম। তাঁর জ্ঞান আহরণের অন্যতম বিষয় ছিল কুরআন শরীফ পাঠ, *গোলেস্তানে সাদি*, *শাহনামা ই ফেরদৌসি*, *জাফর নামে*, *তাবাকাতে নাসিরি* এবং কবি নেজামি ও আমির খসরুর কাব্যগ্রন্থ।[৪৪] তাঁর তুর্কি ভাষায় রচিত *ওয়াকিয়াতে বাবরি* একটি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ। এটি বিশ্বসাহিত্য দরবারে উন্নত গ্রন্থ হিসেবে সমাদৃত হয়েছে। সবচেয়ে তাঁর প্রশংসনীয় গুণ হল অকপটে কবিতা বলে মানুষকে মুগ্ধ করে রাখা। তিনি কবি হাফেজ শিরাজি, শেখ সাদি ও আবদুর রহমান জামিকে অনুসরণ করে গজল কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর একটি ফারসি ভাষায় *দিওয়ান* রয়েছে। সে *দিওয়ানে* অনেকগুলো কবিতা স্থান পায়।[৪৫] তিনি কাব্যে মুবীন (مبین) নাম দিয়ে মসনবি রচনা করতেন। তাঁর ছন্দ বিষয়ে অপরিসীম দক্ষতা ছিল। এই গুণী বাদশার সাথে যেসব ব্যক্তির ঘনিষ্ঠতা ছিল তন্মধ্যে আতশ কান্দাহারি, শায়খ মুহম্মদ গাউস গোল ইয়ারি ও যায়নুল আবেদীন ওফাই অন্যতম। তাঁরা প্রত্যেকেই দরবারি লেখক, আলেম ও কবি হিসেবে খ্যাত ছিলেন।[৪৬] তিনি যে একজন দক্ষ ও ভাল মানের সাহিত্যিক ছিলেন তা বোধ করি বলার অপেক্ষা রাখেনা। ভারতের একজন বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও নিয়মিত কবিতা রচনা করতেন যা তাঁর প্রতিভাময়ী গুণকে অধিকতর গৌরবে সমাসীন করে তোলেছে।

নাসির উদ্দিন মোহাম্মদ হুমায়ুনের (১৫৩০ খ্রি.-১৫৫৬ খ্রি.) বহুপ্রতিভাময়ী বাদশাহ হিসেবে খ্যাতি রয়েছে। তাঁর মাতা একজন তুর্কিভাষী হয়েও ফারসি ছিল তাঁর প্রিয় ভাষা। ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ভালবাসা তাঁকে 'হুমায়ুন' অর্থাৎ স্থায়িত্বদান করে রেখেছে। তিনি একটি কবিতার *দিওয়ান* রেখে গিয়েছেন। তাঁর এ *দিওয়ানে* বহুপ্রকার কবিতা রয়েছে। তাঁর কবিতা যদিও সাদাসিধে, তাতে মাধুর্য ও সরলতা বিদ্যমান।[৪৭] তাঁর সময়ে যে সব কবির আলোচনা পাওয়া যায় তাঁরা হলেন যথাক্রমে– শেইখ আমানুল্লাহ পানিপতি, মীর ওসি, মাওলানা জালালি হিন্দি, মুহাম্মদ ইবনে আশরাফুল হোসাইন, মাওলানা নাদিরি সামারকান্দি, মোহাম্মদ কাসেম, শেইখ তাহের দাকিনি, শেইখ আবদুল ওয়াজেদ, জামেরি এবং ইউসুফ বিন মুহাম্মদ অন্যতম। যে সব কবি ইরানি হিসেবে পরিচিত তাঁরা হলেন–

Dhaka University Institutional Repository

মোল্লা মুহাম্মদ জান, মোল্লা মুহাম্মদ সালেহ, মাওলানা আবদুল বাকি, মীর আবদুল হাই বোখারি ও খাজা হিজরি জামি প্রমুখ।[৪৮] তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ কবিতা লিখে বাদশার দরবারকে মুখরিত করে রাখতেন। বাদশাহি দরবারে নিয়মিত কসীদা, মসনবি এবং গজল পরিবেশন করা হত।

জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ আকবর (১৫৫৬ খ্রি.-১৬০৫ খ্রি.) মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি কাব্য চর্চার প্রতি গভীর অনুরাগী ছিলেন। কবিদের প্রতি পৃথক দৃষ্টি ভঙ্গি রাখা ও কাব্যচর্চায় তাঁদেরকে উৎসাহিত করা তাঁর একটি বিশেষ গুণের পরিচয় দেয়। ইরানি কবি ব্যতীত স্থানীয় কবিরাও তাঁর দরবারে কাব্যচর্চা করতেন। সুলতান মাহমুদের পর তাঁর দরবারে সবচেয়ে বেশি কবির উপস্থিতি ছিল। ঐতিহাসিক সাফাকের মতে, ১৬৭ জন কবি ফারসি কবিতা আবৃত্তি করে তাঁর দরবারকে আলোকিত করেছেন।[৪৯] তিনি যদিও লেখাপড়া করেননি, কিন্তু জ্ঞান, বিচক্ষণতা ও দক্ষতা ছিল তাঁর অপিরসীম। বিশেষত যেসব আলেম, দরবেশ ও কবি তাঁর চর্তুপাশে ছিল তাঁরা তাঁকে একজন বিজ্ঞ গবেষক ও আলেম হতে সহায়তা করেছিলেন। তিনি যদিও নিজে বই পড়তে পারতেননা কিন্তু অন্যদের সহযোগিতায় সেই বই পড়ে নিতে সক্ষম হতেন। কবিদের মোয়াশারা এবং আলেমদের আলোচনা সভায় সদা তাঁর উপস্থিতি থাকত।[৫০] তিনি অনেক কবিতা মুখস্থ করেছিলেন এবং কবিতাকে মনে প্রাণে ভালবাসতেন। তাঁর *দিওয়ানে হাফেজ* ও *মাসনাভিয়ে রুমি*র অনেক কবিতা মুখস্থ ছিল। যদিও তাঁর কবিতার কোন *দিওয়ান* কাব্য গ্রন্থ নেই। তবুও তাঁর রচিত বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কবিতা পাওয়া গিয়েছে। ফারসি সাহিত্যকে সমুন্নত রাখতে গিয়ে তিনি অনুবাদের প্রতি সদয় ছিলেন। তিনি তুর্কি ও সংস্কৃত ভাষার সাহিত্যকে ফারসি ভাষায় অনুবাদ করার ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। *রামায়ণ ও মহাভারতের* ফারসি অনুবাদ তাঁর তত্ত্বাবধানে সমাপ্ত হয়।[৫১] তাঁর রাজদরবার যেসব কবি ও লেখকের রচনায় সিক্ত হয়েছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– ফয়জি ইবনে শেইখ মোবারক, নাজিরি নিশাপুরি, জামাল উদ্দিন মোহাম্মদ উরফি, আবুল ফজল আল্লামি, বৈরম খান, আবদুর রহিম খান খানান, হাকিম আবুল ফাতাহ গিলানি, গাযালি মাশহাদি, মোল্লা আবদুল কাদির বাদাউনি এবং জুহুরি তারশিযি অন্যতম। বলা বাহুল্য যে, এ সময়ে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতি ভারতীয় অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে বিস্তার লাভ করে।[৫২] তাঁর সময়ে *তবকাত ই আকবরি*, *মুন্তাখাব উত তারিখ* প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়। এ ছাড়া বহু আলেম ও পরামর্শক তাঁর সময়ে বিশেষ অবদান রেখেছেন। বিশেষত তাঁর সময়ে অনেক মুঘল কর্মচারী বাংলায় এসেছিলেন।

একজন স্বভাব কবি হিসেবে বাদশাহ নুরুদ্দিন মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর (১৬০৫ খ্রি.-১৬২৮ খ্রি.) ছিলেন অনন্য। ছোট্টবেলা থেকে তাঁর গুনগুন করে কবিতা বলে যাওয়ার অভ্যাস ছিল। তিনি এত বিশাল রাজত্বের অধিকারী হয়েও কবিতার মাহফিলকে পরিত্যাগ করেননি। তাঁর কবিতার কোনো *দিওয়ান* না পাওয়া গেলেও *তোযুকে জাহাঙ্গির* রচনাটির গুরুত্ব রয়েছে অনেক।[৫৩] তালেব আমলি ছিলেন রাজ দরবারের অন্যতম কবি। সে সময়ে তাঁকে কবিদের উস্তাদ হিসেবে গণ্য করা হত।

শিহাব উদ্দিন মুহাম্মদ শাহজাহান (১৬২৮ খ্রি.-১৬৫৮ খ্রি.) ছিলেন একজন ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। বাগ্মিতার অধিকারী এবং একজন আলেম হিসেবে এ বাদশার কৃতিত্ব কম নয়। তাঁর দরবারে বিশেষ বিশেষ জ্ঞানবান ব্যক্তিদের সমাগম হত প্রচুর। যেমন কালিম, কুদসি, রাফে কাযভিনি, দানেশ মাশহাদি প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।[৫৪] এ ছাড়া কবিদের যে সমাগত হত তা তাঁকে কবিলালনকারী হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে। শায়দায়ে গীলানি, মির্যা মোহাম্মদ আলি সায়েব, আবু তালেব কালিম, মীর রাযি, হাজি মুহাম্মদ জান মাশহাদি প্রমুখ। তাঁদের কবিতা তাঁর সময়কালকে উজ্জ্বল প্রতিভায় মুখরিত করে তুলেছে।[৫৫]

একজন জ্ঞানী ও সুন্দর হাতে লিখনের জাদুকর হিসেবে মহি উদ্দিন মুহাম্মদ আওরঙ্গজেব আলমগীর (১৬৫৯ খ্রি.-১৭০৭ খ্রি.) ছিলেন এক অনন্য বাদশাহ। *রোকআত ই আলমগীরি* তাঁর হাতে লিখিত একটি গদ্য গ্রন্থ। তিনি কবিদের প্রশংসা করাকে পছন্দ করতেননা। যে কারণে তাঁর দরবারে কবিদের আসা-যাওয়া হত কম।[৫৬] সেসময় বাদশাহদের প্রশংসা করা কবিদের অন্যতম দায়িত্ব ছিল। তিনি প্রশংসা করাকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। তাঁর দরবারের যে ক'জন কবির নাম উল্লেখ রয়েছে তাঁরা হলেন- জেবুন্নেসা মাখফি, মির্যা মুহাম্মদ ইবনে হাকিম প্রমুখ অন্যতম। সে সময়ের অন্যতম ইতিহাস লেখক ছিলেন নেয়ামত খান আলি।[৫৭]

১২০৪ খ্রিস্টাব্দের পর রাজনৈতিকভাবে ফারসি ভাষা ভারত অঞ্চলের দেশসমূহে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। এ অঞ্চলের বাদশাহগণ ফারসি ভাষার উন্নয়ন ও প্রসারে যে ভূমিকা রেখে গিয়েছেন এটি ছিল একটি যুগান্তকারী ইতিহাস। তাঁরা জাতীয়ভাবে ফারসি ভাষাকে সমুন্নত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন এবং শাসনকার্যে ব্যবহার করেন।[৫৮] সে থেকে দীর্ঘ ছয়শত বছরেরও বেশি সময়কাল ধরে শাসক প্রধানদের সহযোগিতা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী ও বহুভাষী সম্প্রদায়ের মধ্যেও এ ভাষাটির ব্যবহার শুধু একটি ভাষারই উন্নয়ন ঘটেনি অপরাপর আঞ্চলিক ও ভিন্ন ভাষার সমৃদ্ধির পথ প্রসারিত করেছে।

## শাহজাদা ও আমিরদের চর্চা

মুঘল সাম্রাজ্যের অন্যতম নক্ষত্র ছিলেন কবি জেবুন্নেসা বেগম। তিনি ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে দৌলতাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আওরঙ্গজেব ছিলেন ভারতের একজন অন্যতম সাহিত্যসেবী ও জ্ঞান পিপাসু শ্রেষ্ঠ বাদশাহ। শৈশবে তিনি গৃহ শিক্ষিকা হাফি মরিয়ামের নিকট কুরআন শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি সুর করে সুন্দরভাবে কুরআন পাঠ করতে পারতেন।[৫৯] তাঁর কুরআন পাঠ ছিল মধুর ও আকর্ষণীয়। তাঁর মধ্যে বিনয়ী, নম্রতা ও জ্ঞান ছিল বিশাল। তিনি রাজকীয় আরাম-আয়েশ থেকে বের হয়ে জ্ঞান চর্চায় মগ্ন থাকতেন। পিতা তাঁর জ্ঞান সাধনা দেখে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তাঁর কবিতা বলার অভ্যাস ছিল চিত্তাকর্ষক। যেন তিনি এই শ্রেষ্ঠগুণ মায়ের গর্ভ থেকে ধারণ করে নিয়ে এসেছিলেন। 'মাখফি' ছিল তাঁর একটি কবি নাম।[৬০] তাঁর রচনাগুলো হল *দিওয়ানে মাখফি*, *পাদশাহনামে* ও *চারগারদ* ইত্যাদি। এই মহিয়াষী নারী ১৭০২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

মুহাম্মদ দারা শেকো (১০২৪ হি.-১০৬৯ হি.) ছিলেন বাদশাহ শাহজাহানের বড় ছেলে। ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে তাঁর খ্যাতি রয়েছে অনেক। তিনি অল্প সময়ে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য জগতে কয়েকটি গ্রন্থ রেখে যান। তাঁর রচনাগুলো হল: *সাফিনাতুল আউলিয়া* (سفینت الاولیا), *সাকিনাতুল আউলিয়া* (سکینت الاولیا), *রেসালেয়ে হাক্কে নুমা* (رسالۂ حق نما), *হাসানাতুল আরেফিন* (حسنت العارفین), *মাজমাউল বাহরাইন* (مجمع البحرین), *সিররে আকবার* (سر اکبر) *দিওয়ান* (دیوان) প্রভৃতি। শাহজাদা হিসেবে তাঁর এই ফারসি চর্চা অত্যন্ত সুদূর প্রসারি ভূমিকা রাখে।[৬১]

আবদুর রহিম খান ই খানান ছিলেন মুঘল রাজদরবারের একজন প্রভাবশালী শাসক ও আলেম ব্যক্তি। তিনি ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বৈরাম খান ছিলেন বাদশাহ আকবরের বিশ্বস্ত সেনাপতি। তিনি একসময় বাদশাহ আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে লিপ্ত হলে বাদশাহ তাঁকে পরাস্ত্র করে তীর্থের জন্য মক্কায় পাঠিয়ে দেন।[৬২] এ সময় খান ই খানান ছিলেন চার বছরের শিশু। বাদশাহ আকবর বৈরামের স্ত্রী ও পুত্র তাঁর দরবারে নিয়ে আসেন। তখন খান ই খানান বাদশাহি পৃষ্ঠপোষকতায় লালন-পালন হতে থাকেন। তিনি ছিলেন অতিশয় একজন মেধাবি ব্যক্তি। অল্প বয়সেই আরবি, ফারসি, তুর্কি ও সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। যুবক বয়সে তিনি আকবরের পুত্র সেলিম ও জাহাঙ্গিরের জন্য শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান। তিনি বাবুরের তুর্কি ভাষায় রচিত বিশ্বখ্যাত *ওয়াক্কিয়াতে বাবরি* ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দে ফারসি ভাষায় অনুবাদ করেন।[৬৩] এ ছাড়া তিনি হিন্দি,

Dhaka University Institutional Repository


ফারসি ও সংস্কৃত ভাষামিশ্রিত কাব্য রচনায় দক্ষ ছিলেন। বাদশাহ তাঁকে জ্ঞান প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে আমির নিযুক্ত করেছিলেন। এ সময় বহু কবি, সাহিত্যিক ও লেখক তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছেন। তাঁর প্রেরণা ও উৎসাহে সংকলিত হয়েছে *তারিখে আলাফি*, *আইনে আকবারি*, *আকবারনামে*, *মুনতাখুবুত তাওয়ারিখ*, *তাবাকাতে আকবারি* এবং *মাসিরে ইব্রাহিমি* গ্রন্থ। তিনি ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[৬৪]

## ফারসিভাষী বাংলার শাসক

**১. বখতিয়ার খলজি (শা.কা. ১২০৪ খ্রি.-১২০৬ খ্রি.):** সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর পর অপর এক দুঃসাহসিক বিজেতার আর্বিভাব ঘটেছে বাংলায়। এই মহা নায়ক সেনাপতি তুর্কি জাতির 'খলজ' গোত্রের নামানুসারে 'খলজি' উপাধিতে প্রসিদ্ধ হন। বাংলায় ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা বেগবান করতে সে নায়কের অবদান অনেক। ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের মাধ্যমে এ অঞ্চলে ফারসি ভাষা চর্চার প্রসার ঘটেছে। তাঁর বিজয় ছিল এ অঞ্চলের জন্য একটি নতুন ইতিহাস সৃষ্টি। তিনি অতি অল্প সময়ে এ অঞ্চলে মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্থানগুলোতে ফারসি ভাষার চর্চা হত। পরবর্তীতে সে ধারার আলোকে সকল মাদ্রাসায় ফারসি পড়ানো হয়।[৬৫] একটি নতুন অঞ্চলে ফারসি ভাষার ভিত্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে এ সেনাপতির অবদান ইতিহাসে কম গুরুত্ব রাখেনা।

**২. আলি মর্দান খলজি (শা.কা. ১২১০ খ্রি.-১২১২ খ্রি.) :** তিনি ছিলেন বখতিয়ার খলজির একজন সামরিক সহযোগী। বাংলায় মুসলিম বিজয়ের পর পরই এ শাসকের অবদান স্মরণ করা যেতে পারে। এ শাসকের প্রধান কার্যালয় ছিল উত্তরাঞ্চলের ঘোড়াঘাট। তিনি খোরাসান ও গজনির অধিবাসী লোক-জনদের থাকার জন্য বাংলায় বসবাসের ব্যবস্থা করে দিতেন। তাঁর সময়ে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি হয়েছে প্রচুর। এ সময়ে সংস্কৃত ভাষার *অমৃতকুণ্ড* গ্রন্থের অনুবাদ করেন কাজি রুকনুদ্দিন সামারকান্দি।[৬৬]

**৩. নাসির উদ্দিন বোগরা খান (শা.কা. ১২৮১ খ্রি.-১২৮৭ খ্রি.) :** তিনি ছিলেন বাংলায় লখনৌতি রাজ্যের বিস্তারকালের একজন কাব্যপ্রেমি শাসক। তাঁর সময়ে দিল্লি থেকে অনেক কবি বঙ্গে আগমন করেন। তন্মধ্যে শামসুদ্দিন দবির, কাজি আসির, আমির খসরু ও হাসান সানজুরি ছিলেন অন্যতম।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁরা রাজ দরবারের সাথে সংশ্লিষ্ট থেকে ফারসি ভাষায় কবিতা রচনা করতেন।[৬৭] বিখ্যাত কবি আমির খসরু দেহলভি (১২৫৩ খ্রি.-১৩২৫ খ্রি.) তাঁর সময়ে বাংলায় এসেছিলেন।

**৪. সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ (শা.কা. ১৩৯০খ্রি.-১৪১১খ্রি.)** : তিনি ছিলেন একজন বিদ্বান ও কবি। তিনি আরবি ও ফারসি ভাষায় কবিতা লিখতেন। তাঁর আমলে বাংলায় ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ঘটেছিল।[৬৮] তিনি ইরানের বিখ্যাত কবি হাফেজ শিরাজির সাথে পত্র বিনিময় করেছিলেন। সে পত্রে তাঁর ফারসি কবিতা ছিল। কবিতার প্রথম লাইন নিম্নরূপ:

شکر شکن شوند همه طوطیان هند - زین قند پارسی که به بنگله میرود [69]

ভারতের ফারসিভাষীগণ সকলেই মিষ্টিতে পরিতৃপ্ত হবে। ফারসি ভাষার এই মিছরিদানা যা বাংলায় যাচ্ছে।

তখন সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ কবি হাফেজ শিরাজিকে বাংলায় আসার আমন্ত্রন জানিয়েছিলেন। কবি হাফেজ বাংলায় না এলেও যে কবিতা এসেছিল তাতে সুলতান খুশি হন। তাতে অনেক ঐতিহাসিক বাংলার সাথে ইরানের সম্পর্কের কথা তুলে ধরেন।

**৫. সুলতান বারবক শাহ (শা.কা. ১৪৫৯ খ্রি.-১৪৭৫ খ্রি.)**: তিনি ছিলেন বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান। ইব্রাহীম কওয়াম ফারুকি তাঁর সহযোগিতা ও বদন্যতার প্রশংসা করেছেন। তিনি কবি ও বিদ্বান ব্যক্তিদের সম্মান করতেন। তাঁর দরবারে আমির শাহাব উদ্দিন কিরমানি, আমির জৈনুদ্দিন হারবি, মনসুর শিরাজি, ইউসুফ হামিদ, সৈয়দ জালাল, সৈয়দ প্রমুখ কবিতা আবৃত্তি করতেন। তাঁর দরবারে কবিদের উপস্থিতি বিশেষ তাৎপর্য রাখে।[৭০] বাংলার সুলতানি যুগে বারবক শাহের রাজত্ব বিশেষভাবে আকর্ষণীয় ছিল। তাঁর সমাজ ব্যবস্থার উন্নতির সাথে সাথে শিল্প-সাহিত্য চর্চার উৎকর্ষতা লাভ করে। এ বাদশার অধীনে কবি জয়েন উদ্দিন *রসুল বিজয়* রচনা করেছিলেন।

**৬. শাহজাদা মুহম্মদ সুজা (শা.কা. ১৬৩৯ খ্রি.-১৬৪৭ খ্রি., ১৬৫২ খ্রি.-১৬৬০ খ্রি.)**: শাহসুজা বাংলার সুবাদার হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় অনেক ইরানি তাঁর অধীনে কর্মরত ছিল। সেনাপতি ও সৈনিক হিসেবেও বহু ইরানি তাঁর অধীনে কাজ করেছে। বলা বাহুল্য যে, মুঘলদের শাসন কার্য বিস্তৃত হওয়ার সাথে সাথে বাংলায় ফারসি চর্চাও বিস্তার লাভ করেছিল। শাহসুজা যুদ্ধে পরাজয়ের সময় তিনি আরাকানে পলায়ন করেছিলেন। এ সময় তাঁর সহকর্মী ও অনুচরেরা তার সাথে যেতে পারেন নি। এ সময় আরব, ইরানি, মুঘল ও আফগানি মুসলমান বাংলায় বসতি গড়ে তোলেন।[৭১] উল্লেখ্য যে, বাংলা

ভাষার কবি আলওল ছিলেন তাঁর দরবারের সভাকবি। তিতি ফারসি ভাষা হতে বাংলা ভাষায় দুটি কাব্যের অনুবাদ করেন। একটি *সিকান্দর নামা* অপরটির নাম *হাপ্ত পয়কর*।

কবিরা শাসকদের থেকে যে সহযোগিতা ও উৎসাহ পেতেন তাতে ফারসি ভাষা প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিলনা। এমনকি মুসলমানেদের ধর্মীয় সভা থেকে হিন্দুদের দরবারে ফারসি ভাষার আলোচনা হত। নাসির উদ্দিন বোগরা খানের আমলে (১২৮১ খ্রি.-১২৮৭ খ্রি.) সে চর্চার উন্নতি ঘটেছিল বেশি।[৭২] তাঁর সময়ের প্রবীণ কর্মচারী মাসুম বিন হাসান বিন সালেহ *তারিখে শাহ সুজাই* রচনা করেন।

**৭. মীর জুমলা (শা.কা. ১৬৬০ খ্রি.-১৬৬৩ খ্রি.) ও শায়েস্তা খান (শা.কা. ১৬৬৩ খ্রি.-১৬৭৭ খ্রি.):** এ দুই জন বাংলায় শাসন কার্য পরিচালনা করেছেন। তাঁরা উভয়েই ফারসি ভাষা ও সাহিত্য চর্চার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাঁদেরকে ইরানি শাসক হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া মুর্শিদাবাদের নওয়াবরা নিজেরা ছিলেন ইরানি গোষ্ঠীর অর্ন্তভূক্ত। মুর্শিদ কুলি খান ছিলেন তদ্রুপ একজন ফারসিভাষী শাসক। তিনি বিশ বছর বাংলায় শাসন কার্যের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। সে কারণেও বলা যায় যে, তাঁরা তখন ফারসি ভাষার প্রতি কতটুকু শ্রদ্ধাশীল ও পরস্পর উদার ছিলেন।[৭৩]

## তুর্কি ও মুঘল বাদশাহদের চিন্তা-চেতনা

তুর্কি মুঘল বাদশাহগণ এই অঞ্চলকে নিজেদের বসবাসের জন্য উপযোগী করে শুধু নিজেরাই তৃপ্তিবোধ হননি। ইরানিদেরকে নিজেদের বন্ধু ও তাঁদের ভাষাকে নিজেদের ভাষা করে যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা অপরিসীম। ভারতীয় উপমহাদেশে এ ভাষা ও সাহিত্যকে পরিপূর্ণ দানের ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান একটি অপূরণীয় বিষয়। মূলত তাঁরাই এ ভাষা সাহিত্যকে ভারতীয় উপমহাদেশে বিস্তার লাভের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। বাংলায় ও অন্যান্য অঞ্চলে ফারসি চর্চার স্রোতধারা তাঁদেরই অবদানের ফল।[৭৪] তা না হলে তাঁদের রাজকীয় দরবার ফারসিভাষী কবিদের দ্বারায় আলোকময় হতো না। ভারত-উপমহাদেশে ১২০৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ছিল মুসলিম শাসনের যুগ। এ সময় যেসব সুলতান ও তাঁর অধীনস্ত কর্মচারি ভারতে শাসন করেছেন তাঁরা ছিলেন মূলত ফারসিভাষী ধারার সাথে সম্পৃক্ত। যেমন–গজনভি, গোরি, গেলামান, খলজি, তুঘলুক, উরগোন, তুরখান, মুঘল– এ সব বংশ ইরানি ধারায় ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের লালন করে গিয়েছেন। যে কারণে হিন্দুস্তানের অনেক বাদশাহ ছিলেন নিজেরাই একজন ঐতিহাসিক বা ফারসি কবি। তাঁদের

Dhaka University Institutional Repository

অনেকের ইতিহাস বা কবিতার স্বতন্ত্র রচনা রয়েছে। কবিদের প্রতি সম্মান, উদারতা ও কবি প্রতিভার প্রতি সদয় দৃষ্টি দানে তাঁদের কোনো প্রকার ঘাটতি ছিলনা।[৭৫] ভারত-উপমহাদেশে তুর্কিদের রাজত্ব ও ক্ষমতা লাভের পর তাঁদের তুর্কি ভাষার বিস্তার ঘটেনি। তাঁরা জাতিতে তুর্কি হলেও শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে ইরাননির্ভর ছিল। তাঁরা সাহিত্য সংস্কৃতি লালনের ক্ষেত্রে ইরানি জাতির পথ অনুসরণ করেছেন। যে কারণে ভারতে অন্য ভাষার চেয়ে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের বিস্তার ঘটেছে। তাঁদের তুর্কি ভাষায় সাহিত্য রচনা রয়েছে– এমনটি জানা নেই। তবে তুর্কি ভাষায় ইতিহাসমূলক এক-দু'টি রচনার উপস্থিতি সময়ের তুলনায় খুবই সামান্য। তাঁদের তুর্কি সংস্কৃতি বর্জন করে ইরানি ধারার জীবন-যাপনই ছিল অপর এক বৈশিষ্ট্য।[৭৬] তৈমুরি শাসকের সময়ে যে সব সাহিত্য রচনা হয়েছে অধিকাংশ রচনার লেখক ইরান, আফগানিস্তান বা বালখের অধিবাসী ছিলেন। কেননা, তৈমুরি যুগে এসব অঞ্চল থেকে বহু আলেম, বুদ্ধিমান ও গবেষক ভারতে এসেছেন। তাঁদের সহযোগিতা এবং আন্তরিকতার মধ্য দিয়ে কবি ও সাহিত্যিকরা অবদান রাখতে সক্ষম হন। এ অঞ্চলে ফারসি ভাষার চর্চার একটি উন্নত পরিবেশ সৃষ্টি তৈমুরি শাসকরা করেছিলেন। তৈমুরিদের মাধ্যমে রাজ-দরবারে ও সমাজের সর্বস্তরে এ ভাষার প্রয়োগ হয়। মাদ্রাসা-মক্তবে, মসজিদ, খানকায় ও সুফিদের আস্তানায় এর ব্যবহার ছিল। তখনি এটি ভারতের সাংস্কৃতিক ভাষা হিসেবেও স্বীকৃতি পেয়েছে। যে কারণে ভারতের হিন্দুরাও ফারসি ভাষা শিক্ষা লাভ ও এ ভাষায় অবদান রাখতে এগিয়ে আসতে তৎপর হন।

এটা সত্য যে, দিল্লির সুলতানদের সময়ে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য উন্নতি লাভ করেছিল। যে সব বাহিরের উলামা এবং জ্ঞানীদের আগমন হয়েছে তাঁরা সবাই এ ভাষা সাহিত্যের অবদান রেখে যেতে সমর্থ হন। যদিও সাধরণ ইরানিদের দৃষ্টিতে ভারত উপমহাদেশের ফারসি ভাষা ও সংস্কৃতি তাঁদের চেয়ে উন্নত ছিলনা। তবে অনেক ইরানি সাহিত্যিক তাঁদের দেশের চেয়ে কোনো কোনো পর্যায়ে এখানের ফারসি ভাষা ও সাহিত্যকে ভাল দৃষ্টিতে দেখতেন।[৭৭] এখানের ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের একটি পৃথক অবস্থান ছিল। যে কারণে সাহিত্য রচনার একটি স্টাইল গড়ে ওঠেছে। ফারসির তিনটি স্টাইল বা 'সাবক'[৭৮] এর মধ্যে অন্যতম হল 'সাব্‌কে হিন্দি'। যা ভারতীয় স্টাইল হিসেবে পরিচিত। সে সময় আমীর খসরুর ন্যায় ভারতের অনেক কবি ফারসি কাব্যচর্চা করতেন। আমীর খসরু যে রীতি অবলম্বন করে কবিতা চর্চা করছেন সেটি 'সাব্‌কে হিন্দি' নামে খ্যাত। এটা সত্য যে, ভারতবর্ষে মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর থেকে ফারসি ভাষা সরকারি ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়।

## ফারসি সাহিত্য উন্নতির মুঘল যুগ

মুঘল বাদশাহগণ দেশ শাসনের সাথে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করতেন। তাঁদের একই সাথে শাসন ও সাহিত্য চর্চা বেগবান ছিল। এ আমলেই বঙ্গে ফারসি ভাষা নতুন করে জায়গা করে নিতে সক্ষম হয়। এ সময়ে অফিস-আদালত ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ভাষা ছিল ফারসি।[৭৯] মুঘল যুগের বাদশাগণ নিজেরা যেমন সাহিত্য রচনায় পারদর্শী ছিলেন তেমনি প্রজা সাধারণকে সাহিত্য রচনায় প্রেরণা দানে উৎসাহ যোগাতেন। এ ক্ষেত্রে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা ও বদান্যতা ছিল প্রশংসাযোগ্য। এ কারণে ফারসি সাহিত্যের উন্নতির জন্য মুঘল যুগ স্মরণীয় হয়ে আছে। এ প্রসঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষক মুহম্মদ এনামুল হক বলেন, 'মুঘল-আমলে, শুধু রাজকার্যে নহে, জীবনের প্রতিক্ষেত্রে ফারসী ভাষাকে প্রধান্য দেওয়া হইতে থাকে।'[৮০] বস্তুত মুঘল যুগে ভারতীয় উপমহাদেশের সকল ক্ষেত্রে ফারসির ব্যবহার ছিল। সরকারি ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে মুঘল যুগের অবদান অনেক বেশি। যে সব রচনা তৈরি হয়েছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল *আকবার নামে*, *পাদিশাহ নামে*, *আলমগীর নামে* ইত্যাদি। এসব রচনায় ইতিহাসের উপাদান রয়েছে। যেমন– সৈনিকদের রিপোর্ট, ডায়েরি, অফিসের হিসাবের কাগজ-পত্র প্রভৃতি। যেসব তথ্য বাদশাহি রেকর্ডবুকে জমা থাকত সেগুলো ব্যবহার করেও অনেক বই রচিত হয়েছে।

এ যুগের সকল পর্যায়ে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির যুগ ছিল। এটি সত্য যে, এ ভাষাটি ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সরকারি ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। তখন এ ভাষার ব্যবহার সকল স্তরে সবার মাঝে বিদ্যমান ছিল। ইংরেজ শাসনের মধ্য দিয়ে এ ভাষার স্থলে ইংরেজি ভাষা সরকারি ভাষা করা হলেও এ ভাষাটিকে পরাস্থ করা সম্ভব হয়নি। এর পরবর্তী সময়েও ভারতে অগণিত ফারসি কবির আর্বিভাব ঘটেছে। এঁদের মধ্যে আল্লামা ইকবাল, আসদুল্লাহ গালিব, শিবলি নোমানি প্রমুখ অন্যতম।[৮১] সিন্ধের কোলাউড়া এবং তালপুরান বংশ ঐতিহ্যগতভাবে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য চর্চার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। খ্রিস্টীয় আঠার শতকে তাঁদের মাধ্যমেও ফারসির চর্চা বেগবান হয়েছে। ইতিহাসে এ কথা স্বীকৃত যে, ভারতের সমাজ ব্যবস্থায় উচ্চ ও নিম্ন শেণির মধ্যে ভেদাভেদ ছিল খুব বেশি। মুসলিম শাসনের প্রথম শতাব্দীতে ভারতীয় সমাজে উচ্চ শ্রেণির মুসলিম সমাজ গঠিত হয় পারসিক, তুর্কি ও আফগানদের নিয়ে। যদিও এসময় ভারতীয় গোত্রসমূহের মধ্যে ধর্মান্তরের কারণে সাধারণ মুসলিম সমাজ বৃদ্ধি ঘটেছিল। কিন্তু নও মুসলিমগণ ততটা সমমর্যাদা অর্জনে সক্ষম ছিল না।[৮২] এই উচ্চ শ্রেণি মুসলিম সমাজ তাঁদের জীবন ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যকে ব্যবহার করতেন। মুসলিম সমাজের মধ্যে পেশাভিত্তিক যোদ্ধা ও লেখক –যে দু'টি চাকরির অবস্থান

Dhaka University Institutional Repository

ছিল তাতে ফারসি ভাষায় দক্ষতা ও জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিদেরকেই বেশি যোগ্য হিসেবে নিয়োগ দেয়া হত।[৮৩] সে সমাজের সর্বপেক্ষা প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ছিলেন ধর্মতত্ত্ববিদ ও সাহিত্যিক। হিন্দু কী মুসলমান –তাঁরা সবাই ফারসি ভাষার সুপণ্ডিত ছিলেন। ভারতে হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষা ছিল সংস্কৃত ভাষাভিত্তিক। তাঁরা সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে দর্শন, তর্ক শাস্ত্র, ব্যাকরণ প্রভৃতি শিক্ষা লাভ করতেন। তেমনি মুসলমান সম্প্রদায় মাদ্রাসা-মক্তবে আরবি ও ফারসি শিক্ষা চালু ছিল। সরকারি চাকরিতে প্রবেশকারীদের অবশ্যই ভালভাবে ফারসি শিক্ষা লাভ না করলে চাকরি দেয়া হত না। এ ক্ষেত্রে হিন্দুদেরও ফারসি শিক্ষা ব্যতীত চাকুরি লাভের সুযোগ ছিল কম।[৮৪]

## ৩. ফারসি ভাষা চর্চার কেন্দ্র

### বিখ্যাত স্থান

প্রাচীন ইরানে সমরকন্দ, বোখারা, খোরাসান, হেরাত ইত্যাদি স্থানগুলো ফারসি চর্চার জন্য বিখ্যাত ছিল। ভারতীয় অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রসারকালে বহু ফারসি চর্চাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। হায়দ্রাবাদ, করাচি, পাঞ্জাব, সিন্ধু মুলতান, মেকরান, দিল্লি, গোয়ালিওর, আগ্রা, লখনৌ, হেরাত, গজনি, কান্দাহার, কাবুল, পেশওয়ার, মহিসুন, সোনারগাঁও, রংপুর, ঢাকা ও চট্টগ্রাম ইত্যাদি অঞ্চলগুলো নানা ইতিহাসে সমৃদ্ধ। এ স্থানগুলোতে ইরানিদের বিচরণ, তাঁদের সংস্কৃতি ও ধর্ম প্রচার কোনো অংশেই কম ছিল না। প্রতিটি স্থানের সাথে যেমন ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসার জড়িত রয়েছে তেমনি ফারসি ভাষার চর্চা ও উন্নতির বিষয়টি সম্পৃক্ত। মুসলিম যুগের প্রথম দিকে সবচেয়ে সুফিদের খান্‌কা ছিল মুসলিম শিক্ষার উপযুক্ত স্থান।

সিন্ধু : এটি পাকিস্তানের একটি বৃহত্তম প্রদেশ। এ প্রদেশের অধীন এগারটি জেলা অর্ন্তভুক্ত রয়েছে। এটি খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতক থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত পারস্যের সামানি শাসকদের অধীন ছিল। পাঞ্জাব এবং সিন্ধু ইরানিদের পদচারণায় মুখরিত থাকত। প্রথমে আরবরা সিন্ধুকে ইরানিদের মাধ্যমে জানতে শুরু করে।[৮৫] ৭১১-১২ খ্রিস্টাব্দের দিকে মুহাম্মদ বিন কাসেম সাকাফি ইসলামের দাওয়াত নিয়ে সিন্ধু উপকণ্ঠে এসেছিলেন। তাঁর মাধ্যমে প্রথম ভারতের কোনো অঞ্চল মুসলমানদের অধিকারে আসে। তখন তাঁর সাথে অনেক ইরানি সৈন্য সিন্ধুতে এসেছিল।[৮৬] আরবরা তাঁর এ অভিযানের মাধ্যমে সিন্ধু ও পাঞ্জাব সম্পর্কে অবহিত হয়। এ যুদ্ধ জয়ের জন্য ইরনিদের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি প্রমাণিত হয়েছে। অপরদিকে উইরোপীয় পর্যটকরাও প্রথমে ইরানি দ্বারায় সিন্ধুকে জানতে সক্ষম হয়। সেকান্দর বুর্যগ প্রাচীন সিন্ধু নগরে এসেছিলেন। তখন এ অধিবাসীদের বলা হতো সিন্ধো।[৮৭] এ থেকে

Dhaka University Institutional Repository

সিন্ধে প্রথম ফারসি ভাষার চর্চার বিষয়টি জানা যায়। যদিও ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনের বিষয়টি চোখে পড়ে সুলতান মাহমুদের গজনি আগমনের পর। খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকে এ স্থান থেকে ফারসি কাব্যসাহিত্য বিকাশ লাভ করেছে। যেসব কাব্যগ্রন্থের প্রসিদ্ধি ঘটেছে তন্মধ্যে *গোলেস্তান, বুস্তান, গজলে হাফেজ* ও *রুবাইয়াতে ওমার খৈয়াম* ছিল অন্যতম। ইসলামি জ্ঞান-সভ্যতার বিকিরণ স্থল ছিল সিন্ধু ও মুলতানের বালুকাময় মরুভূমি। এ সিন্ধু থেকেই জ্ঞান সভ্যতার আলো ভারতীয় উপমহাদেশের চর্তুদিক ছড়িয়ে পড়ে।[৮৮]

গজনি: আফগানিস্তানের একটি প্রদেশের নাম গজনি। সুলতান মাহমুদ গজনিতে ক্ষমতা গ্রহণের পর এই প্রদেশের সুনাম বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর সময় থেকেই আফগানিস্তানের গজনি শহর ফারসি সাহিত্যের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। এখানেই ইরানের বড় বড় কবি ও আরেফদের সমাগম ঘটেছে প্রচুর। সুলতান মাহমুদ নিজেই এটিকে ধর্ম ও সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চাকেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন।[৮৯] ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসে গজনির ন্যায় কোনো কেন্দ্রই এত বেশি প্রাণ পায়নি।

লাহুর : ১০২১ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাব গজনি সালতানাতদের অধীন হলে লাহুর হয়ে ওঠে গজনির অধিনস্থ প্রাদেশিক গভর্ণদের রাজধানী। সে সুবাদে লাহুরে ফারসি সাহিত্যের চর্চার পথ উন্মোক্ত হয়। ভারত অধিবাসী শ্রেষ্ঠ কবিদের আবাসস্থল ছিল লাহুরে। বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশের সাহিত্য সংস্কৃতি বিস্তৃতির ক্ষেত্রে লাহুর একটি উৎকৃষ্টতম স্থান ছিল গজনি যুগেও। এ স্থান থেকে মাসউদ সাদ সালমান ও আমির খসরু কবি প্রতিভাকে বিকশিত করেছিলেন। এটি ফারসি ভাষার চর্চার জন্য খ্যাত ছিল প্রায় ছয় শত বছর। এখানে সুলতান মাসউদ গজনভি থেকে শুরু করে বাদশাহ আকবর পর্যন্ত ফারসি সাহিত্যের চর্চা হত।[৯০] সরকারি চাকুরিজীবি, কবি, আলেম, সুফি ও ধর্মীয় ব্যক্তিগণ এখানে সমবেত হতেন। সে সময়ে শহরের আঙ্গিক ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ঐতিহাসিকগণ এ শহরকে ছোট্ট গজনি হিসেবে অভিহিত করেন। একসময় সুলতান মাহমুদের অনুসারীরা গজনি পরিত্যাগ করলে গজনভিদের রাজধানী হয়েছিল লাহুর। লাহুর তখন ফারসি সাহিত্যচর্চার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়।[৯১] এ কেন্দ্র থেকে ফারসি সাহিত্যের যে অনুশীলন হয়েছিল পরবর্তীতে পাকিস্তানের সমগ্র অঞ্চলে বিকশিত হতে সহায়তা করে। এ কেন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন আবুল ফারায রুনি।

দেবল : পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের একটি জেলা। এটি আরব সাগরের তীরে অবস্থিত। মুহাম্মদ বিন কাসেম প্রথম যে স্থান থেকে অভিযান শুর করেন তার নাম দেবল। সেই দেবলে তাঁর সাথে অনেক ইরানি সৈনিক ছিল।[৯২] দেবল নামটি বর্তমানে করাচি রূপে পরিচিতি পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository


**উস্:** গজনি যুগের অবসানের পর কয়েকটি নতুন কেন্দ্রের উদ্ভব ঘটেছে। উস্ ছিল ফারসি সাহিত্য চর্চার অন্যতম কেন্দ্র। মুলতানের শাসনকর্তা নাসির উদ্দিন কুবাচার দরবার ছিল উস নামক স্থানে। এ স্থানে বিভিন্ন কবিদের সমাগম হত। কবি উওফি, ঐতিহাসিক মিনহাজ সিরাজ তাঁর দরবারকে অলংকৃত করে রাখতেন। তাঁর সময়ে আরবি ভাষায় রচিত সিন্ধের ইতিহাসমূলক *চাচনামে* গ্রন্থটি ফারসি ভাষায় অনুবাদ হয়।[৯৩] উল্লেখ্য যে, উস্ কেন্দ্রটি তাঁর সময়কাল পর্যন্ত ফারসি ভাষা সাহিত্যচর্চার কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকে।

**দেহ্লি :** ভারতবর্ষের চিরন্তন ও ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক রাজধানীর নাম দিল্লি। এটির পূর্ব নাম দেহলি বা দিহলি। মুঘল যুগে রাজধানী না হলেও এটি মুসলিম গৌরবের ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে খ্যাত ছিল বহু দিন। সুলতান মুহাম্মদ ঘুরির পর তাঁর ক্রীতদাশ কুতুব উদ্দীন আইবেক সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন দিল্লি রাজধানীরূপে পরিণত হয়। এ সময় ফারসি সাহিত্য চর্চার জন্য দিল্লি প্রধানন্দ্রে হয়ে ওঠে। বদাউন, লখনাবতি ইত্যাদি নগরগুলো প্রাদেশিক রাজধানী ছিল।[৯৪] এ নগরগুলোতে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা হত।

**মুরশিদাবাদ :** মুরশিদাবাদের নওয়াবদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতা ছিল ফারসি চর্চা উন্নতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাংলাদেশের সুবাদার মীর জুমলা এবং শায়েস্তা খাঁ উভয়েই ছিলেন ফারসি সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। মুরশিদ কুলি খাঁর সময়ে ফারসি সাহিত্যের অত্যধিক প্রচার পেয়েছিল। তিনি রাজধানীকে মুরশিদাবাদে সরিয়ে নেন। এসময় মুরশিদাবাদ ফারসি সাহিত্যের প্রধান চর্চাকেন্দ্রে পরিণত হয়।[৯৫] ইরান থেকে বহু কবি এখানে সমাবেত হত। স্থানীয়দের মধ্যেও অনেক কবি কবিতার আসরে কবিতা পাঠ করতেন। কবি আকদাস, মাখমুর এবং বারক ছিলেন অন্যতম। নবাবি আমলে এ দেশের রাজধানী হয়ে ওঠে মুর্শিদাবাদ। এ মুর্শিদাবাদে মুসলমানরা সাংস্কৃতিক চর্চা করতেন।[৯৬]

**লখনৌতি :** এটি ভারতীয় মুসলমানদের অন্যতম প্রধান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও একটি প্রাচীন নগরীর নাম। এটি প্রায় প্রায় এক শত ত্রিশ বছর মুসলিম শাসকদের রাজধানী ছিল। এখানে অগণিত ফারসি চর্চাকারীদের মিলনমেলা বসত। বোগরা খান যখন বাংলার সুবাদার হিসেবে নিযুক্ত লাভ করেন এ সময় তার সাথে বেশ ক'জন কবি ও সাহিত্যিক দিল্লি থেকে লখনৌতিতে গমন করেন। এ সময় লখনৌতি ছিল রাজধানী।[৯৭] সেখানে যে ফারসি চর্চা হত তা থেকেও অনুমান করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

বাঙ্গালা : এটি সুলতান ইলিয়াস শাহ এর আমল থেকে রাজ্যের একটি নাম হিসেবে ব্যবহার হত। তখন বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিম বাংলা নিয়ে গঠিত ছিল। ভারত রাজ্যের অতি নিকটতম ও কাচাকাছি ভাটির দেশ এটি। ভূতাত্ত্বিকগণ মনে করেন যে, ফারসি ভাষাটি প্রথমে ইরান থেকে আফগানিস্তান হয়ে ভারতে এসেছে। পরবর্তীতে ভারতের জনগোষ্ঠীর মধ্যে ফারসি ভাষাটি প্রভাব রাখে এবং ক্রমান্বয়ে জনসাধারণের সাথে মিশে গিয়েছে। ধীরে ধীরে এটি বাঙালিদের মধ্যেও প্রভাব রাখে। এমনকি বাংলার মুঘল শাসনের পত্তনের মধ্য দিয়ে ফারসি চর্চা অধিক উন্নত হয় ও বাঙালি কবিরা ফারসি কাব্যচর্চার ন্যায় বাংলা কবিতা রচনায় অনুপ্রেরণা পান।[৯৮] অবশ্য এ কথার উপর অনেক গবেষক একমত নন যে, যদি আর্য জাতির বসবাস ভারতে স্থায়িত্বলাভ করে থাকে এবং সে জাতির ভাষাও বিকাশ লাভ হয় তা হলে এ জাতির ফারসি ভাষাটিও ভারতেই উৎপত্তি লাভ করেছে। বঙ্গে সে ভাষা প্রসার লাভ করেছে মাত্র।

বাঙ্গালার বহু স্থানে ফারসি ভাষার চর্চাকেন্দ্র ছিল। ঢাকা, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর ও সিলেট অন্যতম কেন্দ্র। ঢাকার খাজা পরিবার, সিলেটের মজুমদার পরিবার, ফরিদপুরের কাজি পরিবার থেকে সে চর্চার প্রমাণ মিলে। উল্লেখ্য যে, বাঙ্গালার অন্যান্য স্থানের চেয়ে চট্টগ্রামে কাব্যচর্চা হত অত্যধিক। চর্চার প্রসারের জন্য লেখ্য সামগ্রী–তুলট কাগজ ও অন্যান্য বস্তু তৈরি হত চট্টগ্রামে।[৯৯] সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবনের শাসনামলে (১২৬৬ খ্রি.-১২৮৭ খ্রি.) ঢাকার সোনার গাঁও এলাকায় একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। আল্লামা শেখ সরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা ও তাঁর জামাতা আহমদ বিন ইয়াহিয়া মুনিরি মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। সে সোনারগাঁওয়ে ফারসি ভাষা চর্চার জন্য বিখ্যাত ছিল। মুসলিম আমলে ঢাকা কখনো রাজধানী আবার কখনো শহর অঞ্চল হিসেবে পরিচিত পেয়েছে। তবে ঢাকা বাংলার কেন্দ্রবিন্দু থেকে কখনো আলাদা ছিল না। সব আমলে ঢাকায় ফারসি ও আরবির চর্চা হত। এখানে কবিদের নিয়ে কবি বহচের আয়োজন ছিল। সে আয়োজনে কাব্যপ্রেমিকরা উপস্থিত হয়ে কবিতা পাঠ করতেন।[১০০]

## রাজকীয় দরবার

খ্রিস্টীয় ষোল ও সতের শতকের পুরো সময়কালে যে সব বাদশাহ ভারত শাসন করেছেন তন্মধ্যে সুলতান জালাল উদ্দিন আকবর (১৫৫৬ খ্রি.-১৬০৫ খ্রি.), বাদশাহ নুরুদ্দিন জাহাঙ্গির (১৬০৫ খ্রি.-১৬২৮ খ্রি.) সুলতান শেহাব উদ্দিন শাহজাহান (১৬২৮ খ্রি.-১৬৫৯ খ্রি.) এবং বাদশাহ মহিউদ্দিন আওরঙ্গজেব (১৬৫৯ খ্রি.-১৭০৭ খ্রি.) অন্যতম। তাঁদের সময়কালে ভারতের বিভিন্ন স্থান ফারসি

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা ও সাহিত্যের চর্চাকেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে ছিল। ইরান থেকে অগণিত কবি ও আলেম এসব স্থানে আগমন করে কবিতা চর্চা করতেন।[১০১] কেন্দ্রগুলো যে নিজস্ব ঐতিহ্যে উদীয়মান ও ঔজ্জ্বল্যে প্রদীপ্ত ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। বিশেষ করে বাদশাহদের রাজকীয় দরবার ছিল কবিতা চর্চার অন্যতম প্রধান স্থান। গজনির তুর্কি বাদশাহ থেকে শুরু করে দিল্লির মুঘল বাদশাহগণ- সবাই রাজ দরবারকে কবিতা চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছিলেন। বাদশাহ আকবরের অধীনস্থ কর্মচারীররা তাঁর দরবারে যেভাবে কবিতা রচনায় লিপ্ত থাকতেন তা ছিল অপূর্ব। মির্যা আবদুর রহিম খান খানান, মির্যা আযিয, হাকিম আবুল ফাতাহ গিলানি, খান আযম কোকলতাশ, কবি ফয়েজি, গাজীবেগ- তাঁরা কেউই বিশ্রাম বা অবসরে অন্যস্থানে যেতেননা। তাঁরা নিয়মিত বাদশার দরবারে কবিতা আবৃত্তি করতে বিভোর থাকতেন।[১০২] উল্লেখ্য যে, এ সবের অনেক কেন্দ্র খ্রিস্টীয় আঠার শতকে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে নিস্তজ হয়ে পড়ে। বিশেষভাবে আঠার শতকে উত্তর ভারতে ব্রিটিশ শাসন বিস্তারলাভ করায় তাঁদের মাধ্যমে উর্দু ভাষার প্রসার ঘটেছে। তখন উর্দু ভাষাকে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আদান প্রদানের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের কারণে ফারসি ভাষার মর্যাদা ও তার অবস্থান হ্রাস পায়।[১০৩] মুসলমান রাজত্বের অবসানের পর সরকার প্রধানের সহযোগিতা তেমন দেখা যায় নি।

### ব্যক্তিকেন্দ্রীক চর্চাকেন্দ্র

ভারতীয় উপমহাদেশে এগার ও বার হিজরি শতকে ফারসি চর্চার বিকাশে বহু ব্যক্তিকেন্দ্রীক চর্চাকেন্দ্র গড়ে ওঠেছিল। অনেক কেন্দ্র কবিতার মাহফিল হিসেবে গণ্য করা হতো। এমনকি প্রতি মাস অন্তর কবিদের মিলনমেলা হতো ব্যক্তি উদ্যোগে। বাদশাহ জাহাঙ্গিরের মেয়ে জেবুন্নেসা বেগম তিনি এরূপ মাহফিলের আয়োজন করতেন। তার তত্ত্বাবধানে কখনও সপ্তাহের প্রতি শনিবার কবিরা একত্রিত হয়ে কবিতা আবৃত্তি করতেন।[১০৪] এখন সেই মাহফিল রূপগল্পের ন্যায় পরিণত হয়েছে।

## ৪. শিক্ষাকেন্দ্রে ফারসি চর্চা

### প্রাথমিক শিক্ষা

যে সময়ের শিক্ষার কথা বলা হচ্ছে তা আজকের ন্যায় ততটা উন্নত বা আধুনিক ছিলনা। এমনিতেই এ অঞ্চলে গ্রাম্য শিক্ষা ব্যবস্থাই অধিকতর শক্তিশালি ছিল। মধ্যযুগের বাংলায় বা ভারত অঞ্চলে ফারসি শিক্ষাকে মুসলিম শিক্ষা হিসেবে বিবেচিত করা হলেও যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেছিল কোনটিই ফারসি মাধ্যমের বিপরীতে পাঠদান হতনা। এমনকি হিন্দুদের মাঝেও ফারসি শিক্ষার

Dhaka University Institutional Repository


রেওয়াজ ছিল। তাঁরা মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফারসি শিক্ষা গ্রহণ করতেন। এরূপ অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেছিল যেখানে ফারসি শিক্ষা ছিল বাধ্যতামূলক। এ শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের গর্ব ছিল এ কারণে যে, ফারসি ধর্ম ও সংস্কৃতির ভাষা।[১০৫] যে কারণে সবাই ফারসি শিক্ষা লাভের প্রতি আগ্রহী ছিলেন।

## উচ্চ শিক্ষার পাঠ

মধ্যযুগের শিক্ষা ব্যবস্থা তা পুরনো যুগের আদলে সৃষ্টি। তাতে নুতনত্ব বা পরিবর্তনীয় বিষয় দেখা যায়নি বরং মক্তব বা মাদ্রাসাই শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত স্থান হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে। যদিও সে সময় প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার স্তর ছিল।[১০৬] অনেকে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য ফারসি ভাষা শিক্ষাকে অধিকতর যোগ্য হিসেবে গ্রহণ করতেন। তখন *গুলেস্তান*, *বূস্তান*, *ইউসুফ ওয়া জোলায়খা*, *বাহারে দানেশ*, *আখলাকে নাসেরি*, *আনওয়ারে সুহায়লি*, *সেকান্দারনামে*, *শাহনামে* প্রভৃতি ছিল পাঠ্য গ্রন্থ। মধ্য স্তরে তথা উচ্চ মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ে ফারসি ব্যাকরণ, *পান্দেনামে* ও ধর্মবিষয়ক ছোট্ট বই পড়তে হত। এ ছাড়া প্রাথমিক পর্যায়ে ফারসি লেখা ও বলা ব্যতীত মাধ্যমিকে পড়ালেখার যোগ্যতা অর্জিত করা সম্ভব হতোনা।[১০৭] মুলত ফারসি শিক্ষা লাভ ছিল শিক্ষিত হিসেবে পরিচিতি লাভের অন্যতম বাহন।

## সাধারণের ফারসি শিক্ষা

মধ্যযুগে সাধারণের মধ্যে ফারসি শিক্ষার বিকল্প শিক্ষা ব্যবস্থা কল্পনা করা যেত না। সবার জন্য ফারসি শিক্ষা লাভ করা ছিল বাধ্যতামূলক। যেহেতু ফারসি ছিল সরকারি ভাষা। চাকুরি লাভের জন্য হউক বা রাজপদ লাভের জন্য হউক সবারই ফারসি শিক্ষালাভ করতে হত। ধর্মীয় ও সামাজিক কাজ-কর্ম সম্পাদনের জন্য এ শিক্ষা ছিল বাধ্যতামূলক।[১০৮] জনসাধারণের ফারসি শিক্ষার চাহিদার কথা বিবেচনা করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠত। উল্লেখ্য যে, তখন এ সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যায় ভার বহন করতেন সে সময়ের নবাব বা স্থানীয় জমিদারগণ। তাঁরা ওয়াকফ সম্পত্তি প্রদান করে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন। সরকার ও স্থানীয় প্রশাসকের সহযোগিতা ছাড়াও ব্যক্তি উদ্যোগেও বহু মক্তব-মাদ্রাসা গড়ে ওঠে। দিল্লি, লখনৌ, রামপুর, মাদ্রাজ, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও পাক-ভারতের বড় বড় শহরে এবং বন্দরে এ ধরণের মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত ছিল। যদিও বর্তমানে অনেক মক্তব বা মাদ্রাসার চিহ্ন অবশিষ্ট নেই।[১০৯]

Dhaka University Institutional Repository


## শিক্ষা ব্যবস্থা ও মাধ্যম

সে সময় শিক্ষা ব্যবস্থাও ব্যতিক্রমধর্মী ছিল। আজকের ন্যায় কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বা ইনস্টিটিউটের কল্পনা করা যেতনা। তবে সে সময় শিক্ষার মধ্যে ধনী-গরীব, জাত-বংশ একটি পার্থক্য কাজ করত। যে কারণে সাধারণ পরিবারের সন্তানেরা ভালভাবে লেখাপড়া করার সুযোগ পেতনা। অবশ্য ধর্ম শিক্ষা সবার জন্য অবধারিত বিষয় ছিল। সবাই মক্তবে বা মাদ্রাসায় ধর্মজ্ঞানলাভ করতেন।[১১০] আশরাফ বা ভদ্র শ্রেণির একটি অংশ- মৌলভি, পির, সুফি, আলেম পরিবার- তাঁরা কেবল আরবি ফারসির চর্চা করতেন। সবাই ইসলাম ধর্ম ও সুফি তরিকার পথে নিয়োজিত থাকার জন্য আরবি ফারসির বই-পুস্তক পড়তেন। সে সময় ধর্মশাস্ত্র, ইতিহাস ও সুফিশাস্ত্র রচনাগুলো ছিল ফারসির।[১১১] সংস্কৃতভাষী হিন্দুরা তাঁদের জন্য আলাদা একটি সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলেন। তদ্রুপ মুসলমানদের জন্য গ্রামে গ্রামে মক্তব ও সাধারণ মানের শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। সেখানে আরবি ফারসি বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হত। উন্নত শিক্ষা গ্রহণের জন্য মাদ্রাসা ব্যতীত অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিলনা। স্বভাবত এ দেশের মুসলমান পরিবারের জন্য যে দু ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল। সেখানেও ফারসি পাঠ বাধ্যতামূলকভাবে রাখা হয়েছে।[১১২]

## অভিজাত পরিবারের শিক্ষা

কলকাতা বা কলকাতার বাইরে বাংলার যে কয়টি অভিজাত মুসলমান পরিবার ছিল পরিবারের সকলেই আরবি ফারসি ভাষা ও সাহিত্যকে উন্নত মনে করতেন এবং তাঁদের পরিবারের সকল সন্তানদের ফারসি শিক্ষা দিতেন। ফারসি ভাষার একটি আলাদা মর্যাদা থাকায় অভিজাত মুসলিম পরিবার সে দিকেই মনোনিবেশ করতেন। [১১৩] তবে এ কথা নিশ্চিত যে, তখন মুসলমানরা এ ভাষার শিক্ষা ও চর্চার কারণে সরকারি চাকুরি সহজভাবে পেয়ে যেতেন। অনেক অভিজাত পরিবার ফারসি শিক্ষা থাকার কারণেই সরকারি চাকুরি করতেন। কোর্ট-কাচারি, আইন-আদালত বিশেষ করে দারোগা, মুনশি, কাজি, আমীন, উকিল প্রভৃতি পদে চাকুরি লাভের জন্য মুসলমানরা উপযুক্ত ছিলেন অন্যেরা নয়।[১১৪] বিচার বিভাগে ফারসি ভাষা জানা মুসলমানদের চাকুরি লাভ ছিল একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। আদালতের অনেক আইন-কানুন ও সংশ্লিষ্ট বিষয় ফারসি ভাষায় ছিল।

এই অঞ্চলে মক্তব (প্রাইমারী স্কুল), মাদ্রাসা (হাইস্কুল বা কলেজ) ঠিক কত হাজার ছিল সেই হিসেব নেই। অনেক গবেষক ও লেখক বিভিন্ন শিক্ষামূলক রিপোর্টের বরাত দিয়ে ইংরেজ শাসনপূর্বকালে শুধু বাংলাদেশে আশি হাজার মক্তব থাকার কথা উল্লেখ করেছেন।[১১৫] গোটা ভারতীয় উপমহাদেশে মক্তব

ও মাদ্রাসার সংখ্যা নিয়ে সঠিক তথ্য না পেলেও তাতে অনুমান করা যেতে পারে যে, প্রতিটি মুসলিম অঞ্চলের জন্য বহু মসজিদ ও মক্তব প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেখানে ধর্মীয় জ্ঞান লাভের পাশাপাশি সাহিত্য, ব্যাকরণ ও চরিত্র আদর্শমূলক বইগুলো পড়ানো হত। *পান্দেনামে, গোলেস্তান* ও *কারিমা* ছিল অন্যতম পাঠ্যবই। বাংলাভাষী অঞ্চলের মুসলিম পরিবারের সন্তানেরা মক্তব মাদ্রাসায় ফারসি শিক্ষা গ্রহণ করতেন। মুসলিম শিক্ষা-ব্যবস্থায় মাদ্রাসা শিক্ষাকে উচ্চ শিক্ষা হিসেবে অভিহিত করা হত।[১১৬]

## ফারসি শিক্ষার প্রভাব

মধ্যযুগে ফারসি ভাষা ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে ভারতীয় উপমহাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি ইসলাম ধর্মভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠেছিল। যে জ্ঞানের পরিধি কুরআন ও হাদিস নিয়ে গবেষণা ও চর্চা করা ছিল মূল উদ্দেশ্য। মুসলিম রাজা-বাদশাহগণ সেসব জ্ঞানীদেরকেও সম্মান করতেন। তাঁদের দরবারও এসব উলামা দ্বারায় অলংকৃত হত। তাঁরা এলমে নাহু, সারফ, বালাগাত, ফেকাহ, মানতেক, কালাম, তাফসির, হাদিস বিষয়ে অবদান রেখেছেন।[১১৭] এসব বিষয়ের বই-পুস্তক ছিল আরবি ও ফারসি ভাষায়। এ সবের ভিত্তিও ছিল খোরাসান, উজবিকিস্তান ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল। তাতে মুসলমান সংস্কৃতির উন্নতি ও প্রসারের যে অবকাটামো গড়ে ওঠে তা অনেক বিশাল অর্জন। যখন বাংলায় ও অন্যান্য অঞ্চলে ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত ঘটেছে তখন মুসলিম শিক্ষায় পরিবর্তন দেখা দেয়।[১১৮] তাতে ফারসি শিক্ষায় ব্যত্যয় ঘটে। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে রাজভাষা ফারসির স্থলে ইংরেজি শিক্ষা চালু করা হলে সে শিক্ষার অধপতন শুরু হয়। শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবতর্ন ও ফারসির স্থলে উর্দু ও ইংরেজি ভাষা চালুকরণ ছিল একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি লেখাপড়ার মাধ্যম হিসেবে চালু করা হলে মুসলমানরা তার বিরোধিতা করেছিলেন।[১১৯] মূলত এ থেকে শুরু হয় ফারসি শিক্ষার অবনতি। ধীরে ধীরে শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ফারসি শিক্ষার পাঠ উঠিয়ে দেয়াসহ নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যে পড়ে ফারসি শিক্ষা।[১২০]

# ৫. সুফি সাধক ও ধর্মীয় পণ্ডিতদের ফারসি চর্চা

## চর্চার পরিধি ও স্থান

এ অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচারের সাথে ফারসি ভাষা চর্চার বিষয়টি উৎপ্রোতভাবে জড়িত। কেননা, যাদের মাধ্যমে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে তাঁরা ছিলেন প্রত্যেকে ফারসি ভাষার পণ্ডিত। তাঁরা ফারসি ভাষার মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছেন। তাতার, তুর্কি, আফগানি ও ইরানি- তাঁরা সবাই ফারসি ভাষা বলতেন।[১২১] যে স্থানে ইসলাম ধর্ম বেশি প্রচার ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে সেখানে ফারসি ভাষার চর্চা

Dhaka University Institutional Repository


তত বেশি প্রচার ও প্রসার লাভ হয়েছে। বস্তুত ইসলাম প্রচারের মধ্য দিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে ফারসি ভাষার প্রসার ঘটেছে বেশি। এ সময় ইরানের কিছু সংখ্যক আলেম, সুফি, শাসক ও কবিগণ ভারতে ইসলাম প্রচারে রত ছিলেন।[১২২] তাঁদের দ্বারায় ধর্মীয় মাযহাব, তরিকা বা মতবাদ, এরফানের পথ ও তাসাউফ বিষয়ক চিন্তা-ভাবনা চর্তুদিক ছড়িয়ে পড়েছে এবং সাধারণের মধ্যে সুফি ও আলেম সমাজের কর্ম ও অবদানগুলো গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। সেই সাথে সুফিদের ওয়াজ-নসিহত ও আত্নসংশোধনের জলসাগুলোতে ফারসি চর্চা অধিক হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। মূলত এ সব জলসার মাধ্যমে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে ফারসি ভাষা ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণ জনসমাজে ফারসি ভাষার প্রভাব পড়ার পিছনে ধর্মীয় জলসাগুলো বিশেষভাবে ভুমিকা রাখে। উল্লেখ্য যে, সেখানে সুফি ও ধর্মীয় আলিমদের বক্তব্য আরবি-ফারসি ভাষা ব্যতীত ছিল না। ইরানি ধারার সুফিরা ফারসি ভাষা ব্যবহার করতেন–এটি একটি অবধারিত বিষয়। ভারতীয় উপমহাদেশে যে ক'জন সুফি ও আলেমের মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে ও প্রসিদ্ধি পেয়েছে তন্মধ্যে বাহাউদ্দিন যাকারিয়া মুলতানি, খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি আজমিরি এবং বু আলি শাহবাজ কলন্দর অন্যতম। তাঁরা ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে অসাধারন ভূমিকা রাখেন।[১২৩] বিশেষত সুফি মতবাদ প্রচারের মাধ্যমে তাঁদের ভালবাসা সমগ্র জাতির হৃদয়ে এখনও প্রতিষ্ঠিত আছে। তাঁরা সাধারণ মানুষের কাছে একজন প্রকৃত সাধক ও ওলি হিসেবে পরিচিত। তবে ফারসিভাষী হিসেবে তাঁদের আলাদা পরিচিতি ও খ্যাতিও ছিল। যা ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁদের ছোট্ট ছোট্ট রচনা ও তাঁদের বক্তব্যের ভাষা ফারসি। এ প্রসঙ্গে কাসেম সাফির একটি উক্তি নিম্নে উল্লেখ করছি।

> مشهورترین سلسله ها که عارفان بزرگی به جامۀ بشریت عرضه کردند و در راه گسترش اسلام و رواج زبان و ادبیات فارسی خدمت شایانی کردند، عبارتند از سلسلۀ سهروردیه (منسوب به شیخ شهاب الدین سهروردی)، سلسلۀ قادریه (منسوب به خواجه معین الدین چشتی)، سلسله نقشبندیه (منسوب به خواجه محمد پارسا) و هر یک را پیروان بسیاری است.

> যে সব প্রসিদ্ধ তরিকা রয়েছে তাঁরা ইসলামের প্রচার ও ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রসারের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। সোহরাওয়াদিয়া, কাদেরিয়া ও নকশবন্দিয়া তরিকা –এসব তরিকার সহযোগিতাই সবচেয়ে বেশি।[১২৪]

এমন বহু সুফি ও আলেম রয়েছেন, যাঁদের কথপোকথনের ভাষা ছিল ফারসি। তাঁরা আজীবন ফারসি ভাষার চর্চা করে গিয়েছেন এ কারণে যে, এ ভাষায় ইসলাম ও সুফিবাদ নিহিত আছে। তাঁদেরই অনুসারী ছিলেন– আলি হাজভিরি দাতা গঞ্জ বখশ লাহুরি, শেখ শফি উদ্দিন কায়রুনি ভাওয়ালপুরি, শাহ ইউসুফ গেরদিযি মুলতানি, খাজা কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকি, ফরিদ উদ্দিন গাঞ্জ শেকার, শাহ জালাল উদ্দিন তাবরেজি (বাঙ্গাল), নিজাম উদ্দিন আউলিয়া (দিল্লি), মাখদুম নাসির উদ্দিন চেরাগ

Dhaka University Institutional Repository

(দিল্লি), নুর কুতুবে আলম চিশতি নেজামি, কাজি রুকনুদ্দিন সামারকান্দি প্রমুখ।[১২৫] তাঁরা ইসলাম প্রচারের পাশাপাশি ফারসি ভাষাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে এক অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছেন।

## সুফিবাদমূলক রচনা

সুফিবাদ বিষয়ক যে সব রচনা আত্মপ্রকাশ করেছে তা এ অঞ্চলের এক অমূল্য সম্পদ। শেখ আহমদ সরহিন্দি (১৫৬৪ খ্রি.-১৬২৪ খ্রি.) ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের একজন ধর্ম সংস্কারক। নকশবন্দিয়া তরিকা প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের জন্য তিনি ছিলেন একজন অনন্য সুফি।[১২৬] ত্রয়োদশ শতকে বাংলায় আগমনকৃত শেখ জালাল উদ্দিন তাবরেজি ফারসি ভাষা চর্চায় অবদান রাখেন। ফারসি কাব্য-সাহিত্যের বিস্তৃত অংশ জুড়ে যে সুফিবাদ রয়েছে তা গোটা ভারত অঞ্চলে সুফিদের মাধ্যমে বিকাশ লাভ করেছে। যে কারণে সুফিভাবধারা বিষয়ক রচনা বা সুফিদের নিয়ে রচিত গ্রন্থাবলিও ফারসি ভাষা চর্চার বড় ভুমিকা রাখে। যেসব গ্রন্থাবলির পরিচয় জানা সম্ভব হয়েছে শুধু সে সব গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে তুলে ধরাও সমীচীন হবে না। ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসে রচনাগুলোর গুরুত্ব অনেক। নিম্নে উল্লেখযোগ্য রচনার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উপস্থাপন করা হল:

১. *আনওয়ারুল মাজালেস* (انوارالمجالس) : এটি খাজা মুহাম্ম ইমাম রচনা করেন। তিনি ছিলেন বাবা ফরিদ উদ্দিন গাঞ্জ শেকারের নাতিন। এতে নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার বক্তব্য ও বিভিন্ন উপদেশমূলক উক্তি রয়েছে। এটি খ্রিস্টীয় চর্তুদশ শতকের প্রথম দিকের একটি 'মালফুজাত' বিষয়ক রচনা।[১২৭]

২. *ফাওয়াইদুল ফুওয়াদ* (فوايد الفواد) : কবি আবুল হাসান সিজজীর সুফিবাদ সম্বলিত একটি গ্রন্থ। তিনি ছিলেন কবি আমির খসরুর সম-সাময়িক বন্ধু। তিনি বাদাউনের নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার ধর্মীয় বক্তব্য উক্ত গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। তাঁর নিজস্ব মতামত ও ধর্মীয় আলোচনা ব্যতীতও পির-দরবেশ ও আউলিয়ার কাহিনী অন্তর্ভূক্ত আছে। এ ছাড়া ভারতের সমসাময়িক সমাজ জীবনের নানা রূপও তাতে স্থান পেয়েছে। গ্রন্থটি যেমন চিশতিয়া তরিকার অনুসারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তেমনি ভারতের তৎকালের সমাজ ব্যবস্থার পরিচয় জানার একটি অন্যতম দলিল।[১২৮]

৩. *আফজালুল ফাওয়ায়েদ* (افضل الفوائد): এটি কবি আমির খসরুকৃত খাজা নিজাম উদ্দিন আউলিয়া (র.)- এর কথামালা। যা তিনি বিভিন্ন সময় মুরিদ ও ভক্তদেরকে উপদেশ হিসেবে বলতেন। কবি আমির খসরু এতে তাঁর মুর্শিদের সকল বক্তব্য একত্রিত করে রচনার নাম করণ করেন

Dhaka University Institutional Repository

*আফযালুল ফাওয়ায়েদ* অর্থাৎ উৎকৃষ্ট কথামালা।[১২৯] এটির সম্পর্কে দ্বিমত বক্তব্য থাকলেও গবেষকগণ এটি আমির খসরু দেহলভির রচনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

৪. *খায়রুল মাজালেস* (خیرالمجالس): সুফিবাদি কথামালার অপর একটি গ্রন্থ। এটির রচয়িতা হামিদ উদ্দিন কলন্দর (মৃ. ১৩৬৭ খ্রি.)। তিনিও চিশতিয়া তরিকার নাসির উদ্দিন চিরাগে দিল্লির শিষ্য ছিলেন। তাতে মালফুজাত ও সুফিবাদের বিষয় স্থান পেয়েছে। এ ছাড়া এরূপ রচনা তৈরি করেছেন খালিক আহমদ নিযামি। পিতা ফরিদ উদ্দিন মাহমুদের উপদেশ এবং সুফিদের বক্তব্য নিয়ে এটি রচিত হয়। তাঁর রচনায় ভারতীয় আউলিয়াদের কাহিনী ও উপদেশ স্থান পেয়েছে।[১৩০]

৫. *সিয়ারুল আউলিয়া* (سیارالاولیا ) : এটি ভারতীয় সুফিদের নিয়ে চিশতি তরিকার উপর রচিত অপর একটি গ্রন্থ। এটির রচয়িতা নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার অন্যতম শিষ্য মীর খোরদ। যার পূর্ণ নাম সায়্যেদ মোহাম্মদ মোবারক আমীর খোরদ কিরমানি (মৃ. ১৩৬৮ খ্রি.)। এটিতে আউলিয়াদের জীব-কাহিনীসহ বিভিন্ন ঘটনাবলি উল্লেখ আছে।[১৩১] উল্লেখ্য যে, শেখ জামালির *সিয়ারুল আউলিয়া* একই ধরণের অপর একটি রচনা।

৬. *তোহফাতু ন্নাসায়েহ* (تحفت النصائح): এটি চতুর্দশ শতকের একজন উল্লেখযোগ্য সুফি কবি ইউসুফ গাদার রচনা। ১৩৫১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর ছেলেকে লক্ষ করে *তোহফাতু ন্নাসায়েহ* কাব্য রচনা করেন। রচনায় ধর্মীয় বিষয় ছাড়াও উপদেশ ও সুফিদর্শন স্থান পেয়েছে। তিনি ছিলেন চেরাগে দেহলির মুরিদ। [১৩২]

৭. *আখবারুল আখইয়ার* (اخبار الاخیار) : সুফিদের উপর ভিত্তি করে অপর একটি গ্রন্থ রচনা করেন আবদুল হক দেহলভি। এটি ছিল ভারতীয় সুফিদের সাধারণ ইতিহাস জানার অন্যতম গ্রন্থ। এটি *আখবারুল আখইয়ার* নামে খ্যাত। এ গ্রন্থে সুফিদের আলোচনা অন্যান্য গ্রন্থের চেয়ে বেশি রয়েছে। রচনাটি বাদশাহ জাহাঙ্গিরের রাজত্বকালে সমাপ্ত হয়।[১৩৩] এতে শেখ জালাল উদ্দিন তাবরেজি, শেখ আলি সিরাজ উদ্দিন উসমান ও শেখ আলাওল হক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

৮. *গুলযারে আবরার* (گلزار ابرار) : এটি সুফিদের জীবন কাহিনী নিয়ে রচিত অপর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এটি মুহাম্মদ গাওসি সাত্তারি ১৬১৩ খিস্টাব্দে রচনা করেন । তাঁর এ গ্রন্থে

Dhaka University Institutional Repository

ভারতের সতের শতকের সুফি ও পির-দরবেশ ও আউলিয়াদের সম্পর্কে তথ্য রয়েছে।[১৩৪] এ গ্রন্থের উপকরণগুলো পূর্ববর্তী রচনা থেকে সংগ্রহ করা হলেও জীবনী গ্রন্থ হিসেবে এটির মূল্য অনেক।

এ ছাড়া শাহ শোয়েব বিহারের মানের শরীফের বিখ্যাত সুফি শায়খ শরফুদ্দিন জীবন অবলম্বনে *মানাকিব উল আসফিয়া* রচনাটি কালের সাক্ষী হিসেবে অনেক গুরুত্ব রাখে। আবদুর রহমান চিশতি রচিত *মিরাত উল আসরার*, গোলাম সরওয়ার রচিত *খাজিনাতুল আসাফিয়া*, মীর মোহাম্মদ সাত্তারীর *রিসালাত উস শোহাদা* ও নওমীর *গোলযার ই আসরার* ইত্যাদি গ্রন্থে সুফিদের জীবনী আলোচিত হয়েছে।

## প্রসিদ্ধ চার তরিকার সুফি

সুফিবাদের যে 'চারটি প্রসিদ্ধ তরিকা'[১৩৫] রয়েছে তা সর্বপ্রথম ভারতে বিস্তার লাভ করেছে। তরিকাগুলো হল–সোহরাওয়ার্দিয়া, কাদেরিয়া, চিশতিয়া ও নকশবন্দিয়া। এসব মতবাদ বা তরিকার অনুসারীগণ ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রবক্তা বা পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সুফিবাদমূলক চিন্তা চেতনা প্রথমে মনসুর হল্লাজ ও মুঈন উদ্দিন চিশতি ভারতে প্রচার করেছেন। ভারতের সর্বত্র স্থানে ফারসি ভাষা প্রচারের ক্ষেত্রে তরিকাগুলোর অবদান অপরিসীম। ইসলাম প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে সুফিদের যেসব তরিকা রয়েছে সেসব তরিকা ফারসি ভাষা চর্চার সেতুবন্ধন হিসেবে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেছে। প্রতিটি তরিকার অনুসারীগণ ফারসি ভাষার স্বাদ আস্বাদন করেছেন– এতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই। মুরিদদেরকে নিয়ে মজলিস ও ওয়াজ-নসিহতমূলক জলসায় ফারসি ভাষার বয়েত পাঠ ও বিভিন্ন বক্তব্য উপস্থাপন হত।[১৩৬] সেগুলো শ্রোতাগণ জীবন চলার পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করতেন।

## বহিরাগত আলেম ও বুদ্ধিজীবী

ইরানি বুদ্ধিজীবি ও আলেমগণ বিভিন্ন সময় ভারতে এসেছিলেন। যে ক'জনের নাম প্রসিদ্ধ হয়ে আছে ও ফারসি ভাষার চর্চার কারণে ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পেয়েছে তাঁদের সংখ্যা অনেক। যেমন–ভারতে সাদি শিরাজির ভ্রমণ, কবি হাফেজের প্রেরিত কবিতা, ভারতে অবস্থানকালে আবু রায়হান বিরুনির গবেষণাকর্ম 'তাহকিক মাল হিন্দ' প্রসিদ্ধ। এ ছাড়া মোল্লা মুরশেদ ইয়াযদ জারদি, শাপুর তেহরানি, সুফি মাযেন্দারানি, ফখরি হারভি, সালেক ইয়াযদি, মীর সায়িদি তেহরানি, মীর্যা মুহাম্মদ শিরাযি, মোল্লা মুহাম্মদ সাইদ শাহযাদি, মীর মুগীয হামাদানি, আবদুল বাকি নাহায়োন্দি, মুলক কুমি, সাইদাই গিলানি, তালেব আমলি, সায়েব তাবরিযি, নজিরি নিশাবুরি, মাওলানা কসেম

কাহি, উরফি শিরাযি, প্রমুখ আলিম ও সুফিদের নাম ভারত উপমহাদেশের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে।[১৩৭] তাঁরাও কোনো না কোনো সময় ভারত অঞ্চলে এসেছিলেন ও ফারসি ভাষার চর্চাকে উজ্জীবিত করেন।

মুঘল আক্রমণের পর বহিরাগত অনেক সুফি ও জ্ঞানী ভারতে এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে সায়্যেদ ইসমাইল বুখারি, সায়্যেদ আলি হাজভেরি অন্যতম। তাঁরা ভারতে সোহরাওয়ার্দিয়া, কাদেরিয়া ও চিশতিয়া তরিকার ভিত্তি রচনা করেছেন। তাদের তরিকা বিভিন্ন স্থানে বিস্তারলাভ করেছে এবং নানা মারকায গড়ে ওঠেছে।[১৩৮] যে সব স্থানে তাঁদের কেন্দ্র ছিল তন্মধ্যে লাহুর, মুলতান, দিল্লি, আজমীর ও সোনারগাঁ উল্লেখযোগ্য। এ স্থানগুলোকে ইসলাম ও তাসাউফের প্রচার কেন্দ্র বলা হয়ে থাকে। এ ছাড়া খাজা নিজামুদ্দিন যাকারিয়া মুলতানি, মীর সায়্যেদ আলি হামাদানি, বুলবুল শাহ, বু আলি কালান্দার, আলি লাল শাহবায কালান্দর, সায়্যেদ মাহমুদ গিসু দারায, বাবা ফরিদ উদ্দিন গাঞ্জ শাকার, খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি আজমিরি এবং অন্যান্য যারা ভারতের প্রসিদ্ধ আলিম ও সুফি হিসেবে গণ্য হয়ে থাকেন তাঁরা অধিকাংশই ইরানি বংশোদ্ভূত নয়তবা ফারসিভাষী ও ইরানি সংস্কৃতি দ্বারায় পরিপুষ্ট ছিলেন।[১৩৯] সৈয়দ মুহম্মদ জৌনপুরি (১৪৪৩ খ্রি.-১৫০৪ খ্রি.) ছিলেন সমকালীন যুগের একজন শ্রেষ্ঠ আলিম ও সুফি। তাঁর পীর ছিলেন শায়খ দানিউল চিশতি জৌনপুরি। তিনি এলম ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। শায়খ আলাঈ ছিলেন মাহদুয়ি পথ অবলম্বনকারী একজন আলিম। তিনি বাংলায় বসবাস করতেন।[১৪০] তাঁর বক্তব্যে একধরণের জাদু ছিল। তিনি মানুষকে সহজভাবে আকৃষ্ট করতে পারতেন।

## ৫. কবি, ঐতিহাসিক ও গবেষক

### ফারসি ভাষা চর্চার নিদর্শন

ভারতীয় ভাষা হিসেবে যেমন সংস্কৃত ভাষা চর্চার বহু নিদর্শন রয়েছে তেমনি ফারসি ভাষারও নিদর্শন বিদ্যমান। এ ভাষাটির ব্যবহার ও প্রচলনের ফলেই ফারসি ভাষার অভিধান, ইতিহাস, কবিতা ও গল্প রচিত হয়। রচনাকারীদের মধ্যে এ অঞ্চলের অধিবাসী ব্যতীতও ভারতে অবস্থানকারী ইরানিদেরও সম্পৃক্ততা রয়েছে। তবে এ অঞ্চলের অধিবাসীরাই ফারসি ভাষার লালন করেছেন তাঁর প্রমাণ অগণিত ঐতিহাসিক, কবি, সাহিত্যিকের আর্বিভাব। ইরানের অধিবাসীরা যেমন এ ভাষার প্রসারের জন্য নানাভাবে নানা বিষয়ে কবিতা আবৃত্তি করেছেন তদ্রুপ এ অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানের অধিবাসীরাও।[১৪১] শুধু পেশাদার কবিরাই কবিতা রচনা করেছিলেন না সমাজের নানা শ্রেণির মানুষ কবিতা আবৃত্তিতে

Dhaka University Institutional Repository


সম্পৃক্ত ছিল। মাদ্রাসা-মক্তবের শিক্ষক, মসজিদের ইমাম ও খতীব, হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তি, সুফি, তরিকাপন্থি সাধক– তাঁরা অনায়েসে কবিতা বলতেন। ওয়াজ নসিহতে যেমন কবিতা ব্যবহৃত হত তেমনি আনন্দ-বিনোদনেও এর ব্যবহার ছিল। সে হিসেবে সহস্র কবিতা আবৃত্তিকারী ভারতীয় উপমহাদেশে রয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের রচনা সম্পর্কে শুধু মাত্র ধারণা উপস্থাপন করা যেতে পারে।

## বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক

**১. দাতাগঞ্জ বখশ লাহুরি (মৃ. ১০৭১ খ্রি.):** তিনি ছিলেন একজন উচুঁমানের সাধক। তিনি গদ্য ও পদ্যে উভয় পদ্ধতিতে রচনায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁর পদ্য রচনায় একটি *দিওয়ান* রয়েছে। এ ছাড়া গদ্য রচনায় তাঁর *কাশফুল মাহবুব* একটি প্রসিদ্ধ রচনা। সুফিবাদ বিষয়ক এ রচনাটি ফারসি সাহিত্য চর্চার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন।[১৪২]এ গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য অনেক।

**২. আবুল ফারায রুণি (মৃ. ১১৩১ খ্রি.):** তিনি ছিলেন রুণার অধিবাসী একাদশ শতকের একজন উল্লেখযোগ্য কবি। কেউ কেউ তাঁকে লাহুরের অধিবাসী বলে অভিহিত করেছেন। তিনি যে বিষয়ে কবিতা রচনা করেছেন তা ছিল প্রশংসাসূচক কবিতা। গজনভি শাসকদেরকে নিয়ে তিনি একাধিক কবিতা রচনা করেছেন।[১৪৩] তবে তিনি প্রশস্তিমূলক রচনা লিখলেও তা গ্রহণীয় পর্যায়ে ছিল। যুগের প্রশংসাকারী বা বাহবাতুল্য কবি হিসেবে তিনি ছিলেন একজন ব্যতিক্রম কবি। তাঁর কবিতা দেখে ইরানের কবি আনওয়ারি প্রশংসা করেছেন।

**৩. মাসউদ সাদ সালমান (১০৪৬ খ্রি.-১১২১ খ্রি.):** তিনি ছিলেন গজনভি যুগের অন্যতম একজন শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁকে হামাদানি হিসেবে অভিহিত করা হলেও তিনি জন্মে ছিলেন লাহুরে। ফেরদৌসির *শাহনামা*কে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রচারে তাঁর ভূমিকা রয়েছে। তিনি বাস্তবধর্মী কবিতা রচনা করতে স্বাচ্ছন্দবোধ করতেন। কবিতার বিষয় ছিল জন্মভূমি ও প্রকৃতি। একসময় তিনি শাসকের রোষাণলে পড়ে কারারুদ্ধ হন। তিনি কারারুদ্ধ অবস্থায় *হাবাসিয়াত* কাব্য রচনা করেন।[১৪৪] এ রচনা থেকে তাঁর কাব্যপ্রতিভা জানা যায়। প্রথম যুগের একজন কবি হিসেবে তাঁর এই অবদান অনেক।

**৪. কাজি রুকনুদ্দিন সামারকান্দি :** তিনি বাংলার অন্যতম সুফি হিসেবে খ্যাত। তাঁর *বাহরুল হায়াত* ফারসি ভাষার রচনাটি আলি মর্দান খিলজির শাসনামলে (১২১০ খ্রি.-১২১৩ খ্রি.) রচিত হয়েছে। এটি

Dhaka University Institutional Repository

মূলত ভোজর নামক ব্রাম্মণ রচিত সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থ 'অমৃতকুণ্ড' –এর অনুবাদ। এতে দশটি অধ্যায়ে পঞ্চাশটি বয়েত রয়েছে। তাতে যোগ দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এটি বাংলাদেশের প্রথম একটি ফারসি গদ্য গ্রন্থ হিসেবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে।[১৪৫]

**৫. শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা ( মৃ. ১২৯৩ খ্রি.):** ভারতীয় উপমহাদেশে একজন সুফি ও আলেম হিসেবে তাঁর নাম প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। জন্মগতভাবে তিনি ছিলেন একজন বোখারার অধিবাসী। তিনি বোখারা ও খোরাসানে ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণের পাশাপাশি সুফিতত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। অতপর সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবনের সময়ে ১২৬০ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে আগমন করেন। এ সময়ে তাঁর জ্ঞান প্রজ্ঞার শ্রেষ্ঠত্ব চর্তুদিক ছড়িয়ে পড়েছিল। অল্প কিছুদিন পর তিনি দিল্লি থেকে সোনারগাঁওয়ের দিকে যাত্রা করেন।[১৪৬] ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসে *নামে হক* ছোট্ট কাব্যরচনাটি তাঁর নামের সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। তাতে ওজু, গোসল, নামাজ এবং রোজা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এর দশটি অধ্যায়ে ১৮০টি বয়েত বিদ্যমান। এটি রুকনুদ্দিন কায়কাউসের রাজত্বকালে (১২৯১ খ্রি.-১৩০১ খ্রি.) ঢাকার সোনারগাঁয়ে রচিত হয়।[১৪৭] এ ছাড়া তাঁর *মাকামাত* নামের একটি পুস্তক রয়েছে।

**৬. আমীর খসরু দেহলবি (১২৫৩ খ্রি.- ১৩২৫ খ্রি.):** ত্রয়োদশ শতকের একজন উল্লেখযোগ্য কবি। ফারসি কাব্যের এমন কোনো বিষয় তাঁর দৃষ্টির অগোচরে ছিলনা যা তিনি লিখে যাননি। তিনি *কিরানুস সাদাইন* কাব্য রচনার জন্য ইতিহাসে খ্যাত হয়ে আছেন। ভারতীয় উপমহাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে তাঁর অবদান অনেক। যার খ্যাতি এবং যশ এতই বিশাল ছিল যে, তাঁকে কবি হাফিজ সিরাজি ভারতের তোতা পাখি বলে সম্বোধন করেছেন। বিশেষ করে মসনবি রীতির কবিতার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে তাঁর অবদান তাৎপর্যপূর্ণ।[১৪৮] ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সম্রাটদের সাথে চলাফেরা ও বসবাসের কারণে ইতিহাসের অনেক তথ্য তাঁর জানা ছিল। তিনি ভারতের সাত জন বাদশার দরবারের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। সে কারণেই ইতিহাসের অনেক বিষয় কবিতায় স্থান করে আছে। ইতিহাসবেত্তাগণ তাঁকে একজন ঐতিহাসিক হিসেবেও জানেন। তাঁর কবিতা ও গদ্য রচনাগুলো অবশিষ্ট আছে। এই কবি ভারতের প্রসিদ্ধ সুফি নিজাম উদ্দিন আওলিয়ার সমসাময়িক ছিলেন।

**৭. কবি হাসান দেহলবি (১২৫৩ খ্রি.-১৩২৮ খ্রি.):** তিনি ছিলেন দিল্লির অধিবাসী আমির খসরুর একজন ভাল বন্ধু। তাঁর অসংখ্য কবিতা ছিল। তিনি বিভিন্ন রকম কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর

Dhaka University Institutional Repository


কবিতার বিষয় একই ধারার মধ্যে সীমিত ছিলনা। তিনি কাব্যরচনার ক্ষেত্রে কবি শেখ সাদিকে অনুসরণ করে কবিতা রচনা করতেন।[১৪৯] তাঁর কয়েকটি কবিতা সংগ্রহ করা হয়েছে।

**৮. আবুল ফয়জ ফয়জি (মৃ. ১৫৯৬ খ্রি.):** তিনি একজন উন্নত ও ভাল হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। ফয়জি তার বিশেষত্ব বা উপাধি। তিনি আরবি ও ফারসি ভাষায় কবিতা রচনা করতেন। তিনি 'মুলকুশ শোয়ারা' খেতাবটি পেয়েছিলেন। গবেষণা ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাঁর উন্নত চিন্তা ভাবনা ছিল।[১৫০] তাঁর রচনাগুলা সে সময়ের ফারসি চর্চার অন্যতম দলিল।

**৯. ইব্রাহিম কাওয়াম ফারুকি:** তিনি ছিলেন জৌনপুরের অধিবাসী আলিম পরিবারের ব্যক্তি। তাঁর জন্ম, মৃত্যু, শিক্ষা ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে কোনো তথ্য নেই। কাব্যপ্রতিভা সম্পর্কে তাঁর রচিত *ফরহাঙ্গ-ই-ইব্রাহিমী* বা *শারফ নামে ইব্রাহিমী* উল্লেখ করা হয়ে থাকে। যদিও এটি একটি অভিধান বিষয়ক রচনা। অভিধানটি প্রচলিত অভিধানের মত নয়। এতে সে সময়ের ফারসি কবিদের জীবনী ও ভিতরে স্বরচিত বয়েত ছাড়াও প্রসিদ্ধ ফারসি কবিদের বয়েত রয়েছে। যে গুলো কবি হিসেবে তাঁর পরিচিতিকে উজ্জ্বল করে তোলে। এটি রুকনুদ্দিন বারবাক শাহের সময়কালে (১৪৫৯ খ্রি.-১৪৭৪ খ্রি.) রচিত হয়।[১৫১] সে হিসেবে এর রচনাকাল ধরা হয়েছে ১৪৭৪ খ্রিস্টাব্দ।

**১০. কবি আবদুর রহমান:** তাঁর জীবনী সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্যের অভাব আছে। তিনি চট্টগ্রাম বা ফরিদপুরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর একটি রচনার নাম *মখজনে গাঞ্জে রাজ*। এটি সুলতান গিয়াস উদ্দিন বাহাদুরের রাজত্বকালে রচিত হয়। সে হিসেবে তিনি এটি ১৫৫৯ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে লিখেন। এতে বিয়াল্লিশটি অধ্যায় আছে। তাতে হামদ-নাত, পীর-মুরিদ, সুফি তরিকা বিষয়ে আলোচনা রয়েছে।[১৫২]

**১১. উরফি শিরাজি (১৫৯১ খ্রি.-১৫৫৬ খ্রি.):** সৈয়দ জামাল উদ্দিন উরফি ছিলেন শিরাজের অধিবাসী একজন কবি। প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর নিজ দেশ থেকে হিন্দুস্থানের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর ভারতে আগমনের তারিখ কোথাও উল্লেখ নেই। তবে তিনি পরবর্তী সময়ে নিজ দেশে ফিরে যান নি। এই কবি গযল ও কাসিদা রীতিতে কবিতা লিখতে পারদর্শী ছিলেন। তাঁর একটি কবিতার *দিওয়ান* রয়েছে।[১৫৩] বাদশাহ আকবরের সভাকবি হিসেবেও তাঁর সুনাম ছিল।

Dhaka University Institutional Repository


**১২. নাজমুদ্দিন হাসান বিন আলা সানজুরি (মৃ. ৭৩৭ হি.):** তিনি ছিলেন উপমহাদেশে ফারসি ভাষার একজন উঁচু মানের কবি। তার কবিতা সুমধুর ছিল। ভারতে তাঁকে ‘সাদিয়ে হিন্দ’ বলে অভিহিত করত। তাঁর ফারসি কবিতার একটি *দিওয়ান* রয়েছে।[১৫৪] এ ছাড়া তাঁর কয়েকটি রচনা থাকার কথা উল্লেখ পাওয়া যায়।

**১৩. ইয়াকুব সারফি (১৫২১ খ্রি.-১৫৯৫ খ্রি.):** ভারতীয় উপমহদেশের অন্যতম ফারসি ভাষার একজন মসনবি বিশারদ। এ কবির আলোচনা আমির খসরুর ন্যায় ততটা প্রসিদ্ধি পায় নি। তিনি ১৫২১ খ্রিস্টাব্দে শ্রী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মীর হাসান গেনাই ছিলেন একজন বিশিষ্ট আলিম। তিনি শৈশব থেকেই প্রখর মেধা ও জ্ঞান বিদ্যার অধিকারী ছিলেন। তিনি ছোট্ট বেলায় আরবি ফারসি শিক্ষা লাভ ব্যতীত সাত বছরে কুরআন শরীফ হেফজ করার গৌরব অর্জন করেন। এ কবির জ্ঞান প্রতিভা ছিল তুলনাহীন। কাব্যচর্চার জন্য বিশেষ উস্তাদ ছিলেন আবদুর রহমান জামির শাগরেদ মোল্লা মোহাম্মদ অ'নি খোতলানি। তিনি কবিকে সারফি উপাধিটি প্রদান করেন।[১৫৫] কখনও উস্তা তাঁকে দ্বিতীয় জামি হিসেবে অবিহিত করতেন। সম্ভবত কবিতা রচনার ক্ষেত্রে সে সময় কাশ্মীরে তাঁর মত দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না। তবে তিনি কবিতা রচনায় কবি নিজামির পথ অনুসরণ করেছিলেন। তিনিই প্রথম কাশ্মীরের একজন ফারসি কবি পারস্যের নিজামির পাঁচটি মসনবি কাব্যের ন্যায় পাঁচটি মসনবি রীতির কাব্য রচনা করতে সক্ষম হন।[১৫৬] তাঁর রচনাগুলো হল: ১. *মাসলিকুল আখবার* (مسلک الاخبار), ২. *ওয়ামিক ওয়া আযরা* (وامق و عذرا), ৩. *মাগাযেয়ে ন্নাবী* (مغازه النبی), ৪. *মাকামত ই মোরশিদ* (مقامات مرشد) এবং ৫. *লায়লা ওয়া মাজনুন* (لیلی و مجنون) প্রভৃতি।

**১৪. আবুল বারাকাত মুনির লাহুরি (১৬০৯ খ্রি.-১৬৪৫ খ্রি.):** তিনি ছিলেন পাকিস্তানের লাহুর অধিবাসী একজন কবি। সায়ফ খান সুবেদার হিসেবে এলাহবাদে থাকাকালীন সময়ে এ কবির বিভিন্ন রচনা প্রসিদ্ধি পায়। তাঁর ভাই আবুল ফাতাহ বাংলায় সায়ফ খানের সুবেদারীর সময় দরবারেরর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। এ সময়ে কবি জাহাঙ্গির নগর ছিলেন এবং *মসনবি দার সিফাতে বাঙ্গাল (مثنوی در صفات بنگال)* কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি এক লক্ষের অধিক কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। তাঁর কবিতাগুলো বিভিন্ন রীতির উপর ছিল।[১৫৭] রচনাটিতে সতের শতকের বাংলার দৃশ্য উপস্থিত রয়েছে।

**১৫. আবদুর রহিম গোরখপুরি (১৭৮৫ খ্রি.-১৮৫৩ খ্রি.):** তিনি ছিলেন পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসী একজন ফারসি বিশেষজ্ঞ। সে সময়ে তাঁর ন্যায় বিশাল পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের অধিকারী অন্য কেউ ছিল

না। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাগুলো হল, *ফারহাঙ্গে দাবিস্তান*, *পান্দে নামে বাহরামি*, *তারিখে হিন্দুস্তান*, *কারনামে হায়দারি* প্রভৃতি। এ কবি ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় এসেছিলেন।[১৫৮] এখানেও তিনি ফারসি কবিতা রচনা করেন।

এ ছাড়া কবি নাসির আলি সারহেন্দি, কবি গানি কাশ্মিরি (মৃ. ১৬৬৮ খ্রি.), মির্যা নেয়ামত আলি (মৃ. ১৭০৯খ্রি.), কবি গানিমাত( মৃ. ১৭৪৫ খ্রি.), কবি মাজহারে জান ই জানান (মৃ. ১৭৮০ খ্রি.), মির্যা কাতিল (মৃ. ১৮২৪ খ্রি.), কবি ওয়াফিক (মৃ. ১৮৭৫ খ্রি.) প্রমুখ প্রসিদ্ধ কবি।

## ইতিহাস রচনায় মুসলমান

ভারত উপমহাদেশে মুসলমান আগমনের পূর্বে ইতিহাস রচনাকারী হিসেবে হিন্দুদের অবদান নেই বললেই চলে। তাঁরা কোন প্রকার ইতিহাস রচনা করেন নাই। যদি তাঁরা সামান্য অবদান রেখে যেত, ভারতের প্রাচীন ইতিহাস জানার জন্য চীনা বা গ্রীক পর্যটকদের স্মরণ করা হত না। বেদ, রামায়ন ও মহাভারত কোনটিই প্রাচীন ভারতের ইতিহাস নির্দেশ করে না।[১৫৯] এই অঞ্চলে যখন মুসলমান আগমন করল তখন থেকেই অসংখ্য ইতিহাস লেখক সৃষ্টি হয়। সবচেয়ে বড় হাস্যকর বিষয় হল যে, মুসলমানদের আগ্রহের দেখাদেখি হিন্দুরা ফারসি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ইতিহাস রচনায় চেষ্টা করেন।[১৬০] তবে দুখের বিষয় যে, কতক রচনা বিলুপ্ত হলেও মুসলিম আমলের স্থানীয় বা বহু ইতিহাসমূলক ফারসি রচনা ছাপার মুখ দেখেছিল বলে ইতিহাসের ক্ষেত্রে ফারসি রচনাদির গ্রহণযোগ্যতা অধিক মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে।

## প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থ

ফারসি ভাষায় ইতিহাস রচনায় ভারতীয়রা খ্যাতি অর্জন করেছেন- বিষয়টি পুরোপুরি সত্য না হলেও আংশিক সত্য। অনেক ইতিহাস লেখক জন্মসূত্রে ভিন্ন দেশের হলেও ভারতে অবস্থান করে ইতিহাস লিখেছেন। সে ইতিহাস রচনার ধারা ছিল অঞ্চল ও দেশভিত্তিক। তাঁরা সমগ্র ভারতে ও অঞ্চলভিত্তিক ইতিহাস ব্যতীত পৃথিবীর ইতিহাস রচনা করে খ্যাতি লাভ করেছেন। এ সব রচনার সংখ্যাও অনেক। শুধুমাত্র নমুনা উপস্থাপনের জন্য ক'টি রচনার উল্লেখ বিশেষ দাবি রাখে।

ক. *আকবার নামে* (اکبر نامه) : আবুল ফজলের *আকবার নামে* একটি ঐতিহাসিকমূলক গ্রন্থ। একজন সরকারের প্রিয়পাত্র হিসেবে আবুল ফজলের কৃতিত্ব রয়েছে। তিনি রচনায় বাদশাহ আকবর

Dhaka University Institutional Repository


ও তাঁর সময়কালের যাবতীয় রাজনৈতিক ঘটনার সাথে সে সময়ের ভারতীয় উপমহাদেশের অনেক চিত্র তুলে ধরেছেন। বাংলায় মুঘল অভিযান, বিদ্রোহ ও জমিদারের প্রতিরোধ এসব ঘটনাও এতে স্থান পেয়েছে।[১৬১] ফারসি ভাষার এ গ্রন্থটি ভারতীয় মুসলিম ইতিহাসের একটি দলিলপুঞ্জ। এটি তিন খন্ডে সমাপ্ত।

খ. *আইনে আকবারি* (آيئن اكبرى) : ইতিহাসের উৎস হিসেবে পরিচিত আবুল ফজল আল্লামি রচিত *আইনে আকবারি* গ্রন্থ। এতে রয়েছে প্রাদেশিক কর্মকর্তার দায়িত্ব, কর্তব্যের বিবরণ, ভূমি ব্যবস্থা, ভূমি বন্দোবস্ত ও সরকার, জমিনদার ও ইত্যাদির ব্যবস্থাপনা, ব্যক্তি ও স্থানের নাম, সামাজিক জীবন ব্যবস্থার চিত্র, কবি সাহিত্যিক, সুফি আলেম-উলামাদের বর্ণনা।[১৬২] এটি তিন খন্ডে সমাপ্ত। উল্লেখ্য যে, অনেকেই এটি *আকবার নামের* অংশ হিসেবে উল্লেখ করেন।

গ. *তাবাকাতে নাসিরি* (طبقات ناصرى) : এটির রচয়িতা কাজি ওমর মিনহাজ উদ্দিন উসমান বিন সিরাজ উদ্দিন আজ জুযজানি। লেখক দিল্লির সুলতানদের অধীন কাজি পদে চাকুরি করতেন। সে সময়ের বিভিন্ন ঘটনাবলি তিনি স্ব চক্ষে দেখেছিলেন। এক সময় তিনি প্রধান কাজি পদে অধিষ্টিত হন। তাঁর ইচ্ছে ছিল যে, বইটি কোনো বাদশার নামে উৎসর্গ করে চিরজীবি করে রাখা। তিনি এটি সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদকে উৎসর্গ করেন। বইটির নাম করণের বিষয়টিও সুলতান নাসির উদ্দিনকে কেন্দ্র করে রাখা হয়। এতে ১২০৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২৬০ খ্রিস্টাব্দের বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাবলি স্থান পেয়েছে। এ গ্রন্থে বখতিয়ার খিলজির বঙ্গ বিজয় ও পরবর্তী ঘটনার ঐতিহাসিক বিবরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।[১৬৩]

ঘ. *তারিখে বাঙ্গালা* (تاريخ بنگاله): শুধু বাংলাদেশ সম্পর্কে আঠার শতকের নির্ভরযোগ্য যে সব ইতিহাসগ্রন্থ ফারসি ভাষায় রচিত হয়েছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম হলো মুনশি সলিমুল্লাহ রচিত *তারিখে বাঙ্গালাহ*। মুঘল বাংলার সুবাদারগণের বিভিন্ন ঘটনাবলী জানার জন্য একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এতে বাংলার ষাট বছরের (১৬৯৬ খ্রি.-১৭৫৬ খ্রি.) ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। তিনি গ্রন্থটি ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন।[১৬৪]

ঙ. *রিয়াজ উস সালাতীন* (رياض السلاطين): এটি পাঠান ও মোগল যুগের বাঙ্গালার ইতিহাস জানার জন্য একটি উৎকৃষ্টতম রচনা। গোলাম হোসেন সেলিম যায়েদপুরি রচনা করেন। এটি ইংরেজ জার্জ

ফোর্ট এর আদেশক্রমে ১৭৮৬-৮৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়।[১৬৫] বাংলার মুসলমানদের ধারাবাহিক ইতিহাস জানার জন্য এ গ্রন্থটির গুরুত্ব অনেক।

চ. *সিয়ার উল মুতাআখ্খরীন* (سيرالمتاخرين): সৈয়দ গোলাম হোসেন খাঁ রচিত *সিয়ার উল মুতাআখ্খরীন* গ্রন্থটি ভারতের সামগ্রীক ইতিহাস জানার জন্য একটি উৎকৃষ্টতম রচনা। তিনি একজন কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর কাব্য নাম হলো সলীম। এতে ভারতের সাতজন বাদশার জীবন-কাহিনী স্থান পেয়েছে। দিল্লির রাজা-বাদশাহ রাজত্বের শুরু থেকে শাহ আলমের যুগ পর্যন্ত বর্ণনা পাওয়া যায়।[১৬৬] এ ছাড়া এ গ্রন্থে ১৭০৬-১৭৮০ খ্রস্টাব্দ পর্যন্ত ভারত সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। এটি বাংলাদেশ সম্পর্কে জানার একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। লেখক ছিলেন নবাব আলি বর্দী খাঁর আত্মীয়। এটি দুটি খন্ডে বিভক্ত।

ছ. *বাহারেস্তানে গায়বি* (بهارستان غيبى): রচয়িতার নাম আলাউদ্দিন ইস্পাহানি। মির্জা নাথান তাঁর একটি জনপ্রিয় নাম; ছদ্ম নাম গায়বি। কবিরা সাধারণত ভিন্ন নামে পরিচিত থাকেন। তিনি একজন কবি ছিলেন। এটি ১৬০৮খ্রি.- ১৬২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা ও অন্যান্য অঞ্চলের ইতিহাস স্থান পেয়েছে। এ গ্রন্থটি চারটি খন্ডে বিভক্ত। বাদশাহ জাহাঙ্গিরের রাজত্বকাল, কাশিম খাঁর প্রশাসনিক ব্যবস্থা, ইব্রাহিম খাঁর শাসন ব্যবস্থা ও বাদশাহ শাহজাহানের রাজত্ব সম্পর্কে আলোচনা পাওয়া যায়। এই ফারসি গ্রন্থটির মূল্য অনেক।[১৬৭]

বাংলার অন্যতম ইতিহাসগ্রন্থ ইউসুফ আলি খান রচিত *আহওয়ালে মাহাব্বাত জাঙ্গ*, সৈয়দ করম আলির *মুজাফফারনামে*, অন্যতম। বাংলা সম্পর্কে ইতিহাসমূলক গ্রন্থগুলোর রচয়িতা বাংলার অধিবাসী ছিলেন। তাঁরা গ্রন্থগুলো বাংলার জীবন যাত্রার সাথে সম্পর্ক রেখে রচনা করেছেন।[১৬৮]

## পত্র রচনা

চিঠি-পত্রের সাথে ইন্শা, মাক্তুবাত, রূকআত– এসব পত্রসাহিত্য হিসেবে অধিক পরিচিত। এগুলো ইতিহাসের উপাদান হিসেবেও বিবেচনা করা হয়ে থাকে। রাজ-দরবারের সাথে যাদের ঘনিষ্ট সম্পর্ক এবং পেশায় দক্ষ ছিল তারাই চিঠিপত্র লিখতেন। মধ্যযুগে ভারত-উপমহাদেশে রাজা-বাদশাহ এবং রাজ্যের কর্তব্যরত ব্যক্তিরা পত্র সাহিত্যের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁদের পত্র বা রচনা নিজস্ব সংগ্রহে বা অফিসেই সংরক্ষিত থাকত। বিশেষ করে ইন্শা ব্যাপকভাবে সাধারণের মধ্যে প্রচলন ছিল। অনেক

Dhaka University Institutional Repository


ইন্‌শা ও মাক্‌তুবাতে আধ্যাত্মিক সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। সুফিবাদের কথা নিহিত থাকায় এসব রচনাকে সুফিদের কার্যক্রমের অংশ মনে করা হত।[১৬৯] একই সাথে ফারসি ভাষায় পত্র লেখার অভ্যাস বাদশাহ থেকে শুরু করে সাধারণের মধ্যেও ছিল। পির-মুরিদ, পিতা-পুত্র, ভাই-বন্ধু ও আত্মীয় স্বজনের মধ্যে পত্র আদান-প্রদানের রেওয়াজ ছিল। যে সব পত্র ইতিহাসের উপাদান বা সুফিবাদের বিষয় হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে শুধু সেগুলো সম্পর্কে আমরা অবহিত আছি। ফারসি ভাষায় রচিত বহু পত্র সাহিত্যের মানেও সমৃদ্ধ। যদিও রাজা-বাদশাহদের পত্র রাজ্য-সংবাদ বা গোপন তথ্য হিসেবে পরিচিত। এসব রচনা সম্পর্কে নিম্নে একটি চিত্র দেয়া হল:

সরফ উদ্দিন বু আলি কলন্দর লিখিত *মাকতুবাত* ধর্ম ও ইতিহাস বিষয়ে নানা তথ্য প্রদান করেছে। এসব রচনা খুব বেশি জনসাধারণের মধ্যে প্রচার পায়নি। অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি হিসেবে সে সবের কিছু সংখ্যক পত্র বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। *আইয়ার দানিশ*কে আবুল ফজলের স্মৃতিচারণমূলক রচনা হিসেবেও আখ্যা দেয়া হয়ে থাকে। এটি আল্লামি আবুল ফজলের এক ধরণের রোজনামচা। তিনি অনেক চিঠি-পত্র ও রচনা রেখে গিয়েছিলেন যা জীবদ্দশায় জনসমাজে আসেনি। এটির সংকলক হিসেবে নুর মোহাম্মদের নাম উল্লেখ পাওয়া যায়। এতে যদিও ধারাবাহিক ইতিহাস নেই তবুও ইতিহাসের অনেক অজানা বিষয় সন্নিবেশীত আছে। সুবেদার, মুনসেবদার, সুবে, ইরানি সনের সাথে বাংলা সন ব্যবহার, ভারত অঞ্চলের কয়েকটি জেলার খাজনা, তহসীলদার এবং রাজ্যের ভাল-মন্দের বিষয়ে আলোচনা পাওয়া যায়। *ইনশাই মাতলুব* –এর রচয়িতার নাম শেখ মোবারক হাশেমি। এটির বিষয়ও বিভিন্ন রকমের চিঠি ও রচনা। পত্রগুলো আরজিনামা, অঙ্গিকারনামা, রাসিদ নামা ইত্যাদি নামে বিভক্ত। এ রচনাতে পূর্ব বঙ্গের ইতিহাস স্থান পেয়েছে। ভাগলপুর, ইসলামাবাদ, সেলিমপুর, ইত্যাদি পরগানায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের নাম পাওয়া যায়। মুনশি হারকারন রচিত *ইন্‌শায়ে হারকরন* একটি মূল্যবান রচনা। এতে বাদশাহ হুমায়ুন বা তদ্‌পরবর্তী সময়ের চিঠি রয়েছে। চিঠিগুলো ফরমান, ফরওয়ানা, জওয়াব, আর্জি ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে। কতক চিঠি বন্ধুর প্রতি, প্রেমিক-প্রেমিকার প্রতি সম্বোধন করে লিখা হয়। চিঠিগুলোর মধ্যে পরগানায়ে সাঈদপুর, জালালাবাদ, সেলিমপুর ও আকবরাবাদ স্থানের নাম পাওয়া গিয়েছে। *জামেউল কাওয়ানীন* এর রচিয়তার নাম মাখদুম শাহ খলিফা মোহাম্মদ। এতে চারটি অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রকার চিঠি ও রচনা রয়েছে। খাজা উবায়দুল্লাহর *মাকতুবাত* রচনায় আকায়েদ বিষয়ে দলিলভিত্তিক আলোচনা পাওয়া যায়। *মান্‌শাতে গুলশান* রচনায় খোদা প্রেম নিবেদন, প্রেমের বিরহ বেদনা, প্রেমের মিলন, বাসনা –আধ্যাত্মিক বিষয় রয়েছে। *রুকআতে আবুল ফজলের* রচয়িতা আল্লামা আবুল ফজল ছিলেন বাদশাহ

Dhaka University Institutional Repository


আকবরের দরবারের একজন বিশেষ ব্যক্তি। দরবারের সাথে সম্পৃক্ত রেখে তাতে ফরমান, নিজস্ব চিঠি ও রচনা লিখেছেন। *রূকআতে আমানুল্লাহ* রচনাটিও বিভিন্ন সময়ের সামাজিক চিঠি সম্পর্কে তথ্য দেয়। হামিদ কলন্দর *খায়রুল মাজালিস* রচনা করেন। এটি খাজা নাসির উদ্দিন চেরাগে দেহলবির (মৃ.৭৫৭ হি.) কথামালা। তাতে অনেক কবিতা রয়েছে। মোল্লা তোঘরা মাশহাদির (মৃ. ১৬৬০ খ্রি.) উল্লেখযোগ্য রচনার নাম *রেসালে* এবং *রূকআত*। তদ্রুপ মির্যা নুরুদ্দিন মোহাম্মদ নিয়ামত খানের (মৃ. ১৭০৯ খ্রি.) একটি *রূকআত* রয়েছে। এসব ফারসি ভাষা ও সাহিত্য চর্চার জন্য গুরুত্বপূর্ণ দলিলপুঞ্জ।[১৭০] রচনাগুলোতে মধ্যযুগের সামাজিক বিচার, লেনদেন, অভিযোগ প্রভৃতি বিষয় স্থান পেয়েছে।

## জীবনী ও গবেষণামূলক রচনা

ভারত অঞ্চলে ফারসি ভাষা চর্চার প্রসার ও উন্নয়নে জীবনী ও গবেষণামূলক গ্রন্থের গুরুত্ব অনেক। সে আলোকেই অসংখ্য গবেষক, লেখক ও অনুবাদক রচনার মাধ্যমে নিদর্শন রেখে যেতে সমর্থ হয়। ফারসিভাষী কবি ও সাহিত্যিকদের জীবনী জানার জন্য উৎকৃষ্টমানের রচনাগুলো হল নিম্নরূপ:

১. *লুবাবুল আলবাব* (لباب الالباب): এটি একটি জীবনীমূলক গ্রন্থ। এটি সাদিদ উদ্দিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ উ'ফি রচনা করেন। এটি ভারত ও পাকিস্তানের ফারসি কবি ও সাহিত্যিকদের জীবনী নিয়ে প্রথম রচনা।[১৭১]

২. রওজাতুস সালাতীন (روضت السلاطين) : এটি বাংলার ফারসি কবিদের নিয়ে অন্যতম একটি গদ্য রচনা। এটিকে রজধানী গৌরের ফারসি কবিতার সংকলন গ্রন্থ বলা চলে। ফখর ইবনে মুহম্মদ আমিরুল হারারি এ কাব্য গ্রন্থটি সংকলন করেন। যদিও গ্রন্থটি বাংলার কবিদের নিয়ে রচিত হয়েছে। এতে বাহিরের বাদশাহদের কবিতার প্রতি অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়।[১৭২]

৩. *রিয়াজুশ শোয়ারা* (رياض الشعرا): একটি অন্যতম জীবন-চরিতমূলক গ্রন্থ। এটি রচিত হয় ১১৬১ হিজরি সালে। রচয়িতা আলি কুলি খান দাগেস্থানি (১১২৪ হি.-১১৬১ হি.) জন্মসূত্রে একজন ভারতীয় না হলেও তিনি মাহমুদ আফগান বাদশাহ সাফাভির সাথে যুদ্ধে জয় লাভকালে ভারতে আগমন করেন। এরপর তিনি ভারতেই অবস্থানকালে গ্রন্থটি রচনা করেছেন। এতে ২৫৯৪ জনের

জীবনী স্থান পেয়েছে। তাতে তাঁর সমসাময়িক এবং পূর্বের ফারসিভাষী কবি ও সাহিত্যিকদের নিয়ে আলোচনা করা হয়।[১৭৩]

৪. জামিমায়ে ইউসুফি (ضميمهٔ يوسفى) : ইউসুফ আলী খান রচিত জামিমায়ে ইউসুফি একটি জীবনীমূলক গ্রন্থ। তিনি ছিলেন নবাব সরফারাজ খানের জামাতা ও মুনশি সলিমুল্লাহর সমসাময়িক বন্ধু। তাঁর এ গ্রন্থে বাংলা বসবাসকারী ক'জন ফারসি কবির জীবনী স্থান পেয়েছে। আঠার শতকের ফারসি কবি ও সাহিত্যিকদের জানার এটিও একটি অন্যতম গ্রন্থ। মূলত এ গ্রন্থটি বন্ধুদের জানার জন্য রচিত হয়।[১৭৪]

৫. *মা'সিরুল উমারা* (ماثيرالامارا): এ অঞ্চলের ইতিহাস লেখক, কবি ও সাহিত্যিক অনেকেই ছিলেন ইরানি। যারা বিভিন্ন সময় বাংলায় এসে বসবাস করেছিলেন তাঁদের সংখ্যা কোনভাবেই নগন্য ছিল না। মুঘল যুগের ইতিহাস জানার জন্য *মাসিরুল উমারা* গ্রন্থটির বিশেষ মূল্য রয়েছে।[১৭৫] লেখক সেমসেমুদ্দৌলাহ যদিও ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ নিয়ে এটি রচনা করেছেন তাতে যথেষ্ট ফারসি কাব্য সাহিত্যের পরিচয় মিলে। তিন খণ্ডে বিভক্ত এ গ্রন্থে ৭৩০ জন আমিরের জীবন-কাহিনী স্থান পেয়েছে।

৬. *নাফহাতুল মাআসীর* (نفحت الماثير): রচয়িতা মীর আলাউদ্দিন হুসাইন কাযভিনি। এটি তিনি ১৫৬৫-৬৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচনা করেন। এতে সমকালীন যুগের কবিদের জীবনী ও তাঁদের কবিতাবলী উদ্ধৃত হয়েছে।[১৭৬] গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে কোনো তথ্য নেই। তদ্রুপ *জাখিরাতুল খওয়ানীন* গ্রন্থটির মূল্য অপরিসীম। তাতে বাদশাহ আকবর, বাদশাহ জাহাঙ্গীর ও বাদশাহ শাহজাহানের সময়কালে আমিরদের জীবনী রয়েছে।

এ সব গ্রন্থে ইতিহাস বর্ণনার পাশাপাশি আমিরদের কাব্যপ্রীতি পরিস্কারভাবে উল্লেখ রয়েছে। তাতে অনুমান করা যেতে পারে যে, ভারতীয় উপমহাদেশে শাসক ও শাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ কী পরিমাণ ফারসি ভাষা সাহিত্যের চর্চা করেছিলেন। কেনইবা ফারসি ভাষা ও সাহিত্য সাধরণ জনগনের হৃদয়ে স্থান করে নিতে সক্ষম হবে না। এ ভাষাটি রাজা ও প্রজা সকলেই বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে সহায়তা করেছেন। সুতরাং শাসকদের ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে রূপদানের একটি বড় কর্মপদ্ধতি ছিল।

## অনুবাদ সাহিত্য

ভারত অঞ্চলের জ্ঞান সাধক ও পণ্ডিত ব্যক্তি সম্পর্কে আবুল ফজল তাঁর *আইনে আকবরি গ্রন্থে* একটি বর্ণনা দিয়েছেন। সেখানে ১৪২ জন পণ্ডিত ব্যক্তির জীবন কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে। অনুবাদ কর্মের প্রতি যেমন ফারসি চর্চাকারীদের আগ্রহ ছিল তেমনি বাদশাহদের আগ্রহের বিষয়টি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এ অঞ্চলের আলেম সমাজ ও পণ্ডিতদের মাঝে সে আগ্রহ অধিক ছিল। তাঁদের অনেকে সংস্কৃত ভাষা থেকে ফারসি ভাষায় অনুবাদ করা একটি বড় দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করতেন। বাদশাহ ফিরোজ তুঘলক (১৩৫১ খ্রি.-১৩৮৮ খ্রি.), সিকান্দর লোদি (১৪৮৯ খ্রি.-১৫১৭ খ্রি.) ও বাদশাহ আকবর প্রত্যেকেই অনুবাদের মাধ্যমে ফারসি ভাষাকে চির স্থায়ীভাবে জীবন্ত করে রাখার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের তত্ত্বাবধানে ফারসি ভাষায় তুর্কি ও বহু সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ হয়। হিন্দি ভাষায় রচিত *রাজ তরঙ্গিনি* গ্রন্থের ফারসি ভাষায় অনুবাদ হয় সম্রাট আকবরের আমলে। কাশ্মিরের ইতিহাস রচনার জন্য এ গ্রন্থের চাহিদা রয়েছে অনেক।[১৭৭] তাঁর সময়ে মুসলমানরা সংস্কৃত গ্রন্থ *রামায়ণ*, *মহাভারত*, *বত্রিশ সিংহাসন*, *লীলাবতী*, *হরিবংশ* প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থের ফারসি ভাষায় অনুবাদ করেন।[১৭৮] তখন মুসলমানদের সাথে সাথে হিন্দুরাও অনুবাদ করার প্রতি আগ্রহী ছিলেন। গিরীধর দাশ, বনমালী দাশ, পণ্ডিত লক্ষি নারায়ণ, মুন্সি মাখন লাল ও অমর সিং প্রমুখ সংস্কৃত ভাষা থেকে ফারসি ভাষায় অনুবাদ করেন।

## বাঙালি কবিদের দৃষ্টি ও ফলাফল

মধ্যযুগে ভারতীয় উপমহাদেশে ফারসি সাহিত্যের এমন কোনো শাখা অবশিষ্ট ছিল না যে, সে বিষয়টির উপর কারও নজর পড়েনি। এ ভাষার সাহিত্যও যে জনসাধারণের মধ্যে বিপুলভাবে প্রসার লাভ করেছিল– তা বিভিন্ন প্রকার রচনা দেখে অনুমান করা যেতে পারে। গদ্যে যেমন– জীবনী, ইতিহাস, ধর্ম, সুফি ও পত্র বিষয়ক রচনা রয়েছে তেমনি পদ্যেও বহু রচনা প্রকাশ পেয়েছে। সেসময় অগণিত কবি আবৃত্তি ও লিখনের মাধ্যমে কাব্যচর্চার পরিচয় দিয়েছেন। সাহিত্যের যে শাখাগুলো রয়েছে–কোনটিই তাঁরা পিছনে রেখে যাননি। সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রে তাঁদের চর্চা ও বিচরণ ছিল এবং তাঁরা সে পরিচয় দিয়েছেন। বলতে দ্বিধা নেই যে, দু' একটি গ্রন্থ ছাড়া সকল রচনাই ছিল ফারসি ভাষার উপর রচিত। পরিতাপের বিষয় যে, অনেক পাণ্ডুলিপি ছাপাখানা তৈরির পূর্বে ধ্বংসে পরিণত হয়েছে। যদি ফারসি ভাষার সকল রচনা ছাপার সুযোগ পেত তা হলে আজ ভারতীয় উপমহাদেশে জ্ঞান পরিপূর্ণতা দানের ক্ষেত্রে একমাত্র ফারসি ভাষারই জয় ধ্বনি শুনতে হত। যেমনটি আজ ভারতীয় মুসলিম ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ফারসি রচনাদির কথা শুনা যায়।

দেশের দাপ্তরিক ভাষা ফারসি সমাজের সকল শ্রেণি মানুষের নিকট প্রিয় ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ ভাষাটি দীর্ঘ সময় স্থায়িত্ব লাভের ফলে বাঙালি কবিদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত সৃষ্টি করেছে। ফলে ফারসি ভাষা চর্চার পাশাপাশি আঞ্চলিক ভাষায় ফারসি কাব্যের অনুবাদ বা ভাব প্রকাশ করার শক্তি ও সাহস সঞ্চারিত হয়। তা না হলে বাংলা ভাষায় উল্লেখযোগ্য ফারসি কাব্যের অনুবাদ ও অনুসরণ করার প্রতি বাঙালি কবিদের দৃষ্টি নিপতিত হতোনা। এ কথা সত্য যে, তাঁদের ফারসি কাব্যের প্রতি মোহ ও প্রেম একদিনে সৃষ্টি হয়নি। অনেক দিন ধরেই ফারসি ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যের প্রতি বাঙালি কবিদের মোহ ছিল। এ অঞ্চলে বাংলা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে ফারসি কবিদের প্রসিদ্ধি অধিকতর স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। সেই সাথে ফারসি ভাষার প্রতি তাঁদের ভালবাসা গভীর থেকে গভীরতর হয়।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. নদভি, সোলায়মান, *মুসলিম যুগে হিন্দুদের শিক্ষা-ব্যবস্থা,* (অনুবাদক মুহিউদ্দিন খান) অল পাকিস্তান এডুকেশনাল কনফারেন্স অফিস, ঢাকা, ১৯৫৮, পৃ. ৩-৪।

২. সাফি, কাসেম, *বাহারে আদাব*, এন্তেশারাতে দানিশগাহে তেহরান, তেহরান, ১৩৮৭ হি.শা., পৃ. ২৬।

৩. *কালিলে ওয়া দেমনে*: দুটি পশুবাচক শব্দের সমন্বয়ে একটি গ্রন্থের নাম। গ্রন্থের কাহিনী হিন্দুস্তানের হলেও বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ ঘটেছে। ইরানীয়রা *কালিলা ও দিমনার* ন্যায় *আনোয়ারে সোহায়লি*, *দাস্তানহায়ে বেদপায়ি*, *এয়ার দানিশ*, *হুমায়ুননামে গ্রন্থ* ভারত থেকে সংগ্রহ করেন। এগুলো ভারতীয় উপাদানে পরিপূর্ণ।- সাবজওয়ারি, রেজা মোস্তাফাভি, সাহমে কালেলেহ ওয়া দিমনে দার এন্তকালে ফারহাঙ্গ ওয়া তামাদ্দুনে হিন্দ ওয়া ইরান বা জাহান, *দানিশ*, ইসলামাবাদ, সংখ্যা ১০১, তাবেস্তান ১৩৮৯, পৃ. ১৬৪।

৪. সাফি, কাসেম, *সাফারনামে সিন্দ কারাচি তা শাহারে খামুশান*, এন্তেশারাতে দানেশগাহে তেহরান, তেহরান, ১৩৮৫ হি.শা., পৃ. ২০।

৫. সাফি, কাসেম, *বাহারে আদাব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬; Chatterji, Suniti Kumar, *Iranianism*, The Asiatic Society, Calcutta, 1972, P. 25.

৬. চৌধুরী, আবদুল হক, *চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৬৩; Ikram, S. M., The Pattern of Pakistan's Heritage, *The Cultural Heritage of Pakistan*, Ikram S. M. (Edited), Oxford University Press, Karachi, 1955, P. 7.

৭. চৌধুরী, আবদুল হক, তদেব, পৃ. ৩৬; Ikram, S. M., The Pattern of Pakistan's Heritage, Ibid, p. 8; Rahim, Abdur, *Social & Cultural History of Bengal Vol. 1*, Pakistan Historical Society, Karachi, 1963, p. 50.

৮. কাসেমি, মোহসেন আবুল, *তারিখে মুখতাসারে যাবানে ফারসি*, এন্তেশারাতে জুহুরি, তেহরান, ১৩৭৮ হি.শা., পৃ. ১০৩; শাফাক, রেযা যাদেহ, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, এন্তেশারাতে দানেশগাহে পাহলাভি, তেহরান, ১৩৫২ হি.শা., পৃ. ১০১।

৯. কাসেমি, মোহসেন আবুল, *তারিখে মুখতাসারে যাবানে ফারসি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৩।

১০. কাসেমি, মোহসেন আবুল, তদেব, পৃ. ১০৪।

১১. সাফি, কাসেম, *বাহারে আদাব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২।

১২. কাসেমি, মোহসেন আবুল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৪।

১৩. কাসেমি, মোহসেন আবুল, তদেব, পৃ. ১০৫-৬।

১৪. তদেব, পৃ. ১০৪।

১৫. ইকরাম, এস এম, *রুদে কাউচার*, ফিরোজ সন্স, লাহুর, ১৯৫৮, পৃ. ৩০।

১৬. সাফি, কাসেম, *বাহারে আদাব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০।

১৭. সাফি, কাসেম, *তারিখে যাবান ওয়া আদাবে ফারসি দার সিন্দ ওয়া পেয়োস্তাগিহায়ে অন বা ইরান*, এন্তেশারাতে দানেশগাহে তেহরান, তেহরান, ১৩৮৭ হি.শা., পৃ. ২০।

১৮. ইকরাম, এস এম, *রুদে কাউচার*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯।

১৯. তদেব, পৃ. ৩০।

২০. গজনভি যুগের সুলতান মাহমুদ প্রথম কবিদের পুরস্কার প্রদানের রেওয়াজ চালু করেন। এটি মুসলিম বাদশাহদের দরবারে বলবত ছিল। কবিদের সম্মান জানানো মুসলিম সুলতানদের অন্যতম কীর্তি।

২১. ফাতোহি, মাহমুদ, *নাকদে আদাবি দার সাবকে হিন্দি*, কিতাবখানে মিল্লি ইরান, তেহরান, ১৩৮৫ হি.শা., পৃ. ৭১।

২২. Rahim, Abdur, *Social & Cultural History of Bengal (Vol.1)*, op.cit, p. 50.

২৩. Ghani, Muhammad Abdul, *A History of Persian Language & Literature at the Mughal Court (Part-1)*, The Indian Press, ltd, Allahabad, 1929, p. 138.

২৪. Rahim, Abdur, *Social & Cultural History of Bengal (Vol.1)*, op.cit, p. 51 & 72; বশীর, মুর্তজা, মুদ্রা ও শিলালিপির আলোকে বাঙলায় হাবশী শাসন ও তৎকালীন সমাজ, নাজমা জেসমিন চৌধুরী দ্বাদশ স্মারক বক্তৃতা, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ২১।

২৫. Rahim, Abdur, *Social & Cultural History of Bengal (Vol. 1)*, op.cit, p. 63.

২৬. একমাত্র আরব ব্যতীত সকলেই বাংলায় ফারসি ভাষার ব্যবহার ও প্রচলন করেছেন। আফগান ও মুঘলরাও ফারসি ভাষায় কথা বলতেন। গবেষক আবদুর রহিমের তালিকায় মূলত ফারসি ভাষা ব্যবহারকারী মুসলমানদের সংখ্যা পরিস্কারভাবে ফুটে উঠেছে।

২৭. Rahim, Abdur, *Social & Cultural History of Bengal Vol. 1*, op.cit, p. 50.

২৮. আল মাসুম, আবদুল্লাহ, *ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা সমস্যা ও প্রসার*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১০; সাফি, কাসেম, *তারিখে যাবান ওয়া আদাবে ফারসি দার সিন্দ ওয়া পেয়োস্তাগিহায়ে অন বা ইরান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৮।

Dhaka University Institutional Repository


২৯. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর, *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, কলিকাতা, ৪র্থ সংখ্যা ১৩২৪, পৃ. ২১৫।

৩০. Ikram, S. M., The Pattern of Pakistan's Heritage, *The Cultural Heritage of Pakistan*, op.cit, p. 13.

৩১. বারটল্ড, ভি. ভি., *মুসলমান সংস্কৃতি*, (মুহম্মদ ফজলুর রহমান অনূদিত) বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ. ৫৩।

৩২. সারওয়ার, গোলাম, *তারিখে যাবানে ফারসি*, জিয়া প্রেস, করাচি, ১৯৬২, পৃ. ২০৪।

৩৩. Rypka, J., Poets and prose wrirers of the late Saljuq and Mongol periods, *The Cambridge History of Iran V.5*, Boyle, J. A. (Edited), Cambridge University press, Great Britain, 1968, p. 606.

৩৪. সাফি, কাসেম, *বাহারে আদাব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০।

৩৫. করিম, আবদুল, *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮, পৃ. ১৯।

৩৬. অসতিয়ানি, আব্বাস ইকবাল, তারিখে ইরান পাস আয ইসলাম, *তারিখে কামেলে ইরান*, মোআসাসে ইন্তেশারাতে নিগাহ, তেহরান, ১৩৯০ হি.শা., পৃ. ৫১৪।

৩৭. করিম, আবদুল, *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯।

৩৮. প্রসাদ, ঈশ্বরী, *মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাস*, (অনুবাদক আরশাদ আজিজ) দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৯৩।

৩৯. করিম, আবদুল, *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২-৩৩।

৪০. তদেব, পৃ. ৯৮।

৪১. হালীম, এস এ, সৈয়দ লোদী আমলে ফারসি সাহিত্য, *বাঙলা একাডেমী পত্রিকা*, ৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যা, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৬৭, পৃ. ৬।

৪২. নদভি, সোলায়মান, *মুসলিম যুগে হিন্দুদের শিক্ষা-ব্যবস্থা*, (অনুবাদক মুহিউদ্দীন খান), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫।

৪৩. Ghani, Muhammad Abdul, *A History of Persian Language & Literature at the Mughal Court (Part-1)*, op.cit, p. 49.

৪৪. Ibid, p. 48.

৪৫. জুনায়দি, আজিমুল হক, (সংকলক) *মাসিরে আযম*, এজোকেশনাল বুক হাউস, আলিগড়, ১৯৮০, পৃ. ৮৫।

৪৬. জুনায়দি, আজিমুল হক, তদেব, পৃ. ৮৫-৮৬।

৪৭. শ্রীবাস্তব, হরিশঙ্কর, *মোগল সম্রাট হুমায়ূন*, (অনুবাদক জালালউদ্দীন বিশ্বাস) ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৩৯৭।

৪৮. সাফি, কাসেম, *বাহারে আদাব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩; শ্রীবাস্তব, হরিশঙ্কর, তদেব, পৃ. ৩৯৮।

৪৯. শাফাক, রেযা যাদেহ, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৫।

৫০. জুনায়দি, আজিমুল হক, (সংকলক) *মাসিরে আযম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৯।

৫১. ইকরাম, এস এম, *রূদে কাউচার*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪।

Dhaka University Institutional Repository


৫২. আমিরি, কিউমারস, *যাবান ওয়া আদাবে ফারসি দার হিন্দ*, শোআরায়ে গোসতারাশে যাবানে আদাবে ফারসি, তেহরান, ১৩৭৪ হি.শা., পৃ. ৩৫।

৫৩. সারওয়ার, গোলাম, তারিখে যাবানে ফারসি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২।

৫৪. তদেব, পৃ. ৮২।

৫৫. আমিরি, কিউমারস, *যাবান ওয়া আদাবে ফারসি দার হিন্দ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯।

৫৬. তদেব, পৃ. ৫১।

৫৭. সারওয়ার, গোলাম, *তারিখে যাবানে ফারসি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪; তদেব, পৃ. ৫।

৫৮. সাফি, কাসেম, *বাহারে আদাব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭।

৫৯. আমিরি, কিউমারস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩।

৬০. সাফি, কাসেম, *তারিখে যাবান ওয়া আদাবে ফারসি দার সিন্দ ওয়া পেয়োস্তর্তাগিহায়ে অন বা ইরান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪।

৬১. দারাশিকোহ, মুহম্মদ, *সাকিনাতুল আউলিয়া*, মোয়াসেসে মাতবোআতে এলমি, তেহরান, ১৩৪৪ হি.শা., পৃ. ৯ ও ২৭।

৬২. রায়, কানাইলাল, আবদুর রহিম খান ই খানান প্রণীত খেটকৌতুকম, *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, বৈশাখ - আষাঢ় ১৩৯৩ বাং., পৃ. ৮৯।

৬৩. রায়, কানাইলাল, তদেব, পৃ. ৯০।

৬৪. তাওয়াসালি, মুহম্মদ মেহেদি, আবদুর রহিম খান খানান ওয়া খেদমাতে উ বাহ ফারহাঙ্গ ওয়া আদাবিয়াতে ফারসি, *দানিশ*, ইসলামাবাদ, ৮৯ সংখ্যা তাবেস্তান ১৩৮৬ হি.শা., পৃ. ৮৯।

৬৫. করিম, আবদুল, *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০; সাহসারামি, মুহাম্মদ কলিম, *খেদমাত গুযারানে ফারসি দার বাংলাদেশ*, রায়েযানি ফারহাঙ্গি জমহুরে এসলামি ইরান-ঢাকা, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ২; ভট্টাচার্য, শ্রী পরেশচন্দ্র, *সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পরিচয়*, জয়দুর্গা লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ৪১৬।

৬৬. ইবনে শাইখ, আসকার, *মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৬৮; সোবহান, আবদুস, আরবি ফার্সি উর্দু সাহিত্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১ ৩য় খন্ড*, (সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম) এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৪০৯।

৬৭. আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ, *বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য [উনবিংশ শতাব্দী]*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ১৯।

৬৮. ইবনে শাইখ, আসকার, *মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২২; Ikram, S. M., Persian Literary Heritage, op.cit, P. 112.

৬৯. ফজল, আল্লামি আবুল, *আইনে আকবরি (জেলদে দোওম)*, মুনশি নাওয়াল কিশোর প্রেস, লখনৌ, ১৯৮৩, পৃ. ৬৬।

৭০. Rahim, Abdur, *Social & Cultural History of Bengal Vol. 1,* op.cit, p. 176.

৭১. Ibid. P. 50 & 55 ; Ikram, S. M., Persian Literary Heritage, op.cit, P. 114.

৭২. Ikram, S. M., Ibid, pp. 114-115.

৭৩. Ibid, p. 115.

৭৪. সারওযার, গোলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৮; আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ, *বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য [উনবিংশ শতাব্দী]*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮।

৭৫. জুনায়দি, আজিমুল হক, (সংকলক) *মাসিরে আযম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩।

৭৬. হবিবুল্লাহ, এ বি এম, *ভারতে মুসলিম শাসনের বুনিয়াদ*, (ভাষান্তর লতিফুর রহমান) বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ২১৩।

৭৭. সাফি, কাসেম, *বাহারে আদাব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮।

৭৮. সাবক: একটি সাহিত্য স্টাইল বা রীতির নাম। এটি তিন প্রকার। যথা-: ১. সাবকে খোরাসান- এর অর্ন্তভুক্ত ৩য় হিজরি, ৪র্থ হিজরি ও ৫ম হিজরি শতকের সাফারি, গজনভি ও সামানি যুগের রচনা। ২ সাবকে এরাকি- সপ্তম, অষ্টম, নবম হিজরিতে যে সাহিত্য রচিত হয়। ৩. সাবকে হিন্দি হল একাদশ ও দ্বাদশ হিজরি শতকের রচনা।-বাদাখশানি, মগবুল বেগ, *আদাবনামে ইরান* -২, ইউনিভারসিটি বুক এজেন্সি, লাহুর, ১৯৬৭, পৃ.৭৫৯-৬১

৭৯. আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ, *বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য [উনবিংশ শতাব্দী]*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭।

৮০. হক, মুহম্মদ এনামুল, *মুসলিম বাংলা-সাহিত্য*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ ২০০১, পৃ. ৯০।

৮১. সাফি, কাসেম, *তারিখে যাবান ওয়া আদাবে ফারসি দার সিন্দ ওয়া পেয়োস্তাগিহায়ে অন বা ইরান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮।

৮২. হবিবুল্লাহ, এ বি এম., *ভারতে মুসলিম শাসনের বুনিয়াদ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৪।

৮৩. হবিবুল্লাহ, এ বি এম., তদেব, পৃ. ২০৭।

৮৪. চৌধুরি, কিরণচন্দ্র, *ভারতের ইতিহাসকথা ২য় খণ্ড*, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ৩৭।

৮৫. সাফি, কাসেম, *বাহারে আদাব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯।

৮৬. সাফি, কাসেম, *সাফারনামে সিন্দ কারাচি তা শাহরে খামুসান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০।

৮৭. সাফি, কাসেম, তদেব, পৃ. ১৩।

৮৮. হাই, আবদুল, *ইসলামি উলুম ও ফুনুন হিন্দুস্তান মে*, (অনুবাদক আবুল এরফান) দারুল মুসান্নিফীন আযমগড়, ইউ পি, ১৯৬৯, পৃ. ৫০; ১. বামরি, রমজান, রাওয়াবেতে যাবান ওয়া আদাবিয়াতে বিলুচি বা ফারসি, *দানিশ*, ইসলামাবাদ, সংখ্যা ১০১, তাবেস্তান ১৩৮৯ হি.শা., পৃ. ১৭৮।

৮৯. সাফি, কাসেম, *বাহারে আদাব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩।

৯০. সাফি, কাসেম, তদেব, পৃ. ৪৭; তাহেরি, আনজাম, মারকাযে আদাবিয়াতে ফারসি আয আসরে গাযনুভিয়ান তা দোওরেয়ে হাজের, *দানিশ*, ইসলামাবাদ, সংখ্যা ১০০, বাহার ১৩৮৯ হি.শা., পৃ. ২১৮; Ikram, S. M. , op.cit, p. 92.

৯১. Ibid, p. 93.

৯২. হাই, আবদুল, *ইসলামী উলুম ওয়া ফুনুন হিন্দুস্তান মে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪।

৯৩. Ikram, S. M., op.cit, p. 95.

৯৪. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ (১৩শ খণ্ড)*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৩৮৯।

৯৫. Ikram, S. M., op.cit, p. 95 & p. 115.

৯৬. হাই, হুমায়ুন আবদুল, *মুসলিম সংস্কারক ও সাধক*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ. ১৮।

৯৭. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ (২৩শ খণ্ড)*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৫৪-৫৫।

৯৮. বাঙ্গালার যেসব ফারসি রচনা বিখ্যাত তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: *বাহরুল হায়াত, নামে হাক, আনিসুল গোরাবা, ফারহাঙ্গে ইব্রাহিমি, গাঞ্জে রায, তারিখে শাহ সুজায়ি* ও *মাসনাবি দার সিফাতে বাঙ্গালে* প্রভৃতি।

৯৯. Ikram, S. M., op.cit, p.116; করিম, আবদুল, অভিভাষণ বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলন, *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা*, ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ১৩২৫, পৃ. ২৮২।

১০০. আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ, *বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য [ঊনবিংশ শতাব্দী]*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭।

১০১. সাফি, কাসেম, *তারিখে যাবান ওয়া আদাবে ফারসি দার সিন্দ ওয়া পেয়োস্তাগিহায়ে অন বা ইরান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪।

১০২. সাফি, কাসেম, *বাহারে আদাব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬।

১০৩. চৌধুরি, কিরণচন্দ্র, *ভারতের ইতিহাসকথা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮।

১০৪. ফাতোহী, মাহমুদ, *নাকদে আদাবি দার সাবকে হিন্দী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪।

১০৫. আহমদ, ওয়াকিল, *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা ১ম খণ্ড*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৫৯ ও *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা* ২য় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৯৬।

১০৬. নদভি, সোলায়মান, *মুসলিম যুগে হিন্দুদের শিক্ষা-ব্যবস্থা, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৪।

১০৭. নদভি, সোলায়মান, তদেব, পৃ. ৪৫।

১০৮. আহমদ, ওয়াকিল, *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা- চেতনার ধারা ২খণ্ড*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬।

১০৯. রংপুরে বখতিয়ার খলজির মাদ্রাসা, মুলতানের নাসির উদ্দিন কোবাচার মাদ্রাসা, হুগলি জেলায় জাফর খানের মসজিদ ও মাদ্রাসা, জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ শাহের মাদ্রাসা, মালদহ জেলায় আলাউদ্দিন হুসেন শাহের মাদ্রাসা, গৌরের মাদ্রাসা ও ঢাকার মাদ্রাসার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

১১০. আহমদ, ওয়াকিল, *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা- চেতনার ধারা ২য় খণ্ড*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭।

১১১. আহমদ, ওয়াকিল, তদেব, পৃ. ৯৮।

১১২. সাত্তার, আবদুস, *আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস* (অনুবাদক মোস্তফা হারুন) ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ২০।

১১৩. আহমদ, ওয়াকিল, *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা- চেতনার ধারা ১ম খণ্ড*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫।

১১৪. তদেব, পৃ. ৫৪।

১১৫. সাত্তার, আবদুস, *আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস* (অনুবাদক মোস্তফা হারুন), পূর্বোক্ত, পৃ. ২০।

১১৬. আলী, মো. আজহার, ও বেগম, হোসনে আরা, *মুসলিম শিক্ষা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৫১।

১১৭. হাই, আবদুল, *ইসলামী উলুম ওয়া ফুনুন হিন্দুস্তান মে*, (অনুবাদক আবুল এরফান), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

১১৮. আহমদ, ওয়াকিল, *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা ২য় খণ্ড*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২।

১১৯. আহমদ, ওয়াকিল, *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা ১ম খন্ড*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১।

১২০. আলী, মো. আজহার, ও বেগম, হোসনে আরা, *মুসলিম শিক্ষা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪।

১২১. সাফি, কাসেম, *বাহারে আদাব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫।

১২২. জুনায়দি, আজিমুল হক, (সংকলক) *মাসিরে আযম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২।

১২৩. সাফি, কাশেম, *বাহারে আদাব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০-৪১।

১২৪. সাফি, কাসেম, *তারিখে যাবান ওয়া আদাবে ফারসি দর সিন্ধ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬।

১২৫. সাফি, কাসেম, *বাহারে আদাব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪-৩৫।

১২৬. একরাম, এস এম, *রূদে কাউসার*, পূর্বোক্ত, পৃ.২০৯; হাই, হুমায়ুন আবদুল, *মুসলিম সংস্কারক ও সাধক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩।

১২৭. সাফি, কাসেম, *বাহারে আদাব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭।

১২৮. তদেব, পৃ. ৫৭।

১২৯. মুসাভি, সায়্যেদ মুরতাযা,শাখসিয়াত, আহওয়াল ওয়া আসারে আমির খসরু আয দীদগাহে তাযেহ, *দানিশ*, পাকিস্তান, সংখ্যা-৮০ বাহার, ১৩৮৪ হি,শা., পৃ. ৯৭।

১৩০. সাফি, কাসেম, *বাহারে আদাব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭।

১৩১. তদেব, পৃ. ৫৭।

১৩২. তদেব, পৃ. ৫৮।

১৩৩. তদেব, পৃ. ৭৮।

১৩৪. লোগারি, গুল হাসান, মোআরাফি ওয়া বাররাসি সায়েরে কিতাবহায়ে ফারসি দার দাওরেয়ে কুলাহউরা, *দানিশ*, ইসলামাবাদ, সংখ্যা ৮৬ পায়িয ১৩৮৫ হি.শা., পৃ. ৭৬।

১৩৫. চারটি প্রসিদ্ধ তরিকা: এ চারটি তরিকার প্রতিষ্ঠাতা ইরানীয় ধারায় প্রতিষ্ঠিত ও ফারসি শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেষ্ঠ আলিম ও আরিফ হিসেবে খ্যাত। তাঁদের তরিকা ভারতীয় উপমহাদেশে বিস্তার লাভের সাথে শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রচার পেয়েছে। এগুলো ফারসি ভাষা চর্চার সাথে উৎপ্রোতভাবে জড়িত।-শাফাক, রেযা যাদেহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৬।

১৩৬. শাফাক, রেযা যাদেহ, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৭।

১৩৭. সাফি, কাসেম, *বাহারে আদাব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৯

১৩৮. সাফি, কাসেম, পৃ. ৯৩।

১৩৯. তদেব, পৃ. ৯২ ও ৯৪।

১৪০. ইকরাম, এস এম, *রূদ কাউচার*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮।

১৪১. Rypka, J., Poets and prose wrirers of the late Saljuq and Mongol periods, *The Cambridge History of Iran*, op.cit, p. 606.

১৪২. Ikram, S. M., op.cit, p. 95.

১৪৩. সাফি, কাসেম, *বাহারে আদাব, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৩; Ikram, S. M., op.cit, p. 93.

Dhaka University Institutional Repository

১৪৪. আখতার, মোহাম্মদ সেলিম, নিগাহি বা রাওয়ান্দ নাফোয়ে শাহনামে দার শিবহে কারেহ দার চান্দ কারনে আখীর, *দানিশ*, সংখ্যা-৯৩, ইসলামাবাদ, তাবিস্তান ১৩৮৭, পৃ. ৬৮; তাহেরি, আনজাম, লাহোর মারকাযে আদাবিয়াতে ফারসি আয আসরে গাযনুভিয়ান তা দোওরেয়ে হাজির, *দানিশ*, পৃ. ২২০; Ibid , P. 93.

১৪৫. সাহসারামি, মুহাম্মদ কলিম, *খেদমাত গুযারানে ফার্সি দার বাংলাদেশ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২।

১৪৬. সাহসারামি, মুহাম্মদ কলিম, তদেব, পৃ. ১৬; আহমদ, মফিজউদ্দিন, শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ৫।

১৪৭. আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ, *বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য [ঊনবিংশ শতাব্দী]*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০।

১৪৮. Rypka. J., Poets and prose wrirers of the late Saljuq and Mongol periods, *The Cambridge History of Iran V.5*, op.cit, p. 607.

১৪৯. Ibid, p. 610.

১৫০. ফজল, আল্লামি আবুল, *আইনে আকবরি ১ম খণ্ড*, মুনশি নাওয়াল কিশোর, লক্ষণৌ, ১৮৯৩, পৃ. ১৬৮।

১৫১. আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪; Ikram, S. M., op.cit, p.113; আবদুস সোবহান, আরবি ফার্সি উর্দু সাহিত্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১ ৩য় খন্ড*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১১।

১৫২. আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ, তদেব, পৃ. ২৮।

১৫৩. নেসারি, সেলিম, *তারিখে আদাবিয়াত ইরান (জেলদে আওয়াল)*, শেরকাতে নাসাবি, তেহরান, ১৩৩৩ হি.শা., পৃ. ৭৬; জুনায়দি, আজিমুল হক, (সংকলক) *মাসিরে আযম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৮।

১৫৪. হাই, আবদুল, (অনুবাদক আবুল এরফান) *ইসলামী উলুম ওয়া ফুনুন হিন্দুস্তান মে*, দারুল মুসান্নিফীন আযমগড়, ইউ পি, ১৯৬৯, পৃ. ৪৪৫।

১৫৫. তেকু, গেরদারী লাল, *ফার্সি সারায়েনে কাশ্মির*, এন্তেশারাতে আনজুমানে ইরান ওয়া হিন্দ, তেহরান, ১৩৪২ হি.শা., পৃ. ৮।

১৫৬. তদেব, পৃ. ৮।

১৫৭. সাহসারামি, মুহাম্মদ কলিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭; লাহুরি, মনির, *মাসনাবি দার সিফাতে বাঙ্গালে*, এদারেয়ে মাতবোআতে পাকিস্তান, করাচি, ১৯৮৭, পৃ. দিবাচে-৩।

১৫৮. আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ, *পশ্চিম বঙ্গে ফার্সী সাহিত্য*, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ১৭-১৮।

১৫৯. নদভি, সোলায়মান, *মুসলিম যুগে হিন্দুদের শিক্ষা ব্যবস্থা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫।

১৬০. তদেব, পৃ. ৫৭।

১৬১. চৌধুরী, তেসলিম, *মধ্যযুগের ভারত*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ১২।

১৬২. তদেব, পৃ. ১৩।

১৬৩. আহমদ, ওয়াকিল, *বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৬১।

১৬৪. ইয়াকুব আলী ও রুহুল কুদ্দুস, *মুসলমানদের ইতিহাস চর্চা*, অবসর, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ২৪২।

Dhaka University Institutional Repository


১৬৫. হাই, আবদুল (অনুবাদক আবুল এরফান) *ইসলামী উলুম ওয়া ফুনুন হিন্দুস্তান মে*, দারুল মুসান্নিফীন আযমগড়, ইউ পি, ১৯৬৯, পৃ. ৯৬; হবীবুল্লাহ, মুহম্মদ, রিয়াজ উস সালাতীন ও পাঠান যুগের বাঙ্গলা, *মাসিক মুহাম্মদী*, ১৪শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ১৩৪৮ বাং, পৃ. ৬৫১।

১৬৬. আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১; হবীবুল্লাহ, মুহম্মদ, রিয়াজ উস সালাতীন ও পাঠান যুগের বাঙ্গলা, তদেব, পৃ. ৬৫১।

১৬৭. মূল্যবান ফারসি গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি বিষয়ের অধ্যাপক ডক্টর মুয়িদুল ইসলাম বোরা।

১৬৮. আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ, তদেব, পৃ. ১১; সোবহান, আবদুস, আরবি ফার্সি উর্দু সাহিত্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৩।

১৬৯. ইকরাম, এস এম, *রূদে কাউচার*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৬।

১৭০. ফারসি চিঠি পত্র ও রচনা এ অঞ্চলের জনসাধারণ পাঠ করে বিভিন্ন প্রকার স্বাদ পেতেন। এরূপ নামের বহু ফারসি পাণ্ডুলিপি ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। সবচেয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চিঠিপত্র ও রচনা বিষয়ক চল্লিশটির অধিক পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। সে থেকে তথ্য দেয়া হয়েছে। দ্রষ্টব্য-খেতক, নুসরাত জাহান, মাকায়েসে কিতাবহায়ে ইনশায়ি ইরান ওয়া শিবেহকারেহ, *দানিশ*, পাকিস্তান, সংখ্যা ৯৩, তাবেস্তান ১৩৮৭ হি.শা., পৃ. ২২৩-২৩১।

১৭১. সাফি, কাসেম, *বাহারে আদাব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১।

১৭২. Ikram, S. M., op.cit, p. 113.

১৭৩. সাফি, কাসেম, *বাহারে আদাব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৬।

১৭৪. খান, ইউসুফ আলি, *জামেমেয়ে তার্যাকিরেয়ে ইউসুফি*, (সম্পাদনায় আবদুস সোবহান) এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ইনট্রোডাকশন -১০; আহমদ, ওয়াকিল, *বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪।

১৭৫. সেমসেমাদ্দৌলাহ, নবাব, *মাসিরুল উমারা*, এশিয়াটিক সোসাইটি বাঙ্গাল, কলকাতা, ১৮৯৪, পৃ. ৩৫; হোসাইনযাদে, সায়্যেদ ও তাওয়াসালি, মেহেদি, তারিখ নাভিসি ফারসি দার দাওরেয়ে কুলাহউরা, *দানিশ*, ইসলামাবাদ, সংখ্যা ১০০, ১৩৮৫ হি.শা., পৃ. ৩৯।

১৭৬. শ্রীবাস্তব, হরিশঙ্কর, *মোগল সম্রাট হুমায়ূন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৮।

১৭৭. নদভি, সোলায়মান, *মুসলিম যুগে হিন্দুদের শিক্ষা-ব্যবস্থা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮।

১৭৮. নদভি, সোলায়মান, তদেব, পৃ. ১১৩।

Dhaka University Institutional Repository


# সহায়ক গ্রন্থাবলি


১. মাহমুদ ফাতেহি : নাকদে আদাবি দার সাবকে হিন্দি

২. এ বি এম হাবিবুল্লাহ : ভারতে মুসলিম শাসনের বুনিয়াদ

৩. ড. কাশেম সাফি : বাহারে আদাব

৪. ড. কাশেম সাফি : তারিখে যাবান ওয়া আদাবে ফারসি দার সিন্দ

৫. কালিম সাহসারামি : খেদমাত গুযারানে ফারসি দার বাংলাদেশ

৬. মোল্লা হারভি কাতঈ : মাজমোয়ায়ে শোআরায়ে জাহাঙ্গীর শাহী

৭. ড. কাশেম সাফি : সাফার নামে সিন্দ

৮. ড. গ.ল. তেকু : ফারসি সারায়েনে কাশ্মির

৯. ড. মোহাম্মদ কাসেম আহমদ : আদাবিয়াতে তাতবিকী ইরান ওয়া হিন্দ

১০. এস এম ইকরাম : রূদে কাউচার

১১. Abdur Rahim : Social & Cultural History of Bengal (V. 1)

১২. Muhammad Abdul Ghani : A History of Persian Language & Literature at the Mughal Court (Part-1)

১৩. S. M. Ikram (Edited) : Cultural Heritage of Pakistan

১৪. J. A. Boyle, (Edited) : The Cambridge History of Iran (V.5)

Dhaka University Institutional Repository

# দ্বিতীয় অধ্যায়: ফারসি ও বাংলা ভাষার সম্পর্ক পর্যালোচনা

একটি ভাষার সাথে অন্য ভাষার মিল বা সামঞ্জস্য থাকার বিষয়টি খুবই স্বাভাবিক। মিলটি কোনো না কোনো সম্পর্কের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। যেমন– ভাষা ব্যবহারকারী জাতির আর্বিভাব, ভাষা সৃষ্টির উৎপত্তিকাল ও ভাষার গঠন কাঠামো ইত্যাদি বিষয়ে সম্পৃক্ত থাকা। ফারসি ও বাংলা ভাষার মধ্যে এরূপ মিল বহুদিন ধরেই বিদ্যমান রয়েছে। তবে এ দু'টি ভাষার মধ্যে বিপরীত দিক যে নেই তা নয়। দু'টি ভাষার ব্যবহার ও বাচনভঙ্গিতে প্রচুর পার্থক্যসহ লেখ্যরূপও ভিন্ন। ভাষা ব্যবহারকারী হিসেবে একটি বাঙালি জাতি অপরটি ইরানি জাতি। অথচ ভাষা দু'টি পরস্পর সম্প্রীতি ও সম্মিলনের কথা বলে।

## ভাষা ও ভাষাগোষ্ঠী

পৃথিবীর যে সমস্ত দেশে যে সকল ভাষা প্রচলিত আছে এ সকল ভাষার ইতিহাস রয়েছে। ভাষাতাত্ত্বিকগণ এ সকল ভাষাকে কয়েকটি ভাগে শ্রেণিভুক্ত করে ভাষাগুলোর একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সে ভিত্তিতেই ভাষাগুলোর পরিচয় জানা সম্ভব হচ্ছে। ভাষাগুলোর মধ্যে শব্দ, উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গির পার্থক্য লক্ষণীয়। এটির উপর ভিত্তি করে ভাষার প্রকার ও শ্রেণির তারতম্য করা হয়। একই গোষ্ঠীতে বহু উপ-ভাষার উৎপত্তির পর তা কখনো একই নিয়মে প্রতিষ্ঠিত থাকে না। আবার কতক ভাষা বহু পরিবারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থেকেও নির্দিষ্ট নিয়মে ব্যবহৃত হচ্ছে।[১] মূলত ভাষাকে মার্জিতরূপ দানের জন্যই ব্যাকরণের সৃষ্টি। প্রতিটি ভাষায় ব্যাকরণগত বিষয় আছে যার মাধ্যমে সে ভাষা মার্জিতরূপে ব্যবহার হয়ে থাকে। পৃথিবীর ভাষাগুলো ব্যাকরণ ব্যতীত নয় বরং সুনির্দিষ্ট নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ভাষা বলতে প্রধানত মুখের ভাষাকে বুঝানো হয়ে থাকে। এই মুখের ভাষা সভ্য সমাজে কথ্য ও লেখ্য ভাষা হিসেবে পরিচিত। ভৌগলিক অবস্থান ও গোষ্ঠী বিশেষের কারণে মুখের ভাষায় ভিন্নতা সৃষ্টি হয়।

Dhaka University Institutional Repository

যদর্থে ভাষার মধ্যে প্রকার ও শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে। ভাষাগোষ্ঠী ও শ্রেণি বিন্যাসের বিষয়টি নিরূপণ করা হয় ভাষার প্রকরণ দিয়ে। শব্দ, প্রত্যয় ও বাক্য গঠনরীতি – ভাষার মৌলিক বস্তু।[২] এক ভাষার সাথে অন্য ভাষার সম্পর্ক বা পার্থক্য নির্ণয় ঐ মূল বস্তুর উপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে। যেমন- সংস্কৃত ও আবেস্তা ভাষার মধ্যে এক ধরনের সাদৃশ্য বিদ্যমান রয়েছে। কেননা, এ দু'টি ভাষা একই ভাষাগোষ্ঠী বা একই গোত্রের মধ্যে গণ্য। একই জাতি ও গোষ্ঠীর মধ্যে একাধিক ভাষা বিদ্যমান থাকা স্বাভাবিক। ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে ভিন্ন ভাষার আবির্ভাবের ক্ষেত্রে একটি সম্পর্ক কাজ করে। তা হলো –ভাষার মিল, ধ্বনি, শব্দ ও বাক্য গঠনের রূপ-প্রকৃতি।[৩] এগুলো ভাষাগোষ্ঠীর শাখা-প্রশাখায় একইভাবে অন্তর্ভুক্ত থাকলে শাখাটি একই গোষ্ঠীতে গণ্য হবে। যে কারণে এক গোষ্ঠীর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের একাধিক ভাষা অর্ন্তভুক্ত থাকতে দেখা যায়। অপরদিকে দুই বা ততোধিক ভাষার মধ্যে যদি ধ্বনিতত্ত্বে, রূপতত্ত্বে বা বাক্য গঠন রীতিতে লক্ষণীয় পার্থক্য পরিলক্ষিত না হয় সে ক্ষেত্রেও ভাষাগুলোর মধ্যে বৈপরীত্য নয় বরং বংশগত মৌলিক সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যাবে। বিষয়টি আমরা এভাবেও উপস্থাপন করতে পারি যে, যদি একাধিক ভাষায় উচ্চারণ, শব্দরূপ ও ব্যাকরণে কোনো ধরনের পার্থক্য অনুমিত না হয় বরং এক ধরনের ঐক্য বা মিল পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে বংশগত সম্পর্কের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।[৪] একাধিক ভাষার মধ্যে এক ধরনের প্রভেদ দেখা দিলে তখন ভাষার মধ্যে শ্রেণি বা বিভাগ করতে হয়। যে কারণে পৃথিবীতে অনেকগুলো ভাষা উৎপত্তির পর বিভিন্ন প্রকার ঘটেছে। এ সকল ভাষা কোনো না কোনো অঞ্চলের মানবগোষ্ঠীর মুখের ভাষা ছিল।পৃথিবীর ভাষাবংশ[৫] থেকে অনেক ভাষা বিলুপ্ত হয়েছে যা খ্রিস্টপূর্বকালে বিভিন্ন জাতি ব্যবহার করত। সে ভাষাগুলোর কোনো না কোনো ভাষা বর্তমান প্রচলিত ভাষার উৎস বা ভিত্তি ছিল। সেইসব ভাষার শব্দ ও রূপগত মিল বর্তমান প্রচলিত ভাষায় রয়েছে।

## ইন্দো–ইউরোপীয় (Indo-European) ভাষা

একটি মৌলিক ভাষার প্রধান শাখার নাম হল ইন্দো-ইউরোপীয়। এ শাখাটি খ্রিস্টপূর্ব প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে বিকাশলাভ করেছে। এটি ভাষা জগতের একটি প্রধান বংশের নাম ও পৃথিবীর ভাষাবংশগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এ বংশে কয়েকটি প্রাচীন ভাষা রয়েছে। যে ভাষাগুলো সমৃদ্ধ ও উন্নত। যথা– গ্রীক, আবেস্তা, সংস্কৃত, লাতিন ও গাতিক্ ভাষা। এ বংশ থেকে অনেকগুলো আধুনিক ভাষার জন্মলাভ হয়েছে। যেমন– ইংরেজি, ফারসি, বাংলা, হিন্দি ইত্যাদি।[৬] পৃথিবীর অনেকগুলো জাতি ও গোষ্ঠী এ ভাষাগুলো ব্যবহার করে থাকে। সে দিক দিয়েও এ বংশটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীনকালে মধ্য এশিয়ার ইরান, ভারত ও ইউরোপে যে ভাষাগুলো ব্যবহৃত হত সে ভাষাগুলোর নাম দেয়া হয়

Dhaka University Institutional Repository

'ইন্দো-ইউরোপীয়ান' ভাষা। ইন্দো-ইউরোপীয় বলতে ভাষাবিদরা একটি গোষ্ঠী বা গোষ্ঠীর ভাষা বুঝাতে চেয়েছেন। যে গোষ্ঠীটি পাঁচ হাজার বছর পূর্বে ইউরোপে বসবাস করত এবং তাঁরা একই ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করত। বৃটেন, ইতালি, জার্মান, গ্রীস, আর্মিনিয়া, স্লাবিক, ভারত ও ইরানের ভাষাসমূহ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা হিসেবে পরিচিত।[৭] উল্লিখিত দেশসমূহের ভাষাগুলোর মধ্যে ধ্বনিতত্ত্বে যে ধ্বনি পাওয়া যায় তা ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্ত। এ গোষ্ঠীর ভাষার বাক্যরীতি ও পদ্ধতি একই প্রকার। বস্তুত ধ্বনি, রূপ ও বাক্যরীতিতে সামঞ্জস্য থাকায় প্রধান গোষ্ঠীর অর্ন্তভূক্ত হয়েছে।[৮] এ গোষ্ঠীর আসল পরিচয় কী এবং কোন্ অঞ্চল থেকে উদ্ভব ঘটেছে -সে বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে ভাষাবিদদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মতামত লক্ষ করা যায়। বাংলা এবং ফারসি ভাষার গ্রন্থে- সে বিষয়টি স্পষ্ট। অনেকেই এ মতামত দিয়েছেন যে, প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির বাসস্থান কিরগিজস্তানের তৃণভূমি বা রাশিয়ার উরাল পর্বতে অবস্থিত। এ অঞ্চল থেকে মূল ইন্দো ইউরোপীয় ভাষাভাষীরা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে।[৯] বলা যায় যে, দক্ষিণ পূর্ব-রাশিয়া ও কিরগিজস্থানের উষর ও মরু অঞ্চল অধিবাসীদের থেকে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার উদ্ভব হয়। ভাষা বিজ্ঞানী ড. রামেশ্বর শ' এর মতে, রাশিয়ার উরাল পর্বতের পাদদেশ থেকে আর্য জাতির মাধ্যমে আর্য ভাষা প্রথম উৎপত্তি লাভ করে।[১০] ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসে তদ্রুপ বর্ণনা দানে বিষয়টি অধিকতর স্পষ্ট করে তোলেছে। ফারসি ভাষাবিদ আবুল কাসেমির মতে, ঈসা আ. জন্মের পাঁচ হাজার বছর পূর্বে রাশিয়ার দক্ষিণে পাহাড় ও গোহায় যে গোত্রটি বসবাস করত সে গোত্রের ভাষা ছিল ইন্দো-ইউরোপীয়। জাতিটি ছিল ইউরোপীয় ও ভারতীয়।[১১] যে কারণে বৃহৎ ভাষাবর্গের নাম হয়েছে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা। ভাষাবিদদের মধ্যে এ বৃহৎ গোষ্ঠীর নাম সম্পর্কে বিস্তর মতপার্তক্য বিদ্যমান। কেননা, ইন্দো-ইউরোপ বলতে ভারত ও ইউরোপের দেশগুলোকে বুঝানো হয়ে থাকে। অথচ ভারত ছাড়াও অন্য কয়েকটি দেশের ভাষাও সম্পৃক্ত রয়েছে। জার্মান ভাষাতাত্ত্বিকরা এটির নাম দিয়েছেন 'ইন্দো-জার্মানিক'। তেমনি এশিয়া-ইউরোপীয় বা 'ইউরো-এশীয়' নাম হওয়া যুক্তি সঙ্গত।[১২] ডক্টর বেহযাদি রোকাইয়া বলেন:

> در گذشته های بسیار دور، بسیاری از اقوامی که اکنون در اروپا، ایران و هند می زیستند، همه به یک گروه قومی به نام هندواروپای تعلق داشتند. وجه تسمیه نام آنها، آن است که در پی مهاجرتهای مکرر و آمیزش بامردم بومی سرزمینهای تازه، ملت های جدیدی را به وجود آوردند که در شرق تا هند و در غروب تا سراسر اروپا گسترش یافتند و ساکن شدند.

বহু পূর্বে অনেকগুলো সম্প্রদায় বর্তমানে আজ যারা ইউরোপ, ইরান ও ভারতে বসবাস করছে সবাই একটি গোত্র পরিচয়ে ইন্দো-ইউরোপীয় হিসেবে সম্পৃক্ত ছিল। তাঁদের এ নামে অভিহিত করার পিছনে

একটি নির্দিষ্ট সময়ে তাঁদের পরিভ্রমণ ও সতেজ ভূ-মণ্ডলে বিভিন্ন জাতির সাথে সম্মিলন নতুন জাতির উদ্ভব সৃষ্টি যারা পূর্বে হিন্দুস্তান পর্যন্ত ও পশ্চিমে ইউরোপীয় অঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ ও বসবাস করছে ।[১৩] তবে ভারত ও ইউরোপ অঞ্চলের ভাষাসমূহের মাধ্যমে এ গোষ্ঠীর পরিচয় লাভ হয় তাতে সন্দেহ নেই। এ বৃহৎ ভাষাগোষ্ঠীর ভাষার স্বর ও ধ্বনি উঠা-নামা করে থাকে। এ গোষ্ঠীর নয়টি বা দশটি শাখা বিদ্যমান রয়েছে। তন্মধ্যে ইন্দো-ইরানীয় শাখা অন্যতম।

## ইন্দো–ইরানীয় (Indo-Iranian) ভাষা

ইন্দো-ইউরোপীয় প্রধান ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত হল ইন্দো-ইরানীয় শাখা। এটিকে ইন্দো-ইরানীয় বা আর্য শাখা বলা হয়। মূলত এতে দু'টি শাখার কথা বলা হয়েছে। একটি ভারতীয় অপরটি ইরানীয়। এ শাখা নিয়েই আমাদের মূল আলোচনা। এ শাখার অর্ন্তগত রয়েছে ইরান, পাকিস্তান, ভারত, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশের ভাষা। প্রাচীনকালে ভারতে এবং ইরানে যে ভাষায় মানুষ কথা বলত এবং সে ভাষার নিদর্শনাবলির উপর ভিত্তি করে গোষ্ঠীবদ্ধ ভাষার নাম দেয়া হয় ইন্দো-ইরানীয় ভাষা।[১৪] এ শাখাটিতে দু'টি স্থানের নাম ব্যবহার করার পিছনে একটি তাৎপর্য নিহিত আছে। এতে একটি দেশের নাম হিন্দ বা ভারত অপরটি হল ইরান। পূর্বে ভারতকে বলা হত হিন্দ বা হিন্দুস্তান। ইরান এবং হিন্দ দু'টি দেশ ও দু'টি জাতির ভাষা মিলে ঘটিত হয়েছে 'হিন্দ-ইরান' বা 'ইন্দো-ইরানি'। বিষয়টি এমন যে, এ নামটির মধ্যেই দু'টি ভাষা বা শ্রেণি নিহিত রয়েছে –একটি ইরানি জাতির ইরানি ভাষা অন্যটি হিন্দীয় বা ভারতীয় হিন্দ ভাষা। তাতে প্রাচীন পারস্য ও প্রাচীন ভারত অঞ্চলের ভাষাসমূহকে বুঝানো হয়েছে। অপরদিকে এ শাখাটির দু'টি উপশাখা হওয়ার পিছনে একটি জাতির দু'দিকে গমনের ইতিহাসকে প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে। যে কারণে ভারতীয় ও ইরানীয় ভাষার সংমিশ্রণে একটি শাখার আবির্ভাব ঘটতে দেখা যায়। ইন্দো-ইরানীয় ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে ডক্টর কৃষ্ণপদ গোস্বামি বলেন, 'ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার অর্ন্তগত ইন্দো-ইরানীয় শাখা মধ্য এশিয়ার সীর এবং আমু দরিয়ার ভিতর দিয়া প্রথমে ইরানে আসে। ইরান হইতে পরবর্তীকালে ভারতে আর্যদের আগমন ঘটে।'[১৫] এ উক্তি থেকে স্পষ্টত দু'টি স্থানে আর্যদের আবাস ভূমির পরিচয় মিলেছে। আর্য জাতি ইরানে ও ভারতে বহুদিন বসবাস করেছিল– সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এ জাতি থেকেই মধ্য এশিয়ার অনেকগুলো ভাষার আর্বিভাব ঘটেছে। গবেষক ড. পারভেজ নাতেল খানলরি বলেন, 'হিন্দ্-ইরানি' শাখাটির অস্তিত্ব সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, এ দু'টি নামের স্বাতন্ত্রবোধ এবং জাতিসত্ত্বার পরিচয় আছে। উৎপত্তিগত স্থানের দিক দিয়ে একটি ইরানি অন্যটি ভারতি।'[১৬] এতে মূলত পৃথক দু'টি জাতির কথা বলা হয়েছে। আর্য গোষ্ঠী একই স্থান থেকে দু'ভাগে বিভক্ত হওয়ার কারণে

দু'টি নামে অভিহিত হয়। তবে এ দু'টি পরিবার বা গোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি একই ছিল– তা পরিস্কার করে বলেন নি। ড. আহমদ তাফাজ্জলির মতে, আর্যগোত্র পৃথক হওয়ার পর এটি ইরানি ভাষা হিসেবে পরিচিত পেয়েছে। শাখাটি ইন্দো-ইরানি যা ইন্দো-ইউরোপি'র অর্ন্তগত।[১৭] ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে কতক গোত্র ইরানে এবং অপর কতক গোত্র পাক-ভারতে প্রবেশ করেছে। যারা ইরানে এসেছিল তারা বিভিন্ন গোত্রনামে অভিহিত। যারা পাক ভারতে এসে বসতি গড়ে তুলে তাঁদেরকে বলা হয় আর্য জাতি। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, উৎপত্তিগত দিক দিয়ে ভারতি ও ইরানি আর্য জাতি প্রথমে একই গোষ্ঠীর অর্ন্তভুক্ত থাকলেও পরবর্তীতে পৃথক দু'টি জাতি হিসেবে পরিচয় লাভ করে। এ কারণে ফারসি ভাষাবিদ ড. পারভেজ নাতেল খানলরি এ দু'টি জাতির ভাষা পৃথক করে বুঝাতে চেয়েছেন। একটি আর্য বা ইন্দো-আর্য ভাষা যা ভারতীয়রা ব্যবহার করে থাকেন। ভারতের বিভিন্ন নিচু ও পাহাড়ি এলাকায় এমন কিছু কিছু ভাষা চালু আছে যা ইন্দো-ইউরোপীয় নয়। এগুলোকে আমরা আর্য বা 'ইন্দো-আর্য' হিসেবে অভিহিত করতে পারি। অপরটি ইন্দো-ইরানি বা ইরানি ভাষা যা প্রাচীনকাল থেকে একই নামে অর্ন্তভুক্ত আছে। যে গোত্র ইরানে বসবাস করত তারা নিজেদেরকে آری = arya বলে পরিচয় দিত।[১৮] তাঁদের বসবাসের স্থানের নামের উপর ভিত্তি করেই ইরান নামটি প্রসিদ্ধি পেয়েছে। ঐতিহাসিক হাসানপীর নায়া আর্যগোত্র বিভক্ত হওয়ায় একটি আর্য ইরানি ও অপরটি আর্য ভারতি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, এই আর্যগোত্রগুলোর মধ্য এশিয়ায় আবাসভূমি ছিল।[১৯] তবে পৃথক হওয়ার সময় তাঁদের ভাষা একই ছিল– সে ব্যাপারে তিনি কিছু বলেন নি। আর্যরা মূল শাখা থেকে পৃথকের পর তাদের ভিন্ন ভাষা ছিল। কেননা আর্যরা দীর্ঘ সময় একই ভাষায় কথা বলবে– এমনটি ভাষাবিদরা বিশ্বাস করেন না। যারা মূল স্থান থেকে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে ভারতে ও ইরানে এসেছিল তাঁরা পৃথকভাবে আর্যবিহীন অন্য কোন জাতি নয়। এখানে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে, এ জাতির পূর্বে ভারতে অন্য জাতির আর্বিভাব ঘটেছিল কী না? আমরা এর উত্তরে বলব, ভারতে দ্রাবিড় বা অস্ট্রিক জাতির অস্তিত্ব ছিল। তেমনি প্রাচীন ইরানেও আর্য জাতি ছাড়া 'ঈলামি ও অরামি'[২০] জাতির বসবাস ছিল। ভাষাবিদরা মূলত আর্য জাতির আর্বিভাবের মাধ্যমে দু'টি দেশের ভাষার ইতিহাস নির্ধরণ করে থাকেন। আর্য শব্দ থেকে গতি ও গমনের অর্থ নির্গত হয়। তা থেকে বুঝা যায় যে, আর্যরা ছিল যাযাবর জাতি। তাঁরা এক দেশ থেকে অন্য দেশে ভ্রমণ করত। কেউ কেউ পরিষ্কার করে এ কথা বলেছেন যে, ইন্দো-ইরানি ভাষা দু'টি ভাগে বিভক্ত। একটি ইরানি অন্যটি ভারতি ভাষা। ইরানি ভাষার নিদর্শন হল *আবেস্তা গ্রন্থ* যা আবেস্তা ভাষায় লেখা রয়েছে। ভারতীয় ভাষার প্রাথমিক ও আদি ভাষার নিদর্শন হল *বেদ গ্রন্থ*।[২১] ভারতি আর্য ভাষা থেকে

Dhaka University Institutional Repository


ভারত ও বঙ্গীয় অঞ্চলের সকল ভাষার উৎপত্তি হয়েছে। ভাষার ইতিহাসে এই আর্য ভাষাটি তিন ভাগে বিভক্ত। যথা:-১. ইরানি আর্য, ২. ভারতি আর্য ও ৩. দারদিক।

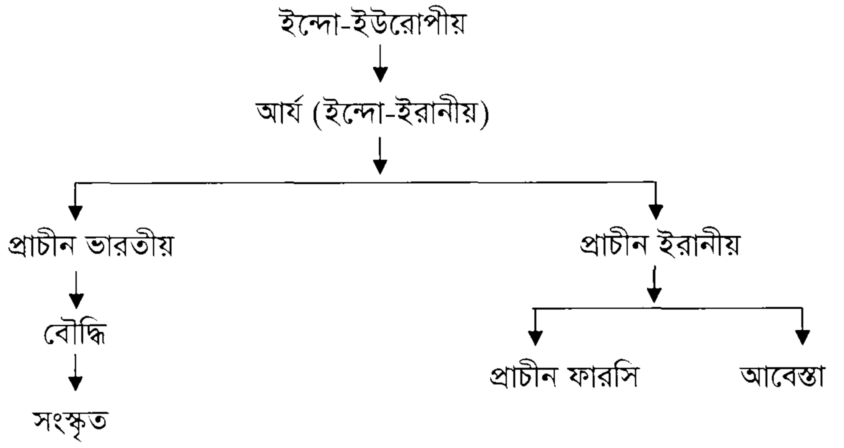


## ইরানি আর্য ভাষা

ইরানের মালভূমিতে যে আর্য সম্প্রদায় বসবাস করেছিল ইতিহাসে প্রধান তিনটি গোত্রের পরিচয় মিলে। মাদ (ماد), পারসি (پارسی) ও পারতি (پارتی)। তখন এ গোত্রগুলো ব্যতীত অন্য কয়েকটি গোত্র মালভূমিতে বসবাস করছিল। যেমন– বাখতার (باختر ها), কারুমানি (كرمانى ها), ওয়ারকানি (وركانى ها) এবং হারাখাওয়াতি (هرخواتى) গোত্র।[২২] কখন আর্য সম্প্রদায় বিভক্ত হয়ে ইরানে প্রবেশ করেছে– ইতিহাসে সে বিষয়টি স্পষ্ট নয়। ইরানের অনেক ঐতিহাসিক এ ব্যাপারটি এড়িয়ে গিয়েছেন। তাঁরা শুধু হাজার বছর পূর্বে আগমনের কথা বলেছেন। হাসানপীর নায়ার দৃষ্টিতে আর্যরা ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠী থেকে কম হলেও তিন হাজার খ্রিস্টপূর্বকালে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল।[২৩] ইরান বিষয়ক ভারতীয় ঐতিহাসিক মগবুল বেগ বাদাখশানি মনে করেন, ইরানের প্রাচীন অধিবাসী আর্যবংশদ্ভূত গোষ্ঠীটি খ্রিস্টপূর্ব চার হাজার বছর পূর্বে বুখারা ও সমরকন্দ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইরানের মূল ভূ খণ্ডের দক্ষিণে ও উত্তরে দু'টি দলে বসবাস করতে শুরু করে।[২৪] ফারসি ভাষাবিদ ডক্টর মোহসিন আবুল কাশেমি তদ্রুপ একটি মতামত উপস্থাপন করেন। তাঁর মতে, ঈসা আ. জন্মের দু' হাজার বছর পূর্বে ভারতি ও ইউরোপি গোত্র নিজেদেরকে আর্য নামে অভিহিত করত। যে ভূমিতে তারা বসবাস করত সে স্থানের নাম ছিল 'ইরান'[২৫]। বিশেষত আর্যদের যাযাবরি জীবনের দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয় ইরানে। তবে তখন তাঁদের ভাষা ভারতে ব্যবহৃত বৈদিক-সংস্কৃতির ন্যায় ছিল কী-না তা স্পষ্ট নয়। ইরানি ভাষাতাত্ত্বিকগণ ভারতের আর্য গোষ্ঠীর ভাষার ন্যায় ইরানেও সংস্কৃত ভাষা ছিল–এমনটি মনে করেননা।[২৬] তবে আবেস্তা ও প্রাচীন ফারসি ভাষার সাথে সংস্কৃত ভাষার সম্পর্ক

Dhaka University Institutional Repository


থাকাটা স্বাভাবিক ব্যাপার। কেননা, প্রাচীনকালের বেদ ও আবেস্তা গ্রন্থের ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। উল্লেখ্য যে, খ্রিস্টপূর্বকালে ইরানিদের ভাষা আজকের আরবি ভাষায় মিশ্রিত ভাষার ন্যায় ছিলনা। তখন তাঁদের ভাষা ইউরোপীয় ভাষার বৈশিষ্ট্যের সাথে পুরোপুরি সম্পৃক্ত ছিল। ইরানি জাতি ইন্দো ইউরোপীয় বংশের। যে কারণে 'ইন্দো ইউরোপীয়' ভাষাগোত্র থেকে ইন্দো-ইরানি শাখার উদ্ভব হয়েছে।

ভাষার শ্রেণি ও গোষ্ঠীগত দিক দিয়ে এটি ইন্দো-ইরানি গোষ্ঠীর একটি শাখা। এ শাখার ফারসি ভাষা বহু দিন ভারত ও ইরান উভয় অঞ্চলের একটি ভাষা হিসেবে চালু ছিল। এ প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার চ্যাটার্জি বলেন

> The Indo-Europeans in most of their branches can very well be described as a horse-loving people, particularly the Iranians and their close brothers the Indian Aryans, besides the Greeks,[27]

তখন ইরান ও ভারতের জনসাধারণ এ ভাষায় কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করত। বর্তমানে ফারসি ভাষার ইতিহাসে এটি শুধু ইরানি ভাষা হিসেবে পরিচিত নয়। মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশ ছাড়াও 'ইসলামের দ্বিতীয় ভাষা'[২৮] হিসেবে এটি ব্যবহার হয়ে আসছে। আফগানিস্তান, পাকিস্তান, তাজিকিস্তান, ইরাক, সিরিয়া, ও তুরস্কে এ ভাষাটি ব্যবহার হয়। ফারসি ভাষার সাথে এ অঞ্চলগুলোর ভাষা ইসলামি ভাষা হওয়ার ব্যপারে বৈপরিত্ব নেই। এ ভাষার যে তিনটি স্তর রয়েছে তা বিভিন্নভাবে ঐতিহাসিকরা বর্ণনা দিয়েছেন। ঈ. জি. ব্রাউন তাঁর *A Literary History of Persia* গ্রন্থে আকামানি যুগ (খ্রি.পূ.৫৫০-৩৩০ খ্রি.), সাসানিয়ান যুগ ( ২২৬ খ্রি.-৬৫২ খ্রি.) ও মুহাম্মদি যুগ (৯০০ খ্রি.- বর্তমান) – এ তিন যুগের বর্ণনা দিয়েছেন।[২৯] তিনি মূলত ফারসি ভাষার উন্নয়নের ধারাটি ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন। আবার *The Legacy of Persia* গ্রন্থে ফারসি ভাষার ভাগকে 'প্রাচীন ইরানিয়ান', 'মধ্য ইরানিয়ান', ও 'নিউ ইরানিয়ান' ভাষা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।[৩০] এ অংশগুলোতে মূলত ইরানি জাতির সাথে ফারসি ভাষার উন্নয়নের ধারাটি দেখা হয়। ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ যুগগুলো হল নিম্নরূপ: ১. প্রাচীন যুগ/ দাওরেয়ে বা'স্তা'ন (دورۀ باستان), ২. মধ্যযুগ/ দাওরেয়ে মিয়ানে ( دورۀ میانه ) এবং ৩. আধুনিক যুগ/ দাওরেয়ে নো ( دورۀ نو )।

Dhaka University Institutional Repository

## ফারসি ভাষার যুগ

প্রাচীন যুগ: সাধারণত প্রাচীন যুগের শুরুটি ঈসা আ. জন্মের অনেক আগ থেকে যা পাঁচ হাজার খ্রিস্ট পূর্বের সময়কাল থেকে গণনা করা হয়। ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসে ইরানি ভাষার যে নিদর্শন রয়েছে তা মালভূমিতে বসবাসকারী একটি জাতির বংশের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। যে জাতি থেকে হাখামানশি গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটেছে। এ হাখামানশি যুগ (৫৫৯ খ্রি.পূ.-৩৩০ খ্রি.পূ.) –এর মাধ্যমে প্রাচীন ফারসির পরিচয় মিলে।[৩১] ড. মুহম্মদ জাফর ইয়াহাকি বলেন, 'গাথা রচনার সময়কাল (আনু. ১০-১২ খ্রি.পূর্ব শতক) থেকে শুরু করে হাখামানশি যুগ (আনু. ৩০০ খ্রি.পূর্ব) এর শেষ সময় পর্যন্ত সময়টিকে প্রাচীন যুগ বলা হয়।'[৩২] এ যুগের লিখিত নিদর্শনাবলি হিসেবে দু'টি ভাষার অস্তিত্ব রয়েছে। একটি ফারসি বাস্তান (زبان فارسی باستان ) অপরটি আবেস্তা ভাষা (زبان اوستای )। এ ছাড়া শিলালিপি ও বিভিন্ন সামগ্রীর উপর খোদিত বিভিন্ন লিপিও রয়েছে। আমরা প্রাচীন ইরানের ভাষা দু'ভাবে পেতে পারি। একটি লেখ্য গ্রন্থ আবেস্তায় লিখিত ভাষা অপরটি অট্টালিকা ও পাহাড়ের প্রস্তরের উপর খোদিত লিপি।

ফারসি বাস্তান: এটি ইরানিদের প্রথম হিজরতের সময়ের ভাষা যা মালভূমিতে বসবাসকালীন সময়ে তাঁরা ব্যবহার করেছিল। হাখামানশি বাদশাহ যুগ (৫৫৯ খ্রি.পূ.-৩৩০ খ্রি.পূ.) –এর যে ভাষা ও লিপি ব্যবহৃত হত তার নামও ফারসি বাস্তান। এ ভাষাটি ফারস অঞ্চলের কথ্য ভাষা ছিল।[৩৩] এই ফারসি বাস্তান ভাষাটি খাওয়ারেযমি, সুগদি ও আবেস্তায়ি ভাষার সাথে মিল রয়েছে। মাদি ভাষাটিও তদ্রুপ ফারসি বাস্তানের ন্যায়। এ গুলো আর্য ভাষা হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে।[৩৪] তবে সাধারণ জনগন সবচেয়ে ফারসি বাস্তান ভাষায় কথা বলত। এ প্রসঙ্গে ভাষা গবেষক খানলরি বলেন, 'আমাদের হাতে ফারসি বাস্তানের যে নমুনা রয়েছে তা মিখ্ জাতীয় অর্থাৎ পেরেক আকৃতির লিপি।'[৩৫] তবে এ ভাষার ব্যবহারের সময় পেরেক লিপি ছাড়াও অরামি লিপি দ্বারাও লেখা হত। ফারসি ভাষাবিদদের মতে, সে সময় হাখামানশি যুগে দরবারি ভাষাও অরামি ভাষা ছিল। যে কারণে সরকারি চিঠিপত্র অরামি ভাষায় লিখা হত।[৩৬] ফারসি বাস্তান বা পেরেক লিপির ছত্রিশটি বর্ণ রয়েছে। যা বাম থেকে শুরু করে ডান দিকে শেষ হয়।

কোহে বিস্তুনে দারিউস বুযুর্গের (৫২১ খ্রি.পূ.-৪৮৬ খ্রি.পূ.) যে লিপি নিদর্শন পাওয়া যায় সেখানে ফারসি বাস্তান (فارسی باستان) ছাড়াও ঈলামি (عیلامی) ও একদি (اکدی) ভাষার ব্যবহার রয়েছে।[৩৭] এটি সত্য যে, ফারসি বাস্তান ভাষায় শুধু ফারস অঞ্চলের অধিবাসীরা কথা বলত। খ্রিস্টপূর্ব

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় শতক থেকে পঞ্চম শতক পর্যন্ত এ ভাষার ব্যবহার ছিল। এ ভাষাটি ক্রমান্বয়ে সমগ্র ইরানের রাজভাষা হিসেবে পরিচিতি পায়। বিশেষ করে ফারসি বাস্তান ভাষাটি হাখামানশি বাদশাহগণ ব্যবহার করতেন। তাঁদের নির্মিত বিভিন্ন প্রাসাদে এবং পাহাড় ও গুহার বিভিন্ন স্থানে লিপিবদ্ধ আছে। এ ছাড়া তাঁদের আদেশ-নিষেধনামা বা এ সময়ের বাদশাহদের চিঠিপত্র ফারসি বাস্তান দ্বারায় লিখিত হয়। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফারসি বাস্তানের লিপি ছিল পেরেক আকৃতির। এ ভাষার নিদর্শন বই-পুস্তক আকারে না পেলেও শিলালিপি ও বিভিন্ন গাত্রে 'খোদাইকৃত লিপি'[৩৮] হিসেবে অবশিষ্ট আছে। এ ছাড়া অরামি, বাবেলি ও ঈলামি লিপির প্রচলন ছিল।[৩৯] বর্তমানে এসব ভাষার ব্যবহার কোথাও নেই।

আবেস্তায়ি: যে ভাষাটি সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে সেটি জরথুস্তের ধর্ম গ্রন্থের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। সে ধর্ম গ্রন্থের নাম আবেস্তা। তবে যারা এ ভাষাটির মাধ্যমে কথা বলত তাঁরা সে ভাষাটি সম্পর্কে কী বলেছিল– সেটি জানা সম্ভব হয় নি। ইরানের কোন্ অঞ্চলে এ ভাষাটির প্রয়োগ হত– সেটির দলিল-দস্তাবেজ নেই। তবে ইরানি ভাষাবিদদের মাঝে বিশ্বাস রয়েছে যে, এ ভাষার ব্যবহারকারীরা ইরানের পূর্ব অঞ্চলে বসবাস করত। সেই পূর্ব প্রান্তের অঞ্চল 'মারভ' এবং 'হেরাত' পর্যন্ত অর্ন্তভূক্ত ছিল। এ ছাড়া আবেস্তা ভাষায় কথা বলত ইরানের দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলের অধিবাসীগণ। আবেস্তাভাষী অঞ্চল হিসেবে মধ্য এশিয়াকেও উল্লেখ করা হয়ে থাকে।[৪০] এ ভাষা ব্যবহারের সময়কাল সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। জরথুস্ত্রের জন্মকাল নিয়ে এ মতভেদের সূত্রপাত ঘটে। খ্রিস্টপূর্ব আট থেকে দশম শতক পর্যন্ত তাঁর জন্মকালের পরিধি রয়েছে। ইরানি ঐতিহাসিকদের মাঝে দু'টি মত বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এ সম্পর্কে খানলরির মতামত হল, জরথুস্ত্র খ্রিস্টপূর্ব ৭০০ সময়কালে জীবন-যাপন করেছিলেন। আহমদ তাফাজ্জলি বলেন 'তিনি খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ বছর সময়কালে বেঁচে ছিলেন।'[৪১] তাঁর সময়ে এ ভাষায় রচিত হয় ধর্মীয় গ্রন্থ আবেস্তা। তাতে পরিস্কার হয়ে ওঠে যে, আবেস্তা ভাষাটি খ্রিস্টপূর্বকালের একটি প্রাচীন ভাষা। ঈশা আ. জন্মের এক হাজার বছর পূর্বে আমু এবং সীর সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে আর্যদের বসবাস ছিল। এই অঞ্চলের উত্তর দিকে 'অরাল সাগর'[৪২]-এর নিকটেই খোয়ারেযম এলাকা অবস্থিত। সেখানেই জরথুস্ত ধর্মীয় লোকদের আবাসন কেন্দ্র ছিল। সম্ভবত এটিই তাঁদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গণনা করা হয়ে থাকে। এ ভাষার আবেস্তা গ্রন্থ ছাড়া অন্য কোনো গ্রন্থের নিদর্শন নেই। আবেস্তার দুটি ভাষ্য লেখা রয়েছে। সবচেয়ে গাহান অংশটি অনেক পুরনো এবং এটি জরথুস্তের বক্তব্য। এ ভাষার বর্ণ সংখ্যা বিয়াল্লিশটি যা ডান থেকে বামে লেখা হয়।[৪৩]

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন যুগের প্রচলিত অন্যান্য ভাষাগুলো হল মাদি (مادی) এবং সেকাই (سکای ) ভাষা। প্রাচীন ইরানে মাদ সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল। তাঁরা ইরানের মালভূমির পশ্চিম উত্তরে বসবাস করত। অঞ্চলগুলো ছিল আযারবাইযান, কুর্দিস্তান, হামাদান, রেই এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলো। এ জাতি যে ভাষায় কথা বলত এবং আদান প্রদানের যে ভাষা ছিল সে ভাষাটি মাদি ভাষা হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে।[৪৪] সে ভাষাটিও প্রাচীন ফারসি ভাষার সাথে সম্পৃক্ত ছিল। যে কারণে প্রাচীন ইরানের ভাষা হিসেবে গণ্য করা হয়। মাদ জাতি ইরানে রাজত্বকারী হিসেবে প্রথম সম্প্রদায় খ্রিষ্টপূর্ব নবম শতকে আর্বিভূত হয়েছিল। বাদশাহ কায়রাসের রাজত্বকালে (৫৫৯-৫২৯ খ্রি.পূ.) পারসিকরা স্বাধীন জাতি হিসেবে আত্নপ্রকাশ করে। তখন তাদের মধ্যে যে ভাষার আদান প্রদান হত তার নাম ছিল মাদি ভাষা।[৪৫] ফারসি ভাষাবিদগণ এ ভাষার সম্প্রদায়কে আর্য সম্প্রদায়ের অর্ন্তভুক্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আর্য দল থেকে ইরানের পশ্চিম উত্তর দিক দিয়ে যে দলটি ইরানের যে স্থানে প্রবেশ করেছিল সেটি ছিল মাদ (Media)। এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, আর্যদের পূর্বপুরুষ দুই দলে বিভক্ত ছিল। হিন্দুস্থানি ও ইরানি। যারা 'হিন্দ-ইউরোপীয়' ভাষায় কথা বলত তাঁরা খ্রিস্টপূর্ব এক হাজার বছর পূর্বে এসেছিল।[৪৬] মাদ জাতি তাঁদের ভাষা ছাড়াও পারসিকদের কথা তাঁরা ভালভাবে বুঝত। আবেস্তা ও অন্যান্য ভাষা সম্পর্কে তাঁদের ভাল জ্ঞান ছিল। মাদদের কোন নির্দিষ্ট লিখনরীতি ছিল না। তবে তাঁদের সময়ে যারা চিঠিপত্র লিখেছিল তাঁরা অরামি, উসুরি এবং ঈলামি লিপিতে লিখত।[৪৭] তবে ঈলামি ভাষা খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতেও চালু ছিল। এ ভাষাটি বেশি দিন স্থায়ী থাকেনি; ব্যবহার না হওয়ার কারণে লুপ্ত হয়ে যায়।

সেকাই ভাষাটি একটি গোষ্ঠীর নামের উপর ভিত্তি করে ভাষার নাম রাখা হয়। সেকাহ দলটি যুদ্ধবায ইরানি ভূখণ্ডেই বসবাস করত। খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ শত সাল পূর্বে সিয়াহ সাগরের নিকটবর্তী চীন সিমান্তের নিকট ছিল তাঁদের আবাসভূমি। ফারসি ভাষাবিদদের মতে, সেকা গোষ্ঠীটি খেজার সাগরের পূর্বে পারতি ও সুগদি আবাস স্থলের উত্তরে বসবাস করত।[৪৮] এ অঞ্চলে তাঁরা যে ভাষায় কথা বলত তার নাম সেকাই। বাদশাহ দারিউশের খোদাইকৃত লিপিতে সেকাই ভাষার নমুনা বিদ্যমান রয়েছে। এ ভাষাটির ব্যবহার বর্তমানে নেই। উল্লেখ্য যে, সুমিরি, ঈলামি, একদি, অরামি, সুরয়ানি ভাষাগুলো ইরানিদের ভাষা নয়।[৪৯] এগুলো প্রাচীন যুগে ইরানে বসবাসকারী ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভাষা ছিল। ভাষাবিদদের দৃষ্টিতে 'অরামি' ভাষা থেকেও কতগুলো ভাষার উৎপত্তি ঘটেছে। যেমন–আরবি, হিন্দি, ফারসি বাস্তান, তাদ্‌মিরি, সুরয়ানি, ও নাব্‌তি ভাষা।

Dhaka University Institutional Repository

**মধ্যযুগ:** সাধারণত ফারসি সাহিত্যের মধ্যযুগের পরিধিটি বাংলা সাহিত্যের পরিধির ন্যায় নয়। এ যুগের সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব তিন শত বছর থেকে নয় শত খ্রিস্টাব্দ (৩৩০ খ্রি.পূ.-৮৬৭ খ্রি.) পর্যন্ত বিস্তৃত। আশকানি যুগ (খ্রি.পূ.২৫০-২২৪ খ্রি.পূ.) এবং সামানি যুগের প্রথম দিকের শাসনকালের সময়কালকে মধ্যযুগ বলা হয়ে থাকে। সময়টি আশকানি শাসনামলের শুরু থেকে ইরানে ইসলাম ধর্ম প্রবেশের আগ পর্যন্ত।[৫০] এসময়ে যে ভাষাগুলোর প্রচলন পাওয়া যায় তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাষা হল: পাহলাভি (پهلوی), পারতি (پارتی), সুগদি (سغدی), খোয়ারাযামি (خوارزمی), খুতনি (ختنی) এবং সেকাই (سکای)। এ সময়ের ফারসি ভাষা পশ্চিম ও পূর্ব মধ্য ইরানি ভাষা হিসেবে দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। পশ্চিম ইরানের মধ্য ফারসি ভাষা থেকে পারতি ও পাহলবি ভাষার অস্তিত্ব মিলে।[৫১] এ ভাষাগুলোর মধ্যে পাহলবি ভাষাটি অধিক সময়কাল ইরানে ব্যবহৃত হয়েছে। ফারসি মিয়ানে ( فارسی میانه) বা পাহলবি ভাষা (زبان پهلوی) ইরানের দক্ষিণ এবং পশ্চিম দক্ষিণ অঞ্চলে চালু ছিল।[৫২] এ ভাষাটি পাহলভি আশকানি ও পাহলভি সাসানি নামেও অভিহিত করা হয়। এক সময় সাসানি সরকারের ভাষাও ছিল মধ্য ফারসি। এ ভাষার অধিবাসীগণ ফারস অঞ্চলের অধিবাসীদের সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক রেখে চলত। ভাষাতাত্ত্বিক মতে, মধ্যযুগে ফারসি ভাষাটি প্রাচীন ফারসি ভাষার রূপ ধারন করে পাহলবি ভাষা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে।[৫৩] মধ্যস্তরে এসে ফারসি ভাষাবিদগণ দুটি দলের কথা উল্লেখ করেছেন। ১. পূর্ব ইরানি গোষ্ঠী ও ২. পশ্চিম ইরানি গোষ্ঠী। এ সময়ে বাল্‌খি, সেকাই, সুগ্‌দি খোয়ারেযমি ও পাহলবি আশকানি ভাষার ব্যবহার পাওয়া গিয়েছে।[৫৪] মধ্যস্তরে এসে যে সব ভাষার উৎপত্তি ঘটেছে তা প্রাচীন ইরানে বিদ্যমান ছিল। এ গুলো পুরনো ভাষার সংস্করণ বলা যেতে পারে। নিদর্শন হিসেবে আবেস্তা ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা অংশকে গণ্য করা হয়। এ ছাড়া অনেক শিলালিপিও পাহলভি ভাষায় বিদ্যমান রয়েছে। কতক ভাষার অস্তিত্ব মুদ্রাপিষ্ঠে, পাত্রে ও পাথরে খোদাই আকৃতিতে বিদ্যমান। ফারসি ভাষাবিদ আবুল কাশেমির মতে, মধ্য স্তরের অনেক লিপি অরামি লিপি থেকে ধারন করা হয়। অরামি গোষ্ঠীটি সাম সম্প্রদায়ের অর্ন্তভূক্ত ছিল। পাহলবি লিপিও ছিল অরামি লিপির ন্যায়।[৫৫] পাহলবি ভাষার বর্ণের সংখ্যা বাইশটি। এটি ডান থেকে বামে লিখা হয়ে থাকে। এ সময় ইরানের উত্তর ও পূর্ব উত্তর দিকের অধিবাসীগণ যে ভাষায় কথা বলত সেটির নাম ছিল পারতি ভাষা ( زبان پارتی)। পারতি ভাষার কোনো নিদর্শনাবলি বর্তমানে উপস্থিত নেই।

**আধুনিক যুগ :** ইরান ভূ-খণ্ডে ইসলাম প্রবেশের পর তাঁদের ভাষার মধ্যে পরিবর্তন দেখা দেয়। সে হিসেবে ২৫৪ হিজরি/৮৬৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে চলমান সময় পর্যন্ত এ যুগের পরিধি। ফারসি ভাষার প্রাচীনরূপের বিবর্তন হিসেবে ফারসি নবরূপে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। পাহলবি বা আবেস্তা ভাষার

লেখ্যরূপ বর্জন করে ইরানি জাতি আরবির রূপ ধারণ করেন। আরবি ভাষার বর্ণমালা থেকে ২৮টি বর্ণ গ্রহণ করে ফারসি ভাষার রূপ দেয়া হয়।[৫৬] এটি আধুনিক ফারসি ভাষা হিসেবে অধিক পরিচিত। যে ভাষাটি ইরানি জাতির ভাষা এবং ইরান ও অন্যান্য অঞ্চলের ভাষা হিসেবে চালু আছে। এটি প্রথম ইয়াকুব বিন লাইসের শাসনামলে জাতীয় ভাষা হিসেবে চালু হয়। ইরানি ভাষা-বংশ থেকে যেসব দেশে পৃথক সত্তা নিয়ে বিরাজ করছে সে ভাষা ফারসি প্রভাবজাতে পরিপুষ্ট। ইরাক এবং পূর্ব তুরস্কের কুর্দি, আফগানিস্তান ও ভারতের সীমান্ত প্রদেশে পস্‌তু, সোভিয়েত ইউনিয়নের কয়েকটি অঞ্চলে তাজিক ও বেলুচি এবং পাকিস্তানের বেলুচিস্তানে বেলুচি ভাষা প্রচলিত।[৫৭] বর্তমানে ইরান, আফগানিস্তান, তাজিকিস্তান ও উজবিকেস্তানে ফারসি ভাষা মৌখিক ও লেখ্য ভাষা হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছে। আবার একইরূপের ভাষা অঞ্চল ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়েছে। যেমন– আফগানিস্তানের পশ্‌তু, তুরস্ক, ইরাক ও সিরীয়ায় তুর্কি, তাজিকিস্তানে তাজিকি ও পাকিস্তানে বেলুচি ভাষা। এ ভাষাগুলো ফারসি ভাষার ন্যায় ব্যবহৃত হয় এবং ভাষাগুলোর ভিত্তি যে প্রাচীন ফারসি ছিল তা পরিস্কার।

**পারস্য সভ্যতার নিদর্শন**

| ভাষা | নির্দশন | ডলপি | বর্ণ সংখ্যা | ব্যবহারের সময়কাল |
|---|---|---|---|---|
| ফারসি বাস্তান | হাখামানশি যুগের খোদিত লিপি | মিখি লিপি (ফারসি) | ৩৬/৩৯ | ফারেস প্রদেশ খ্রি. পূ. ৬১০- খ্রি. পূ. ৩৩০) |
| আবেস্তা ভাষা | আবেস্তা ধর্মীয় গ্রন্থ | আবেস্তা লিপি | ৪২/৪৪ | সিস্তান, মারভ ও বালখ জরথুস্তীয় যুগ |
| পাহলবি ভাষা | সাসানি বাদশার খোদিত লিপি | পাহলবি লিপি | ২২ | মধ্য ইরান সাসানি যুগ |

## ভারতি আর্য ও ভাষা

খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দে আর্যগোত্র ভারতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। তাঁদের আধিপত্যের মাধ্যমে এ অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ সৃষ্টি হয়। তাঁদের দ্বারায় যে সব ভাষা সৃষ্টি হয়েছে সে সব ভাষা আর্য উৎস ভাষা হিসেবে পরিচিত। আর্য জাতির আগমন এবং তাঁদের বসবাসের স্থান সম্পর্কে বাংলা ভাষাবিদদের মাঝে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। আর্যরা আনুমানিক ঈসা আ. জন্মের ১৫০০ বছর পূর্বে ভারতে এসেছিল। তখন তাঁরা আফগানিস্তান, সিন্ধু ও অন্যান্য ঘিরি-গোহায় বসবাসের স্থান হিসেবে পছন্দ করে নেন।[৫৮] সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিতরা মনে করেন, এ অঞ্চলে খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ থেকে ১৭৫০ খ্রিস্টপূর্বের মধ্যে ইন্দো-ইরানি ভাষার অস্তিত্ব ছিল। সে থেকে অনুমান

Dhaka University Institutional Repository


করা যায় যে, আর্যরা বহু আগেই ভারতে বসবাস শুরু করেছে। এই আর্য উৎস ভাষাগুলো হল প্রাচীন ভারতীয় (১২০০-৪০০ খ্রি.পূর্ব), মধ্য ভারতীয় (৪০১ খ্রি.পূ.-৬৫০ খ্রি.) ও আধুনিক ভারতীয় (৬০০খ্রি.- বর্তমান) আর্য ভাষা।

প্রথম স্তর প্রাচীন ভারতীয় আর্য থেকে বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টি হয়।[৫৯] এ স্তরের নিদর্শন হিসেবে বেদ গ্রন্থকে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য যে, এ গ্রন্থের সাথে ইরানি ভাষার জেন্দ-আবেস্তা'র মিল রয়েছে প্রচুর। মধ্য স্তরে এসে যে ভাষাগুলোর আবির্ভাব ঘটেছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল প্রাকৃত, পালি, মহারাষ্ট্রি, শৌরসেনি, মাগধি, অপভ্রংশ ইত্যাদি ভাষা। আধুনিক আর্য উৎস ভাষাগুলোর প্রধান ভাষাগুলো হল উর্দু, হিন্দি, বাংলা, অহমিয়া, পাঞ্জাবি, উড়িয়া কাশ্মিরি, মারাঠি ও গুজরাটি ইত্যাদি।[৬০] এ ভাষাগুলোর ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ও ইতিহাস রয়েছে। আমরা শুধু সংক্ষিপ্ত পরিসরে ফারসি ভাষার সাথে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি ভাষার ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করব। উল্লেখ্য যে, ভারতীয় আর্য ভাষার উপর ইরানি ভাষার প্রভাব আছে।

ভারতে প্রচলিত আর্য ভাষার পরিবর্তন ও বিবর্তনের নতুন রূপ থেকে আধুনিক কয়েকটি ভাষার সূত্রপাত ঘটেছে। খ্রিস্টীয় নবম শতকের সময়কালে ভারতীয় আর্য শাখা থেকে যে সব ভাষার জন্ম হয় তাদের সকল ভাষাই আর্য ভাষা নব্য স্তর।[৬১] এসব ভাষার জন্ম ও উৎপত্তি ইন্দো-ইরানি শাখার মধ্য থেকে হলেও ভাষাগুলোর পরিচয়দান অকোংশে জটিল। কেননা, এ ভাষাগুলোর প্রকৃত অবস্থানে পৌঁছতে অনেকগুলো স্তর অতিক্রম করতে হয়েছে। বাংলা ভাষার অনেক গবেষক মনে করেন যে, এ নতুন ভাষাগুলো মধ্য ভারতি আর্য ভাষা তথা অপভ্রংশ অবহট্ঠ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে।[৬২] বাংলা, উর্দু ও হিন্দি– এসব ভাষা অস্তিত্বে আসতে ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেক সময় অতিক্রম করতে হয়।

ভারতে ইসলামের অগ্রযাত্রার মধ্য দিয়ে সংস্কৃত ভাষার বিলুপ্তি সাধিত হয়। এ সময় ভারতে আগমন ঘটেছে ইসলাম ধর্মভিত্তিক একটি ভিন্ন জাতির ভাষা। বিশেষ করে বিজেতারা ছিল তুর্কি জাতি। তাঁদের মাতৃভাষা তুর্কি হলেও রাজ্য শাসনের ভাষা ছিল ফারসি। সেনাবাহিনীরা ঘরে ও নিজেদের প্রয়োজনীয় কাজের ক্ষেত্রে তুর্কি ভাষা ব্যবহার করত।[৬৩] ইরান, আরব ও ইয়ামেন থেকেও অসংখ্য মুসলমান ভারতে আগমন করেছে। তাঁরা এ সময় নিজেদের মাতৃভাষাও ব্যবহার করত। এ সব মুসলমান ভারত অবস্থানকালে বহু ভাষা সংস্কৃতির মিলনের মাধ্যমে তৃতীয় একটি ভাষার অবস্থান

গড়ে তুলে। ভারতে খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকে ভিন্ন একটি ভাষার উদ্ভব ঘটতে দেখা যায়। যে ভাষার নাম রাখা হয় উর্দু ভাষা।[৬৪] ভাষাটির মূল উদ্ভাবক ছিলেন ভারতীয় মুসলমানগণ। তাঁরা এ ভাষায় বহু আরবি ও ফারসি শব্দের প্রবেশ ঘটিয়ে এটিকে মুসলমানি ভাষা হিসেবে অভিহিত করেন। প্রথমে হিন্দুস্থানি ভাষা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও অষ্টাদশ শতকে উর্দু ভাষা হিসেবে পরিচিতি পায়।[৬৫] এ ছাড়া বুরুজ ভাষা ভারতের গঙ্গা ও যমুনা তীরবর্তি মধ্যগোষ্ঠীর ভাষা ছিল। এটি পঞ্চম হিজরি শতকের পর বিহার থেকে নিলাব এবং নিলাব থেকে মালুহ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। ত্রয়োদশ শতকে এ ভাষার মধ্যে আরবি ও ফারসি ভাষা প্রবেশ করলে তা উর্দু ভাষায় রূপান্তরিত হয়। ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের মতো এটিও ভারতে বিস্তার লাভ করেছে। বর্তমানে পাকিস্তানে ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এ ভাষার ব্যবহার ও প্রচলন রয়েছে।

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের আদলে সৃষ্ট অপর ভাষার নাম হল হিন্দি। ভারতের হিন্দুগণ দেবনাগরি লিপিতে হিন্দি ভাষার প্রবর্তন করেন। উচ্চারণে উর্দুর ন্যায় হলেও লিপিগুলো সংস্কৃত ভাষার মত দেখায়। বলা যায় যে, সংস্কৃত ভাষা থেকে অনেক ভাব ও শব্দ গ্রহণ করেছে এ ভাষাটি। ভারতের অনেকগুলো অঞ্চল হিন্দি ভাষায় কথা বলে। এটি শুধুমাত্র ভারতে সরকারি ভাষা হিসেবে প্রচলিত। বাদশাহ বাবুর এবং বাদশাহ জাহাঙ্গীর এর সময়কালে হিন্দি ভাষার উন্নতি হয়েছিল।[৬৬] সে সময়ে এ ভাষার মধ্যে কোন পরিবর্তন লক্ষ করা যায় নি। তখন মুসলমান ফারসি ভাষা এবং হিন্দুরা তাদের হিন্দি ভাষা ব্যবহার করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। এই হিন্দি ভাষায়ও ফারসি শব্দের প্রভাব পড়েছে প্রচুর।

আর্যদের ভাষা থেকে যেরূপ পরিবর্তন হয়ে সংস্কৃত ভাষা এসেছে। ঠিক নব্য আর্য শাখা থেকে পরিবর্তন হয়ে বাংলা ভাষার জন্ম হয়। ভাষার শ্রেণি বিভাগে বাংলা ভাষার স্তরবিন্যাস শেষদিকের শাখা বঙ্গকামরূপীর গোত্র। গোত্র-শাখা বিভক্ত হয়ে যেভাবে বাংলা ভাষা এসেছে তা সংস্কৃত ভাষা থেকে নয়। প্রাচীন ভারতি আর্য শাখা থেকে সংস্কৃত ভাষা জন্মলাভ করলেও সংস্কৃত থেকে সরাসরি বাংলা ভাষার জন্ম হয়নি। সংস্কৃত একটি গতিহীন ভাষা। যা কোনো দিন জনসাধারণের মুখের ভাষা ছিলনা।[৬৭] বলা যেতে পারে যে, বাংলা ভাষা বহু পরিবর্তন ও সংযোজনের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। অবশ্য বাংলা ভাষা সৃষ্টির পিছনে বহু জাতি গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখ করার মত। বিশেষত ইন্দো-ইউরোপীয় বৃহত্তম শাখা হতে আধুনিক বাংলা ভাষার স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে সাত হাজার বছর সময় লেগেছে। ভাষাতাত্ত্বিক মতে, গৌড়ীয়-প্রাকৃত ভাষা থেকে তিনটি স্বতন্ত্র ভাষার সৃষ্টি হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এ তিনটি ভাষা হল– অহমিয়া, উড়িয়া ও বাংলা ভাষা।[৬৮] বাংলা ভাষা বাংলাদেশ, ভারতের বিহার আসাম, বার্মার আরাকানে ব্যবহৃত হচ্ছে।

**সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাংলা ভাষা ব্যবহারের নমুনা**

| সংস্কৃত | প্রাকৃত | বাংলা |
|---|---|---|
| গৃহ | ঘর | ঘর |
| বহি: | বাহির | বাহির |
| চন্দ্র | চন্দ | চাঁদ |
| ত্বম্ | তুমম্ | তুমি |
| কার্য্য | কজ্জ | কাজ |
| হস্ত | হত্থ | হাত |
| মস্তক | মত্থঅ | মাথা |
| বৃক্ষ | গচ্ছ | গাছ |

এখানে বাংলা শব্দগুলো সরাসরি সংস্কৃত শব্দ থেকে আসেনি। শব্দগুলো পরিবর্তন হয়ে বাংলা ভাষায় রূপ পেয়েছে।

## দারদীক

ভারতি আর্য ও ইরানি আর্য ভাষার সম্মিলনে এ ভাষার সৃষ্টি হয়। ভারতে কাশ্মিরি ভাষা হিসেবে যে ভাষাটি পরিচিত এটি দারদি ভাষার শাখা। কাশ্মিরি ভাষায় অনেক সাহিত্য রচনা হয়েছে। ফারসি লিপির মাধ্যমে এ সাহিত্য লেখা হয়ে থাকে।[৬৯] ভাষাবিদদের মতে পশ্‌তো ও বেলুচি– এ দু'টি ভাষাও দারদি শাখার অর্ন্তগত। তবে ভাষা বিজ্ঞানি ড. রামেশ্বর শ' এ দু'টি ভাষাকে ভিন্নভাবে বিচার করতে চান। তাঁর মতে, পশ্‌তো ও বিলুচি এ দু'টি ভাষা ইরানি শাখা থেকে উৎপন্ন লাভ করেছে; ভারতি আর্য থেকে নয়। একটি আফগানিস্তানের পশ্‌তু অপরটি বেলুচিস্তানের বেলুচি ভাষা।[৭০]

## আধুনিক ফারসি ভাষা

ইসলাম ধর্ম ইরানিদের ভাষার মধ্যে নতুনত্ব এনে দিয়েছে যা ইতোমধ্যে আলোচিত হয়। তাঁদের মধ্যে আরবি ভাষার প্রাধান্য পাওয়ার বিষয়টি ছিল মূলত ইসলাম ধর্ম গ্রহণের উপর। ইসলাম গ্রহণের প্রাথমিক যুগে আরবি ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব ক্রমান্বয়ে বেড়ে যাওয়ায় পাহলবি ভাষাটির প্রয়োগ ও ব্যবহার

Dhaka University Institutional Repository


হ্রাস পায়। সেই সাথে দ্রুত গতিতে পাহ্লবি ভাষাটি অকার্য অবস্থায় উপনীত হয়। যে কারণে ইসলামি যুগে পাহলবি ভাষা ও সাহিত্য উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে পারেনি। কুরআন, হাদিস ও ইসলাম ধর্মের ভাষা আরবি হওয়ার কারণে ইরানের আলেম ও জ্ঞানীগণ নতুন ভাষার দিকে অগ্রসর হতে থাকেন।[৭১] তাঁদের আধুনিক ফারসি ভাষার প্রতি আগ্রহ ঠিক এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে। ইরানের অনেক ঐতিহাসিক আরবি লিপি ধারণের সময়কালে বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন। কখন আরবি লিপি ফারসি ভাষার লিপি হিসেবে ব্যবহার করা হল, সে ইতিহাস স্পষ্ট করে অনেক ইরানি লেখক বলে যাননি। শহীদ মুর্তজা মুতাহিরি ইরানে ইসলামের অবদান বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। তবে তিনি ইরানে ইসলাম আগমনের সময় পাহলভি লিপির পরিবর্তে আরবি লিপি গ্রহণের বিষয়ে কোনো রকম মন্তব্য করেন নি। তিনি ফারসি ভাষার পুনরুজ্জীবনকে এ অঞ্চলে ইসলামেরই একটি বিজয় বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে, ফারসি ভাষার অনেক মূল্যবান গ্রন্থের মাধ্যমে ইসলামের সাথে পরিচয়ের সেতুবন্ধন সৃষ্টি হয়। তবে ইরানীয়রা আরবি ভাষার কুরআনকে ধারণ করে শত শত ফারসির গ্রন্থ উপহার দিয়েছেন।[৭২] তাঁরা কখন থেকে আরবি লিপি ধারণ করে ফারসি রচনা শুরু করেন– সে বিষয়ের উল্লেখ নেই। ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসমূলক গ্রন্থগুলোতে আরবি শব্দ গ্রহণ ও ফারসির লেখ্যরূপ আরবির ন্যায়– এর বর্ণনা থাকা উচিৎ ছিল। তাতে অনুমান হয় যে, আরবি লিপি ধারণের ক্ষেত্রে ইরানিয়রা দ্বিধাবিভক্ত ছিলেন। ড. মোহসেন আবুল কাসেমি বলেন, ২৫৪ হিজরি সালে বাদশাহ ইয়াকুব লাইস সাফফার ফারসি দারি (দরবারি ভাষা) ভাষাকে ইরানের জাতীয় ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। তখন থেকে ফারসি ভাষা দেশের ও জনসাধারণের ভাষা হিসেবে চালু থাকে। এ জাতীয়তা এখনো রয়েছে।'[৭৩] তবে তাঁর আরবি লিপি ধারণের বিষয়টি সঠিক করে বলা হয় নি। এ প্রসঙ্গে জাফর ইয়াহাকি বলেন, ডাক্তারি বিদ্যা সম্পর্কিত একটি বই যার নাম *আবনাইহে হাকায়েকুল আদায়েহ* যা ৪৪৮ হিজরি সালে আসাদি তুসি অনুলিখন হিসেবে রচনা করেন। সে থেকে আরবি লিপির প্রয়োগটি সবার নিকট উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তবে তার পূর্বেও ইতিহাসের অনেক গ্রন্থ আরবি লিপির মাধ্যমে ফারসি গ্রন্থ লেখা হয়। বস্তুত আরবি ভাষা চালুর পর থেকে পাহলভি লিপির পরিবর্তন দেখা দেয়। যদিও সে সময় পাহলভি লিপির সম্মান জরথুস্ত্রীয় ধর্মীয় পণ্ডিতদের নিকট সর্ব্বোচ্চে ছিল। জরথুস্ত ধর্মের মর্যাদা হ্রাস পাওয়ায় পাহলবি লিপির প্রতি সে গুরুত্ব থাকেনি।[৭৪] তবে ইরানি জাতি আরবি ভাষার ব্যবহার ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে ধীর মত গ্রহণ করেছিলেন বলা যায়। আধুনিক ফারসি ভাষা আরবি বর্ণমালায় লেখা এ ভাষার একটি সংস্করণ রূপ। এ রূপটি খ্রিস্টীয় নবম শতক থেকে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রসারিত হতে থাকে। সামানি যুগে বোখারা, খোরাসান ও অন্যান্য অঞ্চলে নতুন ধারার বিকাশ ঘটে।

Dhaka University Institutional Repository

মধ্য ফারসির প্রভাবজাত আধুনিক ফারসি ভাষা। আধুনিক ফারসি ভাষার বর্ণসংখ্যা বত্রিশটি। বর্ণটি শব্দের সাথে সংযোগকালে কোনো বর্ণের পুরোপুরি রূপটি পরিহার করে অর্ধেক বা তার কিছু অংশ লেখতে হয়। খাটি চারটি বর্ণমালা ব্যতীত অন্যসব বর্ণগুলো আরবি ভাষার।[৭৫] আরবি বর্ণমালা গ্রহণ করার কারণে ঠিক আরবি বর্ণমালার ন্যায় ডান থেকে শুরু করে বামে শেষ হয়। লিখনরীতি ও লেখ্যশিল্প আরবির ন্যায় হলেও বাচন ভঙ্গি ও ব্যবহার একেবারেই ভিন্ন রয়েছে। এটি যে ভাষার জগতে নতুন নয় তা তুর্কি বা আরবি ভাষার দিকে দৃষ্টি ফিরালে অনুধাবন করা যেতে পারে। পৃথিবীর অনেক দেশ সাধারণ সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ ও রাজনৈতিক বিবেচনায় অন্য জাতির বর্ণমালা গ্রহণ করেছে। তুর্কিরা সে থেকে ভিন্ন নয়। ভৌগলিক অবস্থানের দিক দিয়ে তুর্কিরা পাশ্চাত্বের পাশেই তাঁদের অবস্থান। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে তুর্কিরা আরবি বর্ণমালা হতে গৃহীত বর্ণমালা পরিবর্তন করে তুর্কি ভাষার জন্য ল্যাটিন বর্ণমালা গ্রহণ করেছে।[৭৬] কেননা তাঁরা আরবির চেয়ে ল্যাটিন শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ছিল বলেই তা করতে বাধ্য হন। ইরানীয়দের আরবি বর্ণমালা গ্রহণের সবচেয়ে বড় কারণ ছিল তাঁরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সে ধর্ম প্রচারে ভুমিকা রাখা। ইসলাম ধর্মের মৌলিক গ্রন্থ কুরআন আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়। অপরদিকে তখন পাহলবি ভাষা সাধারণের মাঝে কঠিন একটি ভাষা হিসেবে পরিচিত ছিল। ফলে ইসলাম গ্রহণের পরপরই তাঁদের আরবি বর্ণমালা গ্রহণ করাটা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। আরবদের ইতিহাসের দিকে তাকালেও একই ভাব লক্ষ করা যায়। খ্রিস্টপূর্ব সাত শত বছর সময়কালে মিশরে তিন ধরণের শিক্ষার প্রচলন ছিল। শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে তখন হিরোগিলীকি, হিরোতীকি, দিমুতীকি বর্ণমালার প্রচলন পাওয়া যায়। এই তিন ধরণের বর্ণমালার মিশ্রণে ফিনীকি লিপির আর্বিভাব ঘটে। সময়ের বিবর্তনে আরবরা অরামি, নেবতি ও সুরয়ানি ভাষায় কথা বলত। তাঁদের লিখন শিল্পে আরবি লিপি ছিল না। আরবি বর্ণমালার উদ্ভব ঠিক এভাবেই হয়।[৭৭] ইসলাম আগমনের পূর্বকালীন সময়েও আরবরা আরবি বর্ণমালা জানত না। মূলত ইসলাম ধর্ম আরব ও অন্যান্য স্থানে আরবি বর্ণমালার বিকাশ ঘটিয়েছে।

ইউরোপীয় দেশসমূহের মধ্যে ফারসি ভাষাটি সমধিক একটি পরিচিত ভাষা। তাঁদের মতে, এ ভাষার মধ্যে প্রাচীনত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব দু'টোই রয়েছে। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি মতামত উপস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক ইংরেজি লেখক ও পণ্ডিত E. G. Browne বলেন, The Persian Language of to-day, Farsi, the Language of Fars, is then the lineal offspring of the Language which Cyrus and Darius spoke.[৭৮] তাঁর নিকট ফারসি ভাষাটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিকসমৃদ্ধ ভাষা। এইচ. ডব্লিউ বলেন, Let us first look at the Persian Language of the

Dhaka University Institutional Repository

present day as spoken and written in Persia during the past thousand years.[৭৯] তিনি অন্যত্র বলেন, The Persian Language, the *Zaban-i farsi* (the Farsi tongue) as the inhabitants of Iran call their beautiful speech, is now the dominant language in the land...[৮০] উল্লিখিত উক্তিতে ফারসি ভাষার গুণগত মানের অবস্থার কথা ব্যক্ত হয়েছে। এটি অতীতে যেরূপ শ্রেষ্ঠ ভাষা হিসেবে ছিল বর্তমানে তাঁর মর্যাদা কোন অংশে কম নয়।

<u>বাংলা ও ফারসি বর্ণ</u>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ক =ک | ট =# | প =پ | স =س/ص/ث | অ =آ | ঔ = |
| খ =خ | ঠ =# | ফ =ف | হ =ح/ه | আ =ا/ع | |
| গ =گ | ড =# | ব =ب | ড় =# | ই = | |
| ঘ =# | ঢ =# | ভ =# | ঢ় =# | ঈ = | |
| ঙ =# | ণ =# | ম =م | য় =ی | উ = | |
| চ =چ | ত =ت/ط | য =ز | ৎ =# | ঊ = | |
| ছ =# | থ =# | র =ر | ং =# | ঋ = | |
| জ =ج | দ =د | ল =ل | ঃ =# | এ = | |
| ঝ =# | ধ =# | শ =ش | ঁ =# | ঐ = | |
| ঞ =# | ন =ن | ষ =# | | ও =و | |

ফারসি ভাষার লিপিটি আজকের লেখ্যরূপ আকারে ছিলনা। পরিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটি স্বতন্ত্র রূপ পেয়েছে। ইরানীয়রা প্রথমে চিত্রকলার মাধ্যমে তাঁদের মনের ভাব প্রকাশ করত। এসব কতক চিত্র গুহায় ও পাহাড়ে এবং প্রাচীন বাদশাহদের নির্মাণ স্থাপত্যে রয়েছে।[৮১] পর্যায়ক্রমে তা আদান প্রদানের লিপি হিসেবে স্থান করে নেয়। ফারসি বাস্তান যে বর্ণ দ্বারায় লেখা হত তা ছিল মিখি বর্ণ। মিখির ন্যায় ছিল বলে তাকে খাত্তে মিখি বলা হত। সে থেকেই ফারসির প্রাথমিক কালের লিপির বর্ণনা দেয়া হয়। প্রাচীন ফারসি ভাষার নমুনা খোদাইকৃতভাবে হাখামানশি যুগের বাদশাহগণ রেখে গিয়েছেন। এ ছাড়া প্রাচীনতম নির্দশন হিসেবে আজারবাইযানে খোদাইকৃত লিপি যা ৫৮০-৬১০ খ্রিস্টপূর্ব লিখিত হয়। কোরাশ বুযর্গ (৫২৯-৫৬০ খ্রিপূ.) এর নিদর্শন হিসেবেও লিপি বিদ্যমান রয়েছে।[৮২] ফারসি লিপি-কলা কখন শুরু হয়েছিল, কী ভাবে ইরানীয়রা লিপি পেল, একটি পূর্ণ লিপির মাধ্যমে ফারসি ভাষার বিকাশ ঘটেছে সে ভাষার ইতিহাস আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি।

## সংস্কৃত ও আবেস্তা ভাষা

ইন্দো-ইরানি শাখায় প্রাচীন দু'টি ভাষা রয়েছে; সংস্কৃত এবং আবেস্তা। এ দু'টি ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশেরও প্রধান ভাষা। প্রাচীন কালে ইরানে যে ভাষার প্রচলন ছিল সেটির নাম

Dhaka University Institutional Repository

আবেস্তা। বাংলাভাষী অঞ্চলেও তদ্রুপ বহুপূর্ব থেকে সংস্কৃত ভাষার প্রচলন পাওয়া যায়। উভয় দু'টি ভাষাকেই এরিয়ান বা আর্য ভাষা বলা হয়ে থাকে।[৮৩] এ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, স্থান ও কাল ভেদে সংস্কৃত ও আবেস্তা দু'টি ভিন্ন নাম ধারণ করেছে। বাংলা ভাষাবিদরা আবেস্তা ভাষাকে সংস্কৃতের সাথে তুলনা করেছেন। অনেকে বৈদিক সংস্কৃতের সহোদরা বলে অভিহিত করেন।[৮৪] বাঙালি ইরান বিষয়ক গবেষক গোলাম মকসুদ হিলালি আবেস্তা ভাষাকে প্রাচীন ফারসি ও বৈদিক ভাষার ভগ্নি-সম্বন্ধ বলে অভিহিত করেছেন।[৮৫] ইরানি ভাষাবিদদের মধ্যেও সংস্কৃত ও আবেস্তার সাথে গভীর সম্পর্কের বিষয়টি উল্লেখ আছে। এ অঞ্চলের পুরাতন ও ধর্মীয় ভাষা সংস্কৃত ও প্রাচীন ইরানের আবেস্তা ভাষা একই সূত্রে আবদ্ধ। তবে জরথুস্ত্রের সময় ইরানীয় ও ভারতীয়রা এই দুই জাতি একই ভাষায় কথা বলত কী না তা পরিস্কার নয়। সংস্কৃত ভাষার সাথে ইরানের প্রাচীন ভাষার মিল বা সম্পর্ক খুবই গভীরে। সংস্কৃত এবং আবেস্তা ভাষা গঠন ও কাঠামো বিষয়ের নিয়ম-নীতি কাছাকাছি রয়েছে।[৮৬] এ প্রসঙ্গে ইংরেজি লেখক এডওইন লি জোনসন বলেন, ...the development of the Ancient Persian from the parent speech and its relartion to the other languages of the family, particularly the Sanskrit and the Avestan.[৮৭] এ উক্তিতে সংস্কৃত ভাষার সাথে ফারসি ভাষার সম্পর্ক ও নিকট আত্নীয়তা স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। সংস্কৃত ভাষার সাথে প্রাচীন ফারসি ভাষার মিলের বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ার পর বাংলা ভাষার সাথে ফারসির সম্পর্কটিও একেবারেই স্বাভাবিক। নিম্নে আবেস্তা ও সংস্কৃত ভাষার একটি ব্যবহার উল্লেখ করা হল:

<u>আবেস্তা ও সংস্কৃত ভাষা</u>

| সংস্কৃত | আবেস্তা | সংস্কৃত | আবেস্তা |
|---|---|---|---|
| সপ্তা | ঘপ্তা | বাহু | বাযু |
| সোপ্না | খোপ্না | রোচ: | রোয |
| ঘরম | গরম | গৌ | গাব |

সংস্কৃত ভাষা এ অঞ্চলের হিন্দু জন-সাধারণের ধর্ম ও সংস্কৃতির ভাষা হিসেবে পরিচিত। এটি খ্রিস্ট জন্মের প্রায় ছয় শত বছর পূর্বে এ অঞ্চলের প্রচলিত আর্য ও বৈদিক ভাষার উপর ভিত্তি করে 'লৌকিক সংস্কৃত' ভাষার সৃষ্টি হয়।[৮৮] তখন থেকেই এ ভাষাটি লোকমুখের ভাষায় পরিবর্তন হয়ে বিভিন্ন নাম ধারন করেছে। যদিও বর্তমানে আবেস্তা ও সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার কোথাও নেই। তবুও সাহিত্যিক বিচারে এ দু'টি ভাষার সাহিত্য অনেক মূল্য রাখে।

Dhaka University Institutional Repository


## বাংলা ভাষার রূপ ও বাংলাদেশ

প্রাচীনকালে বাংলা নামক দেশ বলতে যে অঞ্চল বুঝাত সে অঞ্চলটি বর্তমানে বাংলাদেশের মত জনবহুল বিস্তৃত ছিলনা। এটি না থাকার বহুবিধ যুক্তি ও কারণ রয়েছে। বিভিন্ন শাসকের পরিবর্তনের ফলে দেশের সীমানা পরিবর্তন হওয়া একটি স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। তেমনি অঞ্চলের আয়তন ও মানুষ সংখ্যার পরিবর্তন হয়েছে বলা যেতে পারে। তখন দেশের আয়তনের মধ্যে বসবাসযোগ্য অঞ্চলের চেয়ে পাহাড়, পর্বত, উপত্যাকা, সমুদ্র ও মালভূমির সীমানাই ছিল বেশি।[৮৯] তবে বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিম বঙ্গের প্রদেশ সেই বাংলা অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই বাংলা নামটি প্রথমে আবুল ফজলের ফারসি ভাষায় রচিত *আইন ই আকবারি* গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আবুল ফজল তাঁর *আইন ই আকবারি* গ্রন্থে উমারায়ে বাঙ্গালা ( امرای بنگاله), রোবে বাঙ্গালা (روبه بنگاله) ইত্যাদি শব্দের মাধ্যমে একটি স্বতন্ত্র অঞ্চল বা দেশ বুঝিয়েছেন। যে স্থানটি হিন্দুস্তানের অধীন ছিল।[৯০] ইংরেজদের লেখায় নাম দেয়া হয়েছে বেঙ্গাল। সুতরাং এই বাংলা অঞ্চলেই বাংলা ভাষার চর্চা হত। তার পূর্বে বাংলা ভাষায় কোনো কবি বা লেখক বাংলাভাষী অঞ্চলকে নির্দিষ্ট করে দেশ বাচক শব্দ ব্যবহার করেননি।[৯১] এ অঞ্চলকেই বিভিন্ন গ্রন্থে গৌড়, বঙ্গ, বাংলা ইত্যাদি নাম দিয়ে অভিহিত করা হয়েছে। এ সব অঞ্চলের অধিবাসীগণ বাংলায় কথা বলতেন। অধিবাসীরা সংখ্যায় ছিল অনেক কম।

অনেকগুলো জনপদ নিয়ে বাংলা গঠন হয়েছিল। গৌড়, পুণ্ড, বরেন্দ্র, রাঢ়, বঙ্গ সমতট এবং হরিকেল ছিল অন্যতম অঞ্চল। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, বাংলা যে নামটি পাওয়া যায় তা বঙ্গ থেকেই এসেছে। সমগ্র অঞ্চলকে একত্রিত করে বাংলাকে একটি দেশ হিসেবে পরিণত করেন সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ। তিনি বাংলায় স্বাধীন সুলতানি আমলের সূচনা করেন। ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দে বাংলাভাষীদের এলাকার নাম হয় বাংলা।[৯২] এ অঞ্চলে যাঁরা রাজত্ব করেছিলেন সে কারণে বাদশাহদের উপাধির ক্ষেত্রে 'বাঙ্গালাহ' শব্দটি প্রয়োগ হয়েছে। যেমন 'শাহ-ই-বাঙ্গালাহ', 'সুলতান-ই-বাঙ্গালাহ', 'শাহ-ই-বাঙ্গালিয়ান' ইত্যাদি। প্রাচীন যুগে 'বঙ্গ' শব্দটির উল্লেখ থাকলেও ভূমি বা দেশ বুঝানো হতনা। ভাষার নির্দিষ্টকরণ যখন শুরু হয় তখন থেকে ভাষার সাহায্যে 'বঙ্গ' অঞ্চল চিহ্নিত হতে থাকে। বাংলা ভাষায় যারা কথা বলত তাঁরা বাঙ্গালি এবং বসবাসের স্থানের নাম হল বঙ্গ।[৯৩] মধ্যযুগের কবিদের মাঝে 'বঙ্গালা' বা 'বাঙ্গালা' দেশবাচক শব্দের প্রতি আকর্ষণ দেখা যায়না। যদিও তাঁরা 'বঙ্গ', 'বাঙ্গালি' এবং 'বঙ্গাল' শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাঁদের রচনায় এ শব্দগুলো শুধু ভাষা বুঝানোর ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়েছে। কবিরা বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলকে কোনো নির্দিষ্ট করে দেশবাচক শব্দ ব্যবহার করেননি। ইতিহাসে গৌড়, বঙ্গ, একটি অঞ্চলের নাম হিসেবে পাওয়া যায়। মুহম্মদ বিন

Dhaka University Institutional Repository


বখ্‌তিয়ার খিলজির বঙ্গজয়ের পর থেকে বাংলা স্থানটির প্রসিদ্ধি ঘটে। তৎকালীন সময়ের বাংলা অঞ্চল থেকেই আজকের বাংলাদেশ বা বাংলাভাষীদের দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়।[৯৪] এ ছাড়া বর্তমানে বাংলাভাষী বলতে বাংলাদেশ ও ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে বাংলা ভাষারূপে প্রচলিত অধিবাসীদের বুঝানো হয়ে থাকে।

বঙ্গে মুসলমান আগমনের পূর্বে বাঙালিদের ভাষা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল বলে বাংলা গবেষকগণ মনে করেন। তবে ভাষাটি কোথায় ছিল, কেমনভাবে ছিল –তা একটি গবেষণার বিষয়। আমরা এ বিষয়টি স্পষ্ট করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করছি। বাংলা ভাষার ভিত্তি হল অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, মাগদি প্রাকৃত ইত্যাদি ভাষা। এই তিন ভাষার শব্দগুলো দেশজ শব্দ হিসেবে পরিচিত। এসব ভাষার দৃঢ় অবস্থান থাকলেও বাংলা ভাষার উদ্ভবে সংস্কৃত ভাষার ভূমিকা রয়েছে।[৯৫] যদিও সংস্কৃতের সাথে বাংলা ভাষার উচ্চারণ ও ভাষাগত প্রভেদ বেশি। সঙ্গত কারণে, এ ভাষার উৎপত্তি ও মূল শাখা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার বক্তব্য প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে। সংস্কৃতজ্ঞ বাংলাভাষী পণ্ডিতদের মধ্যে এ কথা বদ্ধমূল যে, সংস্কৃত বাংলা ভাষার জননী। তাঁরা বাংলা ভাষার আদিকাল বর্ণনা করে সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভব হওয়ার কথা দৃঢ়ভাবে বলে থাকেন। এ সম্পর্কে তাঁদের একাধিক যুক্তিও রয়েছে। তাঁদের একটি যুক্তি হল, ... ভারতীয় আর্যের প্রাচীনতম ভাষা বৈদিক। বৈদিক সংস্কৃতের পূর্ববর্তী... ।[৯৬] তবে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বিষয়ক গবেষক আহমদ শরীফের মতে, বাংলা ভাষার মূল গঠন কাঠামো গড়ে ওঠেছে আর্য ভাষার উপর ভিত্তি করে। প্রথমে বাঙালিরা যে ভাষায় কথা বলত তা ছিল আর্য ভাষা। তখন এ ভাষার নাম রাখা হয়েছিল প্রাচ্য প্রাকৃত। এ ভাষা থেকেই বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়।[৯৭] পণ্ডিত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও আরো অন্যান্য গবেষকের মত হল, বাংলা ভাষা মাগধি থেকে উৎপন্ন হয়েছে। ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষা উৎপত্তির বিষয়টি কোনোভাবেই মেনে নেননি। এমন কি মাগদি থেকেও নয়। বাংলা ভাষাটি প্রাকৃত থেকে উৎপন্ন হয়েছে, যে প্রাকৃতের নাম গৌরি অপভ্রংশ। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এই গৌড় অপভ্রংশ হইতে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি। এই জন্য বাঙ্গালা ভাষাকে এক সময়ে গৌড়ীয় ভাষা বলা হইত।'[৯৮] মূলত সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষা উৎপন্ন হয়নি এবং সংস্কৃত বাংলা ভাষার মাতা নন। বরং মাতামহী বলা যেতে পারে। প্রাকৃত বাংলা ভাষার জননী হওয়াই যুক্তিযুক্ত। তাঁর অন্যতম যুক্তি হল, সংস্কৃত অপেক্ষা প্রাকৃত ভাষা অনেক সহজ। বাংলা শব্দ প্রাকৃতের সাথে শব্দের বানান ও অর্থগতভাবে সম্পর্ক ও মিল রয়েছে। মূলত বাংলা ভাষার উদ্ভব নিয়ে ভাষাবিদদের মাঝে বহু ধরণের মত পরিলক্ষিত হয়। যেমন– ১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও অনেকের দাবি হল, বাংলা মাগধি প্রাকৃত থেকে উৎপন্ন হয়েছে। ২.

Dhaka University Institutional Repository

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও অনেকের মতামত হল, বাংলা গৌড় প্রাকৃত তারপর গৌড় অপভ্রংশ থেকে জন্ম লাভ করেছে। ৩. হিন্দু গবেষকদের মতে, বাংলা সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন লাভ করেছে। বিভিন্ন মতের ভিত্তিতে বাংলা ভাষার উদ্ভব নিয়ে বিস্তর আলোচনা লক্ষ করা যায়। ভাষার ইতিহাসে সংস্কৃত এমন একটি ভাষা যা জনসাধারণের মুখের ভাষা হিসেবে কখনো ছিলনা। অপরদিকে সহজভাবে বলা চলে যে, জনগনের ভাষাই বাংলারূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এটির রূপ আদিম প্রাকৃত, প্রাচীন প্রাকৃত, এবং প্রাকৃত অপভ্রংশ হয়ে বাংলা ভাষা।[৯৯] বাংলা ভাষার সুনির্দিষ্ট রূপ খ্রিস্টীয় নবম ও দশম শতক থেকে পাওয়া যায়। তখন বাংলা ভাষা অপভ্রংশ ও প্রাকৃত ভাষার অবয়বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। উত্তর ভারতের আর্য এবং প্রাকৃত ভাষা বাংলায় এসেছিল বহুপূর্বে। খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে মৌর্য রাজা বাংলাকে যখন প্রদেশ করেছিল তখন উত্তর ভারতের সাথে বাংলার যোগাযোগ সহজ হয়। সে সুবাদে বাংলায় আর্য ভাষা প্রবেশ লাভ করে। তখন আর্য ভাষাটির ব্যবহার ও পরিধি বিস্তৃত ছিল। এটি বহু গোষ্ঠী ও জাতির ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হত।[১০০] তবে বাংলা ভাষা প্রাচীন আর্য ভাষা থেকে সরাসরি উৎপন্ন হয়নি। বাংলা ভাষায় তিনটি রূপ রয়েছে। যথা- প্রাচীন বাংলা, মধ্যযুগীয় বাংলা এবং আধুনিক বাংলা।

**প্রাচীন বাংলা (৯৫০ খ্রি.-১২০০ খ্রি.):** অপভ্রংশ থেকে পরিবর্তন হয়ে যে ভাষার রূপ নেয় তার নাম হলো প্রাচীন বাংলা। এ সময়ের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল বৌদ্ধগান ও দোহা, টীকা সর্ব্বস্ব। এ চর্যাপদকে ভিত্তি করে প্রাচীন বাংলার লক্ষণ তৈরি করা হয়।[১০১] তাতে বাংলা তদ্ভব, অর্ধতৎসম ও দেশি শব্দের উপস্থিতি রয়েছে। যথা- আলিএঁ, হিঅহি ন পইসই, ইত্যাদি। প্রাচীন বাংলায় অনেকগুলো লক্ষণ রয়েছে। যেমন- পদান্তে স্বরধ্বনি ভণতি >ভণই, য়-শ্রুতি আয়াতি>আবয়ি ইত্যাদি। যে লক্ষণগুলো প্রাচীন বাংলা চেনার সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।

**মধ্যযুগীয় বাংলা (১২০০ খ্রি.-১৮০০ খ্রি.):** এ সময়ের নিদর্শন হল শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য[১০২]। এটিকে লক্ষ করে এ যুগের বাংলা ভাষার বিবরণ দেয়া হয়। যেমন- আইসে, বইসিল, তেরহ ইত্যাদি। তাতেও অনেকগুলো লক্ষণ বিদ্যমান। যেমন- অসমাপিকার সাথে 'আছ' ধাতুর যোগে যৌগিক ক্রিয়া পদ গঠন। এরূপ অনেগুলো লক্ষণ দেয়া আছে। যে গুলো মধ্যযুগীয় বাংলা চেনার লক্ষণ বলে বাংলা ভাষার পণ্ডিতগণ বর্ণনা দিয়েছেন ।

Dhaka University Institutional Repository

**আধুনিক বাংলা (১৮০০ খ্রি.- চলমান):** এ যুগে শব্দের মধ্যে সংক্ষিপ্ত রূপ পরিগণিত হয়। কথ্য ও লেখ্য ভাষা দু'টি ভিন্নভাবে প্রয়োগের ধারা দেখা যায়। এখানেও অনেকগুলো লক্ষণ রয়েছে। যেমন–ভাববচন শব্দের সঙ্গে পূর্বক অথবা করত: যোগ করা। ফারসি জাত অব্যয়ের ন্যায় বাক্যে সংযোজন হওয়া ইত্যাদি।[১০৩] উল্লেখ্য যে, আধুনিক বাংলা ভাষা উদ্ভবের পর সাধু ও চলিত ভাষার ব্যবহার চালু হয়। কতক লেখায় আঞ্চলিক ভাষাও প্রয়োগ হতে থাকে।

<u>বাংলা ভাষা রূপের নমুনা</u>

| প্রাচীন বাংলা | মধ্য বাংলা | আধুনিক বাংলা |
|---|---|---|
| বাঢ়ই<br>থাকিয়া<br>নাটুয়া | বাঢ়ে<br>থাক্যে<br>নাউটুয়া | বাড়ে<br>থেকে<br>নেটো |

## বাংলাদেশে আর্য জাতি

আর্যরা প্রায় দু' হাজার খ্রিস্ট পূর্বাব্দে ভারতে এসেছিল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের প্রভাব বিস্তার করতে আরো এক হাজার বছর অতিবাহিত করতে হয়। তবে বাংলায় আর্যরা এসেছিল কী-না এ বিষয়টি অস্পষ্ট। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, 'আর্যেরা পাক-ভারতের উত্তর পশ্চিম হইতে ক্রমশ: অগ্রসর হইয়া বঙ্গদেশে আসিয়া নিজেদের অধিকার বিস্তার করেন। তাহাদের আগমনের পূর্বে বঙ্গদেশে অনার্যগণ বাস করিত।'[১০৪] তাঁর বক্তব্যে বঙ্গে আর্য ও অনার্যদের বসবাসের প্রমাণ মিলে। শ্রী সুকুমার সেন আর্যদের সম্পর্কে বলেন, 'তাহারা অঙ্গ বঙ্গ মগধ প্রভৃতি অঞ্চলে সন্নিবিষ্ট হইয়া উপভাষার সৃষ্টি করিয়াছিল।'[১০৫] এ থেকেও বুঝা যায় যে, বঙ্গে আর্যরা বসবাস করত। ভাষাতাত্ত্বিক মতে, ভারতীয় আর্য থেকেই বাংলা ও অন্যান্য ভাষার সৃষ্টি হয়। প্রথম দিকে ভারতে আর্যরা বসবাস করেছিল। দিনের পর দিন তাঁদের বসবাস পরিধি বাড়তে থাকলে বঙ্গ দেশে তাঁরা বসবাসের উপযোগী স্থান করে নেয়। অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতক থেকে বাংলাদেশে আর্য ভাষা চালু ছিল।[১০৬] ঋগবেদ যারা রচনা করে ছিল তারা ছিল জাতিতে আর্য জাতি। এ থেকে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উত্তাপিত হয় যে, বাঙালিরা কী আর্য জাতির বংশধর? কেননা, বাঙালিরা কিছুতেই স্বীকার করে নিতে চান না যে তারা আর্য। এ সম্পর্কে আধুনিক বাংলা গবেষকগণ বাঙালিরা শুধু আর্য জাতি নয় বলে বিস্তর আলোচনা করেছেন। বাঙালিদের পরিচয় কোনো একটা বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত হিসেবে নয়। তাঁরা মূলত কিছুটা দ্রাবিড়, কিছুটা অস্ট্রিক বা কিছুটা আর্য। সে হিসেবে বাঙালি জাতি একটি শঙ্কর জাতি।[১০৭]

Dhaka University Institutional Repository

## বাংলা লিপি

ভাষা ও লিপি একবস্তু নয়। লিপির সৃষ্টির বহু পূর্ব থেকে ভাষা সৃষ্টি হয়েছে। শুরুতে একটি ভাষার জন্য যে লিপি ব্যবহার হতো সে লিপিই উক্ত ভাষার প্রাথমিক লেখ্যরূপ। বাংলা লিপি বাংলা ভাষার ধ্বনির বাহক হিসেবে হাজার বছর পূর্ব থেকে ধারণ করেছে- বলা যায়।[১০৮] ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাচীনতম লিপির নিদর্শন হচ্ছে সম্রাট অশোকের লিপি। সাধারণত এ লিপি অশোকের অনুশাসন নামে পরিচিত। বাংলাদেশে প্রাচীনতম লিপি নিদর্শন হিসেবে মহাস্থানগড়ে অশোকের লিপি বিদ্যমান রয়েছে। এই লিপিটির নাম ব্রাহ্মী লিপি। এই ব্রাহ্মী লিপি থেকে বাংলা লিপির উদ্ভব ঘটেছে– তা বাংলা ভাষাবিদদের অভিমত।[১০৯] বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এ কথা স্পষ্ট যে, পাক-ভারতীয় প্রাচীন কোন লিপি থেকে বাংলা লিপির উদ্ভব হয়েছে। এ লিপির বয়সকাল খ্রিস্টপূর্ব আড়াই শ বছরেরও পুর্বের চেয়ে কম নয়। পাক-ভারতীয় লিপি বলতে অনেকে ব্রাহ্মী লিপি বুঝিয়েছেন। যে ব্রাহ্মী লিপি ফিনিসীয়, পারসিক বা অরামীয় লিপির সাদৃশ্য।[১১০] তবে এ লিপির উদ্ভাবক কি ভারতের অধিবাসী ছিলেন না অন্য কোনো জাতি সে সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষক দ্বীন মুহাম্মদের মতে, কুটিল রূপটি থেকে বাংলা লিপির উদ্ভব হয়। নাগর রূপ থেকে দাড়িয়েছে দেবনাগরি লিপি। লিপি ভাষার লিখিত রূপদানের মাধ্যম হলেও বাংলা লিপিকে আশ্রয় করেই বাংলা ভাষার বিকাশ ঘটেছে। এটি শুধু বাংলা ভাষা প্রকাশেরই বাহন।[১১১] বাংলা লিপির উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে অনেকের মতামত হল– এটি ভারতীয় প্রাচীন লিপি থেকে উদ্ভব হয়েছে। এটি সত্য যে, বর্তমানে বাংলা লিপির যে বর্ণমালা পাওয়া যায়, সে লিপির আঙ্গিক রূপ একদিনে আসেনি। ভারতে মুসলমান আগমনের পর লিপির মধ্যেও পরিবর্তন এসেছে। বঙ্গ অঞ্চলে যে লিপির প্রচলন ছিল তা অনেক পরিবর্তন হয়ে নতুন লিপির প্রকাশ ঘটে। তবে সে সময়ের বাংলা ভাষা, তার লেখ্যরূপ ও ব্যবহারের বিষয়টি বর্তমান সময়ের লিপির চেয়ে ভিন্ন ছিল তা অনুমান করা যায়। বাংলা হরফের যে আকৃতি বর্তমানে রয়েছে এটির রূপ আট শত বছর পূর্ব থেকে শুরু হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষক কাজি দ্বীন মুহম্মদ বলেন, 'বাংলা বর্ণমালা অশোকলিপির টানা লেখার ক্রম পরিবর্তন থেকেই প্রাপ্ত।'[১১২] তবে বাংলা ভাষার রূপটি তখন থেকেই শুরু হয়েছিল কী না সে ব্যাপারে ভাষাবিদরা নিশ্চিত নন। এটা সত্য যে, বাংলা ভাষার শুরু বা প্রথম দিকের অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। ভাষাবিদদের মাঝে একটি প্রবল ধারণা হল যে, প্রাচীনকালে ইরানে যে ভাষার প্রচলন ছিল এটি ভারতে এসে সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টি করেছে। যাকে এরিয়ান বা আর্য ভাষা বলা হয়।[১১৩]

Dhaka University Institutional Repository


## বাংলা ও ফারসি শব্দ

ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার খিলজির বাংলায় আগমনের পর নতুন শাসনের সূত্রপাত হয়। এ অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম যেমন একটি আদর্শের বার্তা বহন করেছে তেমনি ভাষা ও সংস্কৃতির পরিবর্তন এনে দিয়েছে। তখন বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের মানুষ দু'টি ভাষার পরিচয় লাভ করত।[১১৪] একটি আরবি অন্যটি হল ফারসি ভাষা। সে সময় বাংলার মানুষ আরবি ভাষার চেয়ে ফারসি ভাষার সাথে পরিচয় লাভ করে ছিল বিবিধ কারণে। কারণগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: ১. তুর্কিদের শাসন ব্যবস্থা ২. রাস্ট্রভাষা ফারসি ও ৩. ফারসি ভাষার পুস্তিকাদির উপস্থিতি। ইসলামের অগ্রযাত্রাকালে এ অঞ্চলে ফারসি ভাষার প্রবেশ ঘটেছে লক্ষণীয়ভাবে। প্রধানত প্রবেশের লক্ষবস্তু ছিল এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষদের মাঝে ইসলাম প্রচার ও ইসলাম শিক্ষা প্রদান। পাঠান ও মুঘল আমলে এ অঞ্চলে ফারসি ভাষার প্রবেশ বেশি করে ঘটতে থাকে।[১১৫] ফলে শব্দগুলো বাংলা ভাষায় প্রবেশের পর উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গি বদলে যায়। এমন কি শব্দগুলোর যে পৃথক পরিচয় ছিল তাও অবশিষ্ট্য থাকে নি। বলতে গেলে তা বাংলারূপেই আত্মপ্রকাশ করেছে।[১১৬] আমরা জানি ভাষার উন্নয়নে যে কোনো ভাষার শব্দ গ্রহণ দোষের নয় বরং তা অনেক ক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত। সে হিসেবে বাংলা ভাষায় ফারসি শব্দের প্রবেশ কোনো অন্যায়মূলক বিষয় নয়। অনেক দেশের ভাষায় ভিন্ন জাতীয় শব্দ প্রবেশ করে সে ভাষার উন্নয়ন হয়েছে। এ কারণে বলতে দ্বিধা নেই যে, বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি ও উন্নয়নে ফারসি ভাষার ভূমিকা নিঃসন্দেহ প্রশংসনীয়। এ সম্পর্কে বাংলা ভাষাবিদদের মন্তব্য হল যে, বাংলা ভাষায় ব্যাপক ফারসি শব্দের প্রবেশ এবং এর ব্যবহার ভাষাসম্পর্ক ও যোগসূত্রতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠেছে এবং তা বাস্তবসম্মত।[১১৭] বাংলা ভাষার পণ্ডিতদের মধ্যে বিশ্বাস হল যে, বাংলা ভাষা পৃথিবীর ভাষাগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত ভাষা। কিন্তু এ ভাষা তার প্রকৃত অবস্থানে পৌঁছতে অনেক সময় অতিক্রম করতে হয়। কঠিন ও অপরিচিত সংস্কৃত ভাষার শব্দ পরিত্যাগ করে বহু ফারসি শব্দের মিশ্রণ ঘটিয়ে বাংলা ভাষার আত্মপ্রকাশ একটি যুগ উপযোগী ঘটনা। এক শ্রেণির পণ্ডিত ফারসি শব্দ গ্রহণ করার কারণে বাংলা ভাষাকে শ্রেষ্ঠ ভাষা বলতে আপত্তি করেছেন। অথচ তখনই বাংলা ভাষা আসল রূপ পেয়েছে।[১১৮] খ্রিস্টিয় ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ছ'শ বছর পর্যন্ত বাংলা ভাষায় ফারসি শব্দ আগমনের প্রবেশকাল। মুসলিম শাসকরা বঙ্গে আগমনের পর থেকেই বাংলা ভাষায় ফারসি শব্দের প্রবেশ ঘটতে শুরু করেছে। ভাষাবিদ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র মতে, বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের পর থেকে ধীরে ধীরে বাংলা ভাষার উপর ফারসি ভাষার প্রভাব শুরু হয়।[১১৯] বলা যায় যে, এ দীর্ঘ সময় ফারসি শব্দ বিপুল পরিমাণে বাংলা ভাষায় প্রবেশ লাভ করেছে। যে কারণে বাংলা শব্দ ভাণ্ডার ফারসি শব্দ দ্বারায় বিপুল শব্দ ভাণ্ডারে পরিণত হয়। তবে অষ্টাদশ শতাব্দেই বাংলা ভাষায়

ফারসির সর্বাধিক প্রভাব লক্ষ করা যায়।[১২০] বাংলা ভাষায় ও সাহিত্যে এর প্রভাব দুই জাতির মধ্যে একটি সম্পর্কের কারণ। তখন বাংলাভাষীরা সহজভাবে গ্রহণ ও ব্যবহারকে প্রাধান্য দিয়েছিল।

এ পর্বে আমরা বাংলা ভাষার বয়সকাল নিয়ে আলোচনা করব। সে কালগুলোর মধ্যে ফারসি ভাষার সাথে বাংলা ভাষার সম্পর্ক খোঁজে পাওয়া যাবে। ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ চারটি যুগের কথা উল্লেখ করে বাংলা ভাষার সময়কাল নির্ধারণ করেছেন। যথা– আধুনিক যুগ (১৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে চলমান), মধ্যযুগ (১৩৫০ খ্রি.-১৮০০ খ্রি.), সন্ধিযুগ (১২০০ খ্রি.-১৩৫০ খ্রি.) ও প্রাচীন যুগ (৬৫০ খ্রি.-১২০০ খ্রি.)।[১২১] তাঁর নিকট আধুনিক যুগের পূর্বের যুগকে বলা হয় মধ্যযুগ। সন্ধি ও মধ্যযুগে বাঙ্গালায় মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠা পায়। তাই তিনি এই দুই যুগকে মুসলিম যুগ হিসেবেও আখ্যায়িত করেছেন।[১২২] এই যুগগুলোর মধ্যে বাংলা ভাষায় ফারসি ভাষার প্রভাব বা বাংলা ভাষার সাথে সম্পর্কের বিষয়টি জড়িত। সন্ধি এবং মধ্যযুগে কিভাবে বাংলা ভাষায় ফারসি শব্দের প্রবেশ ঘটেছে যা ইতিমধ্যে আলোচনা করা হয়। বিশেষত মুসলিম যুগে বাঙালি জাতি ইরানি সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এই সময়ে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বাঙালিরা গ্রহণ করে এবং এর চর্চা অব্যাহত রাখে। ফলে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য মধ্যযুগের পুরো সময়কালে (১২০০ খ্রি.-১৮০০ খ্রি.) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে প্রভাব পড়তে দেখা গিয়েছে।[১২৩] উল্লেখ্য যে, মধ্যযুগে (১২০০ খ্রি.-১৮০০ খ্রি.) বাংলা সাহিত্য বিকশিত হয় মূলত ফারসি ভাষা ও সাহিত্যকে সম্মুখে রেখে। বাংলা ভাষায় ফারসি শব্দের ব্যবহারের ফলে বাংলা সাহিত্যের মাধুর্য ও সৌন্দর্যের বিষয়টিও দৃষ্টিতে আসে। অপরদিকে মুসলমানদের মাঝে ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধির সাথে সাথে ফারসি ভাষাটিও জনসাধারণের প্রাত্যহিক জীবনে স্থান করে নিতে সক্ষম হয়। জনসাধারণের কথা ও কাজকর্মের মধ্যে ফারসি শব্দের মিশ্রণ ঘটায় তাদের ভাষা বিশুদ্ধ ভাষা হিসেবেই পরিগণিত হয়েছে। এসব ব্যবহৃত ফারসি শব্দগুলো বাংলা। ভাষাবিদদের মাঝে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।[১২৪]

এ কথা সত্য যে, বঙ্গে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বঙ্গের ভাষা ও সাহিত্যের পরিবর্তন ঘটেছে। যদিওবা সংস্কৃত সাহিত্য অনেক আগ থেকেই ঝিমেয়ে পড়ছিল। মুসলমানদের আগমনের ফলে সংস্কৃত ভাষার চর্চা ও ব্যবহার একেবারে স্থিমিত হয়ে যায়। তখন বাংলা ভাষায় বহু ফারসি শব্দের প্রবেশের ফলে একটি নতুন ভাষারও সৃষ্টি হয়েছে। সে ভাষার নাম হয়েছে দু'ভাষি বা মুসলমানি ভাষা।[১২৫] এরই প্রেক্ষাপটে পুথি সাহিত্যের জন্ম নেয়। এ সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য হল, আরবি-ফারসি মিশ্রিত বাংলা শব্দ। অনেক হিন্দু সাহিত্যিক তাঁদের রচনায় ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন।

তন্মধ্যে কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র অন্যতম।[১২৬] তাঁদের সাহিত্যে ফারসি শব্দ ব্যবহারের ফলে বাংলা ভাষার সৌন্দর্যের বিকাশ ঘটেছে– বাংলা সাহিত্যিকরা এমনটিই মনে করেন। মুসলিম আমলে বাংলা ভাষার উন্নয়নের ফলে অনেকে আবার মন্তব্য করেছেন এভাবে, 'বাংলা ভাষা এত দিন হিন্দুর দান গ্রহণ করিয়াছে, এইবার তাহাকে মুসলমানের দানও গ্রহণ করিতে হইবে– অনুগ্রহ করিয়া নহে, আগ্রহের সহিতই গ্রহণ করিতে হইবে।'[১২৭] তাতে স্পষ্টত বুঝা যায় যে, মুসলমান আমলে ফারসির প্রভাব বাংলা ভাষাকে নুতনরূপে উজ্জীবিত করে তুলেছিল। মুসলিম সংস্কৃতিতে ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধির সাথে সাথে এ ভাষাটিও বাংলা ভাষায় ব্যবহারের ভাষা হিসেবে স্থান করে নিতে সক্ষম হয়। জনসাধারণের কথা ও কাজকর্মের মধ্যে ফারসি শব্দের মিশ্রণ হওয়ায় এটি বিশুদ্ধ ভাষা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।[১২৮] এ শব্দগুলোকে পরিত্যাগ বা সংস্কৃতকরণ কোনটিই যুক্তিযুক্ত নয়। বরং বাংলা একাডেমী প্রণীত বানান রীতি অবলম্বন করে ব্যবহার করাই শ্রেয়।

ইতোমধ্যে আমরা বাংলা ভাষার সাথে ফারসি ভাষার সম্পর্ক ও নিকট আত্নিয়তা সম্পর্কে অবগত হয়েছি। বিশেষত আমাদের মাঝে বাংলা ভাষার সাথে ফারসি ভাষার উৎপত্তিগত ও জাতিগতভাবে মিলের বিষয়টি পরিস্কার হয়ে ওঠেছে। বাঙালি জাতি দীর্ঘকাল ধরে নানা জাতির সংশ্রবে বসবাস করছিল। এ সসয় সে নতুন নতুন ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হয়। এর ফলে যে সব বিদেশি শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করে এসব শব্দগুলো বিদেশি নয় বলতে গেলে বাংলা ভাষা।[১২৯] আমরা নানা ভাবে প্রবেশকৃত ফারসি শব্দগুলোকে বাংলা ভাষা বলেই জানি। তবে ঠিক কতগুলো ফারসি শব্দ বাংলা ভাষায় রয়েছে সে হিসেব দেয়া কঠিন। যদিও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র ন্যায় অনেকে আড়াই হাজার বা কিছু বেশি শব্দের কথা বলেছেন। বস্তুত এটির সঠিক সংখ্যাটি এরূপ নয়। যে সব প্রজাতির ফারসি শব্দ বাংলা ভাষায় পাওয়া যায় তাতে বাংলা ভাষায় বিশাল শব্দ ভাণ্ডার ফারসির শব্দ হওয়াই স্বাভাবিক। নিম্নে প্রবেশকৃত শব্দের জাত সম্পর্কে একটি ধারণা উপস্থাপন করা হল।

**শব্দের জাত**

ধর্ম : নামাজ, রোজা, ঈদগাহ, শবেবরাত, শবেকদর, বেহেশ্‌ত, মাতম, দোযখ, গুনাহ, খোদা, পয়গাম্বর ইত্যাদি।

শিক্ষা: কাগজ, কলমদানি, মক্তব, মাদ্রাসা, দোয়াত-কলম, শাগরেদ, উস্তাদ, কিতাব, তরজমা, হরফ ইত্যাদি।

অফিস: দপ্তর, কেরানি, দস্তখত, ফরিয়াদ, হাজিরা, ফরমান, ফরমায়েশ, বড় সাহেব, ছোট সাহেব, গোমেস্তা, দাগটানা ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবসা সংক্রান্তঃ কারিগর, দোকানদার, হিসাব, মালামাল, দর দাম, আমদানি, রপ্তানি, বাজার দর, জুট ব্যবসা ইত্যাদি।

সাহিত্য ও সংস্কৃতিঃ বয়েত, গজল, শায়ের, তালিম, কেচ্ছা-কাহিনী, মজলিশ, মোশায়েরা, জলসা, তমদ্দুন, আকিদা, মসনবি ইত্যাদি।

রাজদরবারঃ বাদশাহ, বেগম, বাহাদুর, নবাব, জমিদার, দৌলত, দরবার, মালিক, আমীর, উজির, বে ওয়ারিশ, লা খেরাজ ইত্যাদি।

আইন-আদালতঃ তফসীল, আইন, পেশকার, জেরা, আসামি, রায়, সালিশ, ফয়সালা, জবান বন্দি, মোকদ্দমা ইত্যাদি।

যুদ্ধবিগ্রহঃ কামান, তীর, তোপ, জখম, তীরান্দাজ, সেপাই, ফৌজ, লশকর, রসদ, লঙ্গরখানা, বরকন্দাজ ইত্যাদি।

পেশাঃ চাকর, খাদেম, আমলা, পেশা, নফর, বাবুর্চি, দারোয়ান, জাদুকর, দর্জ্জি, কসাই, মুনশি, কাতেব ও কেরানি ইত্যাদি।

জনজীবনঃ পায়জামা, জামা, পা, খবর, নেহায়েৎ, সাফ, বখশিস, পছন্দ, নমুনা, জলদি, মালদার, শরম, গুম ইত্যাদি।

সমাজ সভ্যতাঃ চশমা, দালান, মখমল, ফারাশ, খোশ বু, আতর, গোলাপ, বাগিচা, সুর্মা, খান্দান, ফানুশ, লঙ্গরখানা ইত্যাদি।

প্রাকৃতিক বস্তুঃ আব হাওয়া, আসমান, জমীন, সর্দি, গরম, সবুজ, আঙ্গুর, পোক্তা, আনার, আসমানি, গোলাপ ইত্যাদি।

সাধারণ দ্রব্যঃ নরম, তাজা, লাল, পছন্দ, ওজন, কম, বাচ্ছা, বস্তা, বান্দা, পর্দা, গোশ্ত, গিরাহ্, ফাঁকা, সব্জি ইত্যাদি।

উল্লিখিত জাতের শব্দগুলো[১৩০] বাংলা ভাষায় পৃথক কোনো পরিচয় প্রদান করেনা। এগুলো আম-সাধারণের মধ্যে খাঁটি বংলারূপে পরিচিত। এরূপ বাংলা ব্যাকরণেও ফারসির প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে। বাংলা ব্যাকরণে প্রত্যয় ও উপসর্গ যোগে বাংলা শব্দ গঠনের নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হল। যেমন−

তদ্ধিত প্রত্যয়

দার – আড়তদার, ঠিকাদার, হানাদার, রোযাদার, খবরদার, হিসাবদার ইত্যাদি ।

খোর– গাঁজা খোর, তামাক খোর, ঘুষ খোর, চশম খোর ইত্যাদি ।

বাজ– ফাঁকি বাজ, ফন্দি বাজ, চাল বাজ ইত্যাদি।

দান– পিক দান, ছাই দান ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

কম– কম জোর, কম বখ্ত, কম জাত ইত্যাদি।

উপসর্গ

বে– বে হাত, বেনামি, বে আদব, বে হিসাবি, বে লাজ, বে পরওয়া, বে তমিজ, বে কার, বে শরম ইত্যাদি।

না– না লায়েক, না ছোড়, না বালিগ, না রাজ, না পসন্দ, না পাক, না হক, না চার, না কচ, না কাল ইত্যাদি।

গর– গর মিল, গর হাজিরা ইত্যাদি।

ব– ব কলম, ব নাম, ব হাল, ব দরস্ত, ব তারিখ, ব দখল, ব জাবেদা ইত্যাদি।

ফি– ফি বছর, ফি হিসাব ইত্যাদি।

তদ্ধিত প্রত্যয় ও উপসর্গযোগের ফারসি মিশ্রিত বাংলা শব্দগুলো ব্যাকরণসম্মত। এসব শব্দ যে ফারসি দ্বারায় মিশ্রিত তা গভীরভাবে মনোনিবেশ ব্যতীত বুঝা সম্ভব নয়।[১৩১] কেননা, শব্দের মধ্যে ব্যবহারের কোনো তারতম্য দেখা যায়না। সহজেই অন্য দশটি শব্দের ন্যায় এ শব্দগুলো বাংলায় ব্যবহৃত হচ্ছে। আঞ্চলিক শব্দেও ফারসি ভাষার প্রভাব রয়েছে। প্রথমত গ্রামের সাধারণ মানুষ যে ভাষায় কথা বলে তা ব্যাকরণ ও মান সম্মত হয়না। অতীতে গ্রামে যে শব্দটি ঠিক যেভাবে সাধারণ মানুষ ব্যবহার করত এটিই সে গ্রামের আঞ্চলিক ভাষা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। বাংলা ভাষার অংশবিশেষ আঞ্চলিক ভাষাসমূহের মধ্যে ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেটের ভাষা প্রসিদ্ধ। এ ছাড়া দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ভাষাগুলোতে বহু ফারসি শব্দ ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ হিসেবে নিম্নে তিনটি অঞ্চলের ভাষা প্রদত্ত হল:

**ময়মনসিংহ অঞ্চলের ভাষা:** যেমন–পিরহান (জামা), বদনা, (পানির বাসন) মুসলমানি (খৎনা অর্থে), দরদি (মর্ম্ম বুঝে এমন লোক), আলাম কালাম (আল্লাহর কথা), পায়জামা, কমজাত, ইত্যাদি।[১৩২]

**সিলেট অঞ্চলের ভাষা :** যেমন– দামান্দ্ (জামাই), বিকরীদার (বিক্রেতা), পাও (পা), আক'ল (বুদ্ধি), পায়াস (পায়েস), পুলাও (পোলাও), হপ্তা (সপ্তাহ), বইদা (ডিম), ব্যাত্তমিজি (বেয়াদবি), মইদান (ময়দান) ইত্যাদি।[১৩৩]

**চট্টগ্রামি ভাষা:** যেমন– তহশ (সাবধান), আনাজ (তরিতরকারি), বহুত সেয়ানা (চালাক অর্থে), হাজির (উপস্থিত), হক্কলত্তুন (সবাই), নাইওর (নবাগত), দাগা (ফাঁকি), নাখান্দা (অশিক্ষিত), লালচ (লোভ) ইত্যাদি।[১৩৪]

অন্য কোনো সম্পর্ক বা প্রভাবের ভিত্তিতেও ফারসি শব্দ বাংলা ভাষার মধ্যে সংমিশ্রণ হতে পারে। যে সব ফারসি শব্দ আধুনিক বাংলা শব্দকোষে স্থান করে আছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল *চলন্তিকা*

Dhaka University Institutional Repository

অভিধান। তাতে চলমান ব্যবহৃত কিছু সংখ্যক ফারসি শব্দ রয়েছে। শ্রীযুত রাজশেখর বসু মহাশয় চলন্তিকা প্রণয়নে ফারসি শব্দের স্থান করে দিয়েছেন।[১৩৫] এটির উদ্দেশ্য বাঙালি মুসলমানদেরকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করার জন্যই তাঁর চেষ্টা ছিল কী না জানা যায়নি। অবশ্য তিনি শুধুমাত্র সুপরিচিত ফারসি শব্দগুলো তার শব্দকোষে স্থান করে দেন। বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধানেও অসংখ্য ফারসি শব্দ রয়েছে। উল্লেখের কারণ হল, শব্দগুলোর ব্যবহারের মাত্রা বৃদ্ধি ও স্বাভাবিকভাবে বাংলা ভাষায় দখল।[১৩৬] আমরা তা থেকেও ফারসি শব্দগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করে নিতে পারি। একটি মিশ্র বা যৌগিক ও অন্যটি সহজ-সরল শব্দ।

মিশ্র শব্দগুলো অনেক ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যিকরা ব্যবহার করেছেন। ফারসি-ফারসি, ফারসি-বাংলা, ফারসি-আরবি শব্দের মাধ্যমে একটি অর্থ প্রকাশ পেয়েছে। তাঁদের প্রয়োজনে এ সব শব্দ সাহিত্যে ব্যবহার হয়।

**মিশ্র শব্দ**

| শব্দের গঠনরূপ | শব্দ | বাংলা | অর্থ |
|---|---|---|---|
| گل+بهار | گلبهار | গুলবাহার | বুটিদার শাড়ি বিশেষ। |
| گل+نقشه | گلنقشه | গুলনকশা | চিকনের ফুল-তোলা কাজ। |
| گل+تراش | گلتراش | গুলতরাশ | যারা কাগজ কেটে ফুল তৈরি করে। |
| گل+رخ | گلرخ | গুলরুখ | যার গন্ডদেশ গোলাপের ন্যায় রঙিন। |
| کرسی+نامه | کرسینامه | কুরছিনামা | বংশ তালিকা এমন। |
| غیر+حاضر | غیرحاضر | গর-হাজির | উপস্থিতের অভাব এমন। |
| گم+تلاش | گم تلاش | গুম তালাশ | নিখোঁজ জিনিষের খোঁজ খবর। |
| نیم + راضی | نیم راضی | নিমরাজি | প্রায় সম্মত। |
| তদ্+درون | তদ্দরুন | তদ্দরুন | সেই নিমিত্ত। |
| কাল +قانون | কাল কানুন | কালা কানুন | অন্যায় আইন। |
| گور+আজাব | গোর আজাব | গুরআজাব | কবরের যন্ত্রণা। |
| نو+مسلم | نومسلم | নওমুসলিম | নব দীক্ষিত মুসলমান। |
| ب+تایخ | بتاریخ | বাতারিখ | তারিখ অনুযায়ী। |
| بد+রুচি | বদরুচি | বদরুচি | নিম্ন স্তরের রুচি। |

Dhaka University Institutional Repository


| | | | |
|---|---|---|---|
| کار+سازی | کارسازی | কারসাজি | চালাকি, ছলচাতুরি। |
| نو+شاه | نوشاه | নওশাহ | নতুন শাহ বা বাদশাহ। |
| خون+خرابی | خون خرابی | খুনখারাবি | হত্যাকাণ্ড এমন। |

সমাজে যে শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে এর পরিচয় অনেকের নিকট অজ্ঞাত। প্রতি নিয়ত যেভাবে আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলছি সকল শব্দই যে খাঁটি বাংলা হবে এমনটি নয়। সংস্কৃত বা ইংরেজি শব্দ বলছি। আমরা ভিন দেশীয় শব্দ বলে কখনই অনুভব করি না যে, এটি ফারসি ভাষার শব্দ, বাংলা নয়। বাংলা ভাষার সাথে যে পরিমাণ ফারসি শব্দ ব্যবহার করছি তা সহজ সরলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। অনিচ্ছায় ও অবহেলায় সমাজে সবসময় ব্যবহার হয় এমন কয়েকটি শব্দ উপস্থাপন করা হল।

**সহজ সরল শব্দ**

| ফারসি | ফারসি উচ্চারণ | বাংলা |
|---|---|---|
| شربت | শারবাত | শরবত |
| عادت | অ'দাত | আদত |
| گرم | গারম | গরম |
| استر | আস্তার | আস্তর |
| پسند | পাছান্দ | পছন্দ |
| جامه | জা'মে | জামা |
| جان | জা'ন | জান |
| جنگل | জাঙ্গাল | জঙ্গল |
| داغ | দা'গ্ব | দাগ |
| خوب | খোব | খুব |
| دم | দাম | দম |
| گل | গোল | গুল |
| گوشت | গোশত | গুস্ত |
| خوشی | খোশি | খুশি |
| خون | খোন | খুন |

Dhaka University Institutional Repository


| | | |
|---|---|---|
| خوراک | খোরা'ক | খুরাক |
| غصه | গোস্‌সেহ | গুস্‌সাহ |
| انگور | আঙ্গুর | আঙ্গুর |
| پسته | পেস্তে | পেস্তা |
| دانه | দা'নে | দানা |
| زور | যূর | জোর |

বাংলা ও ফারসি ভাষার যে বর্ণমালা রয়েছে সংখ্যার দিক দিয়ে দু'টির ব্যবধান বেশি দূরে নয়। ফারসি ভাষার বর্ণ সংখ্যা রয়েছে বত্রিশটি। বাংলা ভাষায় স্বর ও ব্যাঞ্জন বর্ণ মিলে পঞ্চাশটি বর্ণ রয়েছে।[১৩৭] দু'টি ভাষার বর্ণমালার রূপ ও আঙ্গিক একেবারেই ভিন্ন। বাংলার লিখনরীতি বাম দিক থেকে শুরু হলেও ফারসি ভাষার লিখনরীতি ডান দিক থেকে শুরু হয়েছে। ফারসি ভাষার শব্দ গঠনে কোনো কোনো অক্ষর অর্ধেক বা তার কম অংশ গ্রহণ করে শব্দটি লেখা হয়।[১৩৮] বাংলা লেখার ক্ষেত্রে পূর্ণ অক্ষরটিই লেখতে হয় যা ফারসি লিখনরীতির বিপরীত। আমরা দু'টি ভাষার লিখনরীতিতে কিছুটা পার্থক্য দেখতে পাই। তবে পৃথক বর্ণমালা দিয়ে সৃষ্টি শব্দগুলো কিভাবে বাংলা ভাষায় ও বাংলা বাক্যে মিশে গেল– তা ভাষা সম্পর্কের উন্নতি ও সম্পর্কেরই একটি স্পষ্ট আলামত। স্বভাবত একই গোষ্ঠীর মধ্যে দু'টি ভাষা লিখনরীতিতে এক থাকবে এমনটি ভাষাবিদরা সমর্থন করেননা। লিখনরীতি ভিন্ন থাকার কারণেও ফারসি শব্দগুলো বাংলা ভাষায় স্থান করে নেয়া চমৎকার সম্পর্কের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

## বাংলা ভাষায় ফারসি শব্দের ব্যবহার

ফারসি ভাষাটি বাংলা ভাষার ন্যায় আর্য গোষ্ঠীর শাখা থেকেই নির্গত হয়েছে। বাংলা ও ফারসি ভাষা ভিন্ন কোনো শাখার অর্ন্তগত নয়। একটি প্রাচীন ফারসি থেকে আধুনিক ফারসি অপরটি বৈদিক সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষার রূপ পেয়েছে। ভাষাবিদদের মতে, এ দু'টি ভাষা এত কাছাকাছি যে, একই ভাষার দু'টি উপভাষা বললেও কারো আপত্তি থাকার কথা নয়।[১৩৯] নিম্নে ব্যবহারের একটি চিত্র তুলে ধরা হল:

**ব্যবহারের নমুনা**

| ফারসি শব্দ | উচ্চারণ | বাংলা শব্দ | বাংলায় ব্যবহার |
|---|---|---|---|
| آسمان | অ'সমান | আসমান | কত বড় আসমান। |

Dhaka University Institutional Repository

| | | | |
|---|---|---|---|
| آیین | অ'য়ীন | আইন | দেশে আইন-আদালত রয়েছে। |
| اندازه | আন্দা'যে | আন্দাজ | আন্দাজ মত কাজ কর। |
| بالش | বা'লিশ | বালিশ | বালিশটা আন সেলাই করি। |
| نالش | না'লিশ | নালিশ | নালিশ করে লাভ নেই। |
| آفت | অ'ফাত | আপদ | কত আপদ বিপদ আছে। |
| بهانه | বাহা'নে | বাহানা | বাহানা করে লাভ নেই। |
| بیچاره | বীচা'রে | বেচারা | বেচারা আর কী করবে। |
| پایه | পা'য়ে | পায়া | এটা তো ভাঙ্গা পায়া। |
| جنگی | জা'ঙ্গী | জঙ্গি | সে জঙ্গি শিবিরে ছিল। |
| امانت دار | আমা'নাত দা'র | আমানতদার | সে খুব আমানতদার লোক। |
| بی حساب | বী হেসা'ব | বেহিসাব | তুমি একটা বেহিসাবি পুরুষ! |
| بی ادب | বী আদাব | বেয়াদব | ছেলেটা বড় বেয়াদব। |
| سبزه | সাবযেহ | সব্জি | সব্জির চাষ কর। |
| دنیا | দোনিয়া' | দুনিয়া | দুনিয়াটা কত বড়। |
| گردن | গারদান | গর্দান | তোমার গর্দান কাটা যাবে। |
| گرفتار | গেরেফতা'র | গ্রেফতার | সে গ্রেফতার হয়েছে। |
| گلاب | গোলা'ব | গোলাপ | একটু গোলাপজল নিয়ে এস। |

এ ছাড়া দু'টি ভাষার মধ্যে বাক্যের ব্যবহার ও ব্যাকরণের যে মিল রয়েছে তা ভাষা-সংস্কৃতির সম্পর্কের ক্ষেত্রে কম গুরুত্ব রাখে না। আমরা বাংলা ব্যকরণের সাথে মিলের কয়েকটি দিক নিয়ে ব্যাখ্যাদানের প্রয়োজন মনে করছি। সাধারণত ফারসি শব্দের লিঙ্গ পরিবর্তন অতিরিক্ত কোনো বর্ণের মাধ্যমে হয়না। যেমনটি আরবি ভাষায় ঘটে থাকে। বাংলা ভাষায় লিঙ্গ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ফারসির ন্যায় একই নিয়ম বিদ্যমান রয়েছে। ফারসি ভাষায় সর্বনাম যেমন- تو (তো), شما (শোমা')। এর অর্থ হলো তোমি, তোমরা। তোমি, তোমরা- এ দু'টি শব্দে পুরুষ ও মহিলা উভয় জনকে বুঝানো হয়ে থাকে। তাতে পৃথক কোনো প্রত্যয় যোগ করা হয়না। বাংলা ভাষায় তোমি ও তোমরার মধ্যে পুরুষ মহিলা অর্ন্তভূক্ত রয়েছে। ফারসি ভাষায় যেমন- این کتاب (ঈন কেতা'ব), این کار (ঈন কা'র) ইত্যাদি। তেমনি বাংলা ভাষায় কাউকে সম্ভোধন করে বলি- এই বইটি, ঐ টি। সেক্ষেত্রেও ফারসি ও বাংলায় ব্যবহার একইভাবে পাওয়া যায়। বিশেষ্য ও বিশেষণের ব্যবহারের ক্ষেত্রে একই

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ম বাংলা ভাষায় রয়েছে। যেমন– ভাল মানুষ/ نیک مرد (নিক মারদ), সুন্দর চেহারা/ خوب صورت ( খুব সূরাত) প্রভৃতি। এ ক্ষেত্রে পার্থক্য হল, বাংলা ভাষায় বিশেষণটি প্রথমে এবং ফারসি ভাষায় বিশেষণটি বিশেষ্যের পরে বসে। তারতম্য ও অধিকতর বুঝানোর জন্য ফারসি শব্দ ব্যবহারের ন্যায় বাংলা ভাষা ব্যবহার হয়। যথা– অনেক ভাল/ بهترین (বেহতরিন), বেশি খারাপ/ بدترین (বদতারিন) ইত্যাদি।[১৪০] উল্লিখিত উদাহরণে ব্যাকরণগত মিলের একটি সাধারণ ধারণা উপস্থাপন করা হয়েছে।

## বাংলা ভাষার উন্নয়নে সুলতানদের ভূমিকা

মধ্যযুগে (১২০০ খ্রি.-১৮০০ খ্রি.) ফারসি ভাষা এ অঞ্চলের সুলতানদের দরবারি ভাষা হিসেবে খ্যাত হয়ে আছে। এ রাজ ভাষার সাথে বাংলা ভাষারও কদর কম ছিলনা। এক সময় যে ভাষাটি সমাজের উচ্চ শ্রেণির একটি গোষ্ঠী অবহেলা করে চলত। সে ভাষাটিই সুলতানগণ লালন করতে শুরু করেন, এটি কম গৌরবের কথা নয়।[১৪১] এ কথা সত্য যে, মুসলমান শাসকগণ ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন আজীবন পর্যন্ত। বাংলা ভাষার উন্নয়নেও তাঁরা ভূমিকা রেখেছেন। এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমধর্মী সুলতান নুসরাত শাহ্, হোসেন শাহ্, পরাগল খাঁ ও ছুটি খাঁর অবদান অপরিসীম। তাঁরা ফারসি ভাষার সাথে বাংলা ভাষার উন্নয়ন করেছিলেন। বাংলা ভাষাকে কখনই পরিত্যাগ করে কৃতিত্বের পরিচয় দেননি বরং যথাভাবে সমৃদ্ধির জন্য তাঁরা চেষ্টা করে গিয়েছেন।[১৪২] ফারসি ভাষার সাথে বাংলা ভাষার সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে সুলতানদের অবদান রয়েছে অনেক। এটা বাঙালিদের জন্য সৌভাগ্য যে, বিদেশি তুর্কি ও মুঘল বাদশাহদের হাতে বাংলা ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও উন্নতি ঘটেছে। এই বাংলাভাষী অঞ্চলে সংস্কৃত ভাষা হত সরকারি ভাষা। সে স্থানে ফারসি সরকারি ভাষা হিসেবে স্থান দখল করে নেয়। কখনই বাংলা ভাষার স্বাদ বাঙালিরা পেত না যদি বিদেশি তুর্কি সুলতানরা এ ভাষার উন্নতির জন্য সুদৃষ্টি দান ও উদারতার পরিচয় তুলে না ধরতেন।[১৪৩] এ প্রসঙ্গে গবেষক ড. আহমদ শরীফ বলেন, 'মধ্যযুগের বাঙলা ভাষা সাহিত্য বাঙালি মুসলমানের বিশেষ গর্বের অবলম্বন হতে পারে। কেননা এ ভাষার ও সাহিত্যের চর্চায় বাঙালিকে প্রবর্তনা দেন সুলতান-সুবাদার।'[১৪৪] বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য সুলতানদের ভুমকা নিঃসন্দেহ প্রসংশনীয়।

## বাঙালির বাংলা ভাষা

বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে দাপ্তরিক ফারসি ভাষাকে রহিত করে ইংরেজির প্রবর্তন করা হলেও শিক্ষা ও সভ্যতা সংস্কৃতির ভাষা হিসেবে ফারসি ভাষাকে একবারে ওঠিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি।

Dakha University Institutional Repository

এ ভাষাটি মধ্যযুগে (১২০০ খ্রি.-১৮০০ খ্রি.) হিন্দু সুমলিম নির্বিশেষে সকল বাঙালির নিকট প্রিয় ভাষা ছিল। ঠিক একইভাবে ইংরেজ যুগেও সকল শ্রেণি মানুষের মাঝে এটি প্রতিষ্ঠিত থাকে।[১৪৫] বাংলা ভাষা নিয়ে আধুনিক বাংলাভাষীদের মাঝে যে চিন্তার বিকাশ দেখা যায় তা ফারসি ভাষার শব্দকে পরিত্যাগ করে নয়। তাঁদের মতে, ভিন্ন ভিন্ন জাতির শব্দ নিয়ে বাংলা ভাষার উন্নয়ন হয়েছে। তাই বাংলা ভাষায় আগমনকৃত ফারসি শব্দগুলোকে বিশাদের চোখে দেখা ঠিক হবেনা। বরং বাংলা ভাষার সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বৃদ্ধির জন্য এরূপ শব্দ গ্রহণ বাঞ্ছনীয় এবং শোভনীয়।[১৪৬] প্রমথ চৌধুরীর নিকট আরবি ফারসি মিশ্রিত বাংলা ভাষার ব্যবহার জানতে চাওয়া হলে তিনি একই মন্তব্য করেন। বরং তাঁর মতে, আরবি ফারসি শব্দ ব্যবহার করলে বাংলা ভাষার প্রকৃতরূপ প্রকাশ ঘটবে।[১৪৭] এককালে কবি রবীন্দ্রনাথের সাথে যারা বাংলা ভাষা নিয়ে পত্রালাপ করতেন তাঁদের মধ্যেও এ প্রবণতা ছিল যে, ফারসি শব্দকে বাদ দিয়ে বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি নয়। বরং যে স্থানে যে ফারসি শব্দের ব্যবহার মানানসই হয়েছে সেখানে সে শব্দই ব্যবহার করা উচিৎ।[১৪৮] আধুনিক কালের অনেকে বাংলা ভাষায় ফারসি শব্দের ব্যবহার ও বাংলা ভাষার সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে ফারসি শব্দের প্রভাবকে যথেষ্ট মনে করেন। এ প্রসঙ্গে মুহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ বলেন, ‘ফারসী সাহিত্যধারার সংস্পর্শে বাংলা সাহিত্যে শুধু বিষয়বস্তুর দিক থেকেই সমৃদ্ধ হয় নি ভাষা সম্পদেও তা গরীয়ান হয়েছে।’[১৪৯] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ থেকে শুরু করে আধুনিক যুগেও বাংলার সাথে ফারসির সম্পর্ক ও প্রভাবের বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে তিনি বাংলা বানানে ফারসি হরফের উচ্চারণের ক্ষেত্রে বিরোধ করেছেন যা অনেকেই তাঁর যুক্তি গ্রহণ করেন নি।[১৫০] বাংলা ভাষার গবেষকগণ মনে করেন যে, বাংলা ভাষার সাথে ফারসি ভাষার সম্পর্ক এক দিনের সৃষ্টি নয় বরং তা বহু দিনের। তা না হলে মধ্যযুগে বাংলা ভাষা নতুন রূপ পেত না। বরং অনেক শব্দ সংস্কৃত নির্ভর হত। বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ভাবধারা সৃষ্টির জন্য আরবি ফারসি শব্দের ব্যবহার কখনই নিষিদ্ধ ছিলনা। এমনকি আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও ফারসি শব্দ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়।[১৫১] ১২০৩ খ্রিস্টাব্দের পর বাঙালি সমাজ এক নতুন সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। সেই সংস্কৃতির বাহন ছিল আরবি ফারসি ভাষা। সেই ফারসি ভাষার মাধ্যমে অনেক আরবি শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ লাভ করেছে।[১৫২] যার ফলে আমরা বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে (১২০০ খ্রি.-১৮০০ খ্রি.) ফারসি ভাষার শব্দ ছাড়াও ফারসির মাধ্যমে প্রবেশকৃত আরবি শব্দের আধিক্য অনুভব করি।

উল্লিখিত আলোচনায় বাংলা ও ফারসি ভাষার সাথে সর্ম্পকের বিষয়টি পরিস্কারভাবে ফুটে ওঠেছে। বাংলা ভাষায় যে সব শব্দ ফারসির সেগুলো একদিনে প্রবেশ করেনি। বহু পূর্ব থেকে ক্রমে ক্রমে

বাংলা ভাষায় সে শব্দগুলো স্থান করে নিতে থাকে। বিশেষত রাজকার্যের ভাষা ফারসি হওয়ায় বাংলা ভাষায় ফারসি শব্দ প্রবেশের একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়। যে কারণে বাংলা ভাষায় ফারসি শব্দ ব্যবহারের বাধা থাকেনি। বলতে দ্বিধা নেই যে, বাংলা ও ফারসি ভাষার মধ্যে সম্পর্কের ফলে শুধু আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতিকে নয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন করেছে যা যুগ যুগ ধরে অটুট থাকবে।

টীকা ও তথ্য নির্দেশ

১. খানলরি, পারভেজ নাতেল, *তারীখে যাবানে ফারসি,* এন্তেশারাতে বুনিয়াদে ফারহাঙ্গ, তেহরান, ২য় প্রকাশ, ১৩৪৯ হি.শা., পৃ. ১৪৬।

২. গোস্বামি, কৃষ্ণপদ, *বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস*, ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন, কলিকাতা, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৩, পৃ. ৯।

৩. হাই, মুহম্মদ আব্দুল, *ভাষা ও সাহিত্য,* ইষ্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রন ১৩৭০, পৃ. ১২২।

৪. সেন, শ্রী মুরারি মোহন, *ভাষার ইতিহাস (দ্বিতীয় পর্ব),* এস ব্যাণার্জি এণ্ড কোং, কলিকাতা, ১৯৯১, পৃ. ৫।

৫. পৃথিবীর ভাষাবংশ: পৃথিবীতে যে সব ভাষার উদ্ভব ঘটেছে অনেক ভাষা স্ব স্ব জাতির মাধ্যমে সংরক্ষিত হয় নি। কোন ভাষা কত বছর প্রতিষ্ঠিত ছিল সে ব্যাপারেও ভাষাবিদরা নিশ্চিত নন। তবে পৃথিবীতে ২৭৯২ টি বা তার চেয়ে বেশি ভাষা চালু আছে। এ সকল ভাষা একটি নিয়ম ও পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত।- খানলরি, পারভেজ নাতেল, *তারীখে যাবানে ফারসি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৫।

৬. রামেশ্বর শ', ডক্টর, *সাধারণ বাংলা ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*, পুস্তক বিপণি, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ১৪০৬, পৃ. ৫৩১; চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, *বাঙ্গলা ভাষা প্রসঙ্গে,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬ ও খানলরি, পারভেজ নাতেল, *ওয়াযনে শে'রে ফারসি,* এন্তেশারাতে দানেশগাহে তেহরান, ১৩৩৭ হি.শা., পৃ. ১৬।

৭. সেন, শ্রী মুরারি মোহন, *ভাষার ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪; খানলরি, পারভেজ নাতেল, *ওয়াযনে শে'রে ফারসি,* পূর্বোক্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫।

৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী সত্যরঞ্জন, *সংস্কৃত ভাষাতত্ত্ব,* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ২০০৫, পৃ. ৮; খানলরি, পারভেজ নাতেল, *ওয়াযনে শে'রে ফারসি,* পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫।

৯. গোস্বামি, কৃষ্ণপদ, *বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১।

১০. রামেশ্বর শ', ডক্টর, *সাধারণ বাংলা ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩৭।

১১. কাসেমি, মোহসেন আবুল, *তারিখে মুখতাসারে যাবানে ফারসি*, ইন্তেশারাতে তুহুরি, তেহরান, ৫ম প্রকাশ ১৩৮৯ হি.শা., পৃ. ১৭।

১২. রামেশ্বর শ', ডক্টর, *সাধারণ বাংলা ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩৭।

১৩. *বেহযাদি, রোকায়েহ, অরইয়াহা ওয়া না অরইয়াহা দার চাশমে আন্দাযে কোহনে তারিখে ইরান*, ইন্তেশারাতে তুহুরী, তেহরান, ১৩৭৩ হি.শা., পৃ. ১১৩।

Dhaka University Institutional Repository

১৪. Encyclopaedia Board, *The New Encyclopaedia Britannica*, Encyclopaedia Britannica, inc, 1953, p. 296.; খানলরি, পারভেজ নাতেল, *ওয়াযনে শে'রে ফারসি, পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬।

১৫. গোস্বামি, কৃষ্ণপদ, *বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১।

১৬. খানলরি, পারভেজ নাতেল, *ওয়াযনে শে'রে ফারসি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬।

১৭. তাফাজ্জলি, আহমদ, *তারিখে আদাবিয়্যাতে ইরান পেশ আয ইসলাম*, এন্তেশারাতে সুখান, তেহরান, তৃতীয় প্রকাশ, ১৩৭৮ হি.শা., পৃ. ১১।

১৮. খানলরি, পারভেজ নাতেল, *তারীখে যাবানে ফারসি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৪।

১৯. নায়া, হাসান পীর, তারিখে ইরান কাবল আয ইসলাম, *তারিখে কামেলে ইরান*, মোয়াসেসে এন্তেশারাতে নিগাহ, তেহরান, ১৩৯০ হি.শা., পৃ. ২৮।

২০. ঈলামি ও অরামি: ঈলামি (عیلامی) : একটি জাতির নাম। ইরানি জাতি ঈলামিকে খোজা বলে অভিহিত করত। খোজেস্তানে তাঁদের বসবাস ছিল বলে সে দিকে সম্বোধন করা হয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব ২৪০০ সনে এ জাতির মধ্য থেকে বাদশাহ নির্বাচন হয়। বাদশাহ ঈলামি ভাষা ব্যবহার করতেন। - বেহযাদি, রোকায়েহ, *অরইয়াহা ওয়া না অরইয়াহা দার চাশমে আন্দাযে কোহনে তারিখে ইরান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮।

অরামি (آرامی): অরামি জাতিটি খ্রিস্টপূর্ব ১৪০০ সনে আরব ভূ-খন্ডে বসবাস করত। হাখামানশি যুগে ঐ সম্প্রদায়ের ভাষা প্রাচীন পারস্যে চালু ছিল।- খানলরি, পারভেজ নাতেল, *তারীখে যাবানে ফারসি*, পৃ. ১৯০।

২১. বেহযাদি, রোকায়েহ, *তদেব*, পৃ. ১৩।

২২. নায়া, হাসান পীর, *তারিখে ইরান কাবল আয ইসলাম*, *তারিখে কামেলে ইরান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬।

২৩. তদেব, পৃ. ২৮।

২৪. বাদাখশানি, মগবুল বেগ, *তারিখে ইরান (প্রথম খণ্ড)*, শফিক প্রেস, লাহুর, ১৯৬৭, পৃ. ১৮।

২৫. ইরান: শব্দটি আর্যরা বহুপূর্ব থেকে ব্যবহার করত। তখন এটি ঈরান ( ایران ),আইরিন (ایرین ) বলেও অভিহিত করত। এ কারণে যে, তাঁদের আবাসভূমি ছিল ইরান।– কাশেমি, মোহসেন আবুল, *তারিখে মুখতাসারে যাবানে ফারসি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭।

২৬. ইরানে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহারের কোনো তথ্য নেই। তবে ইরানিদের মঝে পাঁচটি ভাষা চালু ও ব্যবহারের ইতিহাস রয়েছে। ভাষাগুলো হল: পাহলবি, দারি, খোযি, সুরয়ানি ও ফারসি ভাষা। পাহলবি ভাষাটি রাজ দরবারের ভাষা থেকে শুরু করে জনগনের ভাষা হিসেবে বহুদিন ইস্পাহান, রেই, হামাদান, মা নাহওয়ান্দ ও আযারবাইযান শহরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। দারি ভাষাটি ফারসি ভাষার একটি পুরনো রূপ। খোরাসান ও বালখ শহরের অধীবাসিরা এ ভাষায় কথা বলত। খোজিস্তান অঞ্চলের তাষা ছিল খোযি। যারা আহলে সাওয়াদ হিসেবে পরিচিত তাঁদের ভাষা হল সুরয়ানি।–সাফা, যাবিহুল্লাহ, *তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান ( জেলদে আওয়াল)*, এন্তেশারাতে ফেরদৌস, তেহরান, ১৩৭১ হি.শা., পৃ. ১৪১।

২৭. Chatterji, Suniti Kumar, *Iranianism*, The Asiatic Society, Calcutta, 1972, p. 5.

২৮. ইসলামের দ্বিতীয় ভাষা: ইসলাম ধর্মে ভাষা মূল বিষয় নয়। ফারসি ভাষা একটি জাতির সম্পদ হিসেবে আবির্ভূত হলেও সে জাতিতে ভাষাটি আবদ্ধ থাকেনি। কুরআন ও হাদিসকে ভিত্তি করেই এ ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব। এ ভাষার মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম বিস্তার লাভের ফলে অন্য জাতিদেরও ভাষা হয়ে ওঠে। ফলে আফগানিস্তানে পশ্তু,

Dhaka University Institutional Repository

ইরাক, সিরিয়া ও তুরস্কে তুর্কি, পাকিস্তানে বেলুচি ও পশ্‌তু এবং তাজিকিস্তানে তাজিকি ও আবেস্তায়ি ভাষা ফারসি ভাষার অনুরূপ ভাষা হিসেবে চালু রয়েছে। এ ভাষাগুলো মূলত ফারসি ভাষার সাথে সম্পর্ক রাখে। – মুতাহ্‌হারি, আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা, *ইসলাম ও ইরানের পারস্পরিক অবদান*, (অনুবাদক আনোয়ারুল কবীর) ঢাকাস্থ ইরান কালচারাল সেন্টার, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৫৭।

২৯. Browne, E. G. *A Literary History of Persia V.-1*, Cambridge at the University Press, Great Britain, 1929, PP. 7-8.

৩০. দ্রষ্টব্য-Bailey, H. W.. The Persian Language, *The Legacy of Persia*, Arberary, A. J., (Editor) Oxford at the Clarendon Press, 1968, PP. 197-198.

৩১. শাফাক, রেজা যাদেহ, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, এন্তশারাতে দানেশগাহে পাহ্‌লাভি, তেহরান, ১৩৫২, পৃ. ২৮; খানলরি, পারভেজ নাতেল, *তারীখে যাবানে ফারসি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০০।

৩২. ইয়াহাকি, মুহম্মদ জাফর, *কুল্লিয়াতে তারিখে আদাবিয়াতে ফারসি*, সাযেমানে ইরান, তেহরান, ১৩৮৯ হি.শা., পৃ. ৯।

৩৩. খানলরি, পারভেজ নাতেল, *তারীখে যাবানে ফারসি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৩; তাফাজ্জলি, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান পিশ আয ইসলাম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩।

৩৪. সোবহানি, তওফিক, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯।

৩৫. খানলরি, পারভেজ নাতেল, *ওয়াযনে শে'রে ফারসি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৩; কাশেমি, মোহসেন আবুল, *ওয়াযেগানে যাবানে ফারসি দারি*, এন্তেশারাতে তুহুরি, তেহরান, ১৩৯০ হি.শা. পৃ. ১১।

৩৬. খানলরি, পারভেজ নাতেল, তদেব, পৃ. ২০৪ ; তাফাজ্জলি, *তারিখে আদাবিয়্যাতে ইরান পিশ আয ইসলাম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩।

৩৭. কাসেমি, আবুল, *ওয়াযেগানে যাবানে ফারসি দারি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১; কাসেমি, আবুল, *তারিখে মুখতাসারে যাবানে ফারসি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০।

৩৮. খোদাইকৃত লিপি: ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রচীন নিদর্শন হলো বিভিন্ন প্রস্তরের উপর খোদিত লিপি। 'কোহে বিস্তুন' ও 'তাখ্‌তে জামশিদ'-এ একদি, অরামি ও ঈলামি ভাষার খোদিত লিপি রয়েছে। ভাষাগুলো ঐ সময়ে প্রচলন থাকার অন্যতম প্রমাণ। ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসে খোদিত লিপিগুলো کتیبه اریارمنه، کتیبه ارشام، کتیبه های داریوش، کتیبه های بیستون، کتیبه های فارس کتیبه کورش، প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ। -তাফাজ্জলি, আহমদ, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান পেশ আয ইসলাম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫।

৩৯. তদেব, পৃ. ২৪।

৪০. খানলরি, *তারীখে যাবানে ফারসি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৪; তদেব, পৃ. ১১ ও ৩৫।

৪১. খানলরি, তদেব, পৃ. ২১৪; তদেব পৃ. ৩৬।

৪২. অরাল সাগর: যেখানে পানি জমাটবাঁধা অবস্থায় বিদ্যমান থাকত। এটি মধ্য এশিয়ার উযবেকিস্তানের দক্ষিণ ও কাযাকিস্তানের উত্তরে অবস্থিত। অতীতে পৃথিবীর চারটি বড় সাগরের মধ্যে এটি ছিল অন্যতম। বর্তমানে পানির প্রবাহ কমে যাওয়ায় তার শ্রেষ্ঠত্ব বিলীন হয়ে পড়েছে। সেখানে খোয়ারিযম অঞ্চল প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। –খানলরি, *তারীখে যাবানে ফারসি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০১।

Dhaka University Institutional Repository

৪৩. কাসেমি, *ওয়াযেগানে যাবানে ফারসি দারি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২।

৪৪. খানলরি, *তারীখে যাবানে ফারসি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০১; তদেব, পৃ. ১০।

৪৫. খানলরি, তদেব, পৃ. ২০১।

৪৬. যামারাদি, হোমায়রা, *তারিখে তাহ্‌লিলি যাবানে ফারসি*, এন্তেশারাতে দানেশগাহে তেহরান, তেহরান, ১৩৯০ হি.শা., পৃ. ৬১।

৪৭. সোবহানি, তওফিক, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, এন্তেশারাতে জাওয়ার, তেহরান, ১৩৮৮ হি.শা., পৃ. ৩৭।

৪৮. খানলরি, *তারীখে যাবানে ফারসি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৩।

৪৯. এ সম্পর্কে ভাষাবিদ খানলরি তাঁর *তারীখে যাবানে ফারসি* গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভাষা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাতে স্পষ্টত ফারসি ভাষার সাথে অন্য ভাষার পার্থক্য তুলে ধরা হয়। দেখুন– খানলরি, *তারীখে যাবানে ফারসি*, পূর্বোক্ত। 467536

৫০. খানলরি, *তারীখে যাবানে ফারসি*, তদেব, পৃ. ২০০ ; কাশেমি, *ওয়াযেগানে যাবানে ফারসি দারি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪।

৫১. যামারাদি, *তারিখে তাহ্‌লিলি যাবানে ফারসি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১; তাফাজ্জলি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২।

৫২. সোবহানি, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮।

৫৩. খানলরি, *তারীখে যাবানে ফারসি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৭।

৫৪. কাসেমি, মোহ্‌সিন আবুল, *তারীখে মুখতাসারে যাবানে ফারসি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫।

৫৫. তদেব, পৃ. ৭২।

৫৬. সোবহানি, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮; কাসেমি, মোহসেন আবুল, *ওয়াযেগানে যাবানে ফারসি দারি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪।

৫৭. হক, দানীউল, *ভাষা বিজ্ঞানের কথা*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০২, পৃ. ৩৫৬।

৫৮. শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ, *বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ২৩।

৫৯. গোস্বামি, *বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১।

৬০. মধ্য ও আধুনিক আর্য ভাষাগুলো নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করেই গঠিত হয়েছে। বহুদিন ধরে ভাষাগুলোর ব্যবহার ও স্থায়িত্বলাভ ছিল। ভারতেই আর্য ভাষা বহু ভাষার জন্ম দেয়। বাংলা ভাষা গবেষকগণ প্রচলিত বারটি আধুনিক আর্য ভাষা ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন। ত্রিশটির অধিক ভারতীয় আধুনিক ভাষা রয়েছে। এ ভাষাগুলো আধুনিক আর্য উৎস ভাষা। এ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন– রামেশ্বর শ', রচিত *সাধারণ বাংলা ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*, পূর্বোক্ত।

৬১. ভাষাতাত্ত্বিক মতে, বাংলা ভাষার উৎস হল প্রাচীন ভারতীয় আর্য। সেই আর্য থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হতে অনেক সময় অতিক্রম করতে হয়েছে। নব্য ভারতীয় আর্য থেকে যে ভাষাগুলোর উদ্ভব ঘটেছে তন্মধ্যে বাংলা ভাষা অন্যতম। এ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন– গোস্বামি, *বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস*, পূর্বোক্ত।

৬২. রামেশ্বর শ', ডক্টর, *সাধারণ বাংলা ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০১।

৬৩. হক, কাজী রফিকুল (সংকলক ও সম্পাদক), *বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ভূমিকা- ষোল।

Dhaka University Institutional Repository

৬৪. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, *বাঙ্গলা ভাষা প্রসঙ্গে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪০।

৬৫. গোস্বামি, *বাংলা ভাষা তত্ত্বের ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১০।

৬৬. কাদেরি, হাকিম সায়্যেদ শামছুল্লাহ, *উরদুয়ে কাদিম*, জেনারেল পাবলিসিং হাউস রোড, করাচি, ১৯৬৩, পৃ. ৩৩।

৬৭. মুহম্মদ, কাজী দিন, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ৮৫।

৬৮. হক, দানীউল, *ভাষা বিজ্ঞানের কথা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৫; খানলরি, *তারীখে যাবানে ফারসি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৫।

৬৯. রামেশ্বর শ', *সাধারণ বাংলা ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০৭।

৭০. তদেব, পৃ. ৬০।

৭১. সোবহানি, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭।

৭২. মুতাহ্হারি, আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা, *ইসলাম ও ইরানের পারস্পরিক অবদান*, (অনুবাদক আনোয়ারুল কবীর) ঢাকাস্থ ইরান কালচারাল সেন্টার, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৫৮।

৭৩. কাসেমি, আবুল, *তারিখে মুখতাসারে যাবানে ফারসি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৩।

৭৪. সোবহানি, *তারিখে আদবিয়াতে ইরান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১; বাদাখশানি, মির্যা মকবুল বেগ, *আদাবনামে ইরান*, ইউনির্ভাসিটি বুক এজেন্সি, লাহুর, ১৯৬৫, পৃ. ৪৪।

৭৫. মুকাদ্দম, আহমদ সাফ্ফার, *যাবানে ফারসি ১ম খণ্ড*, শোআরায়ে গোসতারাশে যাবানে আদাবিয়্যাতে ফারসি, তেহরান, ১৩৮৬, পৃ. ৫; ইয়াহাকি, মুহম্মদ জাফর, *কুল্লিয়াতে তারিখে আদাবিয়াতে ফারসি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০।

৭৬. হিলালি, গোলাম মকসুদ, তুর্কীদের বর্ত্তমান বর্ণমালা, *মাসিক মোহাম্মদী*, ঢাকা, পৌষ ১৩৪২, পৃ. ১৯০।

৭৭. আলী, জোলফিকার ও আহমদ, ফকির, আরবী বর্ণমালার ইতিহাস, *মাসিক মোহাম্মদী*, ঢাকা, ২য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা, ফাল্গুণ ১৩৩৫, পৃ. ২৭৯।

৭৮. Browne, E. G., *A Literary History of Persia V.-1*, op.cit, P. 5.

৭৯. Bailey, H. W., The Persian Language, *The Legacy of Persia*, Arberary, A. J., (Editor) op.cit P. 176.

৮০. Bailey, H. W., The Persian Language, *The Legacy of Persia*, op.cit, p. 174.

৮১. প্রাচীন ইরানি জাতি প্রথমে ভাষার আদান প্রদানের জন্য ছবি ও ইশারা-ইঙ্গিতমূলক চিহ্ন ব্যবহার করত। এ সময়ের মিখ, পাহলবি, ও আবেস্তা জাতীয় লিপি কোহে বিস্তুন, নাক্শে রোস্তম, তাখ্তে জামশিদ ও এস্তেখারে বিদ্যমান রয়েছে।

৮২. খানলরি, *ওয়াযনে শেরে ফারসি*, পূর্বোক্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬।

৮৩. ন্যায়রত্ন, রামগতি, *বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব*, চুঁ চুড়া, কলিকাতা, ১৩১৭, পৃ. ১১।

৮৪. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, *বাঙ্গলা ভাষা প্রসঙ্গে*, জিজ্ঞাসা এজেন্সিজ লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ৩৪১।

৮৫. হিলালি, গোলাম মকসুদ, পারসী ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ, *মাসিক মোহাম্মদী*, ঢাকা, ১৩শ বর্ষ ১০ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৪৭, পৃ. ৬৬৮।

৮৬. Encyclopaedia Board, *The New Encyclopaedia Britannica*, Encyclopaedia Britannica, inc, 1953, p. 376.

৮৭. Johnson, Edwin Lee, *Historcal Grammar*, American Book Company, New York, 1917, p. 40 .

Dhaka University Institutional Repository

৮৮. গোস্বামি, *বাংলা ভাষা তত্ত্বের ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৯।

৮৯. মুহম্মদ, কাজী দীন, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ.৭।

৯০. ফজল, আল্লামি আবুল, *আইনে আকবরী ২য় খণ্ড*, মুনশি নাওয়াল কিশোর, লক্ষণৌ, ১৮৯৩, পৃ. ৪৮।

৯১. করিম, আবদুল, *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১৭।

৯২. শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ, *বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৭; Rahim, Abdur, *Social & Cultural History of BengalVol. I*, Pakistan Historical Society, Karachi, 1963, P. 5.

৯৩. আহসান, সৈয়দ আলী, *আমাদের আত্মপরিচয় এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ*, বাড পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৪৯।

৯৪. Karim, Abdul, *Social History of the Muslims in Bengal (Down to A. D. 1538)*, Baitush Sharf Islamic Reserch Institute Chittagong, Chittagong, 2nd Edition 1985, P. 1.

৯৫. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, *বাঙ্গলা ভাষা প্রসঙ্গে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬।

৯৬. সেন, সুকুমার ও সেন, সুভদ্র কুমার, *বাঙালীর ভাষা*, পশ্চিম বঙ্গ বাংলা একাদেমী, কলিকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ৪।

৯৭. *সাহিত্য তত্ত্ব ও বাঙলা ভাষা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১।

৯৮. শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ, *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃ. ৩১।
এ ছাড়া ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সংস্কৃত-সংস্কার ছিলনা। তাঁর নিকট স্পষ্ট যে, সংস্কৃত বাংলার জননী নয়। তদ্ভব শব্দ খাঁটি বাংলা, বাংলা ভাষার উদ্ভব চর্যাপদের পূর্বে হয়েছে।- নওয়াজ, আলি, বাংলা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় ভাষায় সমউপাদান: এর নৃতাত্ত্বিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট, *নিবন্ধমালা*, দ্বাদশ খণ্ড, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণাকেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৩৬৪।

৯৯. শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ, *বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ২১; ন্যায়রত্ন, রামগতি, *বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব*, চুঁচুড়া, কলিকাতা, ১৩১৭ বাং., পৃ. ১১।

১০০. মুহম্মদ, কাজী দীন, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ৮৪।

১০১. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, *বাঙ্গলা ভাষা প্রসঙ্গে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫-১৬।

১০২. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য: চণ্ডিদাশের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য খ্রিস্টীয় চর্তুদশ শতকের বাংলা সাহিত্যের ভাষা প্রয়োগের একটি উজ্জ্বল প্রমাণ।-চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, *বাঙ্গলা ভাষা প্রসঙ্গে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫।

১০৩. সেন, শ্রী সুকুমার, *ভাষার ইতিবৃত্ত*, ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৬৪, পৃ. ১৪৮।

১০৪. শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ, *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪।

১০৫. সেন, শ্রী সুকুমার, *ভাষার ইতিবৃত্ত*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬।

১০৬. শরীফ, আহমদ, *মধ্যযুগে বাঙলা সাহিত্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ১২।

১০৭. ভূঁইয়া, সাইদুর রহমান, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির আর্য উত্তারাধিকারের ইতিকথা, *বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা*, মাঘ -আষাঢ়, একবিংশ-দ্বাবিংশ বর্ষ, ১৩৮৩-৮৪, পৃ. ১০১।

১০৮. হাই, মুহম্মদ আবদুল, *ভাষা ও সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬।

১০৯. মুহম্মদ, কাজী দীন, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫।

১১০. মুহম্মদ, কাজী দ্বীন, তদেব, পৃ. ৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

১১১. তদেব, পৃ. ৬৬।

১১২. তদেব, পৃ. ৭৪।

১১৩. ন্যায়রত্ন, রামগতি, *বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬।

১১৪. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, *বাঙ্গলা ভাষা প্রসঙ্গে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩।

১১৫. হাই, মুহম্মদ আবদুল, *ভাষা ও সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০।

১১৬. তদেব, পৃ. ১১১।

১১৭. ফারসি শব্দগুলো প্রবেশের পর তার নিজস্ব উচ্চারণ অবশিষ্ট নেই। অনেক শব্দ বর্ণের মধ্যেও পরিবর্তন হয়ে বাংলায় এসেছে। মূল ভাবের পরিবর্তন হয়ে বাংলা শব্দে স্থান করে নেয়া একটি সম্পর্কেরই ফল।

১১৮. কাসেম, আবুল (সম্পাদনায়), *আমাদের ভাষার রূপ*, আজিমপুর প্রেস, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ৪।

১১৯. শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ, *বাঙ্গালা ভাষায় পারসী প্রভাব*, সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা, ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, ১৩৬৫, পৃ. ৯৩।

১২০. বিশ্বাস, নরেন, *প্রসঙ্গ : বাঙলা ভাষা*, অনন্যা, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ২৭।

১২১. শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ, *বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭।

১২২. শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ, *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫।

১২৩. শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ, *বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮।

১২৪. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, *বাঙ্গলা ভাষা প্রসঙ্গে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯।

১২৫. মধ্যযুগে বাংলা ভাষায় আরবি ও ফারসি শব্দের অত্যধিক ব্যবহার ছিল। সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের সদস্যরা এ ভাষা ব্যবহার করতেন। বিশেষ করে আলম ও পির-মাশায়েখগণ ভাষাটির উন্নয়ন ও প্রচারে যথা ব্যবস্থা না গ্রহণ করলে অতি অল্প সময়ে সমাজে তা প্রচার পেতোনা। সাধারণ মানুষ বাংলায় মিশ্রিত আকারে আরবি ও ফারসি শব্দের ব্যবহারের ফলে পৃথক একটি তাষা ব্যবহারের ক্ষেত্র তৈরি হয়। এ সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে একাদশ অধ্যায়ে।

১২৬. সাধারণত হিন্দুরা সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব ও পরিচয় প্রদান করতেন। মুসলিম সাহিত্যে অবদানের জন্য যে ক'জন হিন্দু লেখকের পরিচয় মিলে তা খুবই নগন্য।

১২৭. আলী, সৈয়দ এমদাদ, বাংলা ভাষা ও মুসলমান, *মাসিক মোহাম্মদী*, ঢাকা, প্রথম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৩৪, পৃ. ৩৩৩।

১২৮. মাহ্‌ফুজ উল্লাহ, মোহাম্মদ, *বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা প্রীতি*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮০, পৃ. ৮৭।

১২৯. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, *বাঙ্গলা ভাষা প্রসঙ্গে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০।

১৩০. শব্দগুলো: বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বিভিন্ন জাতের ফারসি শব্দগুলো প্রথমে ভাষাবিদ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর *বাঙ্গালা ব্যাকরণ* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া বাংলা ভাষায় ব্যবহারের ফারসি শব্দ উইলিয়াম গোল্ডসেক রচিত *মুসলমানী বেঙ্গলী-ইংলিশ অভিধান*, গোলাম মকসুদ হিলালি রচিত *বাঙলায় ফারসী-আরবী উপাদান* ও মোহাম্মদ রুস্তম আলী দেওয়ান রচিত *বাংলা ভাষায় ফার্সীর প্রভাব* গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে। উক্ত গ্রন্থগুলোতে বাংলা ভাষায় ব্যবহারকৃত পাঁচ হাজারেরও উপরে ফারসি শব্দ উল্লেখ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৩১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ফারসি উপসর্গযোগের শব্দগুলো *বাঙ্গলা ভাষা প্রসঙ্গে* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তাঁর আলোচনায় ব্যাকরণে ফারসি ভাষার প্রভাবটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

১৩২. ব্যবহৃত শব্দগুলো দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক সংকলিত *মৈমনসিংহ গীতিকা* গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে। - সেন, শ্রী দীনেশচন্দ্র, *মৈমনসিংহ- গীতি কবিতা*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৭৩।

১৩৩. ব্যবহৃত শব্দগুলো শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী কর্তৃক সংকলিত *সিলেটী ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা* গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে। - লাহিড়ী, শিবপ্রসন্ন, *সিলেটী ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৩৬৮।

১৩৪. ব্যবহৃত শব্দগুলো আবদুর রশিদ ছিদ্দিক কর্তৃক সংকলিত *চট্টগ্রামী ভাষাতত্ত্ব* গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে। - ছিদ্দিকী, এম আবদুর রশিদ, *চট্টগ্রামী ভাষাতত্ত্ব*, জুবলি রোড, চট্টগ্রাম, ১৯৭১।

১৩৫. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর *বাঙ্গলা ভাষা প্রসঙ্গে* গ্রন্থে *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান ও চলন্তিকা* শিরোনামে অভিধান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাতে অভিধানের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। তাঁর ভাষ্য মতে, অভিধানটি সাধু ও চলিত এবং ব্যাকরণের প্রতি যথেষ্ট নজর দিয়েছে। অবশ্য শব্দ স্থান করে নেয়ার ব্যাপারে তাঁর কোন মন্তব্য নেই। প্রকৃত সত্য এই যে, অনেক ফারসি শব্দ তাঁর অভিধানে স্থান হয় নি। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ফারসি শব্দগুলো স্থান পেলে অভিধানটি আরো সমৃদ্ধশীল হতো।

১৩৬. হক, মুহম্মদ এনামুল (প্রধান সম্পাদক), *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. স্বরবর্ণ অংশের ভূমিকা- তেরো।

১৩৭. ফারসি ও বাংলা ভাষার বর্ণের লিখিতরূপ ভিন্ন। দু'টি ভাষার উচ্চারণ ও বাচন ভঙ্গিও পৃথক রয়েছে। তবে ফারসির শব্দ বাংলা ভাষায় ব্যবহারে সময় বাংলার ন্যায় ব্যবহৃত হচ্ছে। এটি একটি ঐতিহ্যগত সম্পর্ক।

১৩৮. বাংলা ও ফারসি ভাষা একই ভাষাগোষ্ঠীর অর্ন্তভূক্ত হওয়া সত্ত্বেও একটির লেখ্যরূপ সংস্কৃত ভাষার অপরটির আরবি। লেখ্যরূপের ক্ষেত্রে এ দু'টি ভাষার ব্যবধান অনেক। উল্লেখ্য যে, আরবি ভাষা সেমিটিক গোত্রের শাখা। ইসলাম পরবর্তী সময়ে আরবি থেকে ফারসির লেখ্যরূপ গ্রহণ করা হয়। উর্দু, পাঞ্জাবি, কাশ্মিরি, সিন্ধি ও বেলুচি প্রভৃতি ভাষাগুলোর লেখ্যরূপ একই। এ ভাষাগুলো ফারসি ভাষার লিপির ন্যায় ডান দিক থেকে বাম দিকে লিখা হয়। এ ভাষাগুলো আর্য শাখার অর্ন্তগত এবং ফারসি ভাষার আদলে সৃষ্টি হয়েছে।

১৩৯. সেন, শ্রী সুকুমার, *ভাষার ইতিবৃত্ত*, ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৬৪, পৃ. ৭৮।

১৪০. শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ, *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯। এ সম্পর্কে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর *বাঙ্গলা ভাষা প্রসঙ্গে* গ্রন্থে ফার্সী ও বাঙ্গলা এবং *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ* গ্রন্থে পরিশিষ্ট (৫) ফারসী ও বাঙ্গালা ব্যাকরণ শিরোনামে বাংলা ও ফারসি ভাষার মধ্যে শব্দগত মিলের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচনাটি যৌক্তিক ও প্রাণবন্ত।

১৪১. আল-মামুন, মো. আবদুল্লাহ, *ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা সমস্যা ও প্রসার*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৯।

১৪২. শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ, *ভাষা ও সাহিত্য*, প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৪৯, পৃ. ৬।

১৪৩. শাহনাওয়াজ, এ কে এম, *বাংলার সংস্কৃতি বাংলার সভ্যতা*, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ১৪৫।

১৪৪. আহমদ, শরীফ, *মধ্যযুগে বাঙলা সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৬।

১৪৫. আহমদ, ওয়াকিল, *বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৫৫।

১৪৬. বঙ্গবাসী, খাদেমুল এনসান, বাঙ্গালীর মাতৃভাষা, *আল ইসলাম*, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩২২, পৃ. ৪৬৪-৬৫।

১৪৭. চৌধুরী, প্রমথ, বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী শব্দ, *বুলবুল*, ঢাকা, তৃতীয় বর্ষ ২য় সংখ্যা, ১৩৪৩, পৃ. ৮১।

১৪৮. ফজল, আবুল, *সাহিত্য সংস্কৃতি ও জীবন*, আর্ট প্রেস, চট্টগ্রাম, প্রকাশকাল নেই, পৃ. ১৭৮।

১৪৯. মাহ্‌ফুজ উল্লাহ্‌, মোহাম্মদ, *বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা প্রীতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯।

১৫০. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতামতের বিরুদ্ধে মাসিক মোহাম্মদী ১৩৪২ ও ১৩৪৩ সনের বিভিন্ন সংখ্যায় মতামত প্রকাশিত হয়েছে। মতামতে তাঁর চিন্তা ধারার সাথে কেউ একমত পোষণ করেন নি। বরং তাঁরা বিভিন্ন রকম যুক্তি উপস্থাপন করে বাংলা ভাষায় ফারসি শব্দের ব্যবহার দেখিয়েছেন।

১৫১. ইসলাম, নজরুল, অভিভাষণ, *বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সমিতি*, রজত-জুবলীঃ ১৯৪১, কলিকাতা, ১৯৪১, পৃ. ১১।

১৫২. শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ, *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫।

Dhaka University Institutional Repository


# সহায়ক গ্রন্থাবলি


| | | | |
|---|---|---|---|
| ১. | ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ | : | বাঙ্গালা ব্যাকরণ |
| ২. | কাজী দীন মুহম্মদ | : | বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস |
| ৩. | নরেন বিশ্বাস | : | প্রসঙ্গ : বাঙলা ভাষা |
| ৪. | রামগতি ন্যায়রত্ন | : | বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব |
| ৫. | অতীন্দ্র মজুমদার | : | মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা |
| ৬. | মুহম্মদ আব্দুল হাই | : | ভাষা ও সাহিত্য |
| ৭. | ডক্টর কৃষ্ণপদ গোস্বামি | : | বাংলা ভাষাতত্বের ইতিহাস |
| ৮. | ডক্টর আহমদ তাফাজ্জলি | : | তারিখে আদাবিয়াতে ইরান পিশ আয ইসলাম |
| ৯. | ডক্টর মুহাম্মদ জাফর ইয়াহাকি | : | কুল্লিয়াতে তারিখে আদাবিয়াতে ফারসি |
| ১০. | ডক্টর মুহাম্মদ জাফর ইয়াহাকি | : | তারিখে আদাবিয়াতে ইরান |
| ১১. | ডক্টর মোহসেন আবুল কাসেমি | : | তারিখে মুখ্তাসারে যাবানে ফারসি |
| ১২. | মগবুল বেগ বাদাখশানি | : | তারিখে ইরান |

Dhaka University Institutional Repository

# তৃতীয় অধ্যায়: বঙ্গীয় অঞ্চলে পারস্যের ধর্ম-সংস্কৃতি

বঙ্গের সংস্কৃতি বহু পূর্বে গড়ে ওঠলেও সমুন্নত থাকেনি। বরং ধর্ম ও শাসন ব্যবস্থার উত্থান-পতনে সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটেছে। বস্তুত নানাভাবে এর চর্চার ধারা বিঘ্নিত হওয়ায় বঙ্গের সংস্কৃতি একটি ভিন্ন মাত্রায় রূপ পায়। সে ভিত্তিতেই মধ্য যুগে গড়ে উঠেছে বাঙালির সংস্কৃতি। সেই সংস্কৃতির মধ্যে পারস্যের প্রভাব বিদ্যমান। এটি বঙ্গীয় অঞ্চলের সমাজ ও জীবন-যাত্রায় পরিবর্তন এনে দেয়। এ অঞ্চলের ধর্মীয় সংস্কৃতি সেই পরিবর্তনের একটি দৃষ্টান্ত।

## ধর্মীয় সংস্কৃতি

সংস্কৃতি শব্দটি তমদ্দুন, কালচার ইত্যাদি শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। জাতির কৃষ্টি সভ্যতা বললেও দেশের কালচার বা সংস্কৃতি বুঝানো হয়। সাধারণত সংস্কৃতি শব্দের সাথে ধর্ম, সাহিত্য, ইতিহাস ও ঐতিহ্য উৎপ্রোতভাবে জড়িত। যেমন–সাহিত্য-সংস্কৃতি, ধর্ম-সংস্কৃতি, ইতিহাস-সংস্কৃতি, ইত্যাদি বলে থাকি। ফারসি ভাষায় তমদ্দুন ও ফারহাঙ্গকে সংস্কৃতি বলে। বাংলা ভাষায় সংস্কৃতি অর্থে তমদ্দুন শব্দটি প্রচলিত আছে। এটি ধর্ম সংস্কৃতির একটি প্রধান উপাদান। ধর্ম বিশ্বাসের কারণে সংস্কৃতির আঙ্গিক চিত্র ভিন্নতর হয়। অনেক সময় বাঙালি মুসলমান লেখকগণ শব্দটি একই সাথে 'সভ্যতা সংস্কৃতি'[১]র অর্থে ব্যবহার করেছেন। ইসলামি কালচার বলতে গেলে শুধু আরবি কালচার বুঝায় না। দেশীয় কালচারের সমন্বয়ে ইসলাম ধর্মের আদলে যে কালচারটি গড়ে ওঠে এটিও একটি ইসলামি কালচার। অনেক ক্ষেত্রে দেশীয় কালচারের সাথে আরব দেশীয় কালচার সম্পৃক্ত হয়েছে। এর ফলে একটি নতুন কালচার গঠন হয়। তাতে দেশীয় কালচারটিই শক্তিশালী ও উজ্জ্বল ভূমিকা রাখে।[২] আমাদেরকে ইসলাম ধর্ম দেশীয় সংস্কৃতির সাথে সমন্বয় করে পথ চলতে শিখিয়েছে। তা না হলে প্রাচীন ইরানের দেশীয় সংস্কৃতি ধর্মীয় সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হতনা।

সংস্কৃতি শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার হলেও এ আলোচনায় ধর্মীয় বিষয়টির গুরুত্ব কথা তুলে ধরা হবে। ধর্ম-সংস্কৃতি মানুষের জীবন যাত্রা পরিবর্তনের একটি বড় মাধ্যম। ধর্ম নিয়ে মানুষ অনেক

Dakha University Institutional Repository

অনেক দিন পূর্ব থেকে ভাবতে শুরু করেছে। এটির প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব এত বেশি যে, তা এক কথায় শেষ করার মত নয়। ধর্ম আল্লাহ তায়ালার একটি শ্রেষ্ঠ দান।[৩] পৃথিবী সৃষ্টির পর হজরত আদম (আ.) সৃষ্টি হন। প্রথম হজরত আদম (আ.) আল্লাহ তায়ালা থেকে নিয়ম-নীতি মেনে চলার শিক্ষা গ্রহণ করেন। মোটামোটি বলা যায় যে, এই প্রথম হজরত আদম (আ.) থেকে ধর্ম জানার আগ্রহ সূচিত হয়। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য মানুষের মধ্য থেকে একজন পথপ্রদর্শক নির্বাচিত করেন। যাঁদেরকে বলা হয় নবি, ধর্মপ্রচারক বা ধর্মপ্রবক্তা। ইসলাম ধর্মের শেষ নবি হলেন হযরত মুহম্মদ (দ.)।[৪] যিনি সমাজের মানুষদেরকে সঠিক পথ দেখান। তাঁর পথ অনুসরণ করে সমাজের মানুষ ধার্মিক হন। সে নিজেকে পবিত্র ও সৎ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেন। পৃথিবীতে ঠিক কতজন ধর্মপ্রবক্তা রয়েছেন তার হিসেব দেয়া দুষ্কর। হযরত মুহম্মদ রাসুল (সা.) হলেন শেষ নবি ও রসুল। তিনি নিয়ে এলেন মানুষের মাঝে ইসলাম ধর্ম। এটি আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য প্রকাশের কথা বলে।[৫] সে ইসলাম ধর্মকে ভিত্তি করে মুসলমানদের ধর্মীয় সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটেছে। ধর্ম মানুষের সাথে একটি সংশ্লিষ্ট বিষয় যা মানুষ জন্মের পরপরই পালন করতে উদ্যোগী হয়। সাধারণত মানুষ একটি নির্ধারিত সময়ে তাঁর ধর্ম সম্পর্কে জানার চেষ্টা করে। ধর্মের কর্ম ও নিয়ামাবলি পালন ছাড়া ধর্ম মান্য হয় না। ধর্মের কাজগুলো সম্পর্কে কতক ধর্মগ্রন্থ খোদাপ্রদত্ত আবার কতক ধর্মপ্রচারক কর্তৃক রচিত হয়েছে। ধর্মগ্রন্থকে ভিত্তি করেই ধর্মীয় সংস্কৃতির সৃষ্টি এবং ধর্ম থেকেই অনেক আচার আচরণ পালিত হয়।[৬] এ কারণেই মুসলমানদের অনেক উৎসব, অনুষ্ঠান ধর্মভিত্তিক।

## প্রাচীন ইরানের ধর্মের কথা

প্রাচীন ইরানে মানব গোষ্ঠী পাহাড়-পর্বতে, গর্তে ও গুহায় বসবাস করত। শিকার করা ও কৃষিকাজ করা তাঁদের জীবনকর্মের একটি অংশ ছিল। পেশা হিসেবে সবসময় তাঁরা শিকারকেই প্রাধান্য দিত।[৭] তবে তাঁদের সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটেছে ধর্ম চর্চার মধ্য দিয়ে। ধর্মপ্রচারের সময়কালটি ছিল মূলত যাযাবরি অবস্থার পরিবর্তনের পরের সময়কাল। এটি খ্রিস্টপূর্ব দু হাজার বছরেরও পূর্বের সময়কাল হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। যখন পারস্যের মানুষ জীবিকা অর্জনের জন্য বসতি স্থাপন ও আবিস্কারের প্রতি মনোনিবেশ করেন। সেই প্রাচীন জাতীগুলোর মধ্যে মায্দা, এলাম ও মাদ জাতি প্রসিদ্ধ। তাঁরা মগদের ধর্ম-কর্মের ন্যায় নিয়ম নীতি মেনে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করেছিল।[৮] তবে উল্লিখিত জাতিগুলোর সংস্কৃতি বা ধর্ম কী ছিল সে বিষয়টি অস্পষ্ট থেকে যায়। বিশেষ করে পারস্যে জরথুস্তের আবির্ভাবের আগ পর্যন্ত তাঁদের ধর্মের রীতি কর্ম বিভিন্নমুখী ও অস্থায়ী ছিল। ঈলাম

Dhaka University Institutional Repository


জাতির ধর্ম সম্পর্কে একই মন্তব্য করা হয়। তবে মাদ জাতির ধর্মের নীতি ও কর্মগুলো মগদের প্রাচীন ধর্মের রীতি অনুযায়ী ছিল।[৯] জরথুস্তের ধর্মমতবাদ ও তৎকালীন সময়ের ধর্ম সম্পর্কে আবেস্তা গ্রন্থে যা উল্লেখ আছে তাই ইরানীয়দের ধর্ম জানার একটি ভিত্তি। এর পূর্বের কোনো ধর্মের নিয়ম কানুন এতটা বিস্তৃতি ভাবে জানা যায় না। এ ধর্মের মধ্যে পাপ ও পুণ্যের প্রতিদান শাস্তি ও শান্তির কথা রয়েছে। জরথুস্ত্রের অনুসারীদের ধর্মের কাজ-কর্মগুলো স্বতন্ত্রমুখী হলেও পূর্বের জাদুবিদ্যা, কুসংস্কার, পুরোহিতদের রীতি-নীতি আবৃত ছিল। একই সাথে প্রাচীন ইরানে বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের মিশ্রণে ভিন্নরূপী ধর্মমত গড়ে ওঠেছে। যেমন- ঈসায়ি, জরথুস্তি ও মাদি মতবাদ।[১০] তবে সাধারণ মানুষের মাঝে জরথুস্তীয় ধর্মটির প্রভাব দীর্ঘদিন স্থায়িত্বলাভ করেছে। জরথুস্ত ছিলেন একজন ধর্মপ্রবক্তা। ইরানি জাতির মধ্যে লিখিত আকারে সর্বপ্রথম শ্রেষ্ঠ ও প্রচলিত যে ধর্মের কথা পাওয়া যায় তা হলো জরথুস্তীয় ধর্ম। এটি খ্রিস্টপূর্ব সাত শত বছর পূর্ব থেকে ইসলাম ধর্ম আগমনের আগ পর্যন্ত ইরানীয়দের মধ্যে স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে।[১১] জরথুস্ত ধর্মমত নিজে প্রচার করেছিলেন। জরথুস্তের নামানুসারে তাঁর মতবাদের নাম হয় জরথুস্তবাদ। তিনি নিজে লোকজনদের মধ্যে ধর্মমতবাদ প্রচার করে তার ভাল মন্দের ব্যাখ্যা দিতেন। তিনি বহু দেবতাবাদ, পশুবলি, এবং জাদুর প্রভাব থেকে মুক্ত করে আধ্যাত্মিক পথে পরিচালিত করার চেষ্টাও করেন। জরথুস্ত[১২] ধর্মে দুই দেবতার প্রতি পূজা করার প্রবণতা রয়েছে। জরথুস্ত ধর্মালম্বীরা দুই দেবতার বিশ্বাস করতেন। একটির নাম ছিল আহুরামজাদা অপরটির নাম আহিরমান। আহুরামজাদা ভাল কাজ করার প্রতিচ্ছবি। তিনি ছিলেন সত্য, ন্যায় ও আলোর পথ প্রদর্শক। আহিরমান ছিল বিশ্বাসঘাতক, অন্ধকারের ও ভ্রান্ত পথ প্রদর্শক। তাঁদের এ বিশ্বাস ছিল যে, ভাল মন্দের সৃষ্টিকারী দুই দেবতা। সত্য জয় হবে মিথ্যার উপর।[১৩] ভাল মন্দের বিরোধ ও যুদ্ধ সৃষ্টির শুরু থেকে চলে আসছে। যে কারণে সৃষ্টিকারী দুই শক্তি। জরথুস্ত খ্রিস্টপূর্ব ৬৬০ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর মৃত্যু হয় খ্রিস্টপূর্বাব্দ ৫৮৩ সনে। তাঁর পিতার নাম পুরো সাপাহ ও মাতার নাম দোগদ। তাঁর বংশটি ছিল সেপিতামাহ। তিনি রেই, আযারবাইজান, খাওয়ারিযম, মারভ, বা হেরাতের অধিবাসী ছিলেন।[১৪] অনেক ফারসি গবেষকদের ধারণা যে, তাঁর জন্মস্থান ইরানের পূর্বপ্রান্তে বাল্‌খ বা খোরাসানে অবস্থিত। তাঁর জন্মকাল ও জন্মস্থান বিষয়ে মতভেদ দেখা দিলেও আবেস্তা গ্রন্থটি যে প্রাচীন ইরানের নিদর্শন, সে ব্যাপারে কারও সন্দেহ নেই। ইরানের ফারসি ভাষার পুস্তকগুলোতে তাঁকে ইরানি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তিনি যে প্রাচীন ইরানের পূর্ব বা পশ্চিমে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন সে বিষয়ে বহু প্রমাণ বিদ্যমান। তাঁর সম্পর্কে বাঙালি গবেষকদের ধারণাও কম নয়। প্রাচীন পারস্যের মতবাদ, বিশ্বাস ও ধর্মের কথা জানার জন্য আবেস্তা একটি শক্তিশালী গ্রন্থ। যেমনটি ভারতে হিন্দুদের ধর্ম গ্রন্থ বেদকে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে।[১৫] প্রাচীন ইরানের ধর্ম-

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃতির রূপরেখা সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে জরথুস্তের ধর্মীয় গ্রন্থ আবেস্তার আলোচনা প্রয়োজন। ইরানীয়দের ধর্মের নিদর্শনাদি হিসেবে *আবেস্তা একটি প্রাচীন ধর্ম গ্রন্থ। এটি ছাড়া প্রাচীন* ইরানের ধর্মীয় সংস্কৃতির নিদর্শন হিসেবে প্রস্তর ফলক, খোদিত লিপিও রয়েছে। যেমন– কাতিবেহায়ে শূশ (کتیبه های شوش), কাতিবেহায়ে চূয়েয, (کتیبه های سوئز) প্রভৃতি। বিভিন্ন স্থানের গুহা, পাহাড় ও প্রাসাদে খোদাই করা লিপির মাধ্যমেও তাঁদের প্রাচীন ধর্মকথা জানা যায়। সে সময়ে লিখিত আকারে পুস্তিকাদি না পাওয়াটা স্বাভাবিকই ছিল। তখন লিখে না রাখার কারণ ছিল বহুবিধ। যেমন– ১. লেখার যে আসবাবপত্র তার অভাব ছিল প্রচুর। ২. মুখস্থ করে বক্ষে ধারণ করার প্রবণতা থাকা। ৩. সবার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, ইত্যাদি। ইরানিদের ধর্মীয় গ্রন্থ আবেস্তাও যুগ যুগ ধরে সীনায় সংরক্ষিত ছিল। সে সময় ইরানিদের মধ্যে কোনোদিন তা লিখিত আকারে কোথাও রেখে যাওয়ার ইচ্ছা জাগেনি। তখন না লিখাটাকে সম্মান জানানো হত। মুখস্থ করে রাখাটা তাঁদের ধর্মীয় সংস্কৃতির একটি প্রাচীন নিয়ম ছিল।[১৬] যাদের হৃদয়ে ধর্মের কথা বেশি গচ্ছিত থাকত সে বেশি সম্মানের পাত্র ছিল। প্রাচীন পারসিকরা মেসোপটিমিয়া, মিসর ও উত্তর প্যালেষ্টানের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। তারা মিসরীয়দের কাছ থেকে ধর্মীয় সাংস্কৃতিক বিষয় পেয়েছিল।[১৭] তাঁদের ধর্ম সমসাময়িক যুগে পূর্বের প্রতিবেশী দেশ থেকে আয়ত্ব করেছিল বলা যায়। তবুও যে তাঁরা ধর্মীয় সংস্কৃতির দিক দিয়ে একটি উর্বর জাতি– তা আমাদের স্বীকার করে নিতে হয়। ধর্মীয় ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান তাঁদের রয়েছে।

ইসলাম আগমনের পূর্বে ইরানে অনেকগুলো ধর্ম ছিল। জরথুস্তি, ইয়াহুদি, ঈসায়ি, বৌদ্ধ, মানঈ, সাবেঈ, মায্‌দাকি, বাম্মনি ধর্ম ইত্যাদি। বিশেষ করে জরথুস্ত, মায্‌দাক, মানি- এই তিনটি ধর্ম ছিল প্রসিদ্ধ ও পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম।[১৮] এ সব ধর্মের লোক বসবাসের মাধ্যমে তাঁদের ধর্ম সংস্কৃতির রূপরেখা কী ছিল পরিস্কার হয়ে ওঠেছে। তখনও তাঁদের স্বাধীনচেতা মনোভাব ও ধর্মসাধনার প্রতি একনিষ্টতা বিরাজমান ছিল। বহু ধর্মের আর্ভিভাব ও তাঁদের কর্ম পালনের মাধ্যমেও উৎকৃষ্টতম জাতির পরিচয় মিলে। তবে ইরানে যুরথুস্ত্র ধর্মের অনুসারীদের সংখ্যাই ছিল বেশি। একত্ববাদের উপর বিশ্বাস তখনও ছিল। যে কারণে ইসলাম পূর্ব যুগেও পৌত্তলিক বিশ্বাস কিংবা অবৈধ বিবাহ সম্পর্ক তাঁদের মাঝে বিরাজমান ছিলনা।[১৯] উল্লেখ্য যে, প্রাচীন ইরানে মাদ জাতির ধর্ম সম্পর্কেও একই ধারণা করা যেতে পারে। মাদরা তাঁরা নিজেদেরকে আর্য জাতি হিসেবে পরিচয় দিত। তারা আহুরামজাদার পূজা করত এবং পার্শিকদের ধর্মের ন্যায় তাদের ধর্ম ছিল।[২০] প্রাচীন পারস্যে পুরোহিতদের প্রভাব ছিল বেশি। তবে পুরোহিতদের ধর্ম ও আচার-আচরণের লিখিত নীতিমালা পাওয়া যায়নি। মানি ধর্ম ও

Dakha University Institutional Repository

বৌদ্ধ ধর্ম প্রচলিত ছিল। তাঁদের ধর্ম সম্পর্কে জানার মত লিখিত আকারে কোনো গ্রন্থ থাকার নজির মিলেনা। এটা সত্য যে, প্রাচীন ইরানিদের মধ্যে আর্য অধিবাসীদের ধর্মের মত চন্দ্র, সূর্য, তারকার পূজা করত। তাঁরা সূর্য ওঠার সময়কালে মাথা নত করতে দ্বিধা করতনা। তাঁরা সূর্যকে বলত মেহের। এমনকি সূর্যের নামে বলিদানও প্রসিদ্ধ ছিল।[২১] একই সাথে তাঁদের একত্ববাদের চিন্তা চেতনার বিষয়টিও প্রাচীন কাল থেকে পাওয়া যায়। জরথুস্ত ধর্মের পূর্বে মাযদি ধর্মের অনুসারীরা পূর্ব পশ্চিমের খোদাকে পূজা করত। এটি ছিল মানুষ ও পৃথিবীর খোদা।[২২] ধর্মীয় ভাব ও ধর্মের প্রতি অবিচলতা ইরানিদের মধ্যে খ্রিস্টপূর্বকাল থেকে বিরাজমান রয়েছে। ধর্মীয় গ্রন্থ আবেস্তাকে ঘিরে একদল উলামা ছিল যারা দেশের নেতৃত্বদানের মতই শক্তিশালি ভূমিকা রাখে। তারা সমাজের মধ্যে বসবাসকারী পারস্পরিক লেনদেন ও আদান-প্রদান বিষয়ে দেখাশোনা করত। আবার কেউ কেউ ধর্মীয় কাজে ধর্মের প্রসারে ব্যাস্ত থাকতেন। যারা ধর্মের কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন তাঁদের মধ্যে পবিত্রতা ও তাকওয়া বিদ্যমান থাকাটাই ছিল একটি নিয়ম।[২৩] আত্মা ও চরিত্র সংশোধনের বিষয়টি জরথুস্ত্র ধর্মীয় অনুসারীদের মাঝে বিদ্যমান ছিল। ধর্মীয় উলামারা মানুষদেরকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিতেন।[২৪] পবিত্রতা ও ন্যায় নিষ্ঠার দিকটিও সব সময় তাঁদের মাঝে ছিল।

## পারস্যের ইসলাম যুগের ধর্ম-সংস্কৃতি

পারস্যবাসীদের ইসলাম গ্রহণের পর কিছুটা তাঁদের সংস্কৃতির পরিবর্তন হয়েছে। ঠিক যতটা অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোতে ছিল পরিবর্তনটি ততখানি ঘটেনি। বহু পূর্ব থেকেই পারস্যবাসীরা উর্ববর জাতি হিসেবে পরিচিত। তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করলেও আরবদের সংস্কৃতি তাঁরা গ্রহণ করেনি। বরং ইরান আরব থেকে ইসলাম গ্রহণকালে ইসলামের যে ভিত্তি রয়েছে সেই ভিত্তির উপর তাঁদের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।[২৫] ইরানের কালচার বা সংস্কৃতি যে আরব দেশের কালচার থেকে স্বতন্ত্র তা থেকে অনুমান করা যেতে পারে। তাঁদের কালচারই তুর্কিবাসীদের উপর প্রভাব ফেলেছে। ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভাষী হওয়ার পরও তুর্কিরা ইরানি কালচার গ্রহণ করেছিল।[২৬] উল্লেখ্য যে, সেই তুর্কিবাসীরাই এদেশে বিজয়বেশে ইসলাম প্রচার কালে সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়ে এক নতুন বিপ্লব সাধিত করেন। সেই সংস্কৃতি ছিল ইরানি সংস্কৃতি, তুর্কি নয়।

আরবরা পারস্য জয়ের পর তাঁদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছিল। যে কারণে তাঁরা পারস্যে ইসলাম প্রবেশের পরও তাঁদের শিক্ষা সংস্কৃতি বিকাশ ঘটাতে পারেনি।[২৭] মুহাম্মদ বিন জাবির তাবারি (২২৪ হি.-৩১০ হি.), মুসলিম বিন আল হাজ্জাজ নিশাবুরি (মৃ. ২৬১

Dhaka University Institutional Repository


হি.), আবু আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদুল কাযভিনি (২০৯ হি.- ২৭৩ হি.) ও আবু হানিফা নুমান বিন সাবিত (৮০ হি.-১৫০ হি.) প্রমুখদের ন্যায় অসংখ্য তফসির, হাদিস বিশারদ ও ফকিহ ইরানি নিজ ভাষায় গ্রন্থ রচনা করে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শিক্ষা-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাঁদের যে অবদান তা অনেক ও বিশাল।[২৮] ইরানি জাতি ইসলামের সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের ফলে নিজেরা নতুন সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছে। ইরানি শাসক ও জনসাধারণ নিজেদের সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন ছিল বলেই তাঁরা নিজেদের সভ্যতা সংস্কৃতি নিয়ে গৌরব করত। এক সময় ইরান ইসলাম গ্রহণের পর তাঁদের সংস্কৃতির সাথে আরবের সংস্কৃতিও উচ্চ স্থান লাভ করে। সে সময় ইরানের মুসলমানগণ আরবি কুরআনের ভাষা হওয়ার কারণে এ ভাষার শিক্ষাকে যথাভাবে মূল্যায়ন করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। যার ফলশ্রুতিতে অসংখ্য আরবি বিষয়ের গ্রন্থ ফারসি ভাষায় রচিত হয়। পারস্যের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও আরবি ভাষার প্রয়োগ ও ব্যবহার হতে কোনো বাধা ছিলনা। এমনকি ইসলাম ধর্মকে প্রসারিত করার জন্য নিজেদের মাতৃভাষা ফারসি ভাষা ছাড়াও আরবি ভাষায় গ্রন্থ রচনায় অবদান রাখতে শুরু করেন তাঁরা।[২৯] ইসলাম আগমনের পর থেকেই পারস্যবাসী আরবি শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। আরবি চর্চার পাশাপাশি তাঁরা ইসলাম ধর্মের বিষয়গুলো চর্চা করতে থাকে। ইসলামের ভাষা আরবির প্রতি তাঁদের আকষর্ণের ফলে পাহলবি ভাষাও তাঁদের জীবন থেকে বিদায় হতে বাধ্য হয়। ইসলাম গ্রহণের কারণে এটি তাঁদের ভাষা সংস্কৃতি বিপর্যয়ের একটি বড় দিক। ধর্মীয় কেন্দ্র, অফিস-আদালত ও জ্ঞান বিজ্ঞানের স্থানগুলোতে আরবি ভাষার ব্যবহার হওয়া ছিল কল্পনাতীত। যে পাহলবি ভাষায় জরথুস্ত্র মতবাদ প্রকাশ পেয়েছিল তাঁদের মাঝে ইসলাম আগমনের পর তা ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। এমনিভাবে ইসলামি জ্ঞান ও আরবি ভাবধারা ইরানিদের মাঝে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়।[৩০] এ কথা সত্য যে, ইরানি মুসলমানদের সংস্কৃতির প্রধান ধারক ও বাহক কুরআন ও হাদিস। এ দুটি গ্রন্থকে ভিত্তি করে তাঁদের ধর্মসংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। অতপর ইরানে ইসলাম ধর্ম পালনের সময় তাঁদের ঐতিহ্যগত বিষয়গুলো ধর্মে প্রবেশ করেছে বলা যায়। পরবর্তীতে এটি ইরানি ধর্মীয় সংস্কৃতি হিসেবে দেখা হয়েছে। এ গুলো যে ইসলাম ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক বা বিপরীতমুখী ছিল–এমনটি নয়। তেমনি তাঁদের সুফিবাদের চর্চা একটি উল্লেখযোগ্য সংস্কৃতি। বলা যেতে পারে যে, সুফি চর্চার বিষয়টি তাঁদের মাঝে বিশাল ভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ইসলাম চর্চার সাথে সুফিতত্ত্ব বা সুফিবাদ ইরানীয়দের একটি অংশ। তাঁরা শুধু এর চর্চাই করেননি বরং রেখে গিয়েছেন অনেকগুলো নিদর্শন। ইরানীয়রা ইসলামি শরিয়তের ব্যাপারে উত্তম চিন্তা চেতনা ও প্রখর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। মাযহাব চর্চার একটি দিক তাঁদের মধ্যে রয়েছে। অবশ্য এটি খেলাফত, ইমামত ও শরীআতের হুকুম আহকামের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়। হিজরি তৃতীয় শতকে ইসলাম ধর্ম

Dhaka University Institutional Repository


তিনটি ভাগে বিভক্ত হলে আহলে সুন্নাত, আহলে শিআ ও খাওয়ারেযম হিসেবে রূপ নেয়।[৩১] সময়ের ব্যবধানে এগুলোর চর্চা করতে গিয়ে মারজিয়া, কাদেরিয়া ও মোতাযেলা দলের সৃষ্টি হয়েছে।

শেখ সাদির বয়েত ও উপদেশপূর্ণ কথাগুলো অনেক মূল্যবান। শেখ সাদিকে পৃথিবীখ্যাত একজন জ্ঞানী ও শিক্ষক হিসেবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। যিনি ত্রিশ বছর জ্ঞান সাধনার জন্য বহু শহর ও অলি-গলি ভ্রমণ করেছেন। তাঁর ভিত্তিতে রচনা করেছেন *গোলেস্তান* ও *বুস্তান* গ্রন্থ। যাতে রয়েছে শিক্ষণীয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ, কাহিনী ও চরিত্র সংশোধনের অনেক কথামালা।[৩২] সে গ্রন্থকে ধারণ করে ইরানি জাতি গৌরবের পরিচয় দিয়েছেন। ইউসুফ জোলেখার অন্যতম রচয়িতা ছিলেন খাজো কিরমানি। সেই গ্রন্থে খোদা প্রেমের অপূর্ব নিদর্শন উল্লেখ রয়েছে। ইরানি জাতি ইসলামি জলসায় সত্য প্রেমের কথামালা ব্যক্ত করতেন।[৩৩] মুঘল যুগের উল্লেখযোগ্য কবি ছিলেন শায়খ আত্তার নিশাপুরি। তাঁকে একজন আরেফ, সুফি ও বিখ্যাত কবি হিসেবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। তিনি মুঘলদের আক্রমণে নিজ বাড়ীঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হন। কিন্তু কবিত্ব থেকে তাঁর চিন্তা চেতনা লেশমাত্র দূরিভূত হয়নি। তাঁর প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ *মানতিকুত তায়ের* সুফিবাদের এক বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার। তাতে প্রাণীদের ভাষাকে কেন্দ্র করে উপদেশ ও সুফি তরীকার স্তরগুলো বর্ণনা দেয়া হয়। রূপক কাহিনী বর্ণনাদানের মাধ্যমে মূলত তিনি সুফিবাদের কথা বলে গিয়েছেন। তেমনি *এলাহি নামা*, *পান্দ নামা*, ও *তাযকিরাতুল আউলিয়া*[৩৪] বিশেষ খ্যাতি রাখে। এ গ্রন্থগুলো যে, ইরানীয়দের ধর্ম সংস্কৃতির সাথে উৎপ্রোতভাবে জড়িত- বললে অতিরিক্ত হবেনা। তেমনি ফারসি সাহিত্যের পঞ্চ তারকার অন্যতম জ্যোতি হলেন মাওলানা জালাল উদ্দিন মুহম্মদ বাল্খি রুমি। তিনি ইরান ও বিশ্ব মুসলিম সাহিত্যের একজন গৌরবপূর্ণ ব্যক্তি। পূর্ব ইরানের অধিবাসীদের একজন মধ্য এশিয়ায় বসবাস করে সালযুকি দরবারকে আলোকিত করেন। তাঁর সম্মান ও প্রতিপত্তির শেষ ছিলনা; যার মাযার তুরস্কের কৌনিয়ায় অবস্থিত। সেখানে সাধারণ ও বিশেষ ব্যক্তিদের মিলনমেলা ঘটে। মৌলভি পন্থার লোকদের সেমা ও সাহিত্য আসর সংস্কৃতির এক বিশেষ নিদর্শন বয়ে চলেছে।[৩৫] তাঁর রচিত *মসনাবিয়ে মানুভি* ও *দিওয়ানে শামস তাবরিযি* মুসলিম দর্শন ও সাহিত্যের অপূরণীয় রচনাসম্ভার। তদ্রুপ শামসুদ্দিন মুহম্মদ হাফেজ শিরাজি একজন প্রতিভাবান কবি। তিনি গজল রচনার জন্য বিখ্যাত। জার্মানের গ্যোতে তাঁকে পৃথিবী খ্যাত অন্যতম কবি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[৩৬] মাওলানা আবদুর রহমান জামির প্রসঙ্গটি তদ্রুপ উল্লেখ করার মত। তিনি হেরাতে জন্মগ্রহণ করে ধর্মীয় সংস্কৃতি জগতের সুনাম কুড়িয়েছেন। 'হাপ্ত আওরাঙ্গ' নামে খ্যাত তাঁর সাতটি মসনবি বিশেষ প্রসংসার দাবীদার। সেই মসনবিতে যে সব হাম্দ ও না'ত রয়েছে খুবই প্রশংসিত।[৩৭] আমরা মোল্লা

Dakha University Institutional Repository

হোসেন কাশিফীর নামও উল্লেখ করতে পারি। তাঁর *রওযাতুশ শোহাদা* কাব্যগ্রন্থটি বিশেষ খ্যাতি রাখে। সাফাভি যুগের অন্যতম কবি ওহাশি বাফকি ও কালিম কাশানি আহলে বায়াত ও আশুরা সম্পর্কে কবিতা রচনা করেছেন।[৩৮] ধর্মীয় সংস্কৃতিতে তাঁদের অবদান কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

## বাংলাদেশের ধর্মচর্চায় সংস্কৃতি

আর্য আগমনের পূর্বে ভারত অঞ্চলে পূজা করার প্রবণতা ছিল। তাঁরা সূর্য, আগুন ও সর্পের পূজা করত। ভারতীয়রা তাঁদের ভূখণ্ডে ইসলাম ধর্ম প্রবেশের পূর্বে বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম পালন করতেন। ইসলাম আগমনের পর অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। প্রাচীন ভারত এবং ইরানে আর্যদের ধর্ম সংস্কৃতি খ্রিস্টপূর্ব ৭০০ এর পূর্বে একই অবস্থানে ছিল। একই শাখা ও একই গোত্রের অধীন হওয়ায় তাঁদের মধ্যে তিনটি বড় গোত্র ছিল। তাঁদের ভাষা, আকাইদ, নিয়ম রীতির মধ্যে কোন প্রকার বিভেদ ছিল না। আর্যরা ইতিহাসের প্রারম্ভিক যুগে পামীর অঞ্চলে বসবাস করত। জীবিকা এবং কাজের অনুসন্ধানে তাঁরা পামীর ত্যাগ করে হিন্দুস্তান ও ইরানের দিকে অগ্রসর হয় এবং তাঁরা দু'টি স্থানে বসতি গড়ে তোলে।[৩৯] সে ধর্ম যে বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করেনি এমনটি বলা যাবেনা। আমরা বঙ্গীয় অঞ্চলের ধর্ম-সংস্কৃতি কীরূপ ছিল সে বিষয়ে আলোচনা প্রয়োজন বলে মনে করি। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম আবির্ভাবের পূর্বে বৈদিক ধর্ম ছিল। সে ধর্মের আচার-আচরণ ছিল প্রকৃতির পূজা ও পশুবলিসহ কয়েকটি কঠিন নিয়ম কানুন পালন।[৪০] তখন বর্ণ ও শ্রেণির গুরুত্ব ছিল খুব বেশি। ব্রাম্মন, ক্ষত্রীয়, বৈশ্য ও শূদ্র শ্রেণি– এই সময়ের সৃষ্টি। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব ঘটেছে। এ সময়ে বৈদিক ধর্মের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করে সমাজের নীচু শ্রেণি ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। তবে  সে সময়ে ধর্মের সাথে এক একটি ভাষার স্পৃক্ততা থাকতে দেখা গিয়েছে। হিন্দু ধর্মের সাথে যেমন সংস্কৃত ভাষার সম্পর্ক ঠিক পালি ভাষার মাধ্যমে বৌদ্ধধর্ম বিকাশ ছিল ধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ধর্মটি কখন বাংলায় পরিচিতি পেয়েছে তা স্পষ্ট নয়। ঐতিহাসিক মতে, মগধ-শাসনামলে বৌদ্ধধর্ম পরিচিতি পেয়েছে। বাংলায় এ বৌদ্ধধর্ম পালযুগ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল। তারপর থেকে শুরু হয় হিন্দু ধর্ম।[৪১] বঙ্গে মুসলমান আগমনের পূর্বে হিন্দু, বৌদ্ধ জাতি ধর্ম-সংস্কৃতির সুনির্দিষ্ট কাঠামো তৈরী করেছিল। বঙ্গের প্রাচীন যুগ ব্যাপী তাদের আবর্তন লক্ষ করা যায়। একই পরিবর্তন সূচিত হয় মধ্যযুগের সূচনালগ্নে। ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খিলজি নদীয়া আক্রমণ করেন। এ সময়ে বঙ্গে আগমন ঘটেছে ইসলাম ধর্ম। তখন থেকে সূচিত হয় একটি নতুন সংস্কৃতির।[৪২] ইসলাম ধর্মের প্রভাব ও বিস্তার সনাতনি ধর্মের উপর প্রভাব পড়ে। ফলে দেশীয়

সংস্কৃতির সাথে ইসলামি সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটেছে প্রচুর। সময়ের বিবর্তনে এটি একটি বাঙালি সংস্কৃতিতে পরিণত হয়।

তুর্কিদের বঙ্গ বিজয় থেকে আরম্ভ করে আঠার শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বহুবার রাস্ট্রের কাঠমো পরিবর্তন সংস্কৃতি বিবর্তনের একটি দিক। বখতিয়ার খিলজির পর থেকে সিরাজ উদ্দৌলা পর্যন্ত বহু শাসক বাংলা শাসন করেন। দিল্লির সুলতান, তুর্কি-আফগান, মুঘল সম্রাট এবং নবাবগণ ছিলেন সে শাসনের অন্তর্ভূক্ত। এ সময় বাংলায় রাজধানী স্থাপন, শহরের উত্থান, স্থানীয় সংস্কৃতির লালন, দেশীয় রীতি নীতির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। যারা শাসন করেছিলেন তাঁরা পূর্বের হিন্দু রাজাদের অনুকরণ করে ছিলেননা এমনটি বলা যাবেনা। এই সময়ে হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতির মিশ্রণ ছিল অভূতপূর্ব।[৪৩] ইসলামের সাথে শরা শরিআত এবং সুফিমত প্রকাশ পেয়েছে। শরীওতের দৃষ্টিতে ইসলাম একটি মুক্তি ও শান্তির ধর্ম। এ ধর্মের বিপরীতে অন্যান্য ধর্ম বাতিল ও অনুসারীরা কাফির। হিন্দুরা যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের বিষয়টি একেবারেই পৃথক। অনেক হিন্দু ইসলামের সাথে বিরোধ করলেও সুফিমতের প্রতি উদার ছিলেন। তাঁদের মাঝে সাধন মার্গ সৃষ্টি সুফি মতেরই প্রভাব।[৪৪]

বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতির একটা জগৎ ছিল। তবে অভাব চিরকালই অনুভূত হয়েছে বলা যেতে পারে। অনুকরণ ও অনুসরণের মধ্যেই বাঙালির সংস্কৃতি নিহিত রয়েছে। এ দেশ এবং গোটা ভারতবর্ষ বিদেশীদের মাধ্যমে শাসিত হয়েছে বহুদিন। ফলে বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতির বিষয়টি হারিয়ে যায় অপরের সংস্কৃতির মধ্যে। মোঙ্গলীয় জ্ঞান- সভ্যতার প্রভাবের মাধ্যমে বাঙালির সংস্কৃতিতে মুঘলদের প্রভাব পড়েছে। সেই সাথে ইরানি প্রভাব তো আছেই। বিশেষ করে মুঘলদের বাংলা জয়ের পর সমাজে দীর্ঘ স্থায়ী প্রভাব পড়ে। ইসলাম নতুনভাবে জন্মলাভ করেছে। সেই সাথে ধর্মীয় সংস্কৃতিগুলো নতুনভাবে রূপ পায়। সকল শ্রেণি মানুষের কাছে ধর্ম ও তার কাজগুলো আদর্শ হয়ে ওঠে।[৪৫] মোটামোটি বলা যায় যে, ইরানের সংস্কৃতি ও রীতি নীতি বঙ্গের মধ্যে যথাভাবে বিদ্যমান রয়েছে। সে সবের উল্লেখযোগ্য বিষয় আলোচনায় নিয়ে আসা প্রয়োজন। ইরানের সাফাভি শাসনের অবসানকালে বেশ কিছু ইরানি বাংলায় এসেছিলেন বলে এ দেশীয় গবেষকরা মনে করেন। তাঁদের থেকেও বাঙালিরা অনেক কিছু শিখেছিলেন। তাঁদের সাহচার্য পেয়ে এ দেশীয় মুসলমানরা বর্হিমুখি হতে শিখেন। এমনিতেই ফারসি ভাষার প্রতি উৎসাহ উদ্দীপনা আগে থেকেই ছিল। সে সময় তাঁদের সংস্কৃতিগুলোও ভালভাবে রপ্ত করে নিতে সক্ষম হয়।[৪৬] তবে বাস্তবতা এই যে, ইরানি জাতি

Dhaka University Institutional Repository


এদেশে অনেক আগ থেকেই এসেছিল। তখন থেকে ধীরে ধীরে যে বাঙালিরা সেই ইরানি সংস্কৃতির প্রতি মনোযোগী হতে থাকে তা বলা যায়। বঙ্গীয় অঞ্চলে ইসলাম প্রবেশের পর পারস্য সংস্কৃতি বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এখানের যে কতক ধর্মীয় সংস্কৃতি রয়েছে তা মূলত পারস্য সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করেই গঠিত হয়।[৪৭] বাংলার মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে পৃথক একটি সংস্কৃতির বহিপ্রকাশ ঘটাতে পারেনি। তখন একটি স্বতন্ত্রমুখী ব্যবস্থা গড়ে তুলার জন্য যে অবকাটামো বঙ্গে উপস্থিত থাকার প্রয়োজন ছিল- সেটির অভাবই বেশি অনুমিত হয়েছে। কেননা, ইসলাম ধর্ম প্রবেশের পূর্বে বঙ্গে হিন্দু ধর্মের সংস্কৃতি ছিল। তখন তাঁরা হিন্দু ধর্মের সংস্কৃতি পালন করতেন। অপরদিকে ইসলাম ধর্ম নির্দিষ্ট রীতি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। বাঙালিদের কোন সংস্কৃতি ইসলাম ধর্মের উপর প্রভাব রাখেনি। তখনকার সময়ে গ্রামের সংস্কৃতি আচার-অনুষ্ঠানকে ভিত্তি কওেন যে সংস্কৃতি গড়ে ওঠেছে তা কতক হিন্দু সংস্কৃতি। যে কারণে বঙ্গের মুসলমান তাঁরা কোনো আলাদা সংস্কৃতি সৃষ্টি করতে পারেনি।[৪৮] এ ক্ষেত্রে পারস্যের সংস্কৃতি ছিল ভিন্ন ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

## পারস্যের ধর্মীয় সংস্কৃতির প্রভাব

সংস্কৃতি ও ধর্মীয় পদ্ধতির প্রভাবের ক্ষেত্রে ইরানি উলামা ও সুফিদের অবদান অনেক। তাঁরাই জীবন-যাপনের পরিবর্তনের দিকগুলোকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন। বিশেষ করে ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সংস্কৃতির পরিবর্তনের দিকগুলো আরো বিশালভাবে জায়গা করে নেয়। ইসলাম ধর্ম প্রসারের সাথে সাথে ইরানীয় সংস্কৃতির প্রসরতাও বৃদ্ধি পায়। ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশেও সে প্রভাব ফুটে ওঠতে দেখা যায়। ইরানের সভ্যতা সংস্কৃতি উন্নত ও প্রাচীন যা ইতিহাসখ্যাত ইতোমধ্যে আলোচিত হয়েছে। এটি পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতা সমূহের একটি। এ সভ্যতাটির ব্যাপারে ভারতের আধুনিক হিন্দুরা আর্য ও বৈদিক উত্তরাধিকারের সূত্র ধরে নিজেদের সংস্কৃতির কথা বলেছেন। এ আলোচনায় ইরানে ইসলাম প্রবেশের পর যে নতুন সভ্যতা সংস্কৃতি গড়ে ওঠেছে এবং সেই ধর্ম সংস্কৃতি বংগে কতটুকু প্রভাব রেখেছে–সে বিষয়টিই আলোচনার মূল লক্ষ্য।

**১. ফারসি ভাষার ব্যবহার ও প্রচলন :** ভাষা মানুষের জীবন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতির একটি মিল আছে। ইরানীয়দের পাঁচটি ভাষা ব্যবহারের প্রচলন ছিল। যথা- পাহলাভি (پہلوی), ফারসি (فارسی), দারি (دری), খোজি (خوزی) ও সুরয়ানি (سریانی)। শুধু ফারসি ভাষাটি ইসলামি ভাষা হিসেবে মর্যাদা পেয়েছে। ইসলাম যুগে বহু আরবি শব্দের প্রবেশের মধ্য দিয়ে নতুন ফারসি ভাষার উৎপত্তি হয়। এটির উৎপত্তির পরও ভাষার আধুনিকায়নের ক্ষেত্রে তার অবস্থান

Dhaka University Institutional Repository

একইভাবে সুদৃঢ় থাকে।[৪৯] এই ভাষাটিকে আলেম সমাজের ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইরানিদের কম চেষ্টা করতে হয়নি। ঐতিহাসিক তাবারি কুরআনের বিস্তারিত তফসির ফারসি ভাষায় করেন। অনুরূপ ইসলাম ধর্মের বহুগ্রন্থ ফারসি ভাষায় করা হয়। ধর্মীয় আলোচনার উপযুক্ত ভাষা হিসেবে আরবির মতই এটি স্বীকৃতি লাভ করে। শুধু আরবি ভাষার মধ্যে নবি এসেছিলেন ফারসি ভাষার মধ্যে নয় এ বিশ্বাস ইরানি জাতি লালন করেন না। হযরত ইসমাঈল আ. এর পূর্ববর্তী নবিগণ আরবদের পূর্বপুরুষ ছিলেন ও তাঁরা আরবি ব্যতীত ফারসি ও অন্য ভাষায় কথা বলতেন।[৫০] নবিদের ভাষা হওয়ার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, এটি ইসলামের ভাষা হওয়ার ব্যাপারে কোনরূপ বাধা নেই। ইসলাম ধর্মের দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বহুদিন ধরেই ফারসি ভাষার একটি সুনাম রয়েছে। ফারসি একটি প্রাচীন ভাষা ও এর সাহিত্যও প্রাচীন। বলতে গেলে এ ভাষার যা কিছু রয়েছে সবই মৌলিক ও অকৃত্তিম। বিশেষত এ ভাষার যারা সেবক, পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সবাই এক একজন খাঁটি মুসলমান ও ধার্মিক। এ ভাষাটিই প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত হত।[৫১] তাঁদের রচিত অধিকাংশ কবিতাই ইসলাম ধর্মকে নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে। পারস্যবাসীরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেই ইসলামের জয়গান গেতে গেতে কবিতা আবৃত্তি করেছেন। কবি হাফেজ শিরাজি, ফরিদ উদ্দিন আত্তার, শেখ সাদি বা মাওলানা রুমি কেউই ইসলাম ধর্মের বাহিরে ছিলেন না।[৫২] বস্তুত ইসলামকেন্দ্রিক কবিতা তাঁদের জগৎ বিখ্যাত করেছে বলা যায়। ফারসি কবিতা যে আরবিয় কবিতার চর্চাকে আবেষ্টিত করে তোলেছে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। বিচিত্র দুনিয়ার মধ্যে ভিন্ন চরিত্র, আদর্শবাদী ব্যক্তিগণ ভিন্ন ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়েছেন। সত্য মানুষের সংখ্যাও অনেক বিচিত্রময়ী। কিন্তু ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের মানুষগুলো একজন দার্শনিক, সুফি বা দরবেশ ব্যতীত নন। তাঁরাই প্রেমের মাধ্যমে মানুষদেরকে একত্রিত করেছেন। মধুময় ভাষাটির ব্যবহারে একটি স্বাতন্ত্র লক্ষ করা যায়। এ ভাষাটি ইসলামের আলো চর্তুদিক ছড়িয়ে দিতে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।[৫৩] ধর্ম-সংস্কৃতিতে ফারসি ভাষার স্থান অনেক উর্ধ্বে। মানুষের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে ইসলামের অনেক রচনা লিপিবদ্ধ হয় ফারসি ভাষায়। এ ভাষাকে কেন্দ্র করে খোরাসান ও নিশাপুর অঞ্চল শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হওয়া কম গুরুত্ব রাখে না।

একই ভাবে বঙ্গে যে ভাষা ও সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে তা বিভিন্ন আঙ্গিক ও রূপে পরিপূর্ণ। ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র মতে, বহু ফারসি শব্দ প্রবেশ করেছে বস্তুর আগমন ও ব্যবহারের মাধ্যমে। যেমন- পর্দা, জামা, কাবাব, শরবত, শিরনি, জাপরান, কিশমিস, গোলাপ জল, হালুয়া ইত্যাদি। শব্দগুলোর আমদানীর সাথে জিনিষপত্রের ব্যবহার ঘটেছে প্রচুর।[৫৪] ধর্মের সাথে সাহিত্য

Dhaka University Institutional Repository


উৎপ্রোতভাবে জড়িত। ভারত বর্ষে হিন্দু ধর্মের উত্থানের মাধ্যমে সংস্কৃত সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। সে সময় ব্রাম্ম ধর্মের সাথে প্রতিধন্দ্বী ধর্ম ছিল বৌদ্ধ ধর্ম। বৌদ্ধ ধর্ম কে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় পালি সাহিত্য। একই ভাবে শিখ ধর্মের মাধ্যমে পাঞ্জাবি সাহিত্যের উদ্ভব ঘটেছে। বঙ্গে ইসলাম ধর্ম আবির্ভাবের মাধ্যমে বাংলা ভাষার পরিবর্তন- এটি ইসলামি সংস্কৃতির অন্যতম প্রভাব। পরিবর্তনীয় ভাষায় ইসলামি সাহিত্যের বিকাশ ছিল বাঙালি জীবনের অপর একটি ঘটনা।[৫৫] বাংলা ভাষায় ইসলাম ধর্মের প্রভাবে বহু ইসলামি সাহিত্য সৃষ্টি হয়। ইসলাম ধর্ম সম্পূর্ণভাবে পৌত্তলিকতার বিরোধি। হিন্দু ধর্মের সাথে তার কোন আপোষ নেই। বাদশাহ্ আকবর ধর্মসমম্বয়ের যে চেষ্টা করেছিলেন তা ছিল একেবারে কল্পনাহীন চিন্তা। মধ্যযুগে ইসলাম ধর্মই বাঙালি জীবনের পরিবর্তন এনে দেয়।[৫৬] আর্য ও অনার্যদের মধ্যে ধর্মীয় বিষয়ে আপোষ হয়েছিল। কিন্তু ইসলাম ধর্ম কোন ধর্মের সাথে আপোষ করেনি। সংস্কৃত ভাষার প্রতি যেমনিভাবে হিন্দুদের ভক্তি ও ভালবাসা ছিল ঠিক ইসলাম আসার পর মুসলমানরা আরবি ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠে। এমনকি মধ্যযুগের মুসলমানরা আরবি ফারসির ধর্মীয় গ্রন্থকে অনুবাদ বাংলা ভাষায় করাকে পাপ মনে করতেন।[৫৭] তাঁরা এটি একটি ধর্মীয় সংস্কৃতির অংশ হিসেবেই গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। তাঁদের ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি উদার ও মনযোগ হওয়াও ধর্মের প্রতি আনগত্য ও সম্মান প্রকাশের কারণ। যে কারণে তাঁরা কখনো ফারসি ভাষার চর্চা ও সমৃদ্ধি থেকে দূরে ছিলেন না। এটা সত্য যে, সংস্কৃতির শক্ত বাহন হলো ভাষা। এটিকে বহমান নদীর সাথে তুলনা করা যেতে পারে। নদী যেমন কখনো খাল বিলের পানি ধারণ করে আবার কখনও প্রবাহিত করে তেমনি ভাষা। ভাষা কখনই একটি সীমায় আবদ্ধ থাকেনা বরং নিজেকে উজাড় করে দিতে ভালবাসে। গ্রহণ ও বর্জনের মধ্য দিয়ে ভাষার সুকুমার্য বৃদ্ধি পায়।[৫৮] বাংলা ভাষার মধ্যে যে ফারসি শব্দের প্রবেশ ঘটেছে সে দিক দিয়ে সে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পেরেছে ঐ সকল শব্দ স্থান করে দিয়ে। খোদা, বেহেশত, দোযখ, নামাজ, রোজা, শব্দগুলো সুমিষ্ট ও সুমধুর। এ ক্ষেত্রে ঈশ্বর, নরক, উপাসনা, উপবাস শব্দগুলো মৌলিক কর্মের বিষয় হারিয়েছে বলা যায়। ফারসির প্রতি শব্দের এক একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ করলে তা ব্যক্ত হয়না। দরবারি ভাষা ফারসির সাথে হিন্দু মুসলিম সবাই একই সময়ে পরিচয় লাভ করেছিল। এটি দ্রুত প্রভাব রাখার অন্যতম কারণ হল মুসলমানদের স্বাজাত্যবোধ ও সহযোগিতা। বঙ্গের মুসলমানদের মাঝে আরবি ফারসির প্রচলন প্রথমে বহিরাগত মুসলমানরা করেছিলেন। ধীরে ধীরে তাঁদের ভাষাই মুসলমানদের ভাষা হিসেবে স্থান করে নেয়।[৫৯] ধর্মীয় ক্ষেত্রে বহিরাগত মুসলমানরা কেবলমাত্র আরবি ভাষা ব্যবহার করতেন তা সঠিক নয়। আমরা প্রতিনিয়ত ফারসি ভাষার বহু শব্দ বাংলা ভাষায় ব্যবহার করে থাকি। এ গুলো বহিরাগত পারস্য বা তুর্কি মুসলমাদেরই অবদানের ফল।

Dhaka University Institutional Repository


**২. মাদ্রাসা শিক্ষার প্রচলন:** ধর্ম চর্চার অভ্যাস ইরানীয়দের মাঝে বহু পূর্ব থেকেই বিদ্যমান রয়েছে। পাহলভি ও গ্রীক ভাষায় তাঁদের মাঝে ধর্ম চর্চা হত। প্রথম দিকে ইরানে গ্রীক দর্শন চর্চার বিষয়টি ঈসা আ. এর ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। সাসানি যুগে ঈসায়ি ধর্ম চর্চা হত মাদ্রাসায়। সে চর্চার স্থানকে মাদরেসায়ে ইরানীয়ান (مدرسهٔ ایرانیان) বলা হত। অবশ্য পঞ্চম হিজরি শতকে এসে এসব শিক্ষার নাম দাবেস্তান বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হয়।[৬০] স্থান ও সময় অনুযায়ী মাদ্রাসা নামটি ইরানেই ভিন্নভাবে ব্যবহার হয়েছে। হাতে খড়ি ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের অন্যতম স্থান হলো মাদ্রাসা। মাদ্রাসায় ইসলাম শিক্ষাটি পারস্যে তৃতীয় হিজরি শতক থেকে চালু রয়েছে। এটিকে শরিয়তি শিক্ষার অন্যতম শিক্ষাপদ্ধতি বলা হয়। এলমুল কেরাত, এলমুত তাফসীর, এলমুল হাদিস, এলমে ফিকাহ, এলমুল কালাম ইত্যাদি শরিয়তি শিক্ষার ভিত্তি। এ শিক্ষার জন্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে রূপ দিতে একটি স্থানের নাম ব্যবহার করা হয়েছে তা হল মাদ্রাসা। একমাত্র মাদ্রাসাই হলো ইসলাম শিক্ষার নির্ধারিত শিক্ষাকেন্দ্র। সে সময় ইসলাম ধর্মের বিষয়গুলো পুরাপুরি মাদ্রাসায় পড়ানো হত বিধায় ধর্মচর্চাও ছিল মাদ্রাসাকেন্দ্রিক। বলা বাহুল্য যে, সাসানি যুগে যে সব মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল আরবি শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মের নানা বিষয় পাঠ হিসেবে পড়ানো হত।[৬১] এ ছাড়া সে সময় শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে মাদ্রাসা ছিল প্রধান। পঞ্চম, ষষ্টম এবং সপ্তম হিজরি শতকে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে মাদ্রাসা শিক্ষা। ইসলামি সংস্কৃতির অন্যতম বাহক ও ধারক হলো এই 'মাদ্রাসা'[৬২]। ইসলাম ধর্ম চর্চা ও বিকাশের ক্ষেত্রে এ শিক্ষার অবদান অনেক। একইভাবে ইসলাম শিক্ষার বিস্তার ও প্রসারের জন্য দেশের সরকার ব্যতীত গোত্র ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক বহু মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তন্মধ্যে মাদ্রাসা ই নিজামিয়া অন্যতম। এটি আহলে সুন্নাহদের মাদ্রাসা হিসেবে পরিচিত। নিজামিয়া মাদ্রাসা সালজুক উযির নিযামুল মুলক প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ইরানে অসংখ্য মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন। এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পিছনে শাফেয়ি মাযহাবের চর্চা নিহিত ছিল।[৬৩] এভাবেই ইরানে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। এই শিক্ষাটি শুধু নিজেদের দেশেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। খ্রিস্টীয় পনের শতকের দিকে সমরকন্দ ও বোখারায় মাদ্রাসা স্থাপিত হয়।[৬৪] মুসলিম আমলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলেও অসংখ্য মাদ্রাসা গড়ে ওঠেছে। অবশ্য বাংলাদেশেও সেই ধারাটি বেশি প্রভাবিত করে। বাংলায় আরবি ফারসি শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা মক্তব স্থাপিত হয়েছে অত্যধিক। উইলিয়াম অ্যাডাম তাঁর শিক্ষা বিষয়ক গবেষণায় এক লক্ষের অধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। মুসলমান যুগের স্থাপিত বিদ্যালয়গুলো ছিল মূলত মাদ্রাসা-মক্তব। সরকারি সহযোগিতার পাশাপাশি অনেক মাদ্রাসা ব্যক্তি উদ্যোগেও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ঢাকার 'শায়েস্তা খাঁ মাদ্রাসা'টি ছিল ব্যক্তি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত অন্যতম মাদ্রাসা। যেখানে কবি শাহ নুরি অধ্যয়ন করেছেন। অভিজাত ও

Dhaka University Institutional Repository

ধনী পরিবারের সন্তানেরা এসব মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষালাভ করতেন।[৬৫] তাঁদের পাঠ্য হিসেবে আরবি ও ফারসির রচনাদি ছিল যা মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করতে হত। ধর্ম, ইতিহাস-ঐতিহ্য, অভিধান, ব্যাকরণ, কাব্য ইত্যাদি বিষয়ের ফারসি রচনা না পড়ে কখনও শিক্ষিত হওয়া যেতনা। সে সময়ে মাদ্রাসা শিক্ষা বা ধর্ম শিক্ষার মাধ্যম ছিল ফারসি। ফারসি ভাষাকে মুসলমানগণ ধর্মীয় ভাষা হিসেবে ব্যবহার করলেও তাঁদের মাঝে আরবি ভাষারও প্রাধান্য ছিল।[৬৬] মধ্যযুগে মাদ্রাসা ও মক্তব শিক্ষা ধীরে ধীরে এ দেশীয় একটি শিক্ষা সংস্কৃতি হিসেবে রূপ পেয়েছে।

**৩. আরবি ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি:** ইরানীয়রা ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর আরবি ভাষাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। এমনকি নামায আদায় করতে গিয়েও মাতৃভাষা ব্যবহার করার উপর ফতোয়া চেয়েছিলেন। ইমাম আবু হানিফা অন্য ভাষায় ক্বেরাত পড়ার বিধান থাকলে ফারসি ভাষায় নামাযে ক্বেরাত পাঠ করার উপর ফতোয়া প্রয়োগ করতেন। কুরআন ও হাদিসের ভাষা আরবির কারণে সমাজের সকল স্তরে আরবি ভাষার গুরুত্ব বেড়ে যায়। ইসলাম ধর্মের উপর তাঁরা গবেষণাকালে আরবির ব্যবহারকে প্রাধান্য দিয়েছেন।[৬৭] ফারেসের ফিরোজাবাদ নগরের অধিবাসী ছিলেন আবদুল্লাহ বিন মোকাফ্ফা। তিনি দ্বিতীয় হিজরি শতকের প্রথম দিকের একজন উল্লেখযোগ্য ইরানি আরবি লেখক। তিনি পাহলাভি ভাষা থেকে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থের আরবি ভাষায় অনুবাদ করেছেন। তাঁর অনুবাদকৃত গ্রন্থগুলো হল: *খোদাই নামে*, *আইন নামে*, *কালিলা ওয়া দেমনে*, *কিতাবে মাযদেক*, *কিতাবে তাজ*, *নামায়ে তানসার* ইত্যাদি। তিনি আরবদের নিকট ইরানের প্রাচীন বিষয়াবলি আরবি ভাষার মাধ্যমে উপস্থাপন করেছিলেন।[৬৮] যে কারণে ইসলাম ধর্মের বিষয়গুলো তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছে। ইরানীয়রা আবেস্তা ভাষাকে পরিত্যাগ করে প্রথমে আরবি ভাষার মর্যাদা দিয়েছিল। আরবি ভাষার প্রতি সম্মান জানানো ছিল তাঁদের প্রধান কাজ। এটিও এদেশের সংস্কৃতিতে প্রভাব রাখে।

**৪. বিশ্বাস ও আনুগত্য প্রকাশ:** ইসলামে মালেকি, হানফি, শাফয়ি ও হাম্বলি প্রধান চারটি মাযহাবি শাখা রয়েছে। এ শাখার মুসলমানগণ প্রত্যেকে ইমাম অনুসরণ করে ইসলামের বিধান পালন করে থাকেন। সালযুক যুগে যে কয়টি মুসলিম দল গঠিত হয়েছিল তন্মধ্যে আহলে সুন্নার দলটি অন্যতম। সে সময় রাজা ও রাজার অধীন সরকারি কর্মচরীরা সুন্নিদের পথ অনুসরণ করে চলতে ভালবাসতেন। যে কারণে ইরানে সালযুক যুগে সুন্নি সম্প্রদায় বৃদ্ধি ঘটেছে। সুন্নি সম্প্রদায়ের মাঝে হানফি মাযহাব মেনে চলা একটি প্রধান বিষয়। হানফি এবং হাম্বলি এ দু'টি মাযহাবের অনুসারী ইরানের পূর্ব অঞ্চলে বেশি পাওয়া যায়।[৬৯] শিয়া মাযহাব অনুসারেও তাঁরা ইমামদের সম্মান জানানোকে অধিকতর গুরুত্ব

Dhaka University Institutional Repository

দিয়ে থাকেন। ইসলামে বিশ্বাস ও আনুগত্য প্রদানের বিষয়টি ধর্মীয় সংস্কৃতির অংশ হিসেবে দেখা হয়। বঙ্গের সংস্কৃতিতেও এটির গুরুত্ব রয়েছে।

**৫. সুফিবাদ চর্চা:** পঞ্চম হিজরি শতকের মধ্যবর্তী সময়কাল থেকে সপ্তম হিজরি শতক পর্যন্ত ইরানের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই দুই শত বছর ইরানে বহু সুফির আর্বিভাব ঘটেছে।[৭০] ইরানকে ঘিরে সুফি জগতের ইতিহাসটি যেভাবে লেখা হয়ে থাকে তা মোটেও অতিরঞ্জিত নয় বরং তা সত্য ও বাস্তবধর্মী। ইরানে ইসলাম ধর্ম প্রবেশের পর সুফিবাদ যেভাবে ইরানীয়দের মাঝে প্রভাব ফেলেছে ইসলাম ধর্ম উৎসস্থান আরবে ততটা প্রভাব ফেলেনি। এটির কারণ উৎঘাটন করা যেতে পারে নিম্নভাবে। ইরানীয়রা পূর্ব থেকেই ধর্মের উপর অবিচল ছিলেন। ধর্মের উপর বিশ্বাস ও পরিপূর্ণ আস্থা তাঁদের মাঝে এক ধরনের শক্তি সৃষ্টি করেছে। ইসলাম আগমনের পূর্বে তারা জরথুস্ত, মানি, বুদ্ধ ধর্মের মতবাদগুলো নিয়ে চর্চা করত। এক ধরনের মতবাদ ও শাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাসের ফলে তাঁদের চিন্তা দর্শন পরিপূর্ণভাবে বৃদ্ধি ঘটে।[৭১] যার ফলে তাঁরা ইসলাম গ্রহণের পরপরই ইসলাম ধর্মের বিষয়গুলো নিয়ে ভাবতে শুরু করেন এবং তাঁদের একটি মতবাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে বিলম্বিত হয়নি। তাঁদের মাধ্যমে দ্রুত সুফিমতবাদ পারস্যে উৎপত্তি লাভ করেছে। চর্চা ও বিকাশের জন্য একমাত্র পারস্যবাসীরা শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেছে বলা যায়। যেসব সুফিমত বা তরিকা রয়েছে এসবের উৎসদাতা পারস্য অঞ্চল। এক কথায় সুফিবাদের চারনভূমি হলো ইরান তথা পারস্য। তাঁদের জ্ঞান ও সুফিচর্চার অন্যতম স্থান হলো খান্‌কাহ। তবে তাঁদের মাঝে সুফিচর্চাই ছিল খানকাহ প্রতিষ্ঠার অন্যতম লক্ষ। ইরানে খানকায় তিন ধরণের লোক বসবাস করত। যেমন- পির ও মুরীদান বা সলেকান ও খাদেমান।[৭২] বাংলায় সুফি দরবেশদের কর্ম ও তাঁদের সুফিবাদী চর্চার স্থান খানকাহ ব্যতীত ছিলনা। বাংলার মুসলমানরা সুফিদের থেকে ধর্মীয় শিক্ষা পেতে এসব খানকায় ভিড় জমাতেন।

**৬. পিরদের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা:** ইরান ও উত্তর এশিয়ার দেশ সমূহে সুফিবাদের ব্যাপক প্রসার লক্ষ করা গিয়েছে। সুফি সাধকদের কেন্দ্র করেই অগণিত দরগাহ ও খানকা শরীফ গড়ে ওঠেছে। এসব খানকা বা দরগায় সুফিবাদের কথাগুলো কবিতা ও উপদেশবাণীর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে থাকে। তাঁদের দরগাহ ও খানকায় মুরিদদের মাঝে ওয়াজ নসিহত করা হত। তা থেকেই এ দেশে ওয়াজ-নসিহতের রেওয়াজ এসেছে।[৭৩] যারা ওয়াজ নসিহত করেন তাঁরা এসব দরগায় সুফিদের মূল নীতি ও আচার আচরণ প্রচার করেন। পিরের কদমবুসি, মান্নত মানা, দরগাহ বানানো, ইত্যাদি সমাজে

Dhaka University Institutional Repository

প্রচলিত ধর্মীয় রীতিতে পরিপূর্ণ। গ্রামের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে শহরেও এর রেওয়াজ ছিল যা এখনও রয়েছে।[৭৪] আমরা পিরবাদের যে সংস্কৃতি পাই, এটি প্রথম ইরানীয়দের থেকে শুরু হয়েছে। দরবেশ ও পিরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস এবং ভালবাসা প্রকাশ এ জাতির একটি আলাদা বৈশিষ্ট্য। সেই বৈশিষ্ট্যের দিকগুলো বঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে প্রভাব রাখাই একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। পির ও দরবেশদের জন্য ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা শুধু মুসলমানদেরই ছিল না হিন্দুরাও তা বিশ্বাস করতেন। বাঙালিদের মাঝে সত্যপির মতবাদ এরই একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য।[৭৫] হিন্দু মুসলিম সবাই পিরদের প্রতি অগাধ বিশ্বাসের কারণে এ মতবাদ গড়ে ওঠেছে।

**৭. মোহরম উৎসব পালন:** হজরত ইমাম হোসেন এর শাহাদাতকে লক্ষ করে মোহরম মাসের দশ তারিখ একটি বিশেষ দিন হিসেবে পালিত হয়।[৭৬] প্রতি বছর মোহরম মাস এলে শিয়া ও সুন্নি মতালম্বি মুসলমানগণ দু'ভাবে মাসটি উদযাপন করেন। যেমন-রোজা, নামায- এবাদাত ও কারবালার চিত্র প্রদর্শন। উল্লেখ্য যে, এ মাসটির প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন পারস্যবাসীরা। পারস্যরা প্রথমে মহরমের দশ তারিখে 'তাজিয়া মিছিল'[৭৭] বের করত: গুরুত্ব তুলে ধরেন। ঠিক একইভাবে বঙ্গের মুসলমানরা দিবসটি পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করে ইসলামি সংস্কৃতি চর্চার বিকাশ ঘটিয়েছেন। দিবসটি সুন্দরভাবে পালনের জন্য নিরামিশ খেয়ে রোজা রাখার প্রবণতা একটি লক্ষণীয় বিষয়। বঙ্গে ইসলাম প্রবেশের সাথে সাথে পারস্যের মুসলমানদের রীতি ও তাঁদের সাথে সম্পৃক্ত কিছু বিষয়ও প্রবেশ লাভ করেছে বলা যায়। তাজিয়া মিছিল, শোভা যাত্রা, মর্সিয়া গাওয়া কখনই ইসলামের প্রারম্ভে ছিলনা। পারস্য থেকে শিয়া মাযহাবধর্মী আলেম ও মুসলমান আগমনের পর পরই এ দেশের মুসলমানদের মাঝে প্রভাব ফেলে। এটি এ দেশীয় একটি মুসলিম সংস্কৃতির অন্যতম দিক।[৭৮] এটি প্রতি বছর উৎসব করে পালিত হয়।

**৮. ঢিলে ঢালা পোষাক পরিধান :** হিন্দুদের যে পোষাক ছিল মুসলমান তা পরিধান করতেন। পুরুষদের ধুতি ও মেয়েদের শাড়ি ব্যতীত আর কোন পোষাক ছিলনা। দরজি সম্পর্কে তাঁদের ধারণা কম ছিল। দরজিরা সেলওয়ার, কামীস, উরনা তৈরি করত। এক সময় মুসলমানের ঘরে এসবের ব্যবহার শুরু হয়। বাঙালিরা বহিরাগত মুসলমানদের নিকট থেকে জামা, মোজা, পিরহান, রুমালের ব্যবহার শিখেছে।[৭৯] বাংলার মুসলমানদের মধ্যে দর্জির পেশা ছিল। অনেকে শুধু এ পেশার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাঁদের মাঝে এ পেশাটি একচেটিয়া ছিল বলে তাঁরা নিজেদেরকে গর্ববোধ করত।[৮০] মুসলমানদের মাঝে চওড়া পায়জামা পরিধানের রীতি ছিল। পারস্যে ইসলাম আগমনের পর

তাঁরা চওড়া পায়জামা পরিধান করতেন। ইসলামি যুগে আব্বাসীয় খলিফার সময়ে যে ধরণের পায়জামা ব্যবহার করে ছিল তা অনেকটাই চওড়া ছিল।[৮১] ইসলাম আগমনের পরই বঙ্গীয় অঞ্চলে মুসলমানরা ধূতি ছেড়ে পায়জামা পরিধান করা শিখেছে। তাঁরা নামাজ পালন ও ধর্মীয় উৎসব পালনের সময় এ সব পোষাক পরিধানকে পুণ্যের কাজ হিসেবে গণনা করেন। ধর্মীয় সংস্কৃতিতে সালওয়ার, কামিজ, শেরেওয়ানি, ইত্যাদি পরিধান অনেক গুরুত্ব রাখে।[৮২]

**৯. পাগড়ি ও টুপি ব্যবহার:** ইসলাম ধর্মে পাগড়ি ও টুপি পরিধান করাকে সুন্নত হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। মসজিদের ইমাম ও পির বংশীয় প্রধানগণ সাধারণত সবসময় পাগড়ি ও টুপি পরিধান করেন । এ দেশের মুসলমানরা এ রেওয়াজটি চালু করেছেন অন্যের থেকে গ্রহণ করে তা বলা যায়। এ রীতিটি অনেকটা দেখাদেখির মাধ্যমে এ দেশের মুসলমানদের মাঝে স্থান করে নেয়। এ দেশে ইসলাম প্রবেশের সময় ইরান, ইরাক ও আফগানিস্তান থেকে বহু মুসলমান আগমন করেছে। তাঁদের অনেকের এসব পোষাক-পাগড়ি ও টুপি পরিধান অবস্থায় থাকত। শেখ জালাল উদ্দিন তাবরিযি যখন বাংলায় আগমন করেন তখন তাঁর মাথায় পাগড়ি এবং হাতে লাঠি ছিল।[৮৩] ঐ সব দেশে এগুলোর প্রচলন ও ব্যবহার সম্মানজনকভাবে থাকায় এখানে এসেও তাঁরা তা পরিত্যাগ করেননি। তাঁদের জাতীয় পোষাকটিই এদেশের সংস্কৃতিতে বিশেষভাবে স্থান করেছে। এমনকি এদেশের বিবাহ-শাদি ও খাত্নার মধ্যেও টুপি ও পাগড়ি পরিধান করা বাধ্য হয়ে আছে।[৮৪] সমাজে টারকি টুপি বা দরবারি টুপির প্রচলন তা থেকেই উৎপত্তি লাভ করে। পারস্যবাসীরা যে টুপি পরিধান করত তা ছিল লম্বাকার ও মোচার ন্যায় যাকে আমরা কিশ্তি টুপি হিসেবে উল্লেখ করে থাকি। খলীফা আল মনসুর থেকে শুরু করে পারস্যে অনেক সম্রাট টুপি পরিধান করাকে পছন্দ মনে করতেন। এমনকি অনেকে টুপি উপহার দেয়াকে ভালভাবে দেখতেন।[৮৫] সবচেয়ে বঙ্গের মওলানা, মৌলভি সাহেবদের পায়জামা, টুপি, পাঞ্জাবি পোষাক পরিধান একটি রেওয়াজে পরিণত হয়। সাধারণের মধ্যে যারা ধার্মিক ছিলেন তাঁরাও এ পোশাক পরিধান করতেন। মুসলমান আমিরদের মধ্যেও কালো পোষাক পরিধানের রীতি ছিল।[৮৬] বর্তমানে সমাজে অনেকেই কিশতি টুপি পরিধান করে থাকেন। এ ছাড়া মুসলমানরা অনেক ধরণের টুপি ব্যবহার করে থাকেন। মহিলাদের শাড়ি ও কামিজ দু'টোই ছিল। তবে অভিজাত মুসলিম পরিবারের মহিলারা কামিজ সেলোয়ার পরিধান করতেন।[৮৭] এ সময় হিন্দুরাও মুসলমানদের ন্যায় বিশেষ পোষাক পাগড়ি ও ঢিলেঢালা জামা পরিধান করতেন।

Dhaka University Institutional Repository


**১০. আকিক বা ফিরুজা আংটি ব্যবহার:** আংটি পরিধান ইসলাম ধর্মের অরিহার্য কোনো বিষয় নয়। মুসলমানদের মাঝে অনেকে আংটি পরিধান করাকে সাচ্ছন্দবোধ করেন। পারস্যবাসীরা পাথরের আংটি পরিধান করাকে নেকফাল মনে করে থাকে। খলিফা হারুন উর রশিদ পারস্য থেকে চুনি পাথর ক্রয় করে ছিলেন।[৮৮] তিনি চুনি পাথরের আংটি ব্যবহার করতেন। ইরানীয় বাদশাহ থেকে শুরু করে সাধারণ জনগণ আংটি পরিধান করাকে একটি নেকফাল বা সুভাগ্য হিসেবে দেখে থাকেন। সেই আংটি পড়ার রেওয়াজ বাঙালিদের মধ্যে পাওয়া যায়। এই রেওয়াজটি বাঙালিদের মাঝে সৌখিন হিসেবে দেখাটা ঠিক হবে না। অনেকেই সুন্নত, নেক ফাল এবং রোগ মুক্তির কামনায় আংটি ব্যবহার করেন।

**১১. ঘরের আসবাবপত্রে চাকচিক্য :** বাঙালিরা ঘরের আসবাবপত্র ব্যহারের ক্ষেত্রে ততটা সৌখিন ছিল না। ঘরে শুবার সময় এক ধরনের ছাটাই ও তার উপর কাঁথা ব্যবহার করত। তোষক, বালিশ, খাট, তাকিয়া ও আলনা ইত্যাদির ব্যবহার মুসলমান আগমনের পর শুরু হয়। ঘরের আসবাবপত্র ব্যবহারের প্রত্যেকটি শব্দই ফারসি। যেমন- আল্না, পায়া, চারপায়া, তক্তা ইত্যাদি।[৮৯] বাহিরের মুসলমানরা এদেশে এসে তাঁদের জীবন যাপনের বিষয়গুলো দেশীয় সংস্কৃতিতে শুরু করেন। তারা কখনই বাঙালিদের ন্যায় জীবন যাপন করতেন না- এটিই স্বাভাবিক। বঙ্গের মুসলমানরা বহিরাগত মুসলমানদের থেকে আসবাব পত্রের ব্যবহার শিখার পাশাপাশি বাংলা ভাষায় শব্দগুলো স্থান করে নেয়।[৯০] এটি যে বাঙালিরা পারস্যদের থেকে পেয়েছিল তা বলা যায়। ঘরে জানালার পাশে বা দরজার সম্মুখভাগে পর্দা ঝুলানোর রীতিটা কখনই বাঙালির মধ্যে ছিলনা। এটিও তাঁদের থেকে শিখার পর সংস্কৃতিতে পরিণত হয়। এ দেশের আলেম সমাজের মধ্যে পর্দার রীতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

**১২. জন্মদিবস পালন:** নবি করীম (সা.) এর জন্ম দিবস পালন মুসলমানদের একটি ধর্মীয় উৎসবের অন্যতম দিন। ইরানীয়দের জন্মদিবস পালনের রেওয়াজ হাখামানশি যুগে শুরু হয়। তাঁরা তখন থেকে বড় বড় ব্যক্তিদের জন্ম দিবস পালন করে থাকেন। বিশেষত ঐ দিন তাঁরা আয়োজনের উৎসবে মেতে ওঠেন।[৯১] নতুন সন্তান জন্মলাভ করলেও সেদিন আনন্দ উৎসব করা হত। যে বেশি সন্তান জন্মলাভ করত তাঁকে রাজকীয়ভাবে পুরস্কৃত করা হত।[৯২] বঙ্গের মুসলমান পরিবারের মধ্যে আকিকা করে শিশুর কল্যাণ চাওয়ার নিয়ম রয়েছে। বিশেষ করে ছেলে সন্তান জন্ম নিলে অনুষ্ঠানে অধিক জাকজমকপূর্ণ করার রেওয়াজ রয়েছে যা একটি বাঙালির ধর্মীয় সংস্কৃতি।[৯৩]

**১৩. খান্কাহ ও আশ্রয়কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা:** এটি ইরানীয় সুফিদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁদের বাসস্থান ও বসবাসের জায়গাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেছে খানকাহ। বখতিয়ার খিলজীর পূর্বে বঙ্গে কোন খানকাহ প্রতিষ্ঠা দেখা যায়নি। মসজিদ প্রতিষ্ঠার পর থেকে সুফিদের জীবন-যাপনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে খান্কাহ প্রতিষ্ঠা পেতে থাকে। এ সব খানকায় সুফিরা মুরিদদের ওয়াজ নসিহতসহ বিভিন্ন বিষয়ে অবহিত করতেন। অনেক খান্কা শাসকদের সহযোগিতায় নির্মিত হয়েছে।[৯৪] যেসব খান্কা বাংলায় প্রসিদ্ধি পেয়েছে তন্মধ্যে সোনারগাঁওয়ে মৌলানা শরফ উদ্দিন আবু তাওয়ামা ও রাজশাহীর মহিসনের মৌলানা তকিউদ্দিন আরাবীর খান্কা প্রসিদ্ধ।

**১৪. ফারসি নাম ধারণ:** মুসলিম যুগের বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে এ প্রথা ছিল যে, মসজিদ, মক্তব ও কবরস্থানে আরবি ফারসি লিপি খোদাই করে রাখার মধ্যে সম্মান ও গৌরব রয়েছে। তাঁরা আরবি ফারসির নাম বরকত ও সুনামের জন্য ব্যবহার করতেন। এটি যে ভিন দেশীয় মুসলমানদের সাথে একটি সম্পৃক্ত বিষয় ছিল বাঙালি মুসলমানদের নাম ধারণের মাধ্যমে প্রকাশ ঘটেছে। নামের সাথে বেগম, খাতুন, সাহেব ইত্যাদি ব্যবহার করে নাম রাখার প্রথাটি মূলত ১২০৩ খ্রিস্টাব্দের পর থেকেই শুরু হয়।[৯৫] যে সব বাঙালি মুসলমানের নামের সাথে উপাধি ব্যবহার হয়েছে, অধিকাংশ শব্দই ফারসি। খেতাব ও খান্দান শব্দ দু'টি মূলত ফারসি ভাষার। মুসলিম সমাজে নামের সাথে খেতাবটি ইরানি চর্চার একটি দিক। সৈয়দ, শেখ, খোন্দকার, শাহ ইত্যাদি উপাধি বহিরাগত পাঠান, মুঘল বিভিন্ন গোত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট।[৯৬] এগুলো বাঙালি উপাধি নয়। মধ্যযুগে সমাজে রীতি ছিল যে, যারা সৈয়দ, শেখ ও আলেম ছিলেন তারা সমাজে বেশি সম্মান পেতেন। সুফি, দরবেশ ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদেরকে সবসময় সাধারণ ব্যক্তিরা বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করতেন।[৯৭] উল্লেখ্য যে, এ সংস্কৃতিটি গবেষক ড. আহমদ শরীফ ভাল দৃষ্টিতে দেখেননি। তাঁর মতে, বাঙালিরা যে আরব বা ইরানীয়দের অনুসরণ করে তাঁদের নিজস্ব নাম, জায়গা বা অন্য যে কোন বস্তুর নাম নির্ধারণ করত নিজেদের খ্যাতি লাভের কারণে। তাঁরা এ দেশের মাটিতে বসে ইরান, সমরকন্দ ও বোখারার বাসনা রাখত। তাঁদের চিন্তা-কর্ম নিজস্ব সংস্কৃতির ছিল না বললেই চলে।[৯৮]এটা নিশ্চয় ছিল সম্মানের বা অপর মুসলিম ভাইদের প্রতি আনুগত্যের।

## বাংলাদেশের মুসলিম সংস্কৃতি

মুসলিম সংস্কৃতি গড়ে ওঠেছে আরবি ভাষা ও ইসলাম ধর্মকে নিয়ে। ইরানীয় গোষ্ঠী ধর্মের সাথে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যকে সম্পৃক্ত করেছেন। বলা যেতে পারে যে, অনেকটা আরবি ও ফারসির উপর

Dhaka University Institutional Repository


মুসলিম সংস্কৃতি নির্ভরশীল। পারস্য সংস্কৃতির কোনটিই ধর্মের বাইরে নয়। তাই অতি সহজে পারস্য ধর্ম সংস্কৃতি বঙ্গে ইসলাম প্রচারকালে প্রবেশ করাটা ছিল খুবই স্বাভাবিক। মানব মুক্তি ও কল্যাণের পুরো জ্ঞান ও বিষয় পারস্যে নিহিত রয়েছে।[৯৯]

বাংলাদেশ ও বর্তমান ইরানের মধ্যে ভৌগলিক দিক দিয়ে অনেকটা দূরত্বই বটে। তবে ধর্মীয় সংস্কৃতির দিক দিয়ে এ দু'টি দেশ খুবই কাছাকাছি অবস্থানে রয়েছে। যে সব নিয়ম-নীতি এক সময় ইরানে প্রচলিত ছিল সেগুলো এখানে বাঙালি জীবনের অংশ হয়ে পড়েছে। বস্তুত ইরানীয় সংস্কৃতির অনেক বিষয় নিজেদের সংস্কৃতিতে মিশে গিয়েছে। এখন এগুলোকে ধর্মীয় সংস্কৃতির অংশ হিসেবে দেখা হয়।

আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, মুসলিম ধর্ম সংস্কৃতির বিকাশের ফলে এ দেশের জনজীবনে যে বিপ্লব সাধিত হয় তা শুধু জীবন পরিবর্তনের দিকটিই ছিল না সমাজ কাঠামো পরিবর্তনের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল। যেমন–ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, ধর্মের কর্মগুলো যথাভাবে পালন, ভাল আচার-আচরন করা, সম্প্রীতি ও মহানুভবতা, পরস্পর পরস্পরের প্রতি সম্মান দেখানো ইত্যাদি সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

<u>টীকা ও তথ্যনির্দেশ</u>

১. সভ্যতা সংস্কৃতি: সংস্কৃতি শব্দটির অর্থ ব্যাপক। এ শব্দটি দ্বারায় ঐতিহ্য, ইতিহাস ও সভ্যতা বুঝানো যেতে পারে। সংস্কার, আচার–আচরণ, আদব কায়দা ইত্যাদিও সংস্কৃতির অর্ন্তভূক্ত।- শরীফ, আহমদ, *সংস্কৃতি ভাবনা*, উত্তরণ, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ১।

২. মোস্তফা, গোলাম, *আমার চিন্তাধারা*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ১৭৮; চট্টোপাধ্যায়, শ্রী সুনীতিকুমার, *সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস*, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, ১৯৭৬, পৃ. ১৬ ও আহসান, সৈয়দ আলী, *আমাদের আত্মপরিচয় এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ*, বাড পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১৩।

৩. শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ, *ইসলাম প্রসঙ্গ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১১।

৪. শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ, তদেব, পৃ. ১২ ও পৃ. ৬২।

৫. তদেব, পৃ. ৬৭।

৬. শরীফ, আহমদ, *সংস্কৃতি ভাবনা*, উত্তরণ, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ১৬।

৭. সোবহানি, তওফিক, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, এন্তেশারাতে যাওয়ার, তেহরান, ১৩৮৮ হি.শা., পৃ. ৩২।

৮. সোবহানি, তওফিক, তদেব, পৃ. ৩৪।

৯. বাদাখশানি, মির্যা মকবুল বেগ, *তারিখে ইরান ( জেলদে আওওয়াল)*, শফিক প্রেস, লাহোর, ১৯৬৭, পৃ. ৩১।

Dhaka University Institutional Repository


১০. প্রাচীন ইরানের ধর্ম এক ছিলনা। ইরানীয়রা আর্য ধর্ম, মাদি ধর্ম, ঈসায়ি ধর্ম, জরথুস্ত ধর্ম প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ধর্মগুলোর অনুসারী ছিলেন। বিস্তারিত দেখুন- তারিখে ইরান কাবল আয ইসলাম, তারিখে কামেলে ইরান গ্রন্থ।

১১. বাদাখশানি, মির্যা মকবুল বেগ, *তারিখে ইরান ( জেলদে আওওয়াল)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৫।

১২. জরথুস্ত: শব্দটি ধর্ম ও ব্যক্তি নামে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসে নামটি যারতুস্ত (زرتشت) বা যারদুস্ত(زردست) রূপে পরিচিত। সাসানি যুগে জরথুস্ত ধর্মের প্রচলন শুরু হয়।-নায়া, হাসানপির,তারিখে ইরান কাবল আয ইসলাম, *তারিখে কামেলে ইরান*, মোয়াসসেসে এন্তেশারাতে নেগাহ, তেহরান, ১৩৯০ হি.শা.,পৃ. ২৪৯।

১৩. বাদাখশানি, মির্যা মকবুল বেগ, *তারিখে ইরান ( জেলদে আওওয়াল)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৬; সোবহানি, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪।

১৪. সোবহানি, তদেব, পৃ. ৪৩।

১৫. *বেদ* ও *আবেস্তা* গ্রন্থ দু'টি প্রাচীন ধর্ম জানার বড় নিদর্শন। একটি ভারতের অপরটি পারস্যের ধর্ম সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করছে।

১৬. ইরানীয়রা *আবেস্তা* ধর্মগ্রন্থটি প্রচুর সম্মান করতেন। গ্রন্থের পবিত্রতা নষ্ট না হওয়ার জন্য তাঁদের চেষ্টার কোনো প্রকার ক্রুটি ছিলনা। গ্রন্থের সকল বিষয়গুলো ধর্মের প্রধান ব্যক্তিদের নিকট সংরক্ষিত থাকত। ফলে জরথুস্তের জীবদ্দশায় তা লিখে রাখার প্রয়োজন হয়নি। তাঁর পরবর্তী সময়ে এ'টি দু বার লিখিত হয়। খ্রিস্টপূর্বের আবেস্তা লিপির লেখার কোনো দলিল নেই। বর্তমানে পাহলবি ভাষার ধর্মগ্রন্থ রয়েছে। -আবুল কাসেমি, মোহসেন, *ওয়াযেগানে যাবানে ফারসি দারি*, এন্তেশারাতে তুহুরি, ১৩৯০ হি.শা., পৃ. ১২।

১৭. হালি, আবদুল ও বেগম, নূরুন নাহার, *মানুষের ইতিহাস প্রাচীন যুগ*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১৩৪।

১৮. কাসেমি, মোহসেন আবুল, *ওয়াযেগানে যাবানে ফারসি দারি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫।

১৯. বারটল্ড, ভি. ভি., *মুসলমান সংস্কৃতি*, (মুহম্মদ ফজলুর রহমান অনূদিত) বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ. ৫৩।

২০. সোবহানি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭।

২১. বাদাখশানি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১০।

২২. তদেব, পৃ. ৩১৫।

২৩. তদেব, পৃ. ৫৬০।

২৪. তদেব, পৃ. ৫৬১।

২৫. মুতাহ্হরী, শহীদ আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা, *ইসলাম ও ইরানের পারস্পরিক অবদান*, (অনুবাদক এ. কে. এম. আনোয়ারুল কবীর) কালচারাল কাউন্সেলরের দফতর, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ২২৭।

২৬. হালদার, গোপাল, *বাঙালী সংস্কৃতির রূপ*, অগ্রণী বুক ক্লাব, কলিকাতা, ১৯৪৭, পৃ. ৪৪।

২৭. Hilali, Shaikh Ghulam Maqsud, *Iran & Islam*, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka, 1989, p. 37.

২৮. মুতাহ্হরী, শহীদ আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা, *ইসলাম ও ইরানের পারস্পরিক অবদান*, (অনুবাদক এ. কে. এম. আনোয়ারুল কবীর) পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৯।

২৯. সাফা, যাবিহুল্লাহ, *তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান ( জেলদে আওওয়াল)*, এন্তেশারাতে ফেরদৌসি, তেহরান, ১৩৭১, পৃ. ১৪০।

৩০. তদেব, পৃ. ১৫২।

৩১. সাফা, যাবিহুল্লাহ, *তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান জেলদে আওওয়াল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩।

৩২. ফারসি সাহিত্যে নীতিধর্মী ও নৈতিক বিষয়ের জন্য শেখ সাদির *গোলেস্তান* গ্রন্থটি প্রসিদ্ধ। এ গ্রন্থের মধ্যে আটটি বাব বা অধ্যায় রয়েছে। যেমন- در سیرت پادشاهان، در اخلاق درویشان، در فضیلت قناعت،در فواید خاموشی، در عشق و جوانی، در ضعف و پیروی، در تاثیر تربیت و در آداب صحبت.

৩৩. আনসারি, জামাল, *তারিখে ফারহাঙ্গে ইরান*, সোবহান নুর, তেহরান, ১৩৮৭, পৃ. ১৬৪।

৩৪. তাযকিরাতুল আউলিয়া: গ্রন্থটি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সংযোজন। ফরিদ উদ্দিন আত্তার কাব্যে প্রসিদ্ধি লাভ করলেও গদ্য রচনায় *তাযকিরাতুল আউলিয়ার* জন্য অধিকতর পরিচিতি পেয়েছেন। শ্রেষ্ঠ সুফি ও আরেফদের জীবন বৃত্তান্ত জানার এটি একটি উত্তম গ্রন্থ। এটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ হয়েছে।

৩৫. আনসারি, জামাল, *তারিখে ফারহাঙ্গে ইরান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৬।

৩৬. তদেব, পৃ. ১৬৭।

৩৭. তদেব, পৃ. ১৬৭।

৩৮. তদেব, পৃ. ১৮০।

৩৯. সাফি, কাসেম, *সাফারনামে সিন্ধ*, এন্তশারাতে দানিশগাহে তেহরান, তেহরান, ১৩৮৫ হি.শা., পৃ. ২১; সাফি, কাসেম, বাহারে আদাব, এন্তেশারাতে দানিশগাহে তেহরান, তেহরান, ১৩৮৫ হি.শা., পৃ. ১।

৪০. চট্টোপাধ্যায়, *সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭।

৪১. শাহনাওয়াজ, এ কে এম, *বাংলার সংস্কৃতি বাংলার সভ্যতা*, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৮৪।

৪২. আহসান, সৈয়দ আলী, *আমাদের আত্মপরিচয় এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ*, বাড পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ২১।

৪৩. আহসান, সৈয়দ আলী, *আমাদের আত্মপরিচয় এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭।

৪৪. চট্টোপাধ্যায়, *সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস*, পৃ. ৩৩; সরকার, জগদীস নারায়ণ, মুগল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস ৩য় খণ্ড*, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৭২।

৪৫. শরীফ, আহমদ, *সংস্কৃতি ভাবনা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩।

৪৬. শরীফ, আহমদ, *বাঙলা ভাষার প্রতি সেকালের লোকের মনোভাব ॥ 'ভাষা' বিদ্বেষ ॥*, *ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা*, ঢাকা, ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা, ১৩৭৫, পৃ. ৩২৫।

৪৭. আশরাফ, সৈয়দ আলী, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য, *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, ৬ষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯, পৃ. ৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

৪৮. আহমদ, ওয়াকিল, *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা- চেতনার ধারা ১ম খণ্ড*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ১৪; হাই, হুমায়ুন আবদুল, *মুসলিম সংস্কারক ও সাধক*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ. ১৭।

৪৯. হবিবুল্লাহ, এ বি এম, *ভারতে মুসলিম শাসনের বুনিয়াদ*, (ভাষান্তর লতিফুর রহমান), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৫৭; সাফা, যাবিহুল্লাহ, *তারিখে আদাবিয়্যাত দার ইরান (জেলদে আওওয়াল)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪১।

৫০. হবিবুল্লাহ, এ বি এম, *ভারতে মুসলিম শাসনের বুনিয়াদ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯।

৫১. মুতাহ্হরী, শহীদ আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা, *ইসলাম ও ইরানের পারস্পরিক অবদান*, (অনুবাদক এ. কে. এম. আনোয়ারুল কবীর) পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬। ইরানীয়দের একাকি ও নির্জন বসবাস, উদার চিন্তা-ভাবনা ও সত্য পথের অনুসন্ধান ঐতিহ্যগত প্রাপ্তি। ইসলামপূর্ব যুগেও তাঁদের মাঝে ধর্মচিন্তা-ভাবনা জাগ্রত ছিল। ইসলাম তাঁদের চিন্তা ও জ্ঞান সাধনার প্রধান বস্তু হয়ে ওঠে। তাঁদের সকল রচনায় ইসলাম ও ইসলামি সুফিবাদ পরিস্ফুট।

৫২. হবিবুল্লাহ, এ বি এম, *ভারতে মুসলিম শাসনের বুনিয়াদ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭।

৫৩. শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ, *ভাষা ও সাহিত্য*, প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৪৯, পৃ. ১১৮-১১৯; সরকার, জগদীস নারায়ণ, মুগল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস ৩য় খণ্ড*, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৭৩।

৫৪. বঙ্গে ইসলাম ধর্ম প্রবেশের মধ্য দিয়ে ইসলামে ব্যবহৃত প্রচলিত শব্দগুলো বাংলা ভাষায় স্থান করে নেয়। যেমন – নামাজ, রোজা, হজ্ব ইত্যাদি। যে কোনো জাতির উপর ধর্মীয় প্রভাব খুবই স্বাভাবিক। বাংলা ভাষায় আরবি ফারসি শব্দের আধিক্য এর অন্যতম কারণ। বিস্তারিত দেখুন–মুহম্মদ শহীদুল্লাহ রচিত *বাংলা সাহিত্যের কথা* ২য় খণ্ড।

৫৫. শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ, *বাঙ্গালা ভাষায় পারসী প্রভাব*, সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা, ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, ১৩৬৫, পৃ. ৯৪।

৫৬. চাঁদ, তারা, *ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব* (অনুবাদক এস. মুজিবুল্লাহ,) ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ.১১৮-১১৯। যুগ যুগ ধরে ধর্ম তাঁর নিজস্ব গতিতে চলার জন্য স্বতন্ত্র ভাষা ও সাহিত্যের আশ্রয় নিয়েছে। ঠিক ইসলাম ধর্মের মধ্যেও একই রূপ পরিলক্ষিত হয়। ফারসি ভাষাটি আরবি ভাষার সহায়ক হিসেবে ইসলাম প্রচারে দায়িত্ব পালন করেছে। বিস্তারিত দেখুন– মুতাহ্হরী, শহীদ আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা, *ইসলাম ও ইরানের পারস্পরিক অবদান*, (অনুবাদক এ. কে. এম. আনোয়ারুল কবীর) পূর্বোক্ত।

৫৭. আহসান, সৈয়দ আলী, *আমাদের আত্মপরিচয় এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭।

৫৮. আহমদ, ওয়াকিল, *বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত*, খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানী, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১৮৮।

৫৯. শাহনাওয়াজ, এ কে এম, *বাংলার সংস্কৃতি বাংলার সভ্যতা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪।

৬০. Karim, Abdul, *Social History of The Muslims in Bengal*, Baitush Sharaf Islamic Research Institute Chittagong, Chittagong, 1985, p. 239.

৬১. সাফা, যাবিহুল্লাহ, *তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান জেলদে আওওয়াল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬।

৬২. মাদ্রাসা: ইসলাম শিক্ষার কেন্দ্র হল মাদ্রাসা। নবি করীম (সা.) সাফা পাহাড়ের একটি পার্শ্বে প্রথম মাদ্রাসার পত্তন করেন। এ মাদ্রাসার রসুল (সা.) ছিলেন একজন শিক্ষক। মধ্যযুগের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই ছিল মাদ্রাসা নামে অভিহিত। সব সময় মুসলমানদের ধর্মীয় বা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের স্থান হল মাদ্রাসা। এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের

Dakha University Institutional Repository

সংখ্যা নিয়ে যেমন পূর্বেও হিসেব ছিল না এখনো তদ্রুপ রয়েছে। দেখুন- আবদুল্লাহ আল্ মাসুম রচিত *ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা সমস্যা ও প্রসার* গ্রন্থটি।

৬৩. সাফা, যাবিহুল্লাহ, *তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান (দ্বিতীয় খণ্ড)*, ইন্তেশারাতে ফেরদৌসি, তেহরান, ১৩৭৩, পৃ. ২৩১।

৬৪. সাফা, যাবিহুল্লাহ, তদেব, পৃ. ২৩৪; আলী, মো. আজহার ও বেগম, হোসনে আরা, *মুসলিম শিক্ষা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৪৭।

৬৫. আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ, বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য উনবিংশ শতাব্দী, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৪২।

৬৬. আল্ মাসুম, আবদুল্লাহ, *ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা সমস্যা ও প্রসার*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১৩-১৪।

৬৭. আহমদ, ওয়াকিল, *বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৫৯; আল-মাসুম, আবদুল্লাহ, তদেব, পৃ. ৪৯।

৬৮. সাফা, যাবিহুল্লা, *তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান জেলদে আওওয়াল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩।

৬৯. ইরানে ইসলাম যুগের সূচনায় শিয়া প্রভাব কম ছিল। তখন তাঁদের মধ্যে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে ঐক্য ছিল দৃঢ় ও শক্ত। যে কারণে শিয়া মতালম্বী মুসলমান ব্যতীত হানাফি, হাম্বলি মুসলমানরা ইসলাম ধর্ম পালন ও চর্চায় অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেছেন। ইমাম বা তাঁদের অনুসারীগণ ইরানে বসবাস ছিল। - মুতাহ্হরী, শহীদ আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা, *ইসলাম ও ইরানের পারস্পরিক অবদান*, (অনুবাদক এ. কে. এম. আনোয়ারুল কবীর) পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২১-২২।

৭০. সাফা, যাবিহুল্লাহ, *তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান দ্বিতীয় খণ্ড*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৮।

৭১. তদেব, পৃ. ১৪০।

৭২. সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুলেন সুফিরা। তাঁদের সাথে সম্পৃক্ত বিষয় ও পরিভাষা বিভিন্ন স্থানে প্রচার পায়। এসবের চর্চা হত খানকা ও মসজিদে। উল্লিখিত চারটি শব্দের আঙ্গিক রূপ বঙ্গীয় অঞ্চলে প্রভাব রেখেছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন- Abdur Rahim, *Social & Cultural History of Bengal Vol. 1* গ্রন্থটি।

৭৩. সাফা, যাবিহুল্লাহ, *তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান দ্বিতীয় খণ্ড*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫১।

৭৪. মসজিদ ব্যতীত মুসল্লিদের একত্রিত করে দরগাহ ও খানকায় ওয়াজ-নসিহত করার রীতিটি পুরনো। এটি প্রথমে সুফিবাদি আলেম সম্প্রদায় ইসলাম ধর্মের প্রসার ও তরিকা প্রচারে এরূপ আয়োজন করে থাকতেন। তাঁদের খানকায় প্রতি সপ্তাহ ও মাসের কোনো এক দিন ওয়াজ নসিহত চলত।

৭৫. আহমদ, ওয়াকিল, *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা- ১ম খন্ড*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪।

৭৬. Rahim, Abdur, *Social & Cultural History of Bengal Vol. 1,* Pakistan Historical Society, Karachi, 1963, P. 338.

৭৭. তাজিয়া মিছিল: মোহরমের দিনে মুসলমানরা যা পালন করে যাচ্ছে এটিই একটি ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতির দিক। মহরম পালনের ক্ষেত্রে তাজিয়া মিছিল বের করা হয়। এর অতিরঞ্জিত বিষয়াদি নিয়ে হিন্দুদের

Dhaka University Institutional Repository

উৎসবের সাথে তুলনা করা যৌক্তিক নয়। এটির ইতিহাস ও সংস্কৃতি ভিন্ন থাকায় সমালোচনা থেকে সংযত থাকাই শ্রেয়।–সাকলায়েন, গোলাম, *বাংলায় মর্সীয়া সাহিত্য,* বাংলা বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, ১৯৬৪, পৃ. ৭৮।

৭৮. Rahim, Abdur, *Social & Cultural History of Bengal Vol. I,* op.cit, p. 279.

৭৯. আহমদ, ওয়াকিল, *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা ১ম খন্ড*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪।

৮০. শহীদুল্লাহ, মুহাম্মদ, *ভাষা ও সাহিত্য,* পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৯। এ সব কুষানদের পোষাক হিসেবে প্রচলিত থাকলেও বাঙালি মুসলমান মধ্যযুগে ফারসি শব্দগুলোর মাধ্যমে অধিকতর পরিচয় লাভ করেছে।

৮১. Rahim, Abdur, *Social & Cultural History of Bengal Vol. I,* op.cit, p. 267.

৮২. Hilali, Shaikh Ghulam Maqsud, *Iran & Islam*, op.cit, p.110.

৮৩. Rahim, Abdur, *Social & Cultural History of Bengal Vol. I*, op.cit, p. 272.

৮৪. Karim, Abdul, *Social History of The Muslims in Bengal*, op.cit, p. 251.

৮৫. আহমদ, আবুয যোহা নূর, *উনিশ শতকের ঢাকার সমাজ জীবন*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৫, পৃ. ৬৭

৮৬. Hilali, Shaikh Ghulam Maqsud, *Iran & Islam*, op.cit, p.109.

৮৭. Rahim, Abdur, op.cit, p. 276; Karim, Abdul, *Social History of The Muslims in Bengal,* op.cit, p. 251.

৮৮. Rahim, Abdur, Ibid, p. 276.

৮৯. Hilali, Shaikh Ghulam Maqsud, op.cit, p.111.

৯০. শব্দগুলো খাঁটি ফারসি। ইরানীয় সভ্যতার জিনিষপত্র বাংলায় আগমনের সাথে শব্দগুলো বাংলা ভাষায় স্থান করে নেয়। বিস্তারিত দেখুন– মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ রচিত *ভাষা ও সাহিত্য* গ্রন্থটি।

৯১. শহীদুল্লাহ, মুহাম্মদ, *ভাষা ও সাহিত্য,* পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮।

৯২. বাদাখশানি, *তারিখে ইরান (জেলদে আওওয়াল)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৭।

৯৩. বাদাখশানি, তদেব, পৃ. ১৯৭।

৯৪. Rahim, Abdur, op.cit, p. 281.

৯৫. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর, *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, কলিকাতা, ৪র্থ সংখ্যা ১৩২৪, পৃ. ২১৩।

৯৬. আহমদ, ওয়াকিল, *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা ১ম খণ্ড*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫।

৯৭. Rahim, Abdur, op.cit, p. 254.

৯৮. শরীফ, আহমদ, *সংস্কৃতি ভাবনা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪।

৯৯. আশরাফ, সৈয়দ আলী, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য, *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, ৬ষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯, পৃ. ৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

## সহায়ক গ্রন্থাবলি


১. মগবুল বেগ বাদাখশানি : তারিখ ইরান (১ম খণ্ড)

২. আহমদ তাফাজ্জলি : তারিখে আদাবিয়্যাতে ইরান পেশ আয ইসলাম

৩. জামাল আনসারি : তারিখে ফারহাঙ্গে ইরান

৪. যাবিহুল্লাহ সাফা : তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান (দ্বিতীয় খণ্ড)

৫. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : ভাষা ও সাহিত্য

৬. গোপাল হালদার : বাঙালী সংস্কৃতির রূপ

৭. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস

৮. শম্ভোনাথ গঙ্গোপাধ্যায় : মধ্যযুগের ধর্মভাবনা ও বাংলা সাহিত্য

৯. Shaikh Ghulam Maqsud Hilali : Iran & Islam

১০. Abdul Karim : Social History of the Muslims in Bengal

১১. Abdur Rahim : Social & Cultural History of Bengal, Vol. 1

Dhaka University Institutional Repository

# চতুর্থ অধ্যায়: বঙ্গে ইসলাম প্রবেশ ও সুফি মতবাদ প্রচার

ইসলাম ধর্ম আরব থেকে অনারব জাতি ও গোষ্ঠীর মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে সুফি মতবাদও ছড়িয়ে পড়ে। একসময় বঙ্গে ইসলাম ধর্মকে কেন্দ্র করে সুফিদের মতবাদ প্রচারিত হয়। বঙ্গের মানুষ ইসলাম ধর্মের সাথে সুফিমতের শিক্ষা পেয়েছিলেন। তাঁরা সুফিমতবাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ইসলামকে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসেন। যে কারণে বঙ্গের মানুষ দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সুফি মতবাদ প্রচারেও ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। তাঁদের ইসলাম গ্রহণের পিছনে সুফিবাদী ধারার শক্তি অনুপ্রাণিত করেছিল।

## সুফিদের ইসলাম প্রচার

বঙ্গে সুফিদের ইসলাম প্রচারের বিষয়টি একটি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত। বিশেষ করে ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গে মুসলমানদের আক্রমণের আঘাতে আর্য ও অনার্যদের যে সংস্কৃতি এবং ধর্ম ছিল তা আপন গতিতে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। তখন আর্য ও অনার্যদের চিন্তা মননশীলতার উপর প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলাম ধর্ম। বলা বাহুল্য, বঙ্গে মুসলমানদের আক্রমণের পূর্বে ইসলাম ধর্মহীন একটি ভিন্ন পরিবেশ বিরাজমান ছিল। কেননা, এই অঞ্চলে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের আবাসভূমি গড়ে ওঠেছিল বহু পূর্ব থেকেই। বৌদ্ধ ও হিন্দুদের ধর্মে আচার আচরণ সকল কাযকর্মে প্রকাশ পেত। রাজা-প্রজা উভয়ই এ দু'টির কোন না কোন ধর্মের অনুসারী ছিলেন। যে কারণে তখন ইসলাম ধর্মের প্রভাব ততটা বঙ্গে পড়েনি।[১] তবে বঙ্গ বিজয়ের পূর্বে বাংলার সাথে আরবদের যোগাযোগ ছিল। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক থেকে সে যোগাযোগ ছিল বলে প্রমাণ মিলে। তখন আরবরা ইসলাম প্রচার বা বাণিজ্যের জন্য বঙ্গে এসেছিলেন। ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে তাঁদের মাঝে দু'টি ভাগ বা দল ছিল। একটি সুফি সাধক দল অপরটি বিভিন্ন সময়ে কাজে আগত দল।[২] সুফিরা যখন ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে শুরু করেন তখন

তাদের মনে নতুন ধর্ম কিভাবে প্রভাব ফেলবে সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন। যার ফলে সুফিমত এদেশে দ্রুত প্রতিফলন ঘটেছে এবং সফলতা পেতেও বেশি সময় অতিবাহিত করতে হয়নি। আমাদের মাঝে ইসলাম প্রবেশের বিষয়টি নানা মাধ্যমের সাথে জড়িত। যুদ্ধে জয়ী ও ব্যাবসায় নিয়োজিত মুসলমানগণ এ দেশে ইসলাম প্রচার করেছেন। অপরদিকে সুফি-দরবেশ, আরেফ ও আলেম – তাঁরা ইসলাম ধর্ম প্রচারে বড় ভূমিকা রাখেন।[৩] এ দেশে সুফিদের ইসলাম প্রচারের পদ্ধতি ছিল বহুবিধ। যেমন– খান্‌কায় ওয়াজ নসিহত প্রদান, মসজিদ- মক্তবে কুরআন ও ইসলাম শিক্ষা দান, ও সুফিবাদী পুস্তিকাদি থেকে পাঠ দান ইত্যাদি। সুফিরা ইসলামের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করেনি। তাঁরা বিভিন্নরূপে এ দেশে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছেন– এ বিষয়টিও সত্য ও প্রমাণিত। এ দেশে ইসলাম প্রচারে সাধু সুফিরা সঠিক দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁরা কখনই কারো উপর কোনো ধরণের আঘাত করেননি বরং তাঁরা উদার মানবতাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। কুরআনের বাণী সকলের নিকট পৌঁছে দেয়াই ছিল একমাত্র তাঁদের উদ্দেশ্য।[৪] এ কথা সত্য যে, ইসলাম প্রচার হওয়ার পর পরই ইসলাম ধর্মকেন্দ্রিক অঞ্চলে সুফি মতবাদ প্রচার পেতে থাকে। ইসলাম ধর্ম উৎপত্তিকালে সুফি ও তাসাউফ সম্পর্কে কারো ধারণা ছিলনা। কেননা, তখন প্রত্যেক মুসলমানই একজন পরহেজগার ও মোত্তাকি ব্যক্তি ছিলেন। সুফিচর্চার প্রয়োজন বা চাহিদার বিষয়টি ততটা দেখা যায়নি। এ মতবাদটি হিজরি দ্বিতীয় শতক থেকে আরব অঞ্চলভুক্ত দেশগুলোতে প্রথম প্রচার পেয়েছে।[৫]

সুফি মতবাদ প্রচারে আবুল হাশেম ছিলেন প্রথম সুফি ব্যক্তি। সময়ের প্রয়োজনে তাঁর পথ অনুসরণ করে অন্যেরাও সুফি মতবাদ প্রচার করতে এগিয়ে যান। এঁদের মধ্যে হাসান বসরি (৬৪৩ খ্রি.-৭২৮ খ্রি.), ইব্রাহিম বিন আদ্‌হাম (মৃ. ১৬১ হি./৭৭৭ খ্রি.), দাউদ তায়ি ( মৃ. ১৬৪ হি./ ৮১ খ্রি.), ফাজিল আয়াজ (মৃ.১৮৭ হি.), মারুফ কিরখি (মৃ. ৮১৫ খ্রি.) প্রমুখ অন্যতম।[৬] এসব সুফি সাধকগণ আজীবন সাধনায় রত ছিলেন। পৃথিবীর মানুষ কিভাবে সঠিক পথ পেতে পারে এবং প্রকৃত লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছতে সক্ষম হয় সেই সঠিক পথ দেখিয়ে দেয়াই তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। মানুষের জটিল বিষয় শুনার পর সমাধান ও সঠিক পথে চলার জন্য তাঁদের মতাদর্শ ইসলাম প্রচারের সাথে বিকাশ লাভ করে।

আরেফ ও সুফি দ'ুটি শব্দই আরবি। আরবি ভাষা থেকে শব্দ দ'ুটির উদ্ভব ঘটলেও প্রসার ও বিকাশের ক্ষেত্রে ফারসি ভাষার ভূমিকা বেশি রয়েছে। প্রভুত্ব ও ধর্মকে সুন্দরভাবে চেনার নাম হলো এরফান।

Dhaka University Institutional Repository

পৃথিবীতে এরফান ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম বা মাযহাবের অস্তিত্ব নেই।[৭] এরফানি ও সুফি জগত পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত একটি বিষয়। সুফি কারা বা সুফি মতবাদ বলতে আমরা কী বুঝিয়ে থাকি। এটি যে কোনো নিজস্ব মতবাদ নয়– সে বিষয়টিও পরিস্কার হওয়া প্রয়োজন মনে করছি। নবি করীম (সা.) এর সময়ে একদল সাহাবি ধর্মীয় কাজ-কর্ম সম্পাদনের জন্য মসজিদকে নির্বাচন করেছিলেন। তাঁরা সর্বদায় মসজিদে বসবাস করতেন এবং এবাদতে লিপ্ত থাকতেন। এই দলটি 'আহলে সূফ' হিসেবে অভিহিত হয়ে থাকে। সে সময়ে তাঁরাই ছিল প্রথম পর্যায়ের সুফি।[৮] সুফি ও তাসাউফ– এ দু'টি শব্দই পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত। যাদের দেহ ও আত্মা, ভিতর ও বাহির পবিত্র এবং যারা সর্বোপরি পরিস্কার, পবিত্র ও সঠিক পথে চলেন তাঁদেরকে বলা হয় সুফি। সুফিরা পুনর্জন্ম বিশ্বাস করেন। মৃত্যুর পর প্রত্যেকের পুনরায় জন্ম হবে এবং পাপ পুণ্যের বিচার অবধারিত। এটি সম্পূর্ণ কুরআন ও হাদিসের আলোকে মানুষেরই একটি স্বাভাবিক চিন্তাধারার বহিপ্রকাশ মাত্র। প্রত্যেক মানুষ অজ্ঞাতকে জানতে ইচ্ছাপোষণ করে থাকে। ঠিক তেমনি আল্লাহকে জানা ও চেনা সুফিদের প্রধান কর্তব্য।[৯] সুফিরা পবিত্র কুরআন থেকে প্রেরণা লাভ করেন। কুরআনের গুড়তত্ত্ব ও অন্তর্নিহিত বিষয় উদ্ঘাটনে তাঁরা সচেষ্ট। তাঁরা হযরত রসুল করীম (সা.) প্রথম এবং হযরত আলি (রা.) দ্বিতীয় আধ্যাত্মিক ব্যক্তি হিসেবে শ্রদ্ধা করেন। সুফিজগতের শ্রেষ্ঠ শিরোমণি নবি করীম (সা.) তারপর হযরত আলি (রা.)।[১০] শুধুমাত্র মুসলিম দেশেই এর চর্চা ও পরিপুষ্টি সাধিত হয়ে থাকে। প্রথমে আরবদের মধ্যে সুফি ভাবধারা জন্মলাভ করলেও আরবে পুষ্টি সাধিত হয়নি। বালখ, বোখারা, সামারকান্দ, শিরাজ, ইয়ামেন, রেই, হামাদান, বাগদাদ, বোস্তাম, খোরাসান, হেরাত, ইত্যাদি অঞ্চল থেকে অসংখ্য সুফির জন্মলাভ ঘটেছে। সবচেয়ে সুফি ভাবধারার পরিপূর্ণতা দান, বিস্তার ও বিকাশের ক্ষেত্রে পারস্য অঞ্চলভুক্ত দেশের ভূমিকা রয়েছে বেশি।[১১] পারস্যে শুধু একাধিক সুফির জন্মলাভ ঘটেনি সুফি মতবাদের অসংখ্য পুস্তিকাদিও রচিত হয়েছে। যে কারণে ফারসি ভাষাটি 'সুফিবাদের ভাষা'[১২] হিসেবেও ঐতিহাসিকরা মন্তব্য করে থাকেন। বঙ্গের সাধারণ মানুষদের মাঝে সুফিদের দাওয়াত প্রদানের সময় বিভিন্ন প্রকার ফারসি পুস্তিকাদি ছিল। সুফিরা ফারসি পুস্তিকাদির মাধ্যমে ইসলামকে জানার শিক্ষাও দিয়েছিলেন। এ দেশে ইসলাম প্রচারকালে ঠিক কতজন সুফি ভূমিকা রেখেছেন তা জানা আদৌ সম্ভব নয়। বস্তুত সুফিদের আগমনকাল ও তাঁদের কার্যকলাপ সম্পর্কে ধারাবাহিক ইতিহাস লেখিত হয় নি। কেন লেখিত হয় নি, সে ব্যাপারে নতুন করে কিছু বলার অবকাশ আছে বলে মনে করি না।

Dakha University Institutional Repository

বিভিন্ন দেশ থেকে সুফিরা এ দেশে এসেছেন। যে সব সুফি সাধক ইসলাম প্রচারে নিজ দেশ থেকে বেড়িয়ে এসেছিলেন তাঁদের সম্পর্কে জানার আগ্রহ এখনও রয়েছে। তবে অনেকাংশেই তথ্যের অভাবে তা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। তখন জানার জন্য বর্তমানের ন্যায় ততটা প্রবল ইচ্ছে বিশেষ ব্যক্তি ও সাধারণের মধ্যেও ছিল না। ফলে সে সময়ে তাঁদের জীবন চরিত লেখার অনুভব করে নি কেউ। বাঙালি মুসলমানরা কিছু বিষয় লিখে রাখলেও বস্তুত পুরনো ইতিহাসের দলিল সংরক্ষিত হয় নি। যে কারণে তাঁদের সম্পর্কে জানার অপূর্ণতাই বার বার হৃদয়ে পীড়া দিচ্ছে। সুফি দরবেশগণ সমাজের একটি অংশ ছিলেন। তাঁরা জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন ৰিধায় শাসক শ্রেণি এমন কি রাজা বাদশাহগণ তাঁদেরকে যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন। তাঁরা সমাজে এতটাই মিশে গিয়েছিল যে, তখন তাঁরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও পরিবর্তন সাধিত করতে পারতেন। কিন্তু সুফিরা রাজতৈতিক ক্ষেত্রে অযথা সময় বিনষ্ট না করে কীভাবে মানুষকে ধর্মকর্মের মাধ্যমে সঠিক পথে পরিচালিত করা যায় সে দিকেই মনোনিবেশ হন।[১৩] তাঁরা প্রাচীন ভাবধারার পরিবর্তন এনে দিয়েছিলেন সত্য। মুসলমান অধিবাসীদের মধ্যে ধর্ম প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে মসজিদ নির্মাণ, মহল্লায় মক্তব প্রতিষ্ঠা, কান্খাহ্, আস্তানা, ও দরগাহ প্রতিষ্ঠা তাঁদেরই অবদান। এমনকি আউল, বাউল, সাঁই, নির্যনবাস প্রভৃতি সুফি ভাবধারার বিষয়গুলো সুফিদের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।[১৪] হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে মিলন ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধন তৈরীতে তাঁদের ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশে সাধারণত ইসলাম প্রচার পেয়েছে সুফি সাধকদের মাধ্যমে। তাঁদের বিভিন্ন কেরামতির আকর্ষণ ও প্রভাব স্থানীয়দের উপর ছিল। সরলময়ী মানুষ এভাবেই ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।[১৫] তাঁরা কেন বিনা বাধায় ইসলাম ও তাঁদের চিন্তা চেতনা ছড়িয়ে দিতে সফল হয়েছিলেন? এ ব্যাপারে গবেষকরা এর উত্তর খোঁজে পেয়েছেন এভাবে। বাংলা দেশে মুসলমানদের রাজত্বকালে ইসলাম প্রচারের জন্য কোন পৃথক গোষ্ঠী ছিল না যে তাঁরা গ্রামে গ্রামে বা জনসমাজে ইসলাম প্রচার করবেন। শাসকশ্রেণিও সুফি দরবেশদের প্রতি নমনীয় ছিল। কী প্রচার হল বা তাঁরা কী করছেন এ সম্পর্কে শাসকরা কোন খবরদারি করতেননা।[১৬]

## সুফিদের বাসস্থান

বাংলা দেশের সাথে বাহিরের মুসলমানদের যোগাযোগ বহু দিন ধরেই বিদ্যমান ছিল। ইতিহাসে কেবল আরব ও ইরানের সাথে সম্পর্কের কথা পুন পুনবার উল্লেখ পাওয়া যায়। কোন মুসলমান বা কোন সুফি সাধক সর্ব প্রথম বাংলা দেশে এসেছিলেন তার কোন সঠিক তথ্য কেউ রেখে যান নি। ত্রয়োদশ শতকে বখতিয়ার খিলজির আগমনের মাধ্যমে বাংলাদেশের সাথে বাহিরের মুসলমানদের

Dakha University Institutional Repository

যোগাযোগের মাত্রা অধিকহারে বৃদ্ধি ঘটেছে।[১৭] সে সময় বাংলা দেশে হিন্দু রাজারা শাসন করত। ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খিলজি রাজা লক্ষণ সেনের বিরুদ্ধে আক্রমণ করলে রাজা লক্ষণ সেন পালিয়ে বাঁচেন এবং তিনি বিক্রমপুরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ সময় থেকে মুসলমান সমাজ গঠনের পিছনে বহিরাগত মুসলমানরা অবদান রাখতে শুরু করে। তাঁদের মাধ্যমে বাংলাদেশে মুসলমান বসতি গড়ে ওঠতে দেখা যায়।[১৮] এ কথা সত্য যে, এ দেশে সুফি মতবাদ প্রচারের পূর্বে ইসলাম ধর্ম একটি ক্ষেত্র তৈরী করেছিল। যে কারণে মুসলমান মাত্রই ধর্মের বাণী শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করত। ধর্মের নিয়ম কানুন মেনে চলার প্রবণতা তৈরী হয়েছিল ইসলাম প্রচারের সময়। সেই সাথে সুফিদের কথা ও সুফিতত্ত্ব গভীরভাবে অবলোকন করে পালনের জন্য হৃদয় অপেক্ষা করত। তা না হলে এত দ্রুত বঙ্গীয় অঞ্চলে সুফি মতবাদ প্রসার পেতনা। সুফি দরবেশরা এ দেশ ও অঞ্চলকে এতটাই ভালবেসে ছিল যে তাঁদের আচার, ব্যবহার ও কর্ম মানুষের মধ্যে মিশে গিয়েছিল। যে কারণে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে দলে দলে মানুষ ইসলাম গ্রহণে উৎসাহী হয়েছিল।[১৯] ঠিক কতজন সুফি ইসলাম প্রচারের সময় তাঁদের সুফিমতবাদ প্রচার করেছিলেন সে হিসেব দেয়া দুস্কর। তবে যে পরিমাণ ঢাকা, সিলেট ও চট্টগ্রামে মাযার, আস্তানা বা খান্‌কাহ রয়েছে তাতে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম প্রচারে সুফিরা সংখ্যায় কম ছিল না। উল্লেখ্য যে, প্রথম দিকে যাঁরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ছিল তাঁদের সংখ্যা ছিল নেহায়েতই কম। ধীরে ধীরে সুফি শক্তি উজ্জীবিত হওয়ায় দলে দলে মানুষ ইসলামের আশ্রয়স্থলে সমবেত হয়। তাতেও বঙ্গের মুসলমান যে সুফি কথা শুনতে উদগ্রীব ছিল তা পরিস্কার বুঝা যায়। তখন মুসলমান রাজ-শক্তির মাধ্যমে ইসলাম প্রসারলাভ করা একটি বিষয় ছিল। ইসলাম প্রবেশের শুরুর দিকে হিন্দু রাজারা বাধা সৃষ্টি করলেও তারা সফল হয় নি। হিন্দু রাজারা সুফিদের কাজে বিরোধিতা করলে পরাজয় ও নিজেদের অধপতনই শেষ পরিণতি নেমে আসে। একমাত্র সুফিরাই ধর্ম প্রচারে সফলতা অর্জন করেন।[২০] ইসলাম প্রসারের সাথে রাজশক্তির প্রভাব সম্পৃক্ত থাকলেও সুফিদের প্রভাব বহুলাংশে জড়িত রয়েছে। সুফিরা তাঁদের খান্‌কাহ, আস্তানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সেখানে মাদ্রাসা, মক্তব, মসজিদ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। মুসলমান সমাজ বিস্তৃতির উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য যা যা করণীয় তা তাঁরা করে গিয়েছেন। সিলেট ও চট্টগ্রামের অসংখ্য দরগাহ এবং আস্তানা অন্যতম প্রমাণ।[২১] সুফিরা যে সব স্থানে নিজেদের আবাসস্থল করেছিলেন সেটি ছিল মসজিদ, মক্তব বা এবাদতের স্থান। কোন সুফির জীবন অট্টালিকা বা প্রাসাদে অতিবাহিত হয়েছে ইতিহাসে এমন নজীর নেই। প্রথমে নিরব একাকি জঙ্গল ও পাহাড়ে বসবাস করে থাকলেও পরবর্তীতে এটি জনসমারোহে রূপদান করে। চট্টগ্রাম ও সিলেটে বসবাসকারী সুফিদের জীবনকাল থেকে তাই প্রতীয়মান হয়। তাঁরা কোন দিন জীবিকা ও ভরণপোষণের চিন্তা করেন নি। আল্লাহর প্রতি ধৈর্য ও ভরসা করে জীবন যাপন

করেছেন। অনেক স্থানে মুসলমান শাসক ও অঞ্চলের ধনী মুসলমানগণ তাঁদের জীবনের ব্যায় বহন করতেন। তাঁদের দরবেশ ভক্তি ও উদারতার ফলে তা ঘটে ছিল।[২২]

## সুফি সাধনা

সুফি মতবাদ একটি চিন্তাধারা ও সাধনা। যার মাধ্যমে নিজের অস্তিত্ব বিলীন করে নিজেকে আল্লাহর কাছে সফে দেয়া যায়। অনেকে এ মতবাদকে মারেফাতের একটি অংশ হিসেবে দেখেছেন। যারা মারেফাতকে বিশ্বাস করেন এবং এ ধারায় জীবন-যাপন করেন তাঁদেরকে বলা হয় সুফি। সুফিদের মধ্যে আল্লাহর সান্নিধ্যলাভের জন্য প্রেম নিবেদন একটি বড় বিষয়। এ পথের অনেক পথিক রয়েছেন। সেই প্রেম একমাত্র আল্লাহকে উদ্দেশ্য করে হয়ে থাকে। যিনি সৃষ্টি করেছেন ও ভালবেসেছেন তাঁকে সব সপে দেয়ার নামই হলো প্রেম।[২৩] সুফিদের মতে যার প্রেম যত গভীর হবে তার সুফি সাধনা তত বিশাল ও সুউচ্চ। তবে মানব প্রেমও যে ঐশীপ্রেমের সোপান হতে পারে তা সুফিরা অস্বিকার করেননা। তাঁদের বিশ্বাস আল্লাহর প্রেম সকল পাপ, অনিষ্ঠা থেকে পবিত্র রাখে। তাই মানবকুলের জন্য প্রেম একটি অবধারিত বিষয়। এ কারণেই সুফি সাধকগণ কাউকে খেলাফত দিতে চাইলে প্রেমের পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণদেরকেই মনোনয়ন দেন। বিশেষ করে তাঁরা কাউকে উপযুক্ত মনে না করলে খেলাফত প্রদান করেননা। সুফি মতবাদ প্রধানত আল্লাহর প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত। এটিকে একটি আন্দোলন বলা যেতে পারে। যে আন্দোলন এক দেশ থেকে অন্য দেশে বিনা বাধায় বিস্তৃতি লাভ করেছে। এক দেশের সুফিদের সঙ্গে অন্য দেশের সুফিদের মাঝে যোগাযোগ ও সম্পর্কের কারণে সুফি ভাবধারা দ্রুত প্রসার ঘটে। যে তরিকা বা পন্থায় তারা বিশ্বাসী সেটা তাঁদের একই নিয়মের উপর আবর্তিত থাকে।[২৪] সুফিবাদের মূলে প্রেম নিবেদন পরম স্রষ্টা আল্লাহর প্রতি ভালাবাসা। সে প্রেমের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্তর রয়েছে। যেমন– মনসুর হল্লাজ 'আনাল হকে' বায়েজিদ বিস্তামি 'সোবহানি' উপাধিতে ভূষিত হন। এটি সম্পূর্ণই খোদা প্রেমের অর্জন যা সাধারণের জ্ঞানের বাহিরে রয়েছে। নিছক কোনো ব্যক্তি বা প্রাণীর প্রতি নয়।[২৫] এই প্রেমের ভাষা ও প্রেম নিবেদনের পদ্ধতি প্রকাশিত হয়েছে ফারসি ভাষায়। প্রেমের কারণে ইরানি ভাষা ও তাঁদের সভ্যতা সংস্কৃতি বেশি করে বিশ্বে প্রভাবিত হয়। অপরদিকে তাঁদের মাধ্যমে ইসলাম বিভিন্ন অঞ্চলে প্রসার লাভ করেছে। বঙ্গ এলাকায় তাঁদের সাধন চর্চার বহু কেন্দ্রবিন্দু গড়ে ওঠেছে মূলত ইসলাম ধর্ম প্রচার পাওয়ার পর। যে কেন্দ্রগুলো 'খান্‌কাহ' ও 'দরগাহ'[২৬] নামে প্রসিদ্ধ। এসব দরগাহ ও খানকায় সুফিবাদের অসংখ্য শিষ্য যাতায়াত করতেন। আল্লাহর যিকির করা ও সুফিবাদ বিষয়ক চর্চা ছিল খানকায় জীবন-যাপনের মূল বিষয়। উল্লেখ্য যে, ইসলাম ধর্ম প্রচারের অন্যতম ক্ষেত্র হিসেবে খান্‌কাকে গণনা করা হয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

সুফিদের সাধানার মধ্যে কয়েকটি স্তর রয়েছে। সাতটি স্তরের মধ্যে শেষ স্তরের নাম হলো ফানা। অর্থাৎ ফানার মাধ্যমে সুফিরা তাঁদের আসল পরিচয় দিয়ে থাকেন। নিজেকে বিলীন করে দেয়াই হলো ফানা ফিল্লাহ এর প্রকৃত কাজ। এটির উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের মতামত রয়েছে সত্য। তবে এটির মূলে রয়েছে কুরআন ও হাদিস অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসুল।[২৭] আল্লাহর প্রেম ব্যতীত সুফিমতবাদ নয়। এর উৎসস্থল হিসেবে পারস্যবাসীদের জ্ঞান সাধনাকে বলা হলেও কুরআনই সুফি মতবাদের উৎপত্তিস্থল। ইসলাম ধর্মের সূচনা থেকেই সুফিবাদের জন্ম হয়েছে। হিজরি প্রথম শতক যদিও ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে সাহাবিগণ তৎপর ছিলেন তাতে তাঁদের সুফিবাদের প্রতি আগ্রহ কম ছিল না। বরং তাঁরা তখন নির্জনে বসবাস, ধ্যান মগ্নকে বেশি প্রাধান্য দিতেন।[২৮] ইসলামের সূচনাকালে সুফি বা তাসাউফ সম্পর্কে কারো ধারণা ছিল না। সে সময় মুসলমানরা ধর্ম নিয়ে ভাবতেন। এক ধরণের মুসলমান নির্জনে একাকি বসবাস করতেন। তখন কেউ কোন প্রয়োজন অনুভব করেন নি। তাকওয়া অবলম্বনকারীদের সুফি হিসেবে ডাকা এবং সে পথকে তাসাউফের পথ বলা ছিল একটি যুক্তিযুক্ত বিষয়। শুধু এতটুকুই ছিল যাহেদ ও নির্জনে বসবাসকারীদের পরিচয়।[২৯] হিজরি দ্বিতীয় শতক থেকে সে ধারাটি ধীরে ধীরে প্রসার পেতে থাকে। প্রসারের পিছনে সবচেয়ে ইরানীয়রা অবদান রাখেন। চিন্তা চেতনার জগতে ইরানীয়রা একটি আলাদা ক্ষেত্র গড়ে তুলেছে। যা হল আরবীয় দর্শনের বিপরীতে আর্য ইরানি দর্শন। চিন্তা চেতনার ক্ষেত্রে অনেকগুলো দর্শন প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।[৩০] তবে হিজরি তৃতীয় শতকে ইরানীয়রা পরিপূর্ণ দর্শনের দিকে এগুতে সমর্থ হয়।

## সমাজে সুফি প্রভাব

এই সুফিদের প্রভাব কিভাবে আমাদের মধ্যে এসেছে তা একটি আলোচনার বিষয়। মধ্য এশিয়ায় যখন ইসলাম প্রচার পায় তখন পারস্যে সুফিবাদের পূর্ণতা ও বিকশিত হওয়ার বিষয়টি পরিস্কার হয়ে ওঠে। বিশেষত সুফিধারা প্রবর্তনের দিক দিয়ে তারা বহুদূর এগিয়ে যান। বহু দার্শনিক, ফকিহ, কবি ও সাহিত্যিক সুফিধারার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। বিশেষ করে পঞ্চম হিজরি শতকের পর ইরানের সাহিত্য সে ধারায় মিশ্রিত হয়ে সুফি সাহিত্য নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।[৩১] ভারত উপমহাদেশে সুফিবাদের আগমন ঘটেছে খায়বার গিরিপথ দিয়ে। ইরান বা আরবের মুসলামানরা এ পথ দিয়েই বার বার ভারত জয়ের চেষ্টা করেছেন। সে পথ দিয়েই সুফিরা প্রথমে ভারতে অতি সহজে প্রবেশ করতে সক্ষম হন। সে সুবাধে ইসলাম অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে বাংলাদেশে শত শত সুফি-দরবেশের আগমন ঘটেছে।[৩২] বঙ্গে সুফিদের মতবাদ প্রচার এর পূর্বে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সুফি মতবাদ

Dhaka University Institutional Repository

প্রচারের বিষয়টি বিভিন্ন তথ্য সূত্রের মাধ্যমে প্রমাণিত। দ্বাদশ শতক থেকে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন সুফির উদ্ভব ঘটেছে ভারতে। খাজা মঈন উদ্দিন চিশতি, শেখ বাহা উদ্দিন মুলতানি অন্যতম।[৩৩] চিশতিয়া, কাদেরিয়া এবং সোহরাওয়ার্দিয়া তরিকা বা মতবাদ তাঁদের অনুসারীদের দ্বারায় চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়ে। একাদশ শতকের পূর্বে বঙ্গে সুফি প্রভাব তেমন দেখা যায়নি। এ কথা সত্য যে, প্রথমে ভারতে সুফিরা তাঁদের কার্যক্রম শুরু করলেও ইসলাম বিজয়ের মাধমে দ্রুত সুফিরা বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়তে সক্ষম হন। ত্রয়োদশ শতক থেকে বঙ্গে বেশি করে সুফিদের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। চর্তুদশ শতকে সুফিরা তাঁদের কার্যক্রম অবাধে চালিয়ে যেতে সক্ষম হন। ভারতে প্রচারকৃত সুফিদের তরিকা বাংলাদেশে দ্রুত প্রচার পেতে থাকে। সুফিবাদি তরিকার উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসেবে বাংলাদেশের গ্রামেও সে সুফি তরিকা ছড়িয়ে পড়ে।[৩৪] এমন কোন শহর বা গ্রাম নেই যেখানে সুফিদের আগমন ঘটে নি। বিভিন্ন স্থানে অগণিত সুফি ও দরবেশের মাযার থাকা একটি প্রমাণ।

সুফিদের প্রতি দেশের শাসক ও সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল প্রগাড়। সমাজের মানুষও তাঁদেরকে এমনভাবে বিশ্বাস করতেন যে, তাঁরা প্রত্যেকেই অলৌকিক শক্তির অধিকারী ও মহাপুরুষ ছিলেন। রোগ মুক্তি, ধন-দৌলত বৃদ্ধি, কঠিন সমস্যার সমাধান তাদের মাধ্যমে সম্ভব হত।[৩৫] এ ধারণা থেকেই সাধারণ মানুষ বেশি করে তাঁদের নিকট আসা যাওয়া করতেন। সুফিদের একনিষ্ঠতা ও কর্মদক্ষতাও সাধারণ মানুষ ও জনগণের বিশ্বাস ও ভালবাসা যুগিয়েছিল। তাঁরা কখনই কোন মানুষকে অবহেলার চোখে দেখতেন না। বরং তাঁরা বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে অক্লান্ত চেষ্ঠা করে যেতেন।[৩৬] অপরদিকে তাঁদের দরগাহ, আস্তানা ও খানকায় সকল শ্রেনি– হিন্দু-মুসলমান, গরীব-ধনী, সবল-অসহায় লোকদের প্রবেশের অধিকার ছিল। সেখানে শান্তি ও সুন্দরভাবে জীবন-যাপনের আলোচনা হত।[৩৭] সমাজে তাঁদের প্রভাব পড়ার পীছনে অন্যতম কারণ ছিল তাঁদের স্বাভাবিক জীবন-যাপন। সাধারণ মানুষ তাঁদের সহজ সরল জীবন যাপন করাকে ভালবাসতেন। কোন হিংসা, অহঙ্কার তাঁদের মধ্যে ছিল না।[৩৮] মানবসেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখাও তাঁদের একটি কর্তব্য ছিল। তাঁরা মানব সেবাকে পবিত্র দায়িত্ব ও আল্লাহর প্রতি ভালবাসার সোপান মনে করতেন।[৩৯] বস্তুত এ ভাবেই সমাজে তাঁদের ভূমিকা প্রসারিত হয়েছে। এটা ঠিক যে, সুফিরা সমাজে তাঁদের প্রতিষ্ঠা পেতে সব সময় সংযম ও সহিষ্ণুতার পরিচিয় দিতেন। তাঁরা আদর্শ চরিত্র ও সৎ মনোভাব দ্বারায় সাধারণ মানুষের মন জয় করে সমাজে একটি স্থান করে নিতে সক্ষম হন।[৪০]

Dhaka University Institutional Repository


## সুফিমতবাদ

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সুফি প্রভাবের বিষয়টি পূর্ব বঙ্গে সুফিদের প্রভাব পড়ার অনেক আগ থেকেই বিদ্যমান রয়েছে। দ্বাদশ শতক থেকে অনেক সুফি নিয়মিতভাবে ভারতের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করতেন। যে সব সুফির মতবাদ প্রসিদ্ধ রয়েছে অনেকগুলো প্রথমে ভারতে বিস্তার লাভ করেছে। খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি (১১৪২ খ্রি.-১২৩৬ খ্রি.) ছিলেন চিশতিয়া তরিকার অগ্রদূত। তিনি ১১৯৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতের আজমিরে এসে চিশ্তিয়া তরিকা প্রচার করেন।[৪১] তদ্রুপ সোহরাওয়ার্দি তরিকার অগ্রদূত ছিলেন শেখ শিহাব উদ্দিন আবদুল্লাহ আল-সোহরায়ার্দি (১১৪৭ খ্রি.-১২৩৪ খ্রি.)। তাঁর অনেক মুরিদ ছিল। তন্মধ্যে শেখ বাহা উদ্দিন যাকারিয় মুলতানি (১১৬৯ খ্রি.-১২৬৬ খ্রি.) অন্যতম। তাঁর মাধ্যমে সোহরাওয়ার্দি তরিকা ভারতে প্রসার লাভ করেছে।[৪২] কাদেরিয়া তরিকার উদ্ভাবক শায়খ আবদুল কাদের জিলানি (১০৭৮ খ্রি.-১১৬৮ খ্রি.) ভারতীয় অধিবাসী নন। তাঁর বংশধরদের মধ্যে সৈয়দ মুহাম্মদ গাওস গিলানি ১৪৮২ খ্রিস্টাব্দে ভারতে আগমন করেন।[৪৩] প্রথমে তাঁর মাধ্যমে এ অঞ্চলে কাদেরিয়া তরিকা প্রচারিত হয়। মূলত প্রথমে ভারতের বিভিন্ন স্থানে এসব তরিকার বিস্তার ঘটেছে। ভারত-উপমহাদেশে যে সুফি মতবাদগুলো প্রচার পেয়েছিল তার বিবরণ *আইন-ই-আকবরি* গ্রন্থে উল্লেখ আছে। আবুল ফজলের সময়ে চৌদ্দটি সেল্সেলা প্রসিদ্ধ ছিল। প্রতিটি সেল্সেলা পরিবারের নামের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন–জায়বি, তায়ফুরি, কারখি, সিক্তি, কাযুরুনি, তুসি, জুনায়দি, ফেরদৌসি, সোরাওয়ার্দি ও চিশতি প্রভৃতি।[৪৪] ভারত বর্ষে প্রথম দিকের সময়কালে সুফি, দরবেশ দ্বারায় ইসলাম প্রচারিত হয়। সেই সাথে তাঁরা তাঁদের নিজ তরিকার কথাও মুসলমানদের অবহিত করেন। সুফিমতের ধারণাটি প্রথমে আফগানিস্তান ও বর্তমান ভারতে প্রচার পেলেও পরবর্তীতে এ মতবাদগুলো বঙ্গে প্রচার পেয়েছে যা আমরা বিভিন্ন তথ্যের আলোকে জানতে পারি।[৪৫] তবে বাংলার সুফিগণ একই ও নির্ধারিত তরিকার অর্ন্তগত ছিলেন না। তাঁরা বিভিন্ন তরিকার মধ্যে অর্ন্তভূক্ত থেকে সুফিধারার বিকাশ ঘটিয়েছেন। তরিকার নিয়ম-পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে সুফিগণ মুরিদদের বিভিন্ন শিক্ষা দিতেন। সে শিক্ষাও ফারসি ভাষাকে ঘিরে প্রচারিত হত। সুফিদের মালফুজাত ও চিঠিপত্র ছিল ফারসি ভাষার।[৪৬] আমরা এ কারণে সুফি দরবেশের তরিকা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় দেখতে পাই। সে সম্প্রদায়গুলো ফারসি ভাষার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। বলা বাহুল্য, বঙ্গে সর্বপ্রথম সোহরাওয়ার্দি তরিকা প্রচার পেয়েছে। ইসলাম ধর্ম প্রচারকালে যেসব সুফি মতবাদ বঙ্গে প্রচার পেয়েছে এ সব মতবাদগুলোর প্রসিদ্ধ কয়েকটি মতবাদ নিম্নে প্রদত্ত হলো:

**ক. সোহরাওয়ার্দি মতবাদ:** সুফি মতবাদ জগতে শেখ শিহাব উদ্দিন সোহরাওয়ার্দি (১১৪৭ খ্রি.-১২৩৪ খ্রি.) নামটি প্রসিদ্ধ। তিনি ছিলেন একজন সুফি তরিকার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। তাঁর নিকট থেকে তৎকালীন সময়ে বহু আলেম-উলামা ও সুফি-শাগরেদ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করতেন।[৪৭] তাঁর আদর্শ শিক্ষা ও পদ্ধতিটি একটি নির্দিষ্ট চিন্তা-চেতনা ও মতবাদে পরিণত হয়েছে। এই মতবাদটি সোহরাওয়ার্দি মতবাদ হিসেবে পরিচয় লাভ করে। মতবাদটি ভারতে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান হিসেবে মুলতান অধিবাসী শেখ বাহা উদ্দিন যাকারিয়া (১১৬৯ খ্রি.-১২৬৬ খ্রি.)-এর নাম উল্লেখ করা হয়ে থাকে। তিনি ছিলেন শিহাব উদ্দিন ওমর সোহরাওয়ার্দির খলিফা।[৪৮] তিনি প্রথমে খোরাসান, উজবেকিস্তান, মা-ওরান্নহর ও মদিনায় হাদিস শিক্ষালাভ করেন। অতপর তিনি সেখানে একাকিত্ব ও নির্জনে বসবাস শুরু করেন। একসময় বাগদাদে শেখ শিহাব উদ্দিন সোহরাওয়ার্দি (১১৪৭ খ্রি.-১২৩৪ খ্রি.) দরবারে উপস্থিত হন। বেশ ক'দিন সেখানে অতিবাহিত করার পর তিনি সোহরাওয়ার্দির নিকটতম শাগরেদে পরিণত হতে সমর্থ হন। শেইখ তাঁকে খলিফা গ্রহণের উপযুক্ত মনে করে খেলাফত প্রদান করেন। তিনি তাঁকে মুলতানে এসে সোহরাওয়ার্দি মতবাদ প্রচারের আদেশ দেন।[৪৯] মুলতান, সিন্ধু ও পাঞ্জাবের এ তরিকার লোকজন তার নিকট মুরিদ হয়েছেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর অনুসারী কাজি ফখরুদ্দিন সোহরাওয়ার্দিয়া তরিকা প্রচারে বড় ভূমিকা রাখেন। লা'ল শাহবায কলন্দর (মৃ. ৬৭৩ হি.), সৈয়দ জালাল বুখারি (মৃ. ৬৯০ হি.), সদরুদ্দিন মুহাম্মদ আরেফ (মৃ. ৬৮৪ হি.) ও রোকনুদ্দিন আলেম (মৃ. ৭৩৫ হি.) প্রমুখ ছিলেন সে সময়ের অন্যতম সোহরাওযার্দিয়া তরিকার বড় আলিম ব্যক্তি। এ ছাড়া এ সময় কাজি হামিদ উদ্দিন ও সৈয়দ জালাল উদ্দিন সোহরাওয়ার্দিয়া তরিকা প্রচারে আবদান রাখেন।[৫০] এ তরিকার মধ্যে সেমা ও চুম্বন-এ দু'টি চিশতিয়া তরিকার বিপরীতে দেখা হয়ে থাকে। এ দুটি বিষয় শাগরেদ ও মুরীদদের শিক্ষার মধ্যে নেই।

বঙ্গে সোহরাওয়ার্দি মতবাদ প্রচারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন সুফি শেখ জালাল উদ্দিন তাবরেজি। তিনি বাংলায় আগমনকালে ইসলাম প্রচারের সাথে এ মতবাদ প্রচার করেছেন।[৫১] তাঁরই প্রচেষ্টায় বাংলা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অনেক হিন্দু, বৌদ্ধ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। মখদুম শাহ দৌলা শহীদ একজন আরবীয় সুফি ছিলেন। তবে তাঁর উস্তাদ ছিলেন মাওলানা রুমির পীর শায়খ শামসুদ্দিন তাবরেজি। শাহ দৌলা শহীদ পাবনা জেলায় ইসলাম প্রচারের পাশাপাশি সোহরাওয়ার্দিয়া তরিকা প্রচার করেন।[৫২]

Dhaka University Institutional Repository


**খ. চিশতি মতবাদ:** চিশতি শব্দটি একটি স্থানের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। স্থানটি হেরাতের নিকটে একটি গ্রামকে বুঝানো হয়ে থাকে। যে গ্রাম আবহাওয়া ও অন্যান্য পরিবেশগত দিক দিয়ে পূর্ণতায় বিদ্যমান রয়েছে। চিশতিয়া তরিকার প্রতিষ্ঠাতা খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি (১১৪২ খ্রি.-১২৩৬ খ্রি.) র. এর জন্মস্থান সিস্তান সীমান্তের অর্ন্তগত চিশত নামক স্থানে অবস্থিত।[৫৩] যে কারণে তাঁর নামের শেষে 'চিশতি' উপাধি প্রসিদ্ধি পেয়েছে। ভারতে চিশতিয়া তরিকা প্রতিষ্ঠাতা খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি (১১৪২ খ্রি.-১২৩৬ খ্রি.) র. যদিও ভারতের অধিবাসী ছিলেননা তাঁর তরিকা ভারতে বেশি করে প্রচার পায়। এ তরিকাটির সৃষ্টি ঘটেছে হযরত আলি (রা.) থেকে। উল্লেখ্য যে, রাসুল (সা.) এর জ্ঞান ও শিক্ষা সরাসরি প্রথম আলি (রা.) পেয়েছেন। সেই জ্ঞান ও শিক্ষা হযরত আলি (রা.) থেকে হাসান বসরির মাধ্যমে পরম্পরায় চিশতিয়া শাজারায় খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি প্রাপ্ত হন।[৫৪] তাঁর অনুসৃত সাধনা ও তরিকার নাম চিশতিয়া তরিকা। চিশতিয়া তরিকার নিয়ম কানুন শরিওতের সাথে কোন সাংগর্ষিক হিসেবে দেখা হয়নি। নামায আদায়ের পর নির্দিষ্ট ওযিফা, মোরাকাবা ও মুশাহিদা করার নিয়ম রয়েছে। এ সকল কর্ম একটি নির্দিষ্ট নিয়মে প্রতিদিন আদায় করে নিতে হয়। এ ছাড়া এতে সেমা ও ঐশি প্রেমের গান-গযলের প্রচলন রয়েছে। তরিকাটি ধ্যানমগ্ন, একাকিত্ব ও নির্জনে বসবাসকে সমর্থন করে। যেসব চিশতি মনীষী অবদান রেখে চলেছেন তন্মধ্যে আযারবাইজানের ঝনঝন এলাকার অধিবাসী সুফি পীর শায়খ হোসাইন অন্যতম। তিনি ছিলেন আলি রাজির বংশধর। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ হজরত খাজা গিয়াস উদ্দিন আহমদ সান্‌জরি; মাতার নাম সৈয়দা উম্মুল ওয়ারা।[৫৫] তিনি ভারতে ইসলাম ধর্ম প্রচারে এসেছিলেন। আজমিরে তাঁর মাযার রয়েছে। শেখ আখি শিরাজ উদ্দিন ছিলেন খাজা নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার একজন প্রিয় শিষ্য। তিনি চর্তুদশ শতকে বাংলায় এসেছিলেন। তিনি উত্তর বঙ্গে গৌড় ও পান্ডুয়ায় ইসলাম প্রচারের সময় চিশতিয়া তরিকা প্রচার করেন।[৫৬] বঙ্গের চিশতিয়া সুফিদের মধ্যে তিনি একজন প্রসিদ্ধ সুফি। তিনি ছিলেন ইমাম হাসানের বংশধর। তাঁর পূর্বপুরুষগণ কখন ভারতে আগমন করেছিল - এ বিষয়ে কোন তথ্য নেই। তাঁকে নিজাম উদ্দিন আউলিয়া অত্যন্ত ভালবাসতেন। তিনি দ্রুত খলিফা হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করার পর খেলাফত প্রাপ্ত হন এবং বাংলা দেশে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব পালন করেন। তৎকালীন সময়ে গৌড় এবং পাণ্ডুয়ায় খানকাহ প্রতিষ্ঠা করে এখান থেকে ইসলাম প্রচারে ভূমিকা রাখেন।[৫৭] শায়খ আলাউল হক ছিলেন এ তরিকার অন্যতম সুফি ব্যক্তি। তিনিও এটি প্রচারে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। শেখ আলাউল হক লাহুরি পান্ডুবি ছিলেন সেখ সেরাজ উদ্দিন আখি সেরাজের শিষ্য। তিনি পান্ডয়া ছেড়ে দুই বছর সোনার গাঁয়ে অবস্থান করেছিলেন। এসময় তাঁর সাথে বহু শাগরেদ ছিল।[৫৮] হযরত খাজা শরফুদ্দিন ওরফে খাজা চিশতি সম্পর্কে একই ধরণের মন্তব্য রয়েছে। তিনি ছিলেন চিশতিয়া তরিকার

Dhaka University Institutional Repository


অন্যতম ইসলাম প্রচারক। তিনি সম্রাট আকবরের সময়কালে ঢাকায় আসেন। তাঁর বংশ সম্পর্কে গোলাম সাকলায়েন বলেন, খুব সম্ভবত তিনি নওয়াব আলাউদ্দিন ইসলাম খান চিশতির বংশধর ছিলেন।[৫৯] তাঁর মৃত্যু তারিখ ৯৯৮ হিজরি সন। ঢাকা হাইকোর্ট ভবনের পূর্ব পার্শ্বে তাঁর মাযার রয়েছে। চিশতিয়া তরিকার অন্যতম দরবেশ ছিলেন টাঙ্গাইলের বাবা শাহ আদম কাশ্মিরি। তিনি ৯১৩ হিজরি সালে ইন্তেকাল করেন। টাঙ্গাইলের আটিয়া গ্রামে তাঁর মাযার রয়েছে।[৬০] এ তরিকার অন্যতম প্রসিদ্ধ কামেল ব্যক্তি ছিলেন আছগর শাহ। তিনি চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানার অর্ন্তগত মাদ্রাসা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর আবাসস্থল ছিল পাহাড়ের চূড়ায়। তিনি সেখানে বসবাস করতেন ও শাগরেদদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। সেখানে তাঁর নিকট অগণিত শিষ্য আগমন করত। শুধু লজ্জাস্থান ব্যতীত শরীরের কোন অংশই তাঁর ঢাকা থাকত না। তাঁর জন্ম ও মৃত্যু তারিখ জানা যায় নি।[৬১] শেখ নুরে কুতুব উল আলম ছিলেন শেখ আলাউল হকের পুত্র। তিনি বাংলাদেশে চিশতিয়া তরিকা প্রচারের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখেন। তাঁর চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচারে অবদানের কথা জানা যায়।[৬২] খাজা মঈনুদ্দিন চিশতির অন্যতম মুরিদ ছিলেন রেজা শাহ চিশতি। তাঁর সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্যের অভাব রয়েছে। তিনি কিভাবে বাংলায় আসেন সে ব্যাপারে কোন তথ্য নেই। তবে চিশতিয়া তরিকা প্রচারে এই সুফির অবদান রয়েছে। তিনি খাজা মইনুদ্দিন চিশতির আদেশক্রমে বাংলায় আগমন করেন এবং কুষ্টিয়ায় ইসলাম প্রচারের রত ছিলেন। চুয়াডাঙ্গার অর্ন্তগত কুশাঘাটা গ্রামে তাঁর মাযার রয়েছে।[৬৩] তিনি ছিলেন একজন দ্বাদশ শতকের সুফি। খাজা চিশতি বেহেশতি ছিলেন খ্রিস্টীয় ষোল শতকের একজ সুফি। ঢাকার সুপ্রিম কোর্টের পূর্ব পার্শ্বে তাঁর মাযার রয়েছে। চিশতিয়া তরিকা প্রচারে তাঁর অবদান অনেক।[৬৪] গবেষকগণ মনে করেন যে, বাংলা দেশে চিশতিয়া তরিকার সুফিরা বেশি সুসংগঠিত ছিল। সুফি ধারা প্রচারে তাঁদের অবদান অন্যান্য সুফিদের চেয়ে বেশি।

**গ. কাদেরি মতবাদ:** তাসাউফবাদি অন্যতম তরিকার নাম হল কাদেরিয়া তরিকা। এটি শায়খ আবদুল কাদের গিলানি প্রবর্তন করেন। তাঁর আসল নাম হল, মহিউদ্দিন আবু মুহাম্মদ আবদুল কাদের গিলানি। তিনি ৪৭০/৪৭১ হিজরি সালে পারস্যের গিলান প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর তাসাউফের শিক্ষক ছিলেন শেখ আবু সাঈদ মুবারক। তিনি আধ্যাত্মিক সাধনায় পরিপূর্ণতা লাভের পর ‘গাউসুল আযম’ উপাধিটি পান।[৬৫] তাঁর নাম অনুসারে প্রচারিত ও উদ্ভাবিত তরিকার নাম হয় কাদেরিয়া তরিকা। এ তরিকা প্রচারে তিনি কখনো ভারতে আগমন করেননি। তাঁর বংশজাত সৈয়দ মুহাম্মদ গাউস গিলানি ১৪১২ খ্রিস্টাব্দে ভারতে এসে কাদিরিয়া তরিকা প্রচার করেন।[৬৬] এ তরিকার মৌল শিক্ষা হল কালেমা তায়্যেবা। এ কালেমার মধ্যে যে বারটি হরফ রয়েছে তাতে সকল জ্ঞান ও রহস্য

Dhaka University Institutional Repository


লুকায়িত। যে ব্যক্তি এ কালেমার রহস্য উদঘাটনে সময় ব্যয় করেছেন তিনিই এ তরিকার একজন পূর্ণ মানুষ। রহস্য ও গোপনমূলক জ্ঞান লাভের পর তিনি ওলিয়ে কামেল হিসেবে ভূষিত হন। এ তরিকায় নামায আদায়ের পর নির্ধারিত কর্তব্য রয়েছে। দরূদ পাঠ, তসবিহ্ তাহ্লিল, যিকির ইত্যাদি কাদেরিয়া তরিকার উল্লেখযোগ্য কর্ম।

বঙ্গে এ মতবাদ প্রচারে হযরত শাহ্ কাশিমের নাম উল্লেখ রয়েছে। তিনি ছিলেন হযরত আবদুল কাদের গিলানির বংশধর। সফল প্রচারক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল অনেক। তিনি অসংখ্য শিষ্য তৈরী করতে সক্ষম হন।[৬৭] এ ছাড়া বঙ্গে এ তরিকা প্রচারে বহু সাধকের নাম উল্লেখ রয়েছে। এ তরিকা প্রচারে অন্যতম ওলিয়ে কামেল ও বুর্যগ ব্যক্তি ছিলেন শাহ আবদুর রহিম শহীদ (১০৭৪ হি.-১১৫৮ হি.)। তিনি ছিলেন একজন কাশ্মিরের অধিবাসী। তিনি ১১২০ হিজরি সনে ঢাকায় আগন করেন। এ সময় তাঁর সাথে ছিল ভ্রাতুষ্পুত্র শাহ্ নাজমুদ্দিন এবং ভাগিনা শাহ্ বাহা উদ্দিন। তাঁরা ময়দান মিয়া মহল্লায় আস্তানা গড়ে ছিলেন। সেখানে তিনি মুরিদদের ওয়াজ-নসিহতসহ কাদেরি মতবাদের শিক্ষা প্রদান করতেন। তিনি ছিলেন বংশ পরম্পরায় শেখ আবদুল কাদির (র.) এর বংশধর। তাঁর মাযার ঢাকার ময়দান মিয মহল্লায় অবস্থিত।[৬৮]

**ঘ. নক্শবন্দি মতবাদ:** এটির উদ্ভাবক ছিলেন শায়খ বাহা উদ্দিন মুহাম্মদ বোখারি নকশবন্দ। তিনি ৭১৮ হিজরি সালে বোখারার নিকটে কোসাক নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।[৬৯] অনেক ঐতিহাসিক তরিকাটির মূলে খাজা আবদুল খালেক গিজদাওয়ানি ও খাজা ইউসুফ হামাদানির দিকে সম্ভোধন করেছেন।[৭০] উল্লেখ্য যে, শেখ বাহা উদ্দিনের ইন্তেকালের পর খাজা নাসির উদ্দিন আবদুল্লাহ এহ্রার ও ইমাম রাব্বানি শেইখ আহমদ সেরহিন্দি এ তরিকার দায়িত্ব পালন করেছেন।[৭১] তাঁর অন্যতম শাগরিদ খাজা বাকী বিল্লাহ (মৃ.১৬০৩ খ্রি.) তুর্কিস্তান থেকে দিল্লিতে হিজরত করলে তাঁর সাথে নকশবন্দি তরিকাটির প্রচার পেয়েছে। তাঁর দ্বারায় প্রথম এ তরিকাটি ভারতে প্রচার পেলেও দ্রুত বিস্তার লাভ ততটা সহজ হয়নি। খাজা বাকী বিল্লাহ্ তিনি দিল্লি না তুর্কি অধিবাসী ছিলেন তা পরিস্কার নয়। চিশতিয়া মতবাদ প্রচার পাওয়ার পর এ তরিকাটি তেমনভাবে ভারতে গুরুত্ব না পাওয়ার কারণ কী ছিল জানা যায়নি। তবে যারা এ মতবাদ বঙ্গে প্রচার করেছেন তাঁরা স্থানিকরূপ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বেশি তৎপর ছিলেননা ।

বঙ্গে নকশবন্দিয়া তরিকা প্রথম কার মাধ্যমে প্রচার পেয়েছিল সে ব্যাপারে কৌতুহল রয়েছে। গবেষকদের ধারণা হল, মঙ্গলকোটের শেখ হামিদ দানেশমন্দ সপ্তদশ শতকে বাংলায় নকশবন্দি সুফি মতবাদ প্রচার করেন।[৭২] তাঁর প্রচারের পর থেকে নকশবন্দিয়া তরিকার কথা আলোচিত হয়। যদিও সেটি ছিল অনেক দিন পর। তবে মুজাদ্দাদ-ই-আলফ সানির মাধ্যমে এই সুফি মতবাদ প্রচার হয়েছিল। এ তরিকার ব্যক্তিগণ তরিকতের চেয়ে শরওিতের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করে থাকেন। তরিকা পন্থীদের বিশ্বাস যে, হযরত আবু বকর (রা.) হযরত রাসুল (সা.) থেকে যে শিক্ষা ও জ্ঞান পেয়েছেন তা নকশবন্দিয়া তরিকার মাধ্যমে পৃথিবীতে বিদ্যমান রয়েছে।[৭৩] এ তরিকার শিক্ষা অর্ন্তনিহিত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। নফস, সির, খফি, আখফা, কলব, রূহ, প্রভৃতির উপর সাধনার মাধ্যমে নিজেকে খাটি মানুষ গড়ে তোলা হয়। মোরাকাবা, নির্জনতা ইত্যাদি নির্দিষ্ট কিছু কর্ম রয়েছে। যেগুলো একেবারে এ তরিকার সাথে সম্পৃক্ত। বঙ্গে এ তরিকাটি শাহ জালাল (র.) এর আগমনের পর বিস্তার লাভ করেছে। নকশবন্দিয়া মুজাদ্দিদিয়া তরিকাটি পূর্ববর্তী কয়েকটি তরিকার সমন্বয়ে গঠিত হয়।

## আধুনিকতা ও সংস্কার

সুফি মতবাদগুলো দীর্ঘ সময় ধরে বাংলায় স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। খ্রিস্টীয় ষোল শতকের পর বাংলায় নতুন ধারার সূচনা হয়। শরিয়ত মোতাবেক চলার জন্য যা করণীয় সে দিকে ভারতের উলামাগণ মতামত প্রদান করেন। সে সময় মুসলমান সমাজের নানা অস্থিরতা সুফি- সাধকদেরকেও অস্থির করে রেখেছিল। শেখ আহমদ সেরহিন্দি (১৫৬৩ খ্রি.-) ও শেখ আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহলভি (মৃ. ১৬৪১ খ্রি.) সংস্কারের পক্ষে প্রচার অব্যাহত রাখলে পুরনো ধারার ব্যত্যয় ঘটে।[৭৪] ভারতের সুফিধারার প্রভাব ও নানা সংস্কার আন্দোলন পরিবর্তনের অন্যতম কারণ।

এ দেশে মুসলিম মনীষী ও সুফি সাধকদের জ্ঞান ও সাধন চর্চার প্রতিফলন ঘটেছিল। সে চর্চাকারীদের একটি বিশাল গোষ্ঠী ছিল ফারসিভাষী। তা না হলে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত হিন্দু-মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোর মধ্যে ব্যাপক ফারসির চর্চা হতো না। ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে ফারসির চর্চা ও শিক্ষা বিকশিত হওয়ার পিছনে তাঁদের অবদান অনিস্বীকার্য। ইসলাম ধর্ম প্রসার লাভের জন্য যে কারণটি গ্রহণীয় তা হলো এই যে, একটি আদর্শ সবাইকে আকৃষ্ট করেছিল। ফলে হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মের লোকেরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

## টীকা ও তথ্য নির্দেশ

১. সেন, দীনেশচন্দ্র, *প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান*, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৩১।

২. Karim, Abdul, *Social History of The Muslims in Bengal*, Baitush Sharaf Islamic Research Institute Chittagong, 1985, p. 26; হক, মুহম্মদ এনামুল, *পূর্ব্ব পাকিস্তানে ইসলাম*, আদিল ব্রাদার্স এণ্ড কোং, ঢাকা, ১৯৪৮, পৃ. ১০; শাহনাওয়াজ, এ. কে. এম., *মুদ্রায় ও শিলালিপিতে মধ্যযুগের বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১৯।

৩. হক, মুহম্মদ এনামুল, *পূর্ব্ব পাকিস্তানে ইসলাম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫।

৪. আহমদ, ওয়াকিল, *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা ১ম খণ্ড*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৩৮।

৫. সোবহানি, তওফিক, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, এন্তেশারাতে জাওয়ার, তেহরান, ১৩৮৮ হি.শা., পৃ. ৯৫।

৬. ইসলামে তাপসদের মধ্যে হাসান বসরির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ইরাকের বসরা নগরীতে বসবাস করতেন। ইরানী ভাবধারার প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। সুফিদের মাঝে প্রচলিত যে, হযরত আলির চার খলিফা ছিল। হাসান, হোসাইন, কামেল ও হাসান বসরি।

৭. সাহলাগি, মুহাম্মদ বিন আলি (সংকলক), *আয মিরাচে এরফানিয়ে বায়েজিদ বেস্তামী* (অনুবাদক রেজা শাফই কুদকানি),এন্তেশারাতে সুখান, তেহরান, ১৩৮৮ হি.শা., পৃ. ১৭।

৮. রশীদ, আ. ন. ম. বজলুর, *পাকিস্তানের সূফী-সাধক*, জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা: পূর্ব পাকিস্তান, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃ. ১১।

৯. হক, মুহম্মদ এনামুল, *বঙ্গে সূফী প্রভাব*, র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ২৬।

১০. Rahim, Abdur, *Social & Cultural History of Bengal (Vol-1)*, Pakistan Historical Society, Karachi, 1963, P. 72; রশিদ, আ.ন.ম. বজলুর, *পাকিস্তানের সূফী-সাধক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১।

১১ দ্রস্টব্য–মুতাহ্হরী, শহীদ আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা, *ইসলাম ও ইরানের পারস্পরিক অবদান*, (অনুবাদক এ. কে. এম. আনোয়ারুল কবীর) কালচারাল কাউন্সেলরের দফতর, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস, ঢাকা, ২০০৪, দর্শন ও প্রজ্ঞা।

১২. সুফিবাদের ভাষা: ধর্মভাষা আরবি হওয়ার কারণে সুফিরা আরবি ভাষা ব্যবহার করতেন। তবে তাঁদের সকল কায-কর্ম পরিচালিত হত ফারসি ভাষায়। সুফি ও সুফিবাদী তরিকাপন্থীদের বিশাল একটি দলের উদ্ভব ঘটেছে পারস্যভুক্ত অঞ্চলগুলোতে। যে কারণে সুফিদের ভাষা ফারসি হিসেবে প্রসিদ্ধি পায়। মুতাহ্হরী, শহীদ আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা, *ইসলাম ও ইরানের পারস্পরিক অবদান*, (অনুবাদক এ. কে. এম. আনোয়ারুল কবীর), পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭।

১৩. হবিবুল্লাহ, এ বি এম, *ভারতে মুসলিম শাসনের বুনিয়াদ*,(ভাষান্তর লতিফুর রহমান) বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ২০৫; Rahim, Abdur, *Social & Cultural History of BengalVol.1*, op.cit, p.139.

১৪. হক, মুহম্মদ এনামুল, *বঙ্গে সূফী প্রভাব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭।

১৫. শরীফ, আহমদ, *মধ্যযুগে বাঙলা সাহিত্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৯৫।

১৬. সাকলায়েন, গোলাম, *পূর্ব পাকিস্তানের সূফী-সাধক*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৌষ-১৩৬৮, পৃ. ৮৭।

*Dhaka University Institutional Repository*


১৭ হক, মুহাম্মদ এনামুল, *পূর্ব্ব পাকিস্তানে ইসলাম*, ঢাকা: আদিল ব্রাদার্স এণ্ড কোং, পুনর্মুদ্রণ ১৯৪৮, পৃ. ১৭।

১৮. করিম, আবদুল, ত্রয়োদশ শতকে বাংলা দেশে মুসলমান সমাজ-বিস্তার, *বাঙলা একাডেমী পত্রিকা*, ঢাকা, ৮ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭১ বাং., পৃ. ২।

১৯. ডলি, লাভলি আখতার, *বাংলাদেশে সূফীদর্শনের রূপরেখা*, সাফা পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১৮০।

২০. Rahim, Abdur, *Social & Cultural History of Bengal Vol.1,* op.cit, p.140.

২১. করিম, আবদুল, *চতুর্দশ শতকে বাংলা দেশে মুসলমান সমাজ বিস্তার*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পুনর্মুদ্রিত, পৃ. ২০।

২২. সাকলায়েন, গোলাম, *পূর্ব পাকিস্তানের সূফী-সাধক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭।

২৩. রশিদ, আ.ন.ম. বজলুর, *পাকিস্তানের সূফী-সাধক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭।

২৪. Rahim, Abdur, *Social & Cultural History of Bengal Vol.1,* op.cit, P. 16.

২৫. সাহলাগি, মুহাম্মদ বিন আলি (সংকলক), *আয মিরাচে এরফানিয়ে বায়েজিদ বেস্তামী* (অনুবাদক রেজা শাফই কুদকানি), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫।

২৬. খান্‌কাহ ও দরগাহ: সুফিচর্চার প্রধান কেন্দ্রের নাম খান্‌কাহ ও দরগাহ। দু'টি শব্দই ফারসি। প্রথম শব্দটি সুফিদের আধ্যাত্মিক কর্মকান্ডের উপর ভিত্তি করে উৎপত্তি লাভ করেছে। এটি সুফিদের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। দরগাহ শব্দের অন্যতম অর্থ হলো সুফিদের সভা বা কর্মপরিচালনার স্থান।

২৭. Rahim, Abdur, *Social & Cultural History of Bengal Vol.1,* op.cit, P. 74.

২৮. সোবহানি, তওফিক, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৫।

২৯. সোবহানি, তওফিক, তদেব, পৃ. ৯৫।

৩০. তদেব, পৃ. ৯৪।

৩১. তদেব, পৃ. ৯৬।

৩২. Rahim, Abdur, *Social & Cultural History of Bengal Vol.1,* op.cit, p. 76.

৩৩. Rahim, Abdur, Ibid, p. 76.

৩৪. Ibid, p. 77.

৩৫. সাকলায়েন, গোলাম, *পূর্ব পাকিস্তানের সূফী-সাধক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮।

৩৬. সাকলায়েন, গোলাম, তদেব, পৃ. ৮৯।

৩৭. তদেব, পৃ. ৮৯।

৩৮. তদেব, পৃ. ৮৯।

৩৯. রশিদ, আ.ন.ম. বজলুর, *পাকিস্তানের সূফী-সাধক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯।

৪০. Rahim, Abdur, *Social & Cultural History of Bengal Vol.1,* op.cit, p. 254.

৪১. ডলি, লাভলি আখতার, *বাংলাদেশে সূফীদর্শনের রূপরেখা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৫।

৪২. ডলি, লাভলি আখতার, তদেব, পৃ. ১২৪।

৪৩. হক, মুহম্মদ এনামুল, *বঙ্গে সূফী প্রভাব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯।

৪৪. আল্লামি, আবুল ফজল, *আইনে আকবরি (জেলদে সওম)*, মুনশি নওয়াল কিশোর প্রেস, লখনৌ, ১৯৮৩, পৃ. ১৬৫।

৪৫. Karim, Abdul, *Social History of The Muslims in Bengal*, op.cit, P. 76; আহমদ, ওয়াকিল, *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা ২য় খণ্ড*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৫৪।

৪৬. Karim, Abdul, *Social History of The Muslims in Bengal*, op.cit, P. 17.

৪৭. হালাভি, আলী আসগর, *তারিখে ফালাসেফে ইরানী*, এন্তেশারাতে যাওয়ার, তেহরান, ১৩৯২, পৃ. ৪৬১।

৪৮. আল্লামি, আবুল ফজল, *আইনে আকবরি (জেলদে সওম)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৯।

৪৯. মুহাম্মদি, গুল নাসা, *তালাক্কি আয ইরফান দার শে'রে মুয়াসেরে আফগানিস্তান*, পেযোহাশগাহে উলুমে ইনসানি ওয়া মুতালেয়াতে ফারহাঙ্গি, তেহরান, ১৩৯১, পৃ. ৫০।

৫০. মুহাম্মদি, গুল নাসা, তদেব, পৃ. ৫০।

৫১. ডলি, লাভলি আখতার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭।

৫২. তদেব, পৃ. ৬৭।

৫৩. মুহাম্মদি, গুল নাসা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩।

৫৪. ডলি, লাভলি আখতার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪।

৫৫. খানম, মাহমুদা, *মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে হিন্দী সুফী কাব্যের প্রভাব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৩৮।

৫৬. Rahim, Abdur, *Social & Cultural History of BengalVol.1,* op.cit, p. 78; রশিদ, আ.ন.ম. বজলুর, *পাকিস্তানের সূফী-সাধক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭।

৫৭. করিম, আবদুল, চতুর্দশ শতকে বাংলা দেশে মুসলমান সমাজ বিস্তার, *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, নবম বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ -আশ্বিন ১৩৭২, পৃ. ১৩।

৫৮. হক, ওবাইদুল, *বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ*, হামিদিয়া প্রেস, নোয়াখালি, ১৯৬৯, পৃ. ১০৪।

৫৯. সাকলায়েন, গোলাম, *পূর্ব পাকিস্তানের সূফী-সাধক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১।

৬০. সাকলায়েন, গোলাম, তদেব, পৃ. ৫৪।

৬১. হক, ওবাইদুল, *বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১।

৬২. করিম, আবদুল, *চট্টগ্রামে ইসলাম*, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র চট্টগ্রম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০, পৃ. ৬৫।

৬৩ ডলি, লাভলি আখতার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫।

৬৪. তদেব, পৃ. ১০৭।

৬৫. মুহাম্মদি, গুল নাসা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬।

৬৬. আল্লামি, আবুল ফজল, *আইনে আকবরি (জেলদে সওম)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৭।

৬৭. খানম, মাহমুদা, *মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে হিন্দী সুফী কাব্যের প্রভাব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭।

৬৮. হক, ওবাইদুল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪।

৬৯. মুহাম্মদি, গুল নাসা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬

৭০. মুহাম্মদি, গুল নাসা, পৃ. ৩৫।

৭১. তদেব, পৃ. ৩৬।

৭২. খানম, মাহমুদা, *মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে হিন্দী সুফী কাব্যের প্রভাব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭।

৭৩. ডলি, লাভলি আখতার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২২।

৭৪. খানম, মাহমুদা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫।

Dhaka University Institutional Repository


## সহায়ক গ্রন্থাবলি


১. গুল নাসা মুহাম্মদি : তালাক্কি আয ইরফান দার শে'রে মুয়াসেরে আফগানিস্তান

২. এ বি এম হবিবুল্লাহ : ভারতে মুসলিম শাসনের বুনিয়াদ

৩. এম ওবাইদুল হক : বাংলা দেশের পীর আউলিয়াগণ

৪. ড. মুহম্মদ এনামুল হক : বঙ্গে স্বূফী প্রভাব

৫. গোলাম সাকলায়েন : পূর্ব পাকিস্তানের সূফী-সাধক

৬. আ.ন.ম. বজলুর রশীদ : পাকিস্তানের সূফী-সাধক

৭. ওয়াকিল আহমদ : উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা- চেতনার ধারা (১ম খণ্ড)

Dhaka University Institutional Repository

# পঞ্চম অধ্যায়: বঙ্গে আগত ইরানি সুফিদের পরিচয়

সুফিদের জীবন কাহিনী জানার জন্য শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার রচিত *তাযকিরাতুল আউলিয়া* গ্রন্থটি অধিক গ্রহণযোগ্য। পরবর্তীতে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী সুফিদের আর্বিভাব ও সুফিবাদ প্রসারের উপর অনেকগুলো গ্রন্থ রচিত হয়েছে। যেগুলো বিভিন্ন সময় তথ্য-উপাত্তের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইরানি সুফি ও সুফিদের জীবনী নিয়েও অনেক ফারসি গ্রন্থ রয়েছে। এগুলো শুধু ঐ দেশীয় সুফিদের পরিচয় বহন করেনা তাঁদের চিন্তা-ধারণা প্রসারেরও তথ্য দেয়। *যেমন–জুস্‌তেজু দার তাসাউফে* ইরান ( جستجو در تصوف ایران ) ও তারিখে ফালাসিফে ইরানি ( تاریخ فلاسفه ایرانی ) বই দু'টিতে ইরানের সুফিদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। তবে ইরানি সুফি বাংলা দেশে আগমন করেছেন তাঁদের সম্পর্কে জানার এমন গ্রন্থ পাওয়াই বিরল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব ইরানি কবি ও ইসলাম প্রচারক এসেছিলেন তাঁদের সম্পর্কেও ইরানিদের তথ্যমূলক রচনা অনেক কম। বাংলাদেশে রচিত সুফি-সাধক বিষয়ের গ্রন্থগুলোতে বঙ্গের সুফিদের বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। তাতে পৃথক করে ইরানি সুফিদের আলোচনা পাওয়া যায়না।

## আগমনের কেন্দ্র স্থান

পারস্যকে সুফিবাদের আদি বাসভূমি বলা হয়। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে দ্বিমত নেই। কার্যত যারা মরমীবাদে বিশ্বাসী তাঁরা পারস্যভূক্ত অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। ত্রয়োদশ শতকে মরমিবাদি সুফিদের যে দলটি ভারতে এসেছিল হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সুদূর প্রসারী ভূমিকা রাখে।[১] মরমি সাধকগণ ইসলাম ধর্মের সকল ক্রিয়া কর্ম সম্পাদন করে একটি আধ্যাত্মিক ধর্মমত গড়ে তুলতে সক্ষম হন। এই সাধকদের ধর্মীয় অনুশীলনের মধ্যে অন্যতম ছিল 'সেমা'[২] অর্থাৎ আল্লাহকে উৎসর্গ করে গীত সঙ্গীত পরিবেশন করা। এই সেমার অন্যতম ভিত্তি হল মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি। তাঁর মাধ্যমে সুফিবাদে সেমা সংযোজিত হয়েছে। তিনি যে একজন ফারসি সাহিত্যে সুফি ধারার অন্যতম পথিক ছিলেন তা বোধ করি নতুন করে পরিচয় দানের প্রয়োজন নেই। সেই

সেমার প্রচলন ইসলাম প্রচারের সময় বঙ্গে ঘটে ছিল। অনেক সাধক নাচের তালে তালে ধর্মীয় গীত পরিবেশন করতেন। এই সব ফকিরদের কেরামত দর্শনে অনেক হিন্দু সেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এ সমস্ত সুফি সাধক নিঃসন্দেহ পারস্যের অধিবাসী ছিলেন। বঙ্গের মানুষকে ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করতে এই সব সুফিদের ভূমিকা ছিল অধিক। পারস্য ধারার সুফিদের একটি দল সেমা ভালবাসতেন। একইভাবে বঙ্গের মানুষ যে সেমা বা সঙ্গিত পছন্দ করতেন তা অনায়েসে বলা যায়। কারণ সেমা সঙ্গিত পরিবেশনে ফারসি বয়েতের ব্যবহার করা হত। বক্তা ও উপস্থিত শ্রোতা সবাই ফারসি ভাষার বয়েত গেয়ে স্বাদ অনুভব করতেন। সুফিতত্ত্বের বিষয়গুলো কখনও ফারসি বয়েত ব্যতীত উৎসবমুখর হতো না। চিশতিয়া ও নকশবন্দিয়া তরিকার অনুসারীরা সেমাকে ভালবাসেন এবং তাঁদের কার্যতালিকায় সেমা অর্ন্তভূক্ত রয়েছে।[৩] এসব তরিকার সুফি ও শাগরেদ ফারসি ভাষার ব্যবহার ও প্রয়োগে উদার ছিলেন।

চর্তুদশ শতকে সিলেটে হযরত শাহ জালালের সাথে তিন শত ষাট জন আউলিয়া বঙ্গে প্রবেশ করেন। এ সব আউলিয়া সবাই আরব ধারার ছিল বোধ করি বিশ্বাসযোগ্য নয়। সিলেটে ইসলাম প্রচারে তাঁদের ভূমিকাকে বড় করে দেখা হয়। এসব সুফিদের আগমনকেন্দ্র বাংলায় ছিল।[৪] তাঁরা সিলেটসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে ভূমিকা রাখেন। চট্টগ্রামে সুফিদের ইসলাম প্রচারকদের তালিকা বাঙালি সুফি গবেষকগণ তৈরী করেছেন। সে সংখ্যা বার জন আউলিয়া থেকে শুরু করে পঞ্চাশ ও তদোর্ধে রয়েছে।[৫] সেখানেও ইরানি সুফিদের উপস্থিতি বা আগমনের কথা অস্বীকার করা ঠিক হবেনা। চট্টগ্রামের সমুদ্রপথে সুফিদের আগমনকে ঐতিহাসিকগণ গুরুত্ব সহকারের বিবেচনা করেন। কেননা, বাংলায় ইসলাম প্রচার ও সুফির আগমন ঐ সমুদ্রপথটি দিয়ে হয়েছে যা ইতিহাসে খ্যাত।[৬] তবে ঐ সব দলভূক্ত আগমনকারী সুফিদের পরিচয় ঐতিহাসিকগণ সঠিক ভাবে তুলে না ধরার কারণে ইরানি সুফির পরিচয় অজ্ঞাত থেকে যায়। ঐতিহাসিকদের মাঝে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সুফিদের প্রভাব সম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই। যে কারণে চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও সিলেটে অবস্থিত মাযারগুলোকে অসম্মান করা হয় না।

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারকালে সুফিদের যে ভূমিকা ছিল বাঙালি গবেষকগণ তা অস্বাভাবিক বলেই মনে করেন। কেননা, তাঁদের দৃষ্টিতে অগণিত সুফিদের আগমন না ঘটলে সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতিতে সুফি ধারার বিকাশ ঘটত না। অবশ্য কারও নিকটে বহিরাগতদের পরিচয় স্পষ্ট নয়। এ

Dhaka University Institutional Repository


অঞ্চলের স্থানীয় ঐতিহাসিকগণ সুফিদের বর্ণনা দিতে গিয়ে অসংখ্য সুফির ভূমিকার কথা তাঁদের রচনায় উল্লেখ করেছেন।

বঙ্গে ইসলাম প্রচারের সময় সুফি-সাধকদের একটি বড় ভূমিকা ছিল।[৭] যে সব পির-দরবেশ আগমন করেছেন আরব ব্যতীত তাঁরা ইরান ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। বালখ, হেরাত, খোরাসান, থেকেও বহু সুফির আগমন বাংলায় ঘটেছে সে বিষয়টি স্পষ্ট। কোন পথে, কিভাবে বাংলায় সুফিরা এসেছেন সে বিষয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী ও বগুড়া অঞ্চলগুলো সুফিদের বিচরণ ভূমি হিসেবে খ্যাত। নৌ পথে, স্থলযান পথে বা পায়ে হেটেও সুফিরা বঙ্গে এসেছেন।[৮] আরবে ইসলাম ধর্মের উৎপত্তির পর সে ধর্মের বিকাশ ঘটেছে বিভিন্নভাবে। সে ধর্ম বিকাশের ক্ষেত্রে শুধু যে আরবরাই অবদান রেখেছেন এমনটি বলা আমাদের যথার্থ হবে না। ইরানে ইসলাম ধর্ম পৌছার পর ইরানি জাতি অন্যদের মাঝে ইসলাম ছড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব পালন করেন। এ দায়িত্ব অন্য কোন মুসলিম দেশের চেয়ে অনেক গুরুত্ব রাখে। যে কারণে আরবদের চেয়ে পারস্যের মাধ্যমে ইসলাম ভারত উপমহাদেশে দ্রুত পৌঁছতে সক্ষম হয়। এ প্রসঙ্গে ইসলাম প্রচারকারী সুফিদের আলোচনা নিয়ে আসা প্রয়োজন মনে করছি।

সুফিদের ভিতর বিশ্বাস ও জ্ঞান রয়েছে যে, নবি করীম (সা.) জ্ঞান ও শিক্ষা হজরত আলিকে (রা.) প্রদান করেছেন। হজরত আলি (রা.) হলেন একমাত্র অধ্যাত্মবাদ ও গুপ্তধনের অধিকারী ব্যক্তি। সে ধারণা থেকেই প্রথমে আরবদেশে উৎপত্তি লাভ করে অধ্যাত্মবাদ বা সুফিসাধনা। পরবর্তীতে এটি ইরানে সুফিদল দ্বারায় সুপ্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত হয়।[৯] ইসলামের প্রথম দিকে আরবের চেয়ে পারস্যেই সুফিদের উত্থান ও চর্চা বেশি হয়। যেসব সুফিদের পরিচয় আমরা পাই তাঁদের অনেকেই পারস্যবাসী বা ইরানের নিকটতম অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। হাসান বসরি (মৃ. ১১০হি./ মৃ. ৭২৮ খ্রি.), মালেক ইবনে দিনার, ইব্রাহীম আদহাম (মৃ. ১৬১ হি./ মৃ.৭৭৭ খ্রি.), আবুল হাশেম কুফি (মৃ. ১৬২ হি./ মৃ.৭৭৭ খ্রি.), ফাজেল ইবনে আয়াজ (মৃ. ১৮৮ হি.), বায়েজিদ বিস্তামি, বাশার হাফি, সেররি সাকতি, জুনায়েদ বাগদাদি (মৃ. ২৯৭ হি./ মৃ. ৯১০ খ্রি.), যন্নুন মিসরি (মৃ. ২৪৫ হি./ মৃ. ৮৬০ খ্রি.), সাহাল ইবনে আবদুল্লাহ তস্তরি, হুসাইন ইবনে মনসুর হাল্লাজ (মৃ. ৯২১ খ্রি.), আবু আলি রুদবারি, খাজা আবদুল্লাহ আনসারি, ইমাম আবু হামেদ গাজ্জালি তুসি (১০৫৮ খ্রি.-১১১১ খ্রি.), শায়খ আহমদ জামি, আবদুল কাদের জিলানি, শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার নিশাপুরি, মাওলানা জালাল উদ্দিন বাল্খি (১২০৭ খ্রি.-১২৭৩ খ্রি.), খাজা হাফেজ শিরাজি, নুরুদ্দিন আবদুর রহমান জামি প্রমুখ সুফিগণ কেউই

Dhaka University Institutional Repository


ভারতীয় অঞ্চলের নন। তাঁদের জ্ঞান-চর্চার বিষয়বস্তু ছিল কুরআন ও হাদিস।[১০] তাঁদের ব্যবহার ও প্রয়োগের ভাষা যে ফারসি ছিল না এমনটি আশা করা আমাদের ভুল হবে। এমনকি সুফিবাদের আলোচনায় তাঁরা যে ফারসি ভাষায় কবিতা ও আলোচনা করতেন না তাও সঠিক নয়। মিসর বা আরব দেশগুলোতে সুফিবাদের উন্মেশ ঘটলেও পারস্যের বালখ, হামাদান, খোরাসান, রেই, শিরাজ, তুস, সেমনান, তাবরিজ, কাজভিন অঞ্চলগুলো সুফিদের পদচারণায় মুখরিত থাকত। একমাত্র ইরানই প্রতিকূলতার সম্মুখীন হওয়া ব্যতি রেখে সুফি মতবাদ ও সুফিদর্শন প্রচারে সক্ষম হয়।[১১] সুফিবাদের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে পারস্যবাসীরা বিড়াট বড় অবদান রাখেন। সেই প্রেক্ষাপটেই ইরানি **সুফি** সাধকদের বিভিন্ন দেশে তাঁদের আগমন ঘটেছে। ইরান থেকে ভারতে সুফিমত প্রচারিত হয়। ইরানের সুফিরাও বাংলায় ইসলাম প্রচার করাকে অনুকূল পরিবেশ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। বাংলার সবুজ মনোরম পরিবেশের সাথে ইরানের প্রাকৃতিক পরিবেশের মিল রয়েছে। এ কারণে তাঁরাও এখানে ইসলাম প্রচার করতে বিড়াট ভূমিকা রাখেন। বাংলায় ইসলাম প্রচারক ও দরবেশগণ ঐ সুফিমতের বিশ্বাসী ছিলেন।[১২]

## ইরানি সুফি

বঙ্গে ইরানি সুফিদের আগমনের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে ফারসি সাহিত্যের আলোচনা ও ইরানি জাতির দর্শন চিন্তার উপর ব্যাখ্যা দানের প্রয়োজন মনে করছি। আরবরা সাসানি সাম্রাজ্য ধ্বংসের মধ্য দিয়ে ইরান ভূ-খণ্ডে ইসলাম ধর্ম প্রবেশের যাত্রা শুরু করেছিল। প্রথম দিকে ফারসি সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ ও উন্নয়নে আরবি ভাষা অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। পরবর্তীতে তাঁদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ও চর্চার কারণে নিজেদের ফারসি ভাষা ও সংস্কৃতি ইসলামের ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে বন্ধন তৈরী করে।[১৩] মহাকবি ফেরদৌসি (৩৩০ হি.-৪১১ হি.), হাফেজ শিরাজি ও শেখ সাদি (১১৭৫ খ্রি.-১২৯৫ খ্রি.) -এর ন্যায় অসংখ্য সুফি ও দর্শনভিত্তিক কবির জন্ম ঘটেছে ইরানে। ফলে সুফিমত দর্শনের ক্ষেত্র হিসেবে ইরান দিন দিন বেড়ে ওঠার পর সুফিচর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। তাতে করে ইরানের সুফিরা ইসলামের আলো চর্তুদিক ছড়িয়ে দিতে এক অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছে বলা যায়। মধ্যযুগ বা তৎপূর্ববর্তী সময়ে ইরানিদের মধ্য থেকে যারা ইসলাম প্রচারের জন্য বঙ্গে ও অন্যান্য অঞ্চলে এসেছেন তাঁদের চিন্তা-চেতনায় সুফি দর্শনের বীজ নিহিত ছিল।[১৪] ব্যবসা-বাণিজ্য, ভ্রমণ বা যে কোন উদ্দেশ্যে এ দেশে তাঁদের আগমন হউক না কেন তাঁরা ইসলামের জয়গান প্রচার করেছেন। তাঁদের প্রচার ও দাওয়াত ছিল দর্শনভিত্তিক। যার ফলশ্রুতিতে ইরানি দর্শনের প্রভাব বঙ্গের সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্যে পড়েছে। এ প্রভাব আফগানিস্তান ও ভারত হয়ে বঙ্গে প্রবেশ

লাভ করে। উল্লেখ্য যে, নয় শত খ্রিস্টাব্দ বা তৎপরবর্তী সময়ে সুফিদের আগমন ছিল খুবই কম। বঙ্গে ১২০৪ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে সুফিদের আগমন বৃদ্ধি ঘটেছে।

বঙ্গে ইসলাম প্রচার ও বঙ্গের মানুষের প্রতি সত্য ও ন্যায়ের পথ তুলে ধরতেই পারস্যের সুফিরা এ দেশে আগমন করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন না করে এখানে ইন্তেকাল করেন। ঢাকা, সিলেট ও চট্টগ্রামে অগণিত মাযার, দরগাহ সুফিদের স্থায়িত্ব ও বসবাসের অন্যতম প্রমাণ। আবার অনেকে অন্যত্র চলে গিয়েছেন। যে কারণে খান্‌কাহ ও আস্তানা সম্পর্কে দ্বিমত বক্তব্য পরিলক্ষিত হয়। সুফিদের দাওয়াত বঙ্গের মানুষ সাদরে গ্রহণ করেছিল বলে এ অঞ্চলের সুফি ভাবধারা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে রূপ পেয়েছে।[১৫] তখন সুফিদের ভাষার প্রয়োগ একটি বিষয় ছিল। সুফিরা কোন ভাষায় সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল। নিশ্চয় সুফিরা নিজের মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য ভাষা ব্যবহার করতেন না। তখন তাঁদের ভাষা যে জনসাধারণের ভাষার সাথে মিশে গিয়ে ছিল তা বলা যায়।[১৬] যদি সুফিরা প্রাচীন ইরান অঞ্চলের অধিবাসী হয়ে থাকেন তাঁরা মাতৃভাষা ফারসি ব্যবহারের প্রতি উদার ছিলেন। কখনও ফারসি ভাষার সাথে আরবি ভাষার ব্যবহার হলেও তাঁরা অন্য ভাষায় কথা বলতেন না। পারস্য সুফিবাদের কেন্দ্রস্থান এবং আদি বাসভূমি হিসেবেও একথাই প্রমাণ করে যে, ফারসি ভাষা সুফিদের প্রাণ। এ স্থান থেকেই বিভিন্ন জায়গায় সুফিদের গমন ও বিভিন্ন দেশে প্রবেশ ঘটেছে। সাথে ফারসি ভাষা স্থানান্তরিত হয়েছে অনায়েসে ও অবলীলায়। যে সব সুফি মরমীবাদে বিশ্বাসী তারা বাংলা বা ভারতের বিভিন্ন স্থানে এসেছিলেন তাঁরা ছিলেন নিঃসন্দেহ ইরানি বা প্রাচীন পারস্যবাসী।[১৭] এখানে এ সব ইরানি সুফিদের পরিচয় প্রদান আমাদের কাম্য। তবে তাঁদের পরিচয় উপস্থাপন মোটেও সহজ নয়। স্পষ্টত এসব সুফিদের নিয়ে আলোচনা করা বা অত্যন্ত দূরূহ। কেননা, তথ্য ও ইতিহাসের অভাব থাকায় ইরানি সুফিদের সম্পর্কে জানার আগ্রহ অনেক আগেই ফুড়িয়ে গিয়েছে।

**১. মীর সৈয়দ আলি তাবরিজি:** তিনি ইরানের তাবরিয প্রদেশের অধিকারী ছিলেন। কখন তাবরিয অঞ্চল থেকে বঙ্গে আসেন সে ব্যাপারে কোন তথ্য নেই। তিনি বঙ্গে আগমনের পর ঢাকার ধামরাইকে ইসলাম প্রচারের উপযুক্ত স্থান হিসেবে গ্রহণ করেন। এ সময় তাঁর সাথে কয়েকজন সুফিভাবাপন্ন ধার্মিক ব্যক্তি ছিল।[১৮] তাঁর ইসলাম ধর্ম প্রচারের সাথে সাথে সঙ্গীরাও আশ-পাশে ইসলাম প্রচারে ভূমিকা রাখেন। ঠিক তিনি কত দিন ইসলাম প্রচারে রত ছিলেন – ইতিহাসে সে ব্যাপারে আলোচনা নেই। এই সুফির ঢাকার ধামরাই নামক স্থানে একটি মাযার রয়েছে। বাংলার

Dhaka University Institutional Repository


ইতিহাসে তাঁর সম্পর্কে যেমন আলোচনা নেই তদ্রুপ ফারসি ভাষার রচনাদিতেও অনুপস্থিত। হয়তবা ইরান থেকে বের হওয়ার পর নিজ দেশে গমন না করার কারণে ইরানিদের নজরে না আসাই স্বাভাবিক। তাঁর মাযারে একটি শিলালিপি পাওয়া যায়। এটি ১৪৮২ খ্রিস্টাব্দে সুলতান ফতেহ শাহ এর আমলে উৎকীর্ণ হয়।[১৯] এটিকে ভিত্তি করে ঐতিহাসিকরা তাঁকে চর্তুদশ বা পূর্বের সুফি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বস্তুত তথ্যের অভাবে এই ইরানি সুফি সম্পর্কে আমরা খুব কমই অবগত আছি।

**২. হজরত আল্লাহ বখশ:** তথ্যের অভাবে এই সুফি সম্পর্কে আমাদের ধারণা নেই। তিনি গিলান প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। কার্যত তাঁর ইসলাম প্রচারের ইতিহাস লেখা হয় নি। এই ইরানি সুফি ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। বাংলাদেশে তাঁর কবরের কথা উল্লেখ করা হলেও কোথায় অবস্থিত তা জানা দুরূহ।[২০]

**৩. শেখ আব্বাস বিন হামজা নিশাপুরি:** ব্যক্তি নামের সাথে 'নিশাপুর' শব্দটি ইরানের দিকে সম্ভোদিত হয়েছে। এই সুফির জন্ম ইরানের নিশাপুরে অবস্থিত। তিনি কখন বাংলাদেশে এসেছিলেন কোথাও উল্লেখ নেই। তাঁর ৯০০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় ইন্তেকাল করার তথ্য পাওয়া যায়। সে হিসেবে তিনি বঙ্গ বিজয়ের আগ থেকেই এ দেশে এসে ছিলেন। ঢাকায় তাঁর মাযার রয়েছে।[২১]

**৪. শাহ সুলতান বাল্খি:** তিনি বালখের অধিবাসী বঙ্গের অন্যতম ইসলাম প্রচারক। এ সুফির নাম সুলতান মাহী সওয়ার হিসেবে লেখা হয়ে থাকে। নামের উপাধিতে পরিস্কার হয়ে ওঠে যে, তিনি একজন বাহিরের সুফি ছিলেন। তাঁকে খ্রিস্টিয় একাদশ ও দ্বাদশ শতকের একজন উল্লেখযোগ্য সুফি হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি ছিলেন বলখের একজন শাসকের সন্তান। পিতার নাম শাহ আসগর। পিতা মৃত্যুবরণ করলে ভিনি রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব হাতে নেন।[২২] এ সময় তাঁর জীবনে পরিবর্তন দেখা দেয়। তিনি রাজ্যের সুখ বিলাস ছেড়ে সত্য ও ন্যায় তালাশে বের হয়ে পড়েন। তিনি বহু পথ ভ্রমণ করে দামিশ্ক পৌঁছলে এক আধ্যাত্মিক ব্যক্তির সন্ধান পান। তাঁর নাম শেইখ তাওফিক। তিনি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি সেখানে প্রায় ছত্রিশ বছর সাধনায় ছিলেন।[২৩] তাঁর জীবনের উল্লেযোগ্য সময় সাধনায় অতিবাহিত হয়েছে। শেইখ তাওফিক তাঁকে বাংলায় ইসলাম প্রচারের জন্য আদেশ দেন। তাঁর আদেশেই তিনি সমুদ্রযানে সন্দীপ হয়ে বাংলায় আসেন। সমুদ্রপথে এক মাছের আকৃতির যানবাহনের উপর আরোহণ করেছিলেন বলে তাঁকে মাহী সওয়ার বলা হয়।[২৪] তিনি চট্টগ্রামে সমুদ্র পথে পৌঁছার পর ঢাকা হয়ে বগুড়ায় গমন করেন। বগুড়ার মহাস্থানগড় ছিল হিন্দু রাজা

Dhaka University Institutional Repository

পরশুরাম এর রাজ্য শাসনের কেন্দ্রবিন্দু। তিনি সেখানে ইসলাম প্রচার করলে হিন্দু রাজার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। সেখানে তাঁর নির্মিত একটি মসজিদ রয়েছে। ঢাকায় অবস্থিত হযরত শাহ্ মালেক ইয়ামনীর পার্শ্বে যে মাযার রয়েছে তার নাম হযরত শাহ্ বাল্খি। তিনি ছিলেন শাহ্ মালেকের শিষ্য ও সহচর। ঢাকায় ইসলাম প্রচারকালে তিনিও ইয়ামিনীর সাথে ছিলেন।

**৫. ইব্রাহীম আদম শাহ্ বালখি:** ইব্রাহিম শাহ্, ইব্রাহিম তাবি, ইব্রাহিম দানেশমন্দ– এই তিন জন সুফির পরিচয় তিন ভাবে দেয়া আছে। শেষের সুফি ইব্রাহিম দানেশমন্দকে বাগদাদের অধিবাসী হিসেবে উল্লেখ করা হয়। সোনার গাঁওয়ের একটি গ্রামে তাঁর মাযার রয়েছে। অন্য একটি গ্রন্থে আদম শাহ্ বালখির মাযার বিক্রমপুরে থাকার কথা পাওয়া যায়। সেখানে একটি দরগাহ ও একটি মসজিদ রয়েছে। এটির নির্মাণের সময়কাল ১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দ। স্থানীয় লোকজন এই মসজিদকে বাবা আদম মসজিদ বলে অভিহিত করেন।[২৫] লোকমুখের বুলি থেকেই আদম শাহ্ বালখির মাযার প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।

**৬. মাখদুম শেখ জালাল উদ্দিন তাবরিজি:** তিনি বঙ্গে প্রথম দিকে আগমনকৃত একজন সুফি। তিনি ইরানে তাবরিজ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাংলা দেশে আগমনের ইতিহাস বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। ঐতিহাসিক ড. আবদুল করিম, ফারসি রচনাবলীর সূত্রের আলোকে ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে তাঁকে বাংলাদেশে আগমনের ব্যাপারে মতামত প্রদান করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে, এ দরবেশ পারস্যের তাব্রিজে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলায় আগমন করেছিলেন কিন্তু বাংলা থেকে ফিরে যান নি। বাংলায় কোথাও তিনি চির নিদ্রায় শায়িত আছেন।[২৬] এ সম্পর্কে ড. এনামুল হক অনুরূপ মত পোষণ করেছেন। তিনি বঙ্গের হিন্দু রাজা লক্ষণ সেনের রাজত্বের (১১৪০ খ্রি.-১২০২ খ্রি.) শেষ কয়েক বছরের মধ্যে আগমন করেন এবং ১২২৫ খ্রিস্টাব্দে গৌড়ের পাণ্ডুয়ায় ইন্তেকাল করেন। সিলেটের শাহ্ জালাল ও তিনি একই ব্যক্তি নন।[২৭] তিনি ছিলেন একজন ভ্রমনকারী সুফি সাধক। আরব, ইরাক ও ইরানের বিভিন্ন অঞ্চল স্বচোখে দেখার তাঁর সুযোগ হয়েছিল। এ সময় তিনি বিভিন্ন জ্ঞানি, আরিফ ও সম্মানিত ব্যক্তিদের সাহচার্য পান। ইতিহাসে তাঁর ভ্রমণের সূত্র ধরে বিভিন্ন মতামত প্রদান করা হয়। যে কারণে তাঁর সম্পর্কে জানার উপকরণগুলো বিভিন্ন তথ্যে মিশ্রিত হয়েছে। তিনি দিল্লীর খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী (১১৪২ খ্রি.-১২৩৬ খ্রি.), মুলতানের বাহাউদ্দিন যাকারিয়া (১১৬০ খ্রি.-১২৬৬ খ্রি.) ও আজমিরের খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি (১১৪৪ খ্রি.-১২৩৬ খ্রি.) প্রমুখ সুফিদের সমসাময়িক বন্ধু ছিলেন।[২৮] তাঁর সম্পর্কে ইরানের ঐতিহাসিকগণ কোন মন্তব্য করেননি।

Dhaka University Institutional Repository

এটির কারণ হিসেবে বলা যায় যে, তিনি ছোটবেলা থেকেই ইরান অঞ্চল ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান এবং পুনরায় নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন নি। ভারতীয় ইতিহাসের অনেক রচনায় তাঁর সুফি সাধনার কথা উল্লেখ রয়েছে। তাঁর তরীকা সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি প্রথমে সোহরাওয়ার্দি তরিকাভূক্ত ছিলেন পরে চিশতিয়া তরিকা গ্রহণ করেন।[২৯] তিনি ১২৪৪ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করলে উত্তর বাংলার পাণ্ডুয়ায় সমাহিত হন।

**৭. সুলতান বায়েজিদ বিস্তামি (মৃ. ৮৭৪ খ্রি.):** সুফি সম্প্রদায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাপস সুলতান বায়েজিদ বেস্তামি। তিনি এদেশে এসেছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে। এ দেশের জনসাধারণ বিশ্বাস করেন যে, তিনি চট্টগ্রামে এসেছিলেন এবং ধর্মপ্রচারে অসামান্য ভূমিকা রাখেন। বাংলা ভাষায় রচিত পুস্তিকাদিতে চট্টগ্রামে 'বায়েজিদ বিস্তামির মাযার'[৩০] থাকার কথা উল্লেখ রয়েছে। এই সুফি-সাধকের উপমহাদেশে ইসলাম প্রচার সম্পর্কে ইতিহাসে স্পষ্ট করে আলোচনা নেই। তাঁর চট্টগ্রামে মৃত্যুবরণের বিষয়টি ততটা পরিস্কার নয়। বাঙালি লেখকদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর চট্টগ্রামে মৃত্যু ও মাযার থাকার কথা উল্লেখ করেছেন। এটি আদৌ সত্য নয়। ইতিহাসে খ্রিস্টীয় নবম শতকে চট্টগ্রামে আগমনের একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি চট্টগ্রামে পাহাড়ে অবস্থান করেছিলেন। সে সময় চট্টগ্রাম অঞ্চল ছিল জঙ্গল ও পাহাড়বেষ্টিত এলাকা। এখানে তাঁর আগমন বিচিত্র কিছু নয়।[৩১] চট্টগ্রাম শহরে বায়েজিদ এলাকায় তাঁর আস্তানা গড়ে ওঠার একটি বড় প্রমান রাখে। আমরা এ সাধকের বঙ্গে আগমনের ইতিহাসটি ফারসি তথ্যাদির আলোকে বর্ণনা দানের চেষ্টা করেছি। তিনি আব্বাসী যুগে সিন্ধে এসেছিলেন। আবুল আলা সিন্ধি ছিলেন তাঁর অন্যতম মুর্শিদ। তিনি তাঁর নিকট থেকে সুফি বিষয়ে ফানা ফিল্লাহ ও তাত্ত্বিক জ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করেন।[৩২] সম্ভবত তিনি ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে অজানা পথে সিন্ধু থেকে চট্টগ্রামে পৌছান। তাঁর এখানে আগমনের কারণ হিসেবে পীরের আদেশ ছিল কী না বিষয়টি স্পষ্ট নয়। এই সাধকের নিজ দেশ থেকে বের হওয়ার ইতিহাসটি ততটা শক্তিশালী নয় বললেও আমরা জানি। তাঁর সম্পর্কে ইরানি লেখকদের ফারসি পুস্তিকাদিতে বিস্তারিত আলোচনা আছে। তিনি একজন ইরানের উঁচু স্তরের সাধক ও আরিফ ছিলেন। তাঁর নাম তায়ফুর বিন ঈসা বিন অদাম বিন সারভেশান। জন্ম তারিখ ও জন্মস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নেই। খোরাসানের বিস্তাম নগরে তিনি বসবাস করতেন বলে বিস্তামি বলা হত এবং এখানে তাঁর কবরস্থান রয়েছে।[৩৩] তাঁর জীবনের দিনগুলো বিভিন্ন ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। তবে ভারতে বা বঙ্গ দেশে এসেছিলেন এমন তথ্য কোন ইরানি লেখক রেখে যান নি।

Dhaka University Institutional Repository


৮. **জালাল উদ্দিন মুজররদ:** বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে শায়খ জালাল এর অবদান অনেক। চর্তুদশ শতকের সুফিদের মধ্যে তাঁকে শ্রেষ্ঠ সুফি হিসেবে গণ্য করা হয়। যদিও তাঁর সম্পর্কে তথ্যের অভাব রয়েছে প্রচুর। তবে তিনি ছিলেন তুর্কি বংশোদ্ভূত একজন বহিরাগত সুফি।[৩৪] তিনি ৩১৩ জন শিষ্য নিয়ে সিলেটে আগমন করেছিলেন। সিলেটে রাজা গৌড় গোবিন্দ –এর সাথে তাঁর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করলে হিন্দু রাজা পলায়ন করেন। সিলেটের বিস্তৃত এলাকা তার করায়ত্ব হয়। তিনি এবং শিষ্যগণ এ স্থানে ইসলাম প্রচারে রত থাকেন। সিলেট ছিল জঙ্গল ও হিন্দু বসতি এলাকা। তিনি ইসলাম প্রচারকালে অনেক হিন্দু তার হাতে মুসলমান হয়।[৩৫]

৯. **শেখ আবদুল্লাহ কিরমানি:** তিনি ছিলেন বঙ্গে আগত একজন প্রথম যুগের চিশতি মতবাদ ধারার সুফি। তুর্কি শাসনের শুরুতেই বঙ্গে আগমন করেন এবং ইসলাম প্রচারে রত থাকেন। তিনি বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলায় ইসলাম প্রচার করেছেন। সেখানে খুস্তীগিরী গ্রামে তাঁর একটি মাযার রয়েছে।[৩৬] তাঁর নামের সাথে 'কিরমান' শব্দটি একটি অঞ্চলের প্রতি ধাবিত করা হয়। এটি ইরানের একটি কিরমান প্রদেশের নাম। তাতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি কিরমান প্রদেশের একজন ফারসি ভাষী সুফি ছিলেন। উল্লেখ্য যে, তিনি বাংলায় চিশতিয়া তরিকা প্রচারে বড় অবদান রাখেন।

১০. **শাহ মখদুম রুপোশ (রাহ.) :** রাজশাহী ও তৎসংলগ্ন এলাকায় ইসলাম প্রচারকারীদের মধ্যে শাহ মখদুম অন্যতম। তিনি বাংলার দ্বাদশ শতকের উল্লেখযোগ্য সুফি। তিনি একজন ফারসিভাষী সুফি ছিলেন এবং তাঁর ভাষা ফারসি ছিল। যদিও তাঁকে বাংলার লেখক ও গবেষকগণ আরবি ভাষার বলে উলে্খ করেছেন। তাঁর সম্পর্কে স্পষ্ট করে কোথাও উল্লেখ না থাকলেও গবেষকগণ অনুমান করেন যে, তিনি ইয়ামনি ছিলেন।[৩৭] শায়খ আবদুল কাদের জিলানি তাঁকে নির্দেশ করেছিলেন যে, তিনি যেন ইসলাম প্রচারে নিজ দেশ ত্যাগ করেন। সে কারণে তিনি এ দেশে এসে ইসলাম প্রচারে রত হন।[৩৮] উল্লেখ্য যে, তাঁর নামটি পুরোপুরি ফারসি ভাষার। তাতে তিনি ইরান বা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসী হওয়া যুক্তিযুক্ত। রাজশাহী অঞ্চলের বোয়ালিয়ায় তাঁর মাযার রয়েছে। এ মাযারটি আলি কুলি বেগ একজন ইরানি শাসক নির্মান করেছিলেন। এটির নির্মাণ কাজ ১৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে সমাপ্ত হয়।[৩৯] তাতেও একজন ফারসিভাষী সুফি হওয়ার পরিচয় মিলে।

১১. **সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানি:** তিনি ছিলেন বাংলায় আধ্যাত্মিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অন্যতম সুফি। সিমনানের রাজ পরিবারে তাঁর জন্মলাভ হয়েছে। তিনি অল্প বয়সেই রাজ পরিবারের

Dhaka University Institutional Repository


আরাম আয়েশ পরিত্যাগ করে সুফি ধারায় জীবন যাপনের প্রতি মনোনিবেশ হন। তিনি সিমনান থেকে বিহারে কখন ও কিভাবে এলেন তার বর্ণনা নেই। ইতিহাসে তাঁর বিহার ও বাংলায় আগমনের কথা উল্লেখ রয়েছে। তিনি শেখ আলাউল হকের (মৃ. ১৩৯৮ খ্রি.) শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর ছয় বছর বাংলায় অবস্থানের কথা পাওয়া যায়।[৪০]

**১২. হজরত শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা:** তিনি বাংলাদেশে মুসলিম সমাজের উন্নতি ও ইসলাম ধর্মের বিকাশের জন্য অনন্য ভূমিকা পালন করেন। তাঁর চেষ্ঠা ও সাধনায় ইসলামের আলো চর্তুদিক ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর সম্পর্কে ইতিহাসবিদ আবদুর রহিম বলেন, Hadrat Sharf al-Din Abu Tawwamah was a great Persian sufi and scholar who settled down with his family and brother at Sonargaon.[41] তাঁর এ বক্তব্যে প্রতীয়মাণ হয় যে, তিনি একজন ইরানি বিখ্যাত সুফি পণ্ডিত ছিলেন। তবে অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থে তাঁকে ইরানি সুফি বলা হয় নি। তাঁর জন্মস্থান সম্পর্কে বোখারায় জন্মের কথা উল্লেখ রয়েছে। তিনি অল্প বয়সে শিক্ষাগ্রহণের জন্য খোরাসানে চলে গিয়েছিলেন। এই সুফি বাংলার সোনারগাঁয়ে বসতি স্থাপন করেন। তবে কখন তিনি সোনারগাঁয়ে এসেছিলেন ইতিহাসে এর নির্দিষ্ট বিবরণ নেই। তিনি ১২৭৫-৮৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলায় এসেছিলেন। শরফুদ্দিন এহিয়া মনেরি ছিলেন তাঁর আগমনের সময় অন্যতম সঙ্গি।[৪২]

**১২. মাখদুম শাহ মাহমুদ গজনভি:** বাংলায় আগমনকারী সুফি হিসেবে তাঁর নাম রয়েছে। তিনি বাংলায় কখন এসেছিলেন- এ সম্পর্কে কোন তথ্য নেই। তাঁর আগমনের ব্যাপারে সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থে বিবরণ পাওয়া যায়। মুসলিম বিজয়ের পর তাঁর আগমন বাংলায় হয়ে ছিল।[৪৩] তিনি কোথায় ও কখন ইসলাম প্রচার করেছেন- বিষয়টি অস্পষ্ট।

## সমাজে সুফিদের প্রভাব ও ফলাফল

ইরানি সুফিরা কী সমাজে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তবে এ কথা নিশ্চিত সত্য যে, অনেক সুফি খানকায় বা তাঁদের আস্তনায় বসবাসকালে মুরিদদের প্রতি প্রভাব বিস্তার করতেন। পাণ্ডুয়ায় শেখ জালাল উদ্দিন তাবরেজি (মৃ.১২২৫ খ্রি.), সিলেটে শাহজালাল (মৃ.১৩৪৭ খ্রি.) ও দিনাজপুরে মাওলানা আতা (মৃ. আন.১৩০৬ খ্রি.) ঢাকার শাহ আলি (মৃ. আনু. ১৫১০ খ্রি.) আরো অনেক সুফি তাঁদের এলাকায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তাঁরা ইসলাম ও মুসলমানদের সম্মান বৃদ্ধির লক্ষে

Dhaka University Institutional Repository


মুরিদদের থেকে সহযোগিতা পেতেন।[৪৪] তাতে করে সুফিধারার সমাজ গঠনে বেশি দিন অতিক্রম করতে হয় নি। সেই সাথে ফারসি ভাষার চর্চাও একধাপ এগিয়ে যায়।

যাঁরা এ দেশে এসেছিলেন তারা নিজেরা কী বলে পরিচয় দিত বা স্থানিক পরিবেশের সাথে নিজেরা কতটুকু আন্তরিকতা রেখেছিল– তা জানা যায়নি। তবে বঙ্গে যে সংস্কারমুক্ত সুফি পরিবেশ গড়ে ওঠেছে তা তাঁদেরই কর্মপ্রচেষ্টার একটি ফল। ইসলামের মূল আদর্শের সাথে এবং স্থানীয় পরিবেশের সাথে তাঁদের সমন্বয় না ঘটলে কখনো সুফিধারার সমাজ প্রতিষ্ঠা পেতনা। তাঁরাও যে নিজ দেশীয় ভাষায় এ দেশের জনগণের সাথে সম্পৃক্ত হতে পেরেছিলেন সেটিই বা কম কৃতিত্ব নয়!

<u>টীকা ও তথ্যনির্দেশ</u>

১. হবিবুল্লাহ, এ বি এম, *ভারতে মুসলিম শাসনের বুনিয়াদ*, (অনুবাদক লতিফুর রহমান) বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ২০৯।

২. সেমা: সেমা এক প্রকার সঙ্গীতের নাম। মাওলানা রুমির কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে সেমা পরিবেশন করা হয়। এটি তরিকায় স্থান পেলেও শরিয়তে সেমা করার স্থান নেই। - তাফাজ্জলি, আবুল কাসেম, মাওলানা ওয়া সেমা, *কান্দে পারসি*, নিউ দিল্লি, সংখ্যা ৩৮, ১৩৮৬ হি.শা., পৃ. ১৬৪।

৩. Rahim, Abdur, *Social & Cultural History of BengalVol.1*, Pakistan Historical Society, Karachi, 1963, P. 49.

৪. রশীদ, আ. ন. ম., বজলুর, *পাকিস্তানের সূফী সাধক*, জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা: পূর্ব পাকিস্তান, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃ. ৬।

৫. আবদুল করিম রচিত *চট্টগ্রামে ইসলাম* গ্রন্থে সুফিদের চারটি তালিকায় ৫০ জন এবং এ. কে. এম. মহিউদ্দিন রচিত *চট্টগ্রামে ইসলাম* গ্রন্থে ১৩১ জন সুফি-আউলিয়ার কথা উল্লেখ আছে। প্রকৃত সংখ্যা কত তার হিসেব কোন লেখকের গ্রন্থে নেই। বস্তুত অধিক সুফির আবাসভূমি হল এই বঙ্গীয় অঞ্চল।

৬. করিম, আবদুল, *চট্টগ্রামে ইসলাম*, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, চট্টগ্রাম, ১৯৮০, পৃ. ১২; করিম, আবদুল, *বাংলা দেশে মুসলমান আগমনের প্রাথমিক যুগ*, সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা সংখ্যা, ঢাকা, ১৩৭০ বাং., পৃ. ৯২।

৭. Karim, Abdul, *Social History of The Muslims in Bengal*, Baitush Sharaf Islamic Research Institute, Chittagong, 1985, p. 160.

৮. বাংলায় সুফিদের আগমনের পদ্ধতি যেমন ভিন্ন রয়েছে তেমনি বঙ্গের এক একটি স্থান ভিন্ন পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত। চট্টগ্রাম সাগর পরিবেষ্টিত একটি অঞ্চল। এখানে অনেক সুফিদের আগমন নৌকা বা জাহাজ দ্বারায় ঘটেছে। এঁদের মধ্যে সুফি সুলতান মহিসওয়ার অন্যতম। সিলেট বা রাজশাহীতে সুফিগণ পায়ে হেটে বা চার পায়া প্রাণীর উপর আরোহণের মাধ্যমে এসেছেন।

৯. আহমদ, ওয়াকিল, *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা ১ম খণ্ড*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ২০।

*Dhaka University Institutional Repository*

১০. মুতাহ্হরী, শহীদ আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা, *ইসলাম ও ইরানের পারস্পরিক অবদান,* অনুবাদক এ. কে. এম. আনোয়ারুল কবীর) কালচারাল কাউন্সেলরের দফতর, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ২৬৯ ও ২৭১ ।

১১. খানম, মাহমুদা, *পারস্যে সুফিবাদের উন্মেষ*, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ঢাকা, কার্ত্তিক-পৌষ ৮৮, পৃ. ৯১ ।

১২. আহমদ, ওয়াকিল, *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা ১ম খণ্ড,* পূর্বোক্ত, পৃ. ২০ ।

১৩. মুতাহহারি, আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা, *ইসলাম ও ইরানের পারস্পরিক অবদান*, (অনুবাদক এ. কে. এম. আনোয়ারুল কবীর) কালচারাল কাউন্সেলরের দপ্তর, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৫৭ ।

১৪. মুতাহহারি, আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা, তদেব, পৃ. ৫৭-৫৮; খানম, মাহমুদা, *মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে হিন্দীসুফী কাব্যের প্রভাব,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৯ ।

১৫. Karim, Abdul, *Social History of The Muslims in Bengal*, op.cit, p. 115.

১৬. মুকুল, এম আর আখতার, *পূর্ব পুরুষের সন্ধানে*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৪৮ ।

১৭. Rahim, Abdur, *Social & Cultural History of Bengal Vol.1,* op.cit, P. 49.

১৮. সাকলায়েন, গোলাম, *পূর্ব পাকিস্তানের সূফী-সাধক,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৌষ-১৩৬৮, পৃ. ৪৯ ।

১৯. হক, ওবাইদুল, *বাংলা দেশের পীর আউলিয়াগণ*, হামিদিয়া লাইব্রেরী, ফেনী, ১৯৬৯, পৃ. ৪ ।

২০. হক, ওবাইদুল, *বাংলা দেশের পীর আউলিয়াগণ*, পৃ. ১০৯ ।

২১. তদেব, পৃ. ৯০ ।

২২. Rahim, Abdur, *Social & Cultural History of Bengal Vol.1,* op.cit, P. 81; সাকলায়েন, গোলাম, *পূর্ব পাকিস্তানের সূফী-সাধক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬ ।

২৩. সাকলায়েন, গোলাম, তদেব, পৃ. ৭৬ ।

২৪. রশিদ, আ.ন.ম. বজলুর, *পাকিস্তানের সূফী-সাধক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০ ।

২৫. হক, ওবাইদুল, তদেব, পৃ.১৩১; সাকলায়েন, গোলাম, তদেব, পৃ. ৪৬ ।

২৬. Karim, Abdul, op.cit, p. 126.

২৭. হক, মুহম্মদ এনামুল, *পূর্ব্ব পাকিস্তানে ইসলাম*, আদিল ব্রাদার্স এণ্ড কোং, ঢাকা, ১৯৪৮, পৃ. ৩৪ ।

২৮. রশিদ, আ.ন.ম. বজলুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১ ।

২৯. করিম, আবদুল, ত্রয়োদশ শতকে বাংলা দেশে মুসলমান সমাজ-বিস্তার, *বাঙলা একাডেমী পত্রিকা*, ঢাকা, ৮ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭১, পৃ. ১২ ও ২০ ।

৩০. বায়েজিদ বিস্তামির মাযার: বর্তমান চট্টগ্রাম শহরের নাসিরাবাদে বায়েজিদ স্থানে একটি মাযার সাদৃশ্য আস্তানা ও এর সম্মুখে পুকুর রয়েছে। এটি চট্টগ্রামে বায়জিদ বিস্তামির আগমনের একটি বড় নির্দশন। বহুদিন ধরেই অগণিত ভক্ত ও পিরবাদী গোষ্ঠী তাঁর এ স্থানে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সমবেত হয়ে আসছে। অনেকে এটিকে তাঁর মাযার হিসেবে উল্লেখ করেছেন। –হক, মুহম্মদ এনামুল, *পূর্ব্ব পাকিস্তানে ইসলাম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০ ।

৩১. হক, মুহম্মদ এনামুল, তদেব, পৃ. ২১ ।

৩২. যাররিনকোব, আবদুল হোসাইন, *জোস্তেজো দার তাসাউফে ইরান,* এন্তেশারাতে আমীর কাবির, তেহরান, ১৩৯০ হি.শা., পৃ. ৩৮ ।

Dakha University Institutional Repository

৩৩. কুবাদিয়ানি মারুযি, নাসির খসরু, *সাফারনামে,* (সম্পাদনায় মুহম্মদ দাবির সিয়াকী) এন্তেশারাতে যাওয়ার, তেহরান, ১৩৮৯ হি.শা., পৃ. ২১২।

৩৪. শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ, *ইসলাম প্রসঙ্গ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৯০।

৩৫. করিম, আবদুল, চতুর্দশ শতকে বাংলা দেশে মুসলমান সমাজ বিস্তার, *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, ঢাকা, শ্রাবণ - আশ্বিন ১৩৭২, পৃ. ৬।

৩৬. Rahim, Abdur, op.cit, P. 110.

৩৭. ডলি, লাভলী আখতার, *বাংলাদেশে সূফীদর্শনের রূপরেখা,* সাফা পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৭১।

৩৮. তদেব, পৃ. ৬২।

৩৯. তদেব, পৃ. ৬২।

৪০. Rahim, Abdur, op.cit, P. 122.

৪১. Ibid, P. 50.

৪২. Karim, Abdul, op.cit,, p. 99.

৪৩. Ibid, p. 122.

৪৪. আশরাফ, সৈয়দ আলী, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য, *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, ৬ষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯, পৃ. ৫৭।

## সহায়ক গ্রন্থাবলি


| | | |
|---|---|---|
| ১. মুহাম্মদ এনামুল হক | : | পূবর্ব পাকিস্তানে ইসলাম |
| ২. আ.ন.ম. বজলুর রশিদ | : | পাকিস্তানের সূফী-সাধক |
| ৩. গোলাম সাকলায়েন | : | পূর্ব পাকিস্তানের সূফী-সাধক |
| ৪. আলী আসগর হালভী | : | তারিখে ফালাসিফে ইরানী |
| ৫. লাভলী আখতার ডলি | : | বাংলাদেশে সূফীদর্শনের রূপরেখা |
| ৬. আবদুল করিম | : | চট্টগ্রামে ইসলাম |
| ৭. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ | : | ইসলাম প্রসঙ্গ |
| ৮. আহমদ শরীফ | : | মধ্যযুগে বাঙলা সাহিত্য |
| ৯. এ কে এম, শাহনাওয়াজ | : | বাংলার সংস্কৃতি বাংলার সভ্যতা |
| ১০. Abdur Rarim | : | Social & Cultural History of BengalVol.1 |
| ১১. Abdul Karim | : | Social History of the Muslims in Bengal |

Dhaka University Institutional Repository

# ষষ্ঠ অধ্যায়: ফারসি কবি ও তাঁদের কাব্য-সম্ভার

ফারসি সাহিত্যে গল্প রচনার চেয়ে কাব্য রচনা অধিক প্রসিদ্ধি পেয়েছে। অনেকে শুধু 'কসীদা', 'রুবাই' বা 'গজল' রচনা করেছেন। কেউ বিভিন্ন নামে কাব্যগ্রন্থ বা *দিওয়ান* রচনা করেছেন। এমন বহু কবি রয়েছেন যাদের জীবনকাল সংরক্ষিত নেই। কবিতার উপর নির্ভর করে কবিযুগ বা কবির সময়ের শাসকের যুগ গঠিত হয়েছে। যেমন– সাসানি, গজনভি ও সালজুকি যুগ। তেমনি ব্যক্তি নামে ফেরদৌসি, নাসির খসরু ও রুমির যুগও প্রসিদ্ধ। যুগগুলোতে অগণিত কবির আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়। এই অধ্যায়ে সেসবের বর্ণনাদান একেবারেই কল্পনাতীত। বঙ্গীয় অঞ্চলে যাঁদের কবিতা প্রসিদ্ধি পেয়েছে তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা হওয়ার দাবি রাখে।

## ফারসি কাব্যসাহিত্য ও তার রূপ

### কাব্যসাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ

সাহিত্য হল চিন্তা, দর্শন, অনুভূতি ও মানবিক বিষয় উপস্থিত থাকার একটি চিত্র। যে চিত্রে একটি জাতির উত্থান-পতন, চিন্তা-চেতনা ও সমাজ জীবন আলোচিত হয়। এ ক্ষেত্রে একজন কবি, গল্পকার ও প্রবন্ধকার মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন।[১] কবিতা হল সাহিত্যের একটি অংশ। এটিকে ফারসি ভাষায় 'শে'র (شعر) বা 'নাযম' (نظم) বলা হয়। প্রাচীন, ভাষা ও সাহিত্যগুলোর মধ্যে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য একটি। এটি দুই হাজার পাঁচ শত বছরেরও অধিক পুরনো। আধুনিক ইরানিদের নিকট ফারসি সাহিত্য সাংস্কৃতিক জগতের একটি চমকপ্রদ বিষয়। এটি ইতিহাসের ঘটনাবলি জানার জন্য একটি সুন্দর দর্পণ এবং ইরানি ও ইসলামি সাংস্কৃতিক জগতের বাহন হিসেবে বড় ভূমিকা পালন করে আসছে।[২] এ ভাষা ও সাহিত্যের উপর যথেষ্ট অবদান রাখার জন্য বহু প্রতিভাবান কবির আবির্ভাব একটি লক্ষণীয় দিক। ইরান, উজ্‌বিকিস্তান, তাজিকিস্তান, ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশে অগণিত কবি জন্মগ্রহণ করেছেন। পৃথিবীর রাজনৈতিক উত্থান ও সংস্কারের মধ্যেও এ ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষতা ও বিকাশ লাভে অগণিত কবির অবদান অনস্বীকার্য। কবি রুদাকি, কবি দাকীকি ও কবি ফেরদৌসির কাব্যপ্রতিভা এমনই ছিল যে, তুর্কি ও মুঘল আফগান

Dhaka University Institutional Repository

শাসকরা নিজের মাতৃভাষা পরিত্যাগ করে কবিদের ভাষা ও কাব্য সাহিত্যের লালন করেছেন। তাঁরা তাঁদের কবিতা সাধারণ মানুষদের মাঝে পৌঁছে দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি।[৩] এটি সত্য যে, বিভিন্ন সময় জ্ঞান অনুসন্ধানী ব্যক্তিগণ ফারসি কবিতা আবৃত্তি করে নিজেদেরকে পরিপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে গঠন করতে সক্ষম হয়েছেন। এতে যে অধ্যাত্নবাদ বা এরফানি জগৎ রয়েছে– তা বিশাল ও বিস্তৃত। পৃথিবীর অন্য যে কোনো ভাষার চেয়ে এ ভাষার মধ্যে শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও সুফির জন্ম লাভ সে বার্তা বহন করছে। ফারসি সহিত্যের ইতিহাসে প্রতিটি শতকেই একজন বা বহুজন কবির আর্বিভাব ঘটেছে তুলনাহীন ও অদ্বিতীয় হয়ে। এঁরা ছিলেন ফারসি কাব্য সাহিত্যের অন্যতম আলোচিত বিষয়। কাব্যের বিষয়বস্তুর আঙ্গিকে প্রত্যেকেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। যেমন– কবি ফেরদৌসি হামাসা রচনায় একজন বিশেষ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর ন্যায় এরূপ রচনায় অন্য কেউ ততটা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে সক্ষম হননি। তদ্রুপ কবি সানাঈ ওয়াজ, নসিহত, হিকমত ও এরফান বিষয়ে যেভাবে পূর্ণতা এনে দিয়েছেন অন্যেরা তা এতটা পারেননি।[৪] তবে এ কথা সত্য যে, ফারসি কবিদের জ্ঞান প্রতিভা একই গণ্ডির ভিতর সীমিত ছিলনা। যদিও এরফান ও দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে সকল কবিদের ভাব ও মিলনের প্রতিফলন ঘটেছে। হেকমত, ধর্ম ও আকিদা ব্যতীত নিজস্ব মতবাদ ও বিশ্বাসের প্রচারও ছিল কাব্যের অন্যতম বিষয়। হাফেজ শিরাজি বা মাওলানা রুমি প্রত্যেকেই ছিলেন নিজ নিজ স্থানে শ্রেষ্ঠ। কবি নাসির খসরু ছিলেন একাধিক প্রতিভার অধিকারী একজন উল্লেখযোগ্য কবি। তিনি ছিলেন ইসমাঈলিয়া মতবাদে বিশ্বাসী একজন ধার্মিক ব্যক্তি। সে বিশ্বাসের উপর তিনি অসংখ্য কবিতা রচনা করেছেন।[৫] আমরা জানি কবিদের শুধু একটি বিষয়ে জ্ঞান থাকা তাঁদের কবি প্রতিভার বিকাশ ঘটায় না বরং কবি প্রতিভার জন্য ভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান ও ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থাকা প্রয়োজন হয়ে থাকে। সে দৃষ্টিকোণ থেকে ফারসিভাষী কবিরা ছিলেন অনন্য। কবি নেজামি ছিলেন সেরকম অন্য একজন কবি। যার মধ্যে আমরা প্রচুর জ্ঞানের মিলন পাই। শেখ সাদি ও ফরিদ উদ্দিন আত্তার কেউই বহু প্রতিভার অধিকারী থেকে মুক্ত ছিলেননা। কবিদের কাব্য রচনার ক্ষেত্রে প্রেমপ্রীতির প্রতি আলাদা আসক্তি ছিল। কবি প্রেম নিয়ে কবিতা লিখবেন এটাই স্বাভাবিক। সে প্রেম যে কেবল একেবারে ঐশীপ্রেম হবে– এমনটি ধারণা করা সত্যিই কল্পনাতীত। ফারসি কাব্যসাহিত্যে যেসব প্রেমের কবিতা পাওয়া গিয়েছে তা বিশাল ও বিস্তৃত। এটি একটি এশ্‌ক এলাহি বা খোদা প্রেমের অপূর্ব জ্ঞান ভাণ্ডার। যে প্রেম সদা নিজেকে বিলীন, মিলন ও পূর্ণতার কথা বলেছে।[৬] এ প্রেমে সুফি-দরবেশরা দিনের পর দিন নিমজ্জিত থেকে পূর্ণতায় পৌঁছেছেন। সে প্রেমের গান গেয়ে উত্তাল তরঙ্গে ঢেউ খেলেছেন ফারসি কবিরাও।

Dhaka University Institutional Repository

## গল্প-কাহিনীকাব্য

ফারসি ভাষার প্রাচীন রূপের মধ্যেও অনেক গল্প ও কবিতা ছিল– যা লেখ্যসামগ্রীর অভাবে প্রাচীনকালে প্রকাশ পায়নি। সেসব গল্প ও কবিতা আধুনিক ফারসি সাহিত্যে প্রভাব রেখেছে। এসব গল্প ও কবিতা যে ইরানিদের কাব্যসাহিত্যের মূল ভিত্তি ছিল তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। ইরানিদের মাঝে এ প্রবণতা রয়েছে যে, তাঁরা নিজেরাই নিজেদের সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সচেষ্ট এবং যত্নশীল। তাঁদের ইসলাম পূর্বকালের ফারসি কাব্যের উপর দক্ষতা পরবর্তীতে পরিপূর্ণ মাত্রায় কাব্যরচনায় সহযোগিতা করেছে। বিশেষ করে তাঁরা সাসানি রাজত্বকালেও ঐতিহ্যের ধারক অনুযায়ী কবিতা আবৃত্তি করতেন। কবিতা আবৃত্তির ধরন ছিল আধুনিক ফারসি ভাষার কবিতার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তখন গীত ও জারি গানের ন্যায় কবিতা আবৃত্তি করা হত। *আবেস্তা* গ্রন্থে যে প্রকার কবিতার উল্লেখ পাওয়া যায় তা গীত বা মন্ত্রের ন্যায় আবৃত্তির রূপ। *আবেস্তায়* গাথা অংশটিতে পুরোপুরি কবিতায় সমৃদ্ধ।[৭] এ গ্রন্থ থেকেও প্রাচীনকালে ইরানি জাতির কবিতা আবৃত্তির প্রমাণ রাখে। তবে আমাদের আলোচনার বিষয় ইসলাম যুগের পর ফারসি ভাষার কবি ও তাঁদের কবিতা। এ কারণে যে, ফারসি কাব্যসাহিত্যের উন্নতি ও বিকাশলাভ ইসলাম পরবর্তী সময়ে সংগঠিত হয়েছে। এ সাহিত্যে মানবিক বিষয়ের উন্নয়ন ঘটেছে ইসলাম ধর্মের আর্বিভাবের মাধ্যমে। আরবের কোরেশ বংশদ্ভূত নবি করীম (সা.) ৬১১ খ্রিস্টাব্দে নবুওতপ্রাপ্ত হন। এ সময়ে ইরানের বাদশাহ হিসেবে খসরু পারভেজ সাসানি (৫৯০খি.-৬২৭খ্রি.) রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আরবকৃত ইসলাম ধর্ম ২১ হিজরি মোতাবেক ৬৫১ খ্রিস্টাব্দে ইরান ভূখণ্ডে বিজয়ের বেশে প্রবেশ লাভ করলে কবিরা পুরনো রীতি-নীতি পরিত্যাগ করে ইসলামের প্রতি ধাবিত হন।[৮] তাঁরা ধর্মের কাহিনীগুলো কবিতায় স্থান করে দিতে শত চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। ইসলামের যেসব কাহিনী প্রসিদ্ধ ও প্রচারযোগ্য এসব কাহিনী তাঁদের কবিতায় স্থান পেয়েছে। বস্তুত কাহিনীকাব্য পারস্যের বিভিন্ন শহর ও পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে ইসলাম ধর্ম প্রচারের সাথে সাথে বিস্তার লাভ হয়।

পারস্য দেশ তথা ইরান ইসলাম ধর্মকে অতি দ্রুত গ্রহণ করেছিল। অনারবদের মধ্যে অন্য কোনো দেশ বা জাতি এত দ্রুত ইসলাম গ্রহণ করেননি বলে আমরা জানি। ইরানি জাতি ইসলামকে গ্রহণ করার পর ইসলামের সৌন্দর্য ও মহিমা অনুধাবন করতে সক্ষম হন। এর ফলে তাঁদের উপর কুরআন ও হাদিসের আলো বেশি করে প্রভাব ফেলতে শুরু করে। তাঁদের চিন্তা চেতনায় পূর্বের চেয়ে নতুন ভাবের সূত্রপাত হয়।[৯] ইরানি জাতি আরব প্রচারকৃত ইসলাম দ্রুত গ্রহণ করেছিলেন সত্য, তাঁরা আরবের ভাষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করেননি। ফলে তাঁরা নিজেদের মধ্যে ইসলাম ও ইরানি সংস্কৃতির

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে একটি নতুন সংস্কৃতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। যে সংস্কৃতি ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে। অপরদিকে অন্য কোনো জাতি ইসলাম গ্রহণের পর দ্রুততার সাথে নিজস্ব সংস্কৃতি সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়নি। ফলে ফারসি কবিদের অনেক কবিতা সাহিত্য সংস্কৃতির উপজিব্য বিষয় হয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশেও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

## কাব্যে ধর্ম-দর্শন

ইরানিদের মধ্যে ধর্ম ও ধর্মের গুরুত্ব জানার আগ্রহটা পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল। তাঁদের মাঝে ইসলাম ধর্ম আগমনের পর থেকে ইসলামের প্রতি মমতা ও শ্রদ্ধাবোধ বেশি করে প্রতিফলন ঘটেছে। ফারসি সাহিত্যে যে সুন্দর ও পবিত্রতা রয়েছে তা ইসলামের প্রভাব ও ইরানি জাতির সত্য অনুসন্ধানের ফল। খোদা প্রেমের মহিমা প্রকাশ, রসুল (সা.)–এর প্রতি অজস্র সম্মান, মানবতাবোধ, সৃষ্টি রহস্য ও মানুষের রূপ বর্ণনা বিশেষ করে আল্লাহ ও মানুষ নিয়ে তাঁদের রহস্যময় কথা সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। তাঁদের সাহিত্য একটি সম্পূর্ণই মানব ও স্রষ্টার প্রেম, সৃষ্টি রহস্যের জয়গান।[১০] সেই ফারসি কবিরা যে, সুফি-দরবেশ, পির, দার্শনিক, আরেফ, আউলিয়া এবং ধর্ম বিশেষজ্ঞ হবেন না- তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। সকল কবিই ছিলেন ইসলাম ধর্মবিশেষজ্ঞ ও সুফিবাদের প্রবক্তা। প্রজ্ঞা, দর্শন, মানবিক ইত্যাদি বিষয় ফারসি কাব্যসাহিত্যে স্থান করে নেয়ায় এটি একটি আলোকবর্তিকা হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে। এ কাব্যসাহিত্যের দ্বারায় পৃথিবীর মানুষ আলোর পথ দেখতে সক্ষম। মাওলানা রুমির *মাসনাভিয়ে মা'নুভি* বা ফরিদ উদ্দিন আত্তারের *মানতিকুত তায়ের* কোনোটিই অহেতুক কাব্যরচনা নয়।[১১] সেই ধারা থেকেই ফারসির সকল কবিদের মধ্যে ইসলামের সত্য গুণ ও ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছে। কোনো ফারসি কবির কবিতায় অশ্লিলতা, অহেতুক কামনা ও বাসনা নেই। তাঁদের প্রেম, আনন্দ, আমোদ, মনের ইচ্ছা, মনের বাসনা–সবই পবিত্র ও সুন্দরের প্রতিচ্ছবি। পবিত্র মনে কবিতা সৃষ্টি যেন তাঁদের একটি বৃহৎ বৈশিষ্ট্য।

## কাব্য সাহিত্যের বিবর্তন ধারা

ফারসি কাব্যসাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের যে ইতিহাস রয়েছে তার আলোকে ফারসি সাহিত্যের উন্নতি জানা সম্ভব। ইসলাম পূর্ব যুগে 'ফারেস' অঞ্চলে ফারসির চর্চা হত। সে চর্চা অনেকটাই মুখে মুখে ছিল; লেখ্য সামগ্রীর অভাবে তা লিখে রাখা সম্ভব হতনা। মাদি সাহিত্য, ফারসি বাস্তান সাহিত্য, আবিস্তায়ি সাহিত্য ও পাহলভি সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের ধারণা একেবারেই কম। হাখামানশি যুগ ( ৫৫৯ খ্রি.পূ.- ৩৩০ খ্রি.পূ.) ও আশকানি যুগ ( ২৫০ খ্রি.পূ.-২২৬ খ্রি.) –এর সাহিত্য সম্পর্কে একই

Dhaka University Institutional Repository


ধারণা করা যেতে পারে। সে সময়ের বাদশাহগণ তাঁদের নিজেদের নাম স্মরণীয় করে রাখার জন্য বীরত্বমূলক কার্যগুলো পাহাড় ও প্রাসাদে খোদাই করে লিখে রাখতেন। বাদশাহ'র অধীনস্থ কর্মচারি ও শাহযাদা তাঁদের জীবনকালের হাস্যরস, প্রেমকাহিনী ও প্রশংসার বিষয়গুলো কোনভাবেই গোপন থাকেনি। এগুলো কতক একইভাবে নিদর্শন হিসেবে চামাড়াজাত দ্রব্য, লোহার পাত ও পাহাড়ে গচ্ছিত রয়েছে। ফারসি ভাষায় হাস্যরসের যে সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে এগুলোর অনেক উৎস ঐসব কাহিনী।[১২] 'দাস্তান' বা 'আদাবিয়াতে হামাসে' আধুনিক যুগের সাহিত্য নয়। বস্তুত তখনকার সময়ে বীরত্বমূলক বহু ঘটনা ও হাস্যরস কাহিনীর উদ্ভব ঘটেছিল। যেমন– 'দাস্তানে সেতরেয়ানগাউস', 'দাস্তানে জোহাক', 'দাস্তানে উরদেশীর' ইত্যাদি। এসব ঘটনা কতক *শাহনামায়ে ফেরদৌসি* কাব্যগ্রন্থে স্থান পেলেও অনেক ঘটনা লিখিত হয়নি। এটাও বাস্তব সত্য যে, পাহলভি ভাষার অনেক প্রেমধর্মী কবিতা ছিল যা বর্তমানে আমাদের হাতে উপস্থিত নেই।[১৩] সেসময়ের ঘটনা, জীবন-কাহিনী ও সাহিত্যের অনেক বিষয় অলিখিতই রয়েছে বলে ধরে নেয়া যায়।

ফারসি সাহিত্যের ইতিহাস এতটা বিস্তৃত যে, এর সাথে রাজনৈতিক শক্তির উত্থান, ভাষা সংস্কৃতির পরিবর্তন ও ধর্ম-সমাজ সম্পৃক্ত রয়েছে। সাসানি যুগে (২২৬ খ্রি.-৬৫১ খ্রি.) বাদশাহগণ পাহলভি ভাষা সমৃদ্ধির জন্য পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাঁদের অবদান চোখে পড়ার মত না হলেও কিছুতেই সামান্য নয়। যেমন– *বুনদাহেশন* (بند هشن), *দারাখত অসুরিক* ( درخت آسوریک), *জামাসাবনামে* (جاماسب نامه), *ইয়াদগারে যাররীন* (یادگار زرین) ইত্যাদি রচনা। এগুলো পাহলবি কবিতার নিদর্শন হিসেবে স্মরণ করা হয়ে থাকে।[১৪] ৬৫১ খ্রিস্টাব্দে সাসানি রাজশক্তির পতনের পর ইসলাম ধর্ম ইরানিদের নতুনভাবে সাহিত্য রচনায় প্রেরণা যোগিয়েছিল। পাহলভি ভাষার যেসব কবিতা ছিল ইসলামি যুগে এসে কতক আরবি ও ফারসি ভাষায় অনুবাদ বা ভাব প্রকাশের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ হতে থাকে। *খাসরু ওয়া রিদাক* (خسرو وریدک), *ভিস ওয়া রামিন(ویس و رامین)* রচনা দুটি ফারসি কাব্যে নতুন সংযোজন হলেও এর ঘটনা পুরনো। ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসে এ রচনাগুলোকে আশকানি যুগ ও তৎপরবর্তী সময়ের গণ্য করা হয়। এ ছাড়া ইতিহাস ও ধর্ম বিষয়ে অনেক পাহলভি ভাষার রচনাও অনুবাদ হয়েছে। যেমন– *খোদাইনামক* (خدای نامک) *দাস্তানে ইস্কান্দার*(داستان اسکندر ), *দাস্তানে খাসরু শিরীন*(داستان خسرو شیرین) , *নামই তানসার* (نامه تنسر), *গুযারেশে শাতরান্জ* (گزرش شطرنز) অন্যতম। উল্লেখ্য যে, *আবেস্তা* ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যা 'জেন্দ-আবেস্তা' পাহলভি ভাষায় রচিত হয়েছিল।

ইরানে আরবদের আক্রমণের সময় তাঁদের ধর্ম, রাজনীতি ও সাহিত্য চর্তুমুখী অবস্থায় বিদ্যমান থাকতে দেখা যায়। ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে পাহলভি ভাষাকে প্রাধান্য দেয়া হলেও এটি স্থায়ীভাবে ইরানিদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকেনি; বরং ক্রমে ক্রমে তাঁরা পুরনো ধারা পরিত্যাগ করে আরবি ভাষা ও ইসলাম ধর্মের প্রতি ধাবিত হন। তখন সাহিত্য বলতে যা বুঝাতো তা ছিল মূলত আরবদের কথার উদ্ধৃতি, কবিতা ও সংবাদ-চিঠি পত্র ইত্যাদি। কুরআন ও হাদিসের উপর গভীরভাবে মনোনিবেশ করাই ছিল তাঁদের রীতিগত একটি ধর্মীয় অভ্যাস।[১৫] যে কারণে ফারসি কাব্যের ধারাটি ইসলাম ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে দেখা গিয়েছে। ইসলামপূর্বকালে ফারসি সাহিত্য অনেকটাই বিক্ষিপ্ত ও ছড়ানো ছিল। তবে ফারসি বাস্তান, আবিস্তায়ি ও পাহলবি সাহিত্য ইসলামি যুগে এসে আরো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তখন নতুন ধর্ম ও ধর্মের ভাষা আরবি হওয়ায় ইরানিদের নতুন করে ভাবতে হয়। ফলে ইসলাম অগ্রযাত্রাকালীন সময়েরও দুই শত বছর পর্যন্ত ফারসি কাব্যসাহিত্যের অভিষেক ঘটে নি।[১৬] হিজরি তৃতীয় শতকের মাঝামাঝি সময়কাল থেকেই ফারসি কাব্যের যুগ শুরু হয়। এ থেকে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে  যে, প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে কোনো ফারসি কবিতা রচনাকারী ছিলেন না ? বা দুই শত বছর ফারসি কবিতা আবৃত্তি হয়নি? এ প্রসঙ্গে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন ভাবে উত্তর দিয়েছেন। প্রথমত এ কথা পরিস্কার যে, ইসলাম ধর্ম প্রচার প্রাক্কালে আরবদের রাজত্ব অনারবদের উপর পরিপূর্ণ ছিল। ইসলাম গ্রহণের পর আজম তথা অনারব জাতি ততটা প্রফুল্ল চিত্তে সাংস্কৃতিক জীবন যাপন করেননি। আরবদের ক্ষমতার শেষ্ঠত্ব ও বীরত্ব সবসময় তাঁদের অনুকূলেই ছিল। অবশ্য আরবদের দাওয়াত ইরানীয়রা গ্রহণ করলেও আরবরা তাঁদেরকে ভাল চোখে দেখতনা। সবসময় পারস্যদের প্রতি তাঁদের পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি প্রভাব ফেলেছে।[১৭] যে কারণে তাঁরা ফারসি ভাষায় কবিতা আবৃত্তিকে ভালভাবে দেখেননি। বরং যেখানে ফারসি ভাষার রচনা ছিল সেখানে এসব জ্ঞান ভাণ্ডার সমূলে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। এ সময় আরবদের ভয়ে অনেকে ফারসি ভাষায় কথা বলাও ছেড়ে দিয়ে ছিল। এটি ছিল এমন একটি সময় যখন ইরানে আরবরা শাসন করত এবং আরবি ভাষার গৌরব অধ্যায় ছিল। *শেরুল আযম* গ্রন্থে *মাযমুআল ফোসাহা* গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে মাওলানা শিবলি নোমানি লিখেন, আবদুল্লাহ বিন তাহের আদেশ করেছিলেন যে, ইরানের সকল রচনা ধ্বংস করে দেয়া হউক।'[১৮] এ আদেশের পর অনেক কবি আতঙ্ক ও বিধ্বস্ত ছিলেন। তাঁরা ভয়ে কবিতা রচনা করতেননা। এ কারণটি অত্যধিক কবিতা রচনা না হওয়ার একটি দিক। এটা সত্য যে, আজম অভিহিত প্রতিভাধারী লেখকেরা বহদিন ভয়ে ফারসি ভাষায় কবিতা আবৃত্তি করেননি। যে কারণে সামানি যুগ (৯০১ খ্রি.-৯৯৮ খ্রি.) এর আগ পর্যন্ত ফারসি কবিদের আর্বিভাব তেমনভাবে ঘটেনি বললেই চলে। শাসকশ্রেণি আরব থাকার কারণে তাঁদের দ্বারায় ফারসি চর্চা হওয়াটা ছিল বিপরীতমুখী

Dhaka University Institutional Repository


একটি বিষয়। তবে ইরানিদের একটি সময়কালে ব্যতিক্রম ঘটনাও ঘটেছিল। ১৭০ হিজরি সালে খলিফা মামুনুর রশিদ কিছু সময়ের জন্য খোরাসানে এলে তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য অনেকে কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। ঘটনাক্রমে আরবি ও ফারসি ভাষায় কবিতা আবৃত্তি করেন আবুল আব্বাস মারুযি। সেসময় ফারসি ভাষার প্রতি উদার মনোভাব পোষণ করে কবিতা আবৃত্তির এটি ছিল অন্যতম দৃষ্টান্ত। তখন মামুনুর রশিদ খুশি হয়ে তাঁর বেতন ভাতা বৃদ্ধি করে ছিলেন।[১৯] এটিই ছিল কোন আরব শাসকের সম্মুখে প্রথম ফারসি কাব্য রচনাকারী ব্যক্তির কবিতা। যদিও তাঁর মাধ্যমে ফারসি কাব্যের ধারা সূচিত হয়েছে, এমনটি বলা যায়না।

## প্রথম কবিতা আবৃত্তি

ফারসি কবিতা প্রথম কে আবৃত্তি করেছিলেন এ বিষয়ে বিভিন্ন রকম বক্তব্য রয়েছে। ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসে এরূপ কয়েকজন কবি সম্পর্কে আলোচনা পাওয়া যায় যারা প্রথম কবিতা আবৃত্তিকারক হিসেবে স্বীকৃতি পেতে পারেন। তন্মধ্যে বাহরামগোর সাসানি, হানজালেহ বাদগিসি, আবু হাফস সুগদি, আব্বাস মারভাযি, মোহাম্মদ বিন ওয়াসিফ, ফিরোজ মাশরিকি ও আবু সেলিক গুরগানি অন্যতম। ঐতিহাসিক ডক্টর যাবিহুল্লাহ সাফা কয়েকটি উদ্বৃতির মাধ্যমে অনেকগুলো নাম উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে গুরুত্বসহকারে বাহরামগোরকে ফারসি কবিদের মাঝে প্রথম কবি হিসেবে উল্লেখ করা হয়।[২০] তিনি প্রেমিকা দেলারামকে উদ্দেশ্য করে দু'টি লাইনের একটি কবিতা আবৃত্তি করে ছিলেন। কবিতাটি হল এই–

منم ان پیل دمان و منم آن شیریله- نام من بهرام گورو کنیتم بوجبله

এটিও একটি কবিতা, যেখানে কাব্যের 'ওযন' এবং 'কাফিয়া' সঠিক হয়েছে। তবে সাসানি যুগে (২২৬ খ্রি.-৬৫১ খ্রি.) শুধু একটি কবিতা থাকায় এটিকে ভিত্তি করা আদৌ ঠিক হবেনা। খসরু পারভেজের সময়কালে ( ৫৯০ খ্রি.-৬২৭ খ্রি.) এক গায়ক ছিল। সে নিজেই গীত রচনা করত এবং নিজেই সুর ধরে গেয়ে বেড়াত। তাঁকেও প্রথম কবি হিসেবে অভিহিত করা হয়।[২১] ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসে এমন অনেক কবি আছেন যারা কোনো এক সময়ে কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। কিন্তু সময় ও অনুকূল পরিবেশ না থাকায় কাব্যচর্চার মৌলিক দিকগুলো প্রকাশিত হয় নি। যেসব বক্তব্য প্রথম কবি হিসেবে উপস্থিত হয়েছে তা কবিদের কবিতার চর্চা যুগ হিসেবে নির্ধারণ করা যায়না। কাব্য রচনা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন ছিল অনুকূল পরিবেশ তথা ইরানি শাসক ও তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা। এ সময়টি পেতে ইরানিদের অনেক দিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। ইতিহাসে তৃতীয় হিজরি শতকের শেষ দিক থেকে ফারসি কাব্যচর্চার একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির প্রমাণ পাওয়া যায়। বাদশাহ মামুনুর রশিদের

সিপাহ সালার ছিলেন তাহের যুল ইয়ামীন। তাঁর খোরাসান অঞ্চলের প্রতি পুরো কর্তৃত্ব ছিল। তাহেরি বংশের এ শাসক মনে প্রাণে ইচ্ছে করতেন, তাঁর দরবারে কবিদের আগমন ঘটুক। যদিও তাহেরি বংশ ফারসির সাথে খুব কমই পরিচিত ছিল। কেননা, তাহেরি সম্প্রদায় আরবি ভাষা প্রচলনের প্রতি দুর্বলতা দেখিয়েছিলেন। তাহেরীয়রা ছিল মূলত আরব বংশোদ্ভূত সম্প্রদায়।[২২] সে সময় কয়েকজন কবির রচনা পাওয়া ব্যতিক্রম নয়। তবে দীর্ঘ সময়ব্যাপী এ ভাষার যথেষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি– এ কথা বলা সঠিক নয় যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির ঐতিহাসিকগণ –এর উত্তর নানাভাবে দিয়েছেন। যেমন–ইসলাম প্রচারের সময় আরবগোষ্ঠী প্রথমে আজমবাসীদের উপর আক্রমণ করেছিল। এটি ছিল প্রাচীন ইরানের উপর ইসলাম ধর্ম প্রচারের যুদ্ধ। সেসময় প্রাচীন ফারসি ভাষার যাবতীয় সাহিত্য-রচনাবলি ধ্বংসে পরিণত হয়। ইসলাম বিস্তার লাভের সময়ও এ সাহিত্যের অনেক ধ্বংস ঘটেছে।[২৩] ফলে ইরানে ইসলাম ধর্ম আগমনের পরও দীর্ঘ সময় এ সাহিত্যের নিদর্শন না পাওয়াটা স্বাভাবিক। ঐতিহাসিক মতে, ইসলাম অগমনের প্রায় তিন শত বছর পর নতুন ধারার ফারসি সাহিত্যের নির্দশন মিলে। যে গুলোর মধ্যে আরবি শব্দের আধিক্য এবং ইসলামের নানা বিষয় নিহিত রয়েছে। বিশেষত এসব রচনায় সুফিদর্শন ও নীতিদর্শন বেশি করে স্থানলাভ করেছে। ফলে ফারসি সাহিত্যে সৌকুমার্য, নৈতিকতার বিষয়টি অধিকতর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমরা ফারসি সাহিত্যে প্রশ্নবিদ্ধ কাহিনী বা অপবিত্র চরিত্রের অবতারণা দেখতে পাইনা। এটি মূলত ইসলাম ধর্ম আর্বিভাবের ফলে মানবিক চরিত্রের উন্নয়ন ও প্রসারে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। আমরা এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, ইসলাম ফারসি সাহিত্যকে একটি উত্তম ও আদর্শ সাহিত্য হিসেবে পরিণত করেছে। যে কারণে এ সাহিত্যর সৌকুমার্য অতি অল্প সময়ে পৃথিবীর বিভিন্নস্থানে ইসলাম প্রসারের সাথে সাথে বিস্তারলাভে সক্ষম হয়। এ কথা সত্য যে, পারস্যে ইসলামের বাণী পৌঁছাতে গিয়ে আরবদের খুব বেশি সময় ব্যায় করতে হয়নি। পারস্যবাসীরা আরবের ইসলাম দ্রুত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের ভাষা সংস্কৃতির প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করে আরবি ভাষা প্রত্যখ্যাত হয়।[২৪] পারস্যবাসীরা আরবি ভাষা গ্রহণ না করে নিজেদের ভাষাকে উন্নত করার চেষ্টায় নিয়োজিত থাকেন। তখনও আরবি শব্দসম্ভার ব্যাপকভাবে ফারসি ভাষায় প্রবেশ করতে পারেনি। ইরানের জাতীয়তাবোধকে জাগ্রত করে রাখার জন্য মহা কবি ফেরদৌসির প্রচেষ্টা ছিল আশাতীত। তিনি *শাহনামা* রচনার মাধ্যমে প্রাচীন ইরানের পুরো জাতির বৃত্তান্ত উপস্থাপন করেন। কাব্যটিতে তিনি আরবি শব্দ ব্যবহার করেননি। তাঁর আবেদন ছিল যে, আরবদের আক্রমণে ইরানের শৌর্যবীর্য যেন ধ্বংস না হয়।[২৫] যদিও পরবর্তীতে মহা কবি ফেরদৌসির সে ধারাটি অব্যাহত থাকেনি। কবি নাসির খসরু, মাওলানা রুমি, শেখ সাদি ও হাফেজ শিরাজি– সবাই তাঁদের কাব্য সাহিত্যে আরবি শব্দের

Dakha University Institutional Repository

স্থান করে দিয়েছেন। তাঁরা কাব্যে আরবি ভাবধারার সম্মিলন ঘটিয়েও নতুনরূপে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন।

## যুগ পরিক্রমা

ফারসি কাব্যের যুগের ধারাটি তৃতীয় হিজরি শতক থেকে গণনা করা হয়ে থাকে। শুরুতে ঠিক যেভাবে ফারসি কবিতা প্রসার লাভ ঘটেছে তা ছিল মূলত নতুন করে একটি ভাষা ও সাহিত্যের শিশু জন্মের ইতিহাস। তাহেরি যুগ (২০৬ হি.-২৫৯ হি.) ও সাফারি যুগ (২৪৮ হি.-৩৯৩ হি.)- এর কবিগণ ছিলেন একেবারে নির্দিষ্ট সীমারেখায় আবদ্ধ। তাঁদের মাঝে কবি চেতনাবোধ জাগ্রত হওয়ার চেয়ে কবিত্বকে টিকিয়ে রাখার মানসিকতা কাজ করেছিল বেশি। কেননা, এ যুগটি প্রাচীন ধারা থেকে বের হতে কবিদের কমই শক্তি যোগাতে সক্ষম হয়। রাস্ট্রের সহযোগিতা না থাকায় কবিদের কবিতা উল্লেখযোগ্যহারে আত্মপ্রকাশ ঘটেনি। তখনকার সময়ে হানযালাহ্ বাদগিসি, মাহমুদ ওরাক হারুভি, ফিরুজ মাশরিকি ও আবু সালিক গুরগানি ছিলেন অন্যতম কবি। বলা যেতে পারে যে, তৃতীয় হিজরি শতকের মাঝামাঝি সময়কাল থেকে পঞ্চম হিজরি শতকের মাঝামাঝি সময়কাল পর্যন্ত প্রায় দুই শত বছর ফারসি সাহিত্য অঙ্কুরিত অবস্থা থেকে প্রস্ফুটিত ও বিকশিত হতে সমর্থ হয়। এ সময় খোরাসান, সিস্তান এবং উজবিকিস্তান অঞ্চলে ফারসি গদ্য ও পদ্যচর্চা ও বিকাশলাভ বৃদ্ধি পেয়েছিল।[২৬] ইসলাম ধর্ম উক্ত অঞ্চলগুলোতে প্রচারের পাশাপাশি ফারসি ভাষাও প্রচার পেয়েছে। তখন ফারসি কবিরা ইসলামের আহবান ছড়িয়ে দিতে যথেষ্ট তৎপর ছিলেন। তাঁদের কাব্যসাহিত্যের মাধ্যমে ইসলামের শ্রেষ্ঠ কাহিনীগুলো প্রচার পায়। সে সুবাদে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হতে বেশি সময় লাগেনি। বিশেষ করে ইসলামভূক্ত দেশগুলোতে দ্রুত ফারসি ভাষার সুফিধারামূলক রচনাগুলো বিস্তার লাভ করে।[২৭] সেই সাথে একের পর এক ফারসি সাহিত্যচর্চার কেন্দ্রও বিভিন্ন শহর ও স্থানে বৃদ্ধি পেতে থাকে। শুধু পূর্ব ইরানেই ফারসিসাহিত্য চর্চাকেন্দ্র সীমিত থাকেনি। এটি ইরাক ও আযারবাইযানের বিভিন্ন শহরগুলোর দিকে প্রসারিত হয়। সময় ও চাহিদার সাথে সাথে ফারসি ভাষা ইরান ভূখণ্ড থেকে এশিয়ার বিস্তির্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে।

## সামানি যুগের কবিতা

সামানি যুগে (২৬১ হি.-৩৮৯ হি.) তাঁদের কথা বলার মধ্যে একটি স্বাধীন চেতা মনোভাব জেগে ওঠেছিল। যেসব কবি কবিতা রচনা করেছিলেন তাঁদের কবিতাই চর্তুদিক আলোড়িত করে তুলেছে। এর কারণ ছিল, কবিদের প্রতি সামানি শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা, উৎসাহ ও আন্তরিকতা। শাসকরা

Daka University Institutional Repository

নিজেদের জাতিসত্তার পরিচয় দিতে গিয়ে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি কামনা করেছিলেন।[২৮] তাঁরা নিজেদের কবিপ্রতিভার বিকাশ ও কবিতা লেখার চর্চাকে পছন্দ করতেন। শামসুল মোয়ালি কাবুস, ইবনে উম্মাদ সাহেব বিন আব্বাদ, আবুল ফযল বালআমি এবং আবু আলি বালআমি রাজ্যের শাসনকার্যের সাথে সম্পৃক্ত থাকা সত্ত্বেও ফারসি রচনাদির সাথে তাঁদের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল।[২৯] যদিও শাসন ব্যবস্থায় তাঁদের অবদান অনেক। তদ্রুপ ফারসি চর্চার ধারাকে সমুন্নত রাখতে তাঁদের ভূমিকা কোন অংশেই কম ছিল না। এই সামানি যুগেই বোখারা, সিস্তান, গাযনীন, গুরগান, রেই, নিশাপুর এবং সামারকান্দ স্থানগুলো ফারসি সাহিত্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।[৩০] এ সময় মসনবি, কসীদা, গজল কেত্‌আ, রুবাই ও দু' বেইতি– ইত্যাদি ধারার কবিতা বেশি আবৃত্তি হয়েছে। অনেক কবি প্রশংসা এবং ওয়াজ-নসিহতমূলক কবিতা রচনা করেছেন। ঘটনা ও কাহিনীমূলক কবিতাও সৃষ্টি হয়েছে প্রচুর। কবিতা রচনার ক্ষেত্রে কবিদের স্টাইল বা ধরন পদ্ধতি ছিল একটি পরিবর্তনীয় বিষয়। ফারসি সাহিত্যের কবিরা কখনই একই পদ্ধতিতে কবিতা রচনা করেননি। যে কারণে তাঁদের কবিতা রচনায় বহুরূপের আর্ভিবাব ঘটেছে। শুরুতে যে কবিতার স্টাইল ছিল এক শত বছর পর তা একই নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেনি। বরং ভিন্ন একটি স্টাইল ও ধারার প্রবর্তন হয়েছে। সামানি স্টাইলের কবিতাগুলো সে যুগের কথা বলত। প্রাচীন বিষয়, যুদ্ধ, সংস্কৃতি ও প্রশংসা ইত্যাদি ছিল কবিতার মূল বিষয়। আরবি শব্দের মিশ্রণ ও আরবি ধারা থেকে তখন বের হওয়া ছিল একটি কঠিন কাজ।[৩১] কবিরা কবিতা লিখনের ক্ষেত্রে বহু আরবি শব্দ ব্যবহার করেছেন।

সামানি যুগে (২৬১ হি.-৩৮৯ হি.) খোরাসান ও বোখারা অঞ্চলে জাতীয়ভাবে কবিতা আবৃত্তির উপর কাব্য মেলা বসত। এসব মেলায় সেসময়ের বিশেষ ব্যক্তি ও কবিরা নিজেদের কবিতা পাঠ করতেন। তখন সামানি শাসকগণ বিরত্বগাথা কবিতা রচনার জন্য কবিদের উৎসাহিত করে চলত। অনেক কবি বাদশাহদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েও উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন। এরই প্রেক্ষাপটে প্রতিভাবান কবি হিসেবে কবি আবু মনসুর আহমদ দাকিকির নাম আলোচনা করা যেতে পারে। তিনি প্রথম পদ্য আকারে *শাহনামে* রচনায় মনোনিবেশ হন এবং বিশ হাজার বয়েত তিনি লিখেছিলেন। মূলত *শাহনামে* রচনার প্রেক্ষাপটটি ছিল সামানি যুগের বড় কৃতিত্ব। কিন্তু সমাপ্তের আগেই তিনি নিজ গোলামের দ্বারায় মারা যান।[৩২] এ সময়ে যেসব কবির আর্বিভাব ঘটেছে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: আবুল হাসান শহীদ বালখি, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন মুসা ফিরাই, আবুল আব্বাস, আবু যার মুআম্মার আলজুরযানি, আবু মুজাফ্‌ফর নাসীর বিন মুহাম্মদ নিশাপুরি, মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আলজুনাইদি, আবু মনসুর উম্মার বিন মুহাম্মদ আল মারুযি, উস্তাদ আবু মনসুর মুহাম্মদ বিন আহমদ দাকিকি,

Dhaka University Institutional Repository


রাবেয়া বিনতে কা'ব কুযদারি, প্রমুখ অন্যতম। তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ অবস্থানে থেকে কবিতা রচনা করেছেন এবং কাব্যগুণে বিশারদ ছিলেন।

## গজনভি ও সালযুকি যুগ

সামানি রাজত্বের একটি শাখা হল গজনভি ধারা। গজনভি যুগের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আলপ্তগিন। তিনি আবদুল মুলক বিন নুহ্ সামানির সময়কালে এ বংশের গোলাম ছিলেন আলপ্তাকীন। এক সময় তিনি নিজের উন্নতিলাভের মাধ্যমে আমীর বা শাসকের স্থান লাভে সক্ষম হন। আবদুল মূলক প্রথম তাঁকে খোরাসানের গর্ভণর নিযুক্ত করেন। মনসুর বিন নুহের রাজত্বের সময় তিনি গজনিতে এসে ষোল বছর শাসনকার্যের সাথে সম্পৃক্ত থাকেন। তাঁরপর ছেলে আবু ইসহাক ও গোলাম সাবুক্তগীন ও সুলতান মাহমুদ রাজত্ব করেন। তাঁরা ৩৫১ হিজরি থেকে ৫৮৩ হিজরি পর্যন্ত মূলত ইরানের শাসনকার্য পরিচালনা করেন।[৩৩] এ যুগের প্রসিদ্ধ ও উল্লেখযোগ্য কবি হলেন, হাসান বিন আহমাদ আবুল কাসেম উনসুরি, আলি আবুল হাসান ফররাখি, আবুল কাসেম ফেরদৌসি, আলি বিন আহমদ আবু নাসর আসাদি তুসি, আহমদ আবুন নাজম মনোচেহরি দামেগানি প্রমুখ। পরবর্তী সময়টি হল সালযুকি যুগ; এ যুগটিও ফারসি সাহিত্যের উন্নতির যুগ হিসেবে পরিচিত। সালযুক সম্প্রদায় ছিল তুর্কি বংশজাত। যারা তৎকালীন তুর্কিস্তান থেকে ইরানে আগমন করেন। এ যুগের সময়কাল ৪২৯ হি./ ১০৩৭ খ্রি. থেকে ৫৫২ হি./ ১১৫৭ খ্রি. পর্যন্ত বিস্তৃত। গজনভি এবং সালযুকি যুগে প্রশংসা, ব্যাঙ্গাত্বক, ঘটনা, কিচ্ছা-কাহিনী, এরফানি, হেকমত ও এশকে এলাহি বিষয়ে প্রচুর কবিতা রচনা হয়েছে। তবে নিজস্ব স্বকীয়তার উপর কবিতা রচনা করতে কবিরা তৎপর ছিলেন। বিশেষ করে তাঁদের আরবি শব্দ ব্যবহার বা আরবি ধারা থেকে বের হয়ে ফারসি ধারার প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি ঘটে ছিল। গজনভি যুগের ৫ম হিজরি শতকের মাঝামাঝি সময়কালে গজনভি স্টাইলে কবিতা লিখার প্রবণতা প্রতিষ্ঠিত থাকে। এ শতকেও কিছু কবি পূর্বের স্টাইলকে পরিত্যাগ করতে পারেননি। নাসির বিন খসরু কুবাদিয়ান ছিলেন সে ধারার অন্যতম কবি। তিনি কসীদামূলক কবিতা রচনা করার ক্ষেত্রে ৪র্থ হিজরি শতকের ধারাকে অবলম্বন করে কবিতা লিখতেন।[৩৪] এ কবির জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ছিল তুলনাহীন। ফখরুদ্দিন বিন আসাদ গুরগাণি প্রাচীন ধারায় কবিতা রচনাকে ভালবাসতেন। *ভিস ওয়া রামিন* রচনার ক্ষেত্রে তিনি প্রাচীন ঘটনাটি নতুন করে কাব্যাকারে স্থান করে দিয়েছেন। কবিদের মাঝে স্টাইল গ্রহণের বিষয়টি ছিল একেবারেই স্বাভাবিক। একসময় তাঁদের স্টাইল সাব্‌কে খোরাসান, সাব্‌কে ইরাক ও সাব্‌কে হিন্দি নামে পরিচিত হয়। অপরদিকে ফারসি কবিদের মাঝে অনুসরণ করে কবিতা রচনা করা ছিল অন্যতম বিষয়। অনেক কবি অপরের অনুসরণ করে কবিতা রচনা করেছেন। যে সকল কবি সপ্তম হিজরি

Dhaka University Institutional Repository

শতকে জন্মলাভ করেন তাঁরা পঞ্চম হিজরি শতকের কবিদের অনুসরণ করে কবিতা লিখেছেন। কবিদের কাব্য রচনায় সম্মানবোধ, আত্মমর্যাদা ও শ্রদ্ধা ছিল অনেক। তাঁরা বড় কবিদের অনুসরণ করে কবিতা লিখাকে গৌরবজনক কাজ মনে করতেন।[৩৫] তবে অনুকরণীয় কবিদের মাঝে একটি নতুনত্ব ও বৈশিষ্ট্য সব সময় বিদ্যমান ছিল। তাঁদের কবিতায় নতুন ভাবে শব্দ ব্যবহার শব্দ গাঁথুনি ও স্বাধীনতা পাওয়া যেত। তাঁরা কখনই অনুকরণকে নিজের জন্য প্রতিষেধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করেননি। যেমন কবি সানাঈ এবং কবি মুঈযি- এ দু'জন কবি পূর্ববর্তী কবি উনসুরি এবং কবি ফররুখির *দিওয়ান* কাব্যগ্রন্থের অনুসরণ করে কবিতা রচনা করেছেন। তাঁদের প্রতিটি রচনার সৃষ্টি ও পদ্ধতি পৃথক এবং পৃথক বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ। পদ্ধতিগত দিক দিয়ে রচনাগুলোর মধ্যে অনেক পার্থক্য বিরাজমান রয়েছে।[৩৬] অবশ্য অনুসরণ করার ক্ষেত্রে সবাই যে একই ধারার কবি হবেন এমনটি নয়। যাঁরা একেবারেই অনুসরণ ও অনুকরণের কথা বলেছেন তাঁদের মধ্যেও কবিতার ধারা স্বতন্ত্রমুখী। কবি নিজামি নিজের মত করে কবিতা রচনা করতেন। তিনি কারও অনুকরণ পছন্দ করতেননা। এটি তাঁর পৃথক একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি নিজে বলেন,

عاریت کس نپذیرفته ام- آنچه دلم گفت بگو گفته ام

আমি কারও থেকে উদার করেনি। হৃদয় থেকে যা এসেছে তাই বলেছি।[৩৭]

ফারসি কবিদের মাঝে এ প্রবণতাও বিশাল করে দেখা অত্যক্তি হবে না যে, তাঁরা অনুকরণকে নিজের যশ ও খ্যাতি মনে করতেন। কবি নিজামি ও কবি জামির অনুসরণ করে কবিতা রচনা অন্যতম প্রমাণ। গজনভি এবং সালযুকি যুগের কবিরা প্রেম নিয়ে কবিতা রচনা করতে পছন্দ করতেন। তাঁদের কবিতায় প্রেমই ছিল মুখ্য বিষয়। কবি মুঈযি, কবি আনওয়ারি, কবি সানাঈ, এবং খাকানি কবিতা রচনায় সে পরিচয় দিয়েছেন।[৩৮]

সালযুকি যুগে (১০৬৩ খ্রি.-১১৯৩ খ্রি.) ফারসি কাব্য সাহিত্যের উন্নতি ও ধরন পদ্ধতি ঠিক গজনভি শাসনামলের মতই প্রতিষ্ঠিত ছিল। তবে এটি সত্য যে, কাব্যের গুণগত একটি পরিবর্তন সালযুকি যুগে ঘটেছিল। এ সম্পর্কে ইংরেজ লেখক জে. রেপকার একটি মন্তব্য উল্লেখ করছি। তিনি বলেন

> Poetry also flourished during the period of the decline and fall of Saljuq rule, but the forms perfectedby the old masters were already dying out and poetry was developing in an entirely new direction.[39]

তাঁর দৃষ্টিতে কবি সানাঈ, আনওয়ারি ও খাকানি কসীদা রীতির কবিতা রচনায় পরিবর্তন এনে দিয়েছিলেন। পূর্ববর্তী যুগের উপর অনুসরণ করে অনেক কবি কবিতা রচনা করেছেন। তবে ব্যতিক্রম ছিল এ ক্ষেত্রে যে, এ যুগের কবিতা দরবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে খান্‌কা ও অন্যান্য স্থানের দিকে

Dhaka University Institutional Repository


প্রসারিত হয়েছে। আরবি ভাষার প্রয়োগ ও ব্যবহার ছিল খুব বেশি। কুরআনের আয়াত ও হাদিস কবিতায় অত্যধিকভাবে ব্যবহার হয়েছে।[৪০] সালযুকি যুগের কবিরাও সর্ব ক্ষেত্রে কবিতা রচনায় পারদর্শী ছিলেন। কাহিনী কাব্যের প্রতি তাঁদের যেমন দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তেমনি ধর্ম, আকায়েদ, তফসির ও হাদিস বিষয়ে। যেমন–আবুল হাসান আলি বিন জোলোগ ফাররুখি সিস্তানি, আবুল কাসেম হাসান বিন আহমদ উনসুরি বালখি, আবুন্নাজম আহমদ বিন কোস মানোচেহর দামাগানি, মাসউদ সাদ সালমান, আবু সাঈদ আবুল খায়ের, হাকিম আবুল মাজদ মাজদুদ বিন আদম সানাঈ, ফখরুদ্দিন আসাদ গুরগানি, আসাদি তুসি, নাসির খসরু, বাবা তাহের হামাদানি, ওমর খৈয়াম, আওহিদ উদ্দিন বিন আলি বিন মুহাম্মদ বিন ইসহাক আনওয়ারি, আফজালুদ্দিন বাদিল বিন আলি খাকানি শিরওয়ানি, হাকিম জামাল উদ্দিন আবু মুহাম্মদ ইলিয়াস বিন ইউসুফ নেজামি গাঞ্জবি প্রমুখ। এ যুগে রুবাইয়াত শ্রেণির কবিতা রচনার জন্য ওমার খৈয়াম প্রসিদ্ধ ছিল।

<u>এক নজরে বিখ্যাত কবি</u>

| নাম | জন্মস্থান | মাযার | বিখ্যাত গ্রন্থ | উপাধি |
|---|---|---|---|---|
| রোদাকি | রোদাক | রোদাক | | মালেকুশ শোআরা |
| ফেরদৌসি | তুস মাশহাদ | তুস মাশহাদ | কাহনামে | জাতীয় কবি |
| ফরিদ উদ্দিন আত্তার | নিশাবুর/ নিশাপুর | | ১.তাযকিরাতুল আওলিয়া ২. মাতেকুততায়ের | আরেফ |
| মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি | বালখ | কৌনিয়া (তুরস্ক) | মাসনাভিয়ে মা'নুভি | আরেফ |
| মুসলেহ উদ্দিন সাদি শিরাজি | শিরাজ | সিরাজ | বুস্তান ও গোলেস্তান | আরেফ |
| মাহমুদ শাবেস্তারি | আযার বায়যান | | গুলশানে রায | আরেফ |
| আমির খসরু দেহলবি | ভারত | ভারত | কেরানুস সা'দাইন | তোতা পাখি/ভারতের সাদি |

### মোঙ্গলীয় আমলের কবিতা

মোঙ্গলরা ইরান বা মুসলিম জাহানের জন্য ক্ষতির কারণ হিসেবে আর্বিভূত হননি। তবুও তাঁদের শাসনের সময় যে ক্ষতিটুকু সাহিত্য সংস্কৃতিতে হয়েছিল তা পূরণযোগ্য নয়। বহু কবি, লেখক ও সাধক মোঙ্গলদের আক্রমণের শিকার হয়েছেন। অনেকে ভয়ে নিজ দেশ ত্যাগ করে ভারত ও অন্যান্য দেশে পালিয়ে আশ্রয় লাভ করেন। এ সময়ে সাহিত্যের যে উন্নতির ধারাবাহিকতা ছিল তা স্থিতিশীল থাকেনি। তবে এ যুগে এরফানি কবিতার উন্নয়ন ঘটেছিল।[৪১] এ সময়ের উল্লেখযোগ্য কবি হলেন–শেখ ফরিদুদ্দিন আত্তার, মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি, ফখরুদ্দিন এরাকি, শেখ সাদি শিরাজি, মাহমুদ শাবেস্তারি প্রমুখ অন্যতম।

Dhaka University Institutional Repository

তৈমুরি যুগেও কবিদের মধ্যে একটি ভয়-ভীতি সর্বদা কাজ করে ছিল। কবিরা তখন কবিতা আবৃত্তির চেয়ে নিজেদের জীবন বাঁচানো ও মান সম্মানের প্রতি সজাগ ছিলেন। দেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সুফি, দরবেশ ও কবি-সাহিত্যিকের উপর প্রভাব রাখা ছিল একটি স্বাভাবিক ঘটনা। এ সময়ে কবিরা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় জীবন-যাপন করতেন। ফলশ্রুতিতে তাঁদের কবিতা সমগ্র ইরান ও ইরানের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ভারত উপমহাদেশে বিস্তার লাভ করেছে। ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসে এ সময়ের কবিগণ দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। একদল কবি হাফেজ অনুসারী অপর দল ছিল কবি জামির। হাফেজ ও জামির যুগ মুলত দুটি কাব্যিক যুগ। এ যুগের মধ্যে খাজা নিজাম উদ্দিন উবায়দুল্লাহ যাকানি, খাজা শামসুদ্দিন হাফেজ শিরাজি, খাজো কিরমানি, শাহ নিয়ামত উল্লাহ ওলি, আবদুর রহমান জামি অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁদের মধ্যেও সুফিবাদী কবিতার প্রসার ছিল একটি ধারাবাহিকতার প্রতীক। তখন সুফি সৃষ্টির খান্‌কাগুলো যথাভাবেই কর্মচাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ থাকত।[৪২] এখান থেকেই সৃষ্টি হত সুফি ধারার কবিতা ও মানুষ। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও ফারসি কবিতা ছিল সবার উর্ধ্বে।

## কবিতার শেষ যুগ

সাফাভি যুগটি (৯০৫ হি.-১১৩৫/১১৪৮ হি.) একটি বংশকে ভিত্তি করে গঠিত হয়েছে। এ যুগের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ইসমাইল সাফাভি। এ বংশের অধিকারীগণ আড়াই শত বছরের বেশি সময়কাল ধরে রাজত্ব করেছেন। এ যুগে ধর্ম, সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান অত্যধিক উন্নতি লাভ করেছে। এ যুগে ফারসি কাব্য সাহিত্য পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়। এ সময় কবিরা দরবার ও কেন্দ্রের সীমানা থেকে বের হয়ে স্বাধীনভাবে কবিতা রচনা করতে উদগ্রীব হয়ে ওঠেন। বিশেষত এ সময় কাব্যে স্বাধীনতা ও সুফিদর্শন উৎকর্ষতা লাভ করে। কবিতা রচনা করে জীবিকা উপার্জন ছিল একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় ছিল।[৪৩] প্রতিটি ক্ষেত্রে কবিতার উন্নয়ন, প্রচার ও প্রসার এ যুগের বড় বৈশিষ্ট্য। ধর্মীয় ও ঐতিহাসিকমূলক 'হামাসা' ও গল্প-কাহিনীমূলক কাব্যরচনা সীমিত ছিলনা। এ যুগে রচনাশৈলীর মধ্যে অন্য একটি ধারার উদ্ভব বিশেষ খ্যাতি রাখে। 'সাবকে হিন্দি' বা হিন্দী স্টাইলটি এ যুগেই প্রচলন হয়েছে। ভারতীয় কবিদের শব্দ কথা ও কাব্যে ব্যবহার এবং কাব্য পদ্ধতিটি পৃথক পরিচয়ে আর্বিভূত হওয়া একটি স্বতন্ত্র কাব্যস্টাইল পরিচয়ের ইঙ্গিত করে। অঞ্চলভিত্তিক একটি ধারার প্রবর্তন ভারতীয়দেরকে ফারসি কাব্যের প্রতি সচেতন করে তুলেছে।[৪৪] এ যুগের উল্লেখযোগ্য কবিরা হলেন–বদর উদ্দিন হেলালি ইস্তরঅবাদি, মাওলানা কামাল উদ্দিন ওহাশি বাফকি, খাজা হোসাইন সেনাই মাশহাদি, কামাল উদ্দিন আলি মোহতাশম কাশানি, জামাল উদ্দিন মুহাম্মদ উরফি

Dakha University Institutional Repository

শিরাজি, মুহাম্মদ হোসাইন নাজিরি নিশাবুরি, শায়খ বাহা উদ্দিন বাহায়ি, মুহাম্মদ তালেব আমলি, আবু তালেব কালিম কাশানি, সায়্যেদ জালাল উদ্দিন আসির ইস্পাহানি, মির্যা মুহাম্মদ সায়েব তাবরিজি, নাসির আলি সেরহিন্দি ও বেদিল দেহলভি প্রমুখ। কবিদের উন্নতির ধারাটি পরবর্তীতে কাজারি যুগেও (১১৯৩ হি./১৭৭৯ খ্রি.-১৩৪৪ হি./১৯২৫ খ্রি.) প্রভাব রাখে।

## ফারসি কাব্যসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি

### মুহাম্মদ রুদাকি (২৬০ হি.-৩২৯ হি./৯৪০ খ্রি.)

সামানি যুগেও আরবি ভাষার চর্চা ও আরবি অনুবাদের কারণে ফারসি কাব্যসাহিত্যের উন্নতির ভাটা পড়েনি। যদিও সে সময় ফারসি সাহিত্যের যে বীজ বপন হয়েছিল তাকে পল্লবিত ও বিকশিত করার জন্য দক্ষ কারিগরের অভাব ছিল প্রচুর। ইসলামের ভাষা আরবির প্রতি গুরুত্ব ও কদর থাকার কারণে ফারসি ভাষায় ভাল মানের কাব্যরচনা সৃষ্টি করা ছিল কল্পনাতীত। এই অবহেলিত অবস্থায় মাতৃভাষার প্রতি ভালবাসা জাগিয়েছিলেন যে কবি তাঁর নাম রুদাকি[৪৫]। গ্রামীণ পরিবেশের মধ্য থেকে আবু আবদুল্লাহ জাফর বিন মুহাম্মদ রুদাকি ফারসি সাহিত্যের সাফল্য এনে দিয়েছিলেন। সরাসরি ধর্মভিত্তিক কোন কাব্যরচনা না করে কাহিনী ও শিক্ষামূলক রচনার দিকে তাঁর মনোনিবেশ ছিল বেশি। তিনি নিজস্ব স্বকীয়তা সৃষ্টিতে পুরনো গল্প *কালিলে ও দিমনে* এবং *সেন্দবাদনামে*'র কাব্যকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন।[৪৬] সে সময় এ ধরণের কবিতা আবৃত্তি ছিল একটি কঠিন ও ব্যতিক্রমমুখী কাজ। এ কারণে যে, ইরানীয়দের মধ্যে ধর্ম, ইতিহাস ও অনুবাদ রচনার প্রতি একটি পৃথক সত্ত্বা গড়ে ওঠেছিল।[৪৭] কবি রুদাকির মধ্যে বহু প্রতিভা জাগ্রত থাকার কারণে তাঁকে কবিদের গুরু এবং অনারবদের প্রথম কবি বলা হয়ে থাকে। তিনি ছিলেন সামানি যুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবি।[৪৮] এর পূর্বে যে সব কবি অতিবাহিত হয়েছেন তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব ততটা ইতিহাসনির্ভর ছিলনা। তাহেরি ও সাফারি যুগে বহু কবির আর্বিভাব ঘটেছে। কিন্তু রুদাকির ন্যায় কেউ কবিতা আবৃত্তিতে পারদর্শীতা অর্জন করতে সক্ষম হননি। ফারসি কাব্যসাহিত্যে পূর্ণতা দানের জন্য সূচনাকালের তিনিই প্রথম কবি ছিলেন।[৪৯] বলা বাহুল্য যে, সেসময়ের ধারাটি ফারসি চর্চার জন্য প্রাথমিক বা প্রচার ও প্রসারের পর্যায়ের ছিল। সামানি যুগকে ফারসি চর্চার উৎপত্তি ও সূচনাকালের সময় হিসেবে গণ্য করা হয়। এ সময় প্রশংসা ও বাস্তবধর্মী কবিতা ছাড়াও নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর কবিতা রচিত হয়েছিল। সেসব রচনা একেবারেই কম। তাঁর কাব্যরচনা খ্যাতি পাওয়ার কারণ হল কাব্যে নতুনত্ব সৃষ্টি। সাধারণত ফারসি কবিতা আরবি কবিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। কবি রুদাকি যে সময় কবিতা রচনা করেন সেসময় আরবি কাব্যে শুধু প্রশংসা করা হত। কবি মোতানাব্বি, কবি আবু তাম্মাম, বুহতারি প্রমুখ আরবি কবিগণ

Dhaka University Institutional Repository

প্রশংসাসূচক কবিতা লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।[৫০] কবি রুদাকি তাঁদের চেয়ে অনেক ক্ষেত্রে ভিন্ন ধারার ছিলেন। যে কারণে সকল কবি তাঁকে কবিদের বাদশাহ বলে অভিহিত করতে দ্বিধাবোধ করেননি। তিনি সামানি শাসকদের রাজ দরবারের একজন সভাকবিও ছিলেন। বিশেষ করে নসর বিন আহমদ সামানি (৩০১ হি.-৩৩১ হি.)-এর রাজদরবার তাঁর জন্য সব সময় উন্মোক্ত ছিল। এ বাদশার নির্দেশে তিনি *কালিলে ওয়া দিমনে* কাব্যাকারে রচনা করেন।

কবি রুদাকি এতটাই তীক্ষ্ণ, মেধাবি ও প্রখর বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন যে, আট বছর বয়সে সমস্ত কুরআন মুখস্থ ও পাঠের কায়দা কানুন রপ্ত করেন।[৫১] কবিতা আবৃত্তির সময়কালটিও ছিল তাঁর শৈশবকাল। তিনি অল্প বয়সেই কবিতা গেয়ে গেয়ে শুনাতেন। দর্শকরা তাঁর কবিতা শুনে মুগ্ধ হত। তাঁকে আল্লাহ তায়ালা এমন সুন্দর কণ্ঠ ও গলার স্বর দান করেছিলেন যে, কোন শ্রবণকারী তাঁর প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে যেত না। তাঁর কবিতা যে কোন প্রকার শ্রোতাকে মুগ্ধ করত। তিনি আবৃত্তির ধারাটি কেমন করে পেয়েছিলেন বা কোন উস্তাদ তাঁকে তা'লিম দিয়েছেন- সে সম্পর্কে কোন তথ্য নেই। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কবি রুদাকির যুগে ফারসি সাহিত্যে অন্য কোন কবির আলোচনা ততটা স্থান লাভ করেনি। সফলতায় পৌঁছতে যে কাব্য দক্ষতার প্রয়োজন ছিল সবগুলোই তিনি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মসনবি, কসীদা, কেত্আ, গজল ও রুবাই-সব ধরণের কবিতা তাঁর আয়ত্বে থাকাটা ছিল গৌরবের ব্যাপার। তিনি যে কবিতা রচনার মাধ্যমে খ্যাতি লাভ করেন তা ছিল মসনবিমূলক কবিতা। ফারসি কাব্য সাহিত্যে গজল ও মসনবি কবিতার উৎপত্তি ও বিকাশ লাভে তাঁর অবদান রয়েছে। তিনি কবিতা রচনায় কসীদা ও গজলের উদ্ভাবক ছিলেন।[৫২] তাঁর বিশাল কাব্য রচনার মাধ্যমে ফারসি কবিতা নতুনরূপে প্রাণ পেয়েছে। এ কারণে ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি প্রথম শ্রেষ্ঠ কবি এবং কবিদের উস্তাদ হিসেবে খ্যাতি পান। বলা যেতে পারে যে, কাব্য জগতে তিনি একজন মসনবি রীতির উদ্ভাবক ও মসনবি বিশারদ। তাঁর অন্য পরিচয় হল, সুফি-সাধক হিসেবে পরিচিতি লাভ। তিনিই প্রথম সুফি ভাবধারার জগৎকে কাব্য রচনার মাধ্যমে আলোকিত করেছেন। বলা বাহুল্য যে, এই কবির কবিতাগুলো সংরক্ষিত হয় নি। বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর এক লক্ষের অধিক বয়েতের কথা বলা হয়েছে। তবে তাঁর রচিত গ্রন্থ হিসেবে *কালিলে ওয়া দিমনে* (كليله و دمنه) ও *সিন্দবাদ নামে* (سندباد نامه) সম্পর্কে সঠিক তথ্য রয়েছে। এ ছাড়া তাঁর মসনবি রীতির উপর কয়েকটি কাব্যরচনা ছিল। সেগুলো তিনি 'বাহরে মুতাকারিব', 'বাহরে খাফীফ', 'বাহরে হেজাজ', ও 'বাহরে সারী' পদ্ধতিতে রচনা করেছেন। এরূপ পদ্ধতির উপর তাঁর চারটি মসনবি রচনার কথা উল্লেখ

Dhaka University Institutional Repository

পাওয়া যায়।[৫৩] বলা বাহুল্য যে, সে সময় তাঁর ন্যায় সুন্দর মসনবি রীতির কবিতা অন্য কেউ রচনা করতে সক্ষম হয় নি। তাঁর রচনার স্টাইল ও ধরন পদ্ধতিও ছিল সকলের চেয়ে ভিন্ন। তিনি এত কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন যে, কোন ক্রমেই তা সংখ্যায় লিপিবদ্ধ হয়ে জনসমাজে আসে নি। কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে এ কথা প্রচলিত আছে যে, তার এক লক্ষ ত্রিশ হাজার বয়েত ছিল।[৫৪] তিনি বিভিন্ন বিষয়ে কবিতা রচনায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁর রচনার পদ্ধতি ছিল খোরাসানি স্টাইল বা সাব্‌ক খোরাসানি। ইরানের ঐতিহাসিকদের মধ্যেও প্রচলন রয়েছে যে, তাঁর এক শত দপ্তরের কবিতার বই ছিল। তবে তাঁর কবিতার কথা সমকালীন যুগে পৌঁছার পূর্বেই ধ্বংসে পরিণত হয়। তাঁর *কালিলে ওয়া দিমনে* গ্রন্থের একমাত্র আদেষ্টা এবং পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বাদশাহ নসর বিন আহমদ সামানি।[৫৫] বাদশার সহযোগিতা ও বদান্যতার ফলে তিনি কবিতা লিখার কাজকে সহজভাবে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। সামানি যুগের কবিদের মধ্যে তাঁকে শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার পিছনে আদর্শ, সত্যবাদিতা, ন্যায়-নীতি বিশেষভাবে গণ্য করা হয়ে থাকে। তিনি সময়ের চাহিদা ও মূল্য ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন বলে কবিতায় নিজের দর্শন ও চিন্তা চেতনায় প্রকাশিত হয়েছে। বাদশাহ নসর বিন আহমদকে উদ্দেশ্য করে তাঁর একটি কবিতা সে দিকেই ইঙ্গিত করছে বলে আমরা জানি।

بوی جوی مولیان آید همی- یاد یار مهربان آید همی

ریگ آموی و درشتی راه او- زیر پایم پرنیان آید همی [56]

মুলিয়ান স্রোতস্বিনীর গন্ধ আমার নিকট আসছে, অনুগ্রহশীল বন্ধুদের কথাও আমার মনে পড়ছে। আমু দরিয়ার ধুলোবালি ও তার রাস্তার স্থুলতা আমার পায়ের নীচে যেন রেশমি কাপড়।

এই কবির মূল্যায়ন সে সময় কবিরাই করেছিলেন। তাঁর কবিতার প্রশংসা করেছেন–আবুল হাসান শহীদ বালখি, নিজামি আরুযি সামারকান্দি, উস্তাদ আলি বিন জোলোগ ফারুখি সিস্তানি– প্রমুখ কবিগণ। সে সময় সকল কবি তাঁকে পছন্দ করে 'সুলতানুশ শোয়ারা' হিসেবে অভিহিত করেছেন।[৫৭] ইরানে সঙ্গীতের ধারাটি যেভাবে সূচিত হয়ছিল সে নামের সাথেও এ কবির নাম জড়িত রয়েছে। তিনি ছিলেন একজন সঙ্গীতজ্ঞ বীণা বাদক। কবিতা আবৃত্তির পাশাপাশি সুর ধরে ভাল গান করতে পারতেন। তাঁর গলার কণ্ঠ ছিল সুমধুর।[৫৮] কাব্য জগতের পাশাপাশি সঙ্গীতশাস্ত্রেও তাঁর অবদান কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বিশেষকরে বীণা বাজনায় তাঁর দক্ষতার প্রমাণ বিরল। তিনি ফারসি কাব্যের আদি কবি হিসেবেও যেমন খ্যাত তেমনি সঙ্গিত শাস্ত্রেও। এ কবির যশ ও খ্যাতি শুধু নিজ দেশেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, ভারত উপমহাদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর সম্পর্কে বাংলাভাষীরাও যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন।

Dhaka University Institutional Repository


## আবুল কাসেম ফেরদৌসি (৩২৯ হি./৯৪০ খ্রি.-৪১৬ হি./১০২৫ খ্রি.)

আবুল কাসেম ফেরদৌসি ফারসি সাহিত্যের নক্ষত্র ও ইরানের বীরত্ব গাঁথা ইতিহাস রচনায় শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি ইরানের মাশ্‌হাদ প্রদেশের অর্ন্তগত তুস নগরে জন্মগ্রহণ করেন। যে কারণে তাঁকে তুসি বলেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। তিনি একজন গ্রামের সাধারণ পরিবারের সন্তান ছিলেন। ঐ সময় গ্রামে যে কৃষকেরা বসবাস করত তাঁরাই ছিল ইরানের কৃষ্ঠি-সভ্যতার উৎসদাতা। আদি পরিবার হিসেবে গ্রামের কৃষকদের একটি মর্যদাকর অবস্থান ছিল। তাঁদের মাঝে বীরত্ব, বাহাদুরি, বুদ্ধিমত্তা ও তাত্ত্বিকতা পূর্ণভাবে পাওয়া যেত।[৫৯] কবি তদ্রুপ একটি বুনিয়াদি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ফলে কবি ফেরদৌসির জীবনে সে বিষয়গুলোর প্রভাব ফেলতে দেখা যায়। তিনি জীবনের শুরু থেকেই এমন কিছু কাজ ও বিষয় নিয়ে ভাবতেন যা ছিল একেবারে অন্যদের চেয়ে স্বতন্ত্র। তাঁর পড়ালেখা ও কবিতা বলার প্রতি মনোনিবেশ ও আগ্রহ প্রবল ছিল। অবশ্য ছোট্টবেলা থেকেই তাঁর অভ্যাস ছিল গুনগুন করে কবিতা আবৃত্তি করা। তিনি প্রতি নিয়ত ভাবতেন, আমার এমন কাজ করা চাই যা আমাকে অনেক দিন বাঁচিয়ে রাখবে।[৬০] এটিই যেন তাঁকে কবিতা আবৃত্তির প্রতি অদম্য সাহসি ও শ্রদ্ধাশীল করে তোলেছে। তাঁর এই আবৃত্তি করা থেকেই বৃহৎ কাব্য রচনার আগ্রহ জাগে। বলা বাহুল্য যে, কবির শিক্ষাগুরু বা কাব্য সাধনার জন্য উস্তাদ সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় নি। কবি যদিও তুসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং এলাকায় নিজের খামার বাড়িও ছিল কিন্তু তাঁর উল্লেখযোগ্য সময় অতিবাহিত হয় খোরাসান ও গজনিতে। তুস নগর ছেড়ে অন্যত্র স্থানে তাঁর বসবাস সম্পর্কে বিচিত্রময় তথ্য রয়েছে। তিনি কী অভাব, ক্ষুদা ও সময়ের যন্ত্রণায় অস্থির ছিলেন! না তিনি কবি প্রতিভা, যশ খ্যাতি বিকশিত করার জন্য ভ্রমণে যান। যে কারণে নিজ এলাকা ত্যাগ করে বহু দিন অস্থির ভবঘুরে জীবন-যাপন করেন। এ সম্পর্কে বহু মতের ও যুক্তির অবতারণা ঘটেছে বলা যায়। তাঁর সম্পর্কে বাংলা গ্রন্থ[৬১] ব্যতীত উর্দু ও ফারসি ভাষার বহু গ্রন্থে সুলতান মাহমুদ থেকে স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্তির কাহিনী রয়েছে। তিনি যৌবনকালে জীবিকা নির্বাহের উদ্দেশ্যে গজনি অঞ্চলে এসেছিলেন। সে সময় গজনি ছিল রাজ্যশাসনের কেন্দ্রবিন্দু ও রাজধানি। এখানে ফারসি কবিদের সমাগম হত প্রচুর। সে হিসেবে তাঁর উপস্থিতি ছিল খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি সুলতান মাহমুদের রাজদরবারে যেতে সাহস পেতেন না। একবার উজির মোহেক বাহাদুর সুলতানের দরবারে খুব ভাল কবিতা আবৃত্তিকারী হিসেবে তাঁর পরিচয় পেশ করেন। তারপর তিনি সুলতানের প্রশংসামূলক কবিতা আবৃত্তি করতে করতে উপস্থিত হন। সুলতান মাহমুদ কবিদের সম্মান করতেন। তাঁর দরবার সবসময় কবিদের উপস্থিতিতে মুখরিত থাকত। কবিদের উপস্থিত থাকার কারণ ছিল বহুবিধ। তন্মধ্যে কবিদের পুরস্কার ও আর্থিকভাবে সহযোগিতা প্রদান অন্যতম। সুলতান মাহমুদ কবি ফেরদৌসিকে সম্মান দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি।

কবিও সুলতান মাহমুদের প্রতি সম্মান রেখে প্রশংসাসূচক কবিতা লিখলেন। এ প্রেক্ষাপটেই শাহনামা রচিত হয়।

তাঁর এই কবিতা ছিল সবচেয়ে সমৃদ্ধময় কবিতা। সময়টি ছিল ভারত-উপমহাদেশের ফারসি ভাষা সাহিত্যের স্বর্ণময় যুগ। তখন ফারসি কবিদের এতই কদর ও সম্মান ছিল যে, চর্চা ও যোগ্যতার মাপ কাটিই ছিল প্রধান। এ ভাষার মাধ্যমে উন্নত কবিতা সৃষ্টিতে এতটা সহজ ছিলনা। অথচ জাতীয় ইতিহাস রচনার জন্য নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গ্রামের কবি ফেরদৌসি। গবেষণায় যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে তা হল, ফেরদৌসি সুলতান মাহমুদের আদেশে *শাহনামে* রচনা করেছেন– ইরানি ঐতিহাসিকরা তা কখনই বিশ্বাস করেননা এবং এর বাস্তবতা নেই। ফেরদৌসির দৃষ্টি কখনই সুলতান মাহমুদ, গজনি বা ভারত ছিলনা। তিনি পারস্যকে উজ্জ্বল করার জন্যই *শাহনামে* কাব্যরচনা করেছেন। তবে তাঁর নিকট একটি চিন্তা জাগ্রত হয়েছিল যে, এত বড় কাব্যরচনা কাউকে উৎসর্গের মাধ্যমে প্রচুর পুরস্কার পেলে দোষের হবেনা। সে কারণেই তিনি সুলতান মাহমুদের দরবারে কবিতা আবৃত্তি ও কাব্যজলসায় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু হিংসুক কবিদের কারণে সেই প্রাপ্য তিনি পান নি। শেষ বয়সকাল তাঁকে অভাব তাড়না দিচ্ছিল– কিন্তু এতটাই অভাব নয় যে, তিনি কাঙ্গাল কবি বা ভিক্ষুক কবি হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করে ছিলেন। এটির বাস্তবতা হল, তিনি নিজ গ্রামে বসবাসকালীন সময়ে পৈত্রিক সম্পত্তি পেয়েছিলেন এবং বাগানের মালিকও ছিলেন। যে কারণে তাঁর জীবন চলার পথে এত বড় অভাব থাকার কথা ছিলনা।[৬২] স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্তির বিষয়টিও তদ্রুপ যে, পরিশ্রমের প্রাপ্তি মেলা ভাল তবে তা যেন অসম্মানজনক না হয়। নিজামি আরোজি ও অন্যান্য ইরানি ঐতিহাসিকগণ বিষয়টিকে স্বাভাবিকভাকে উপস্থাপন করে তাঁরা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। নিজামি আরোজির মতে, ফেরদৌসি তাঁর রচনাটি বাদশাহ মাহমুদের দরবারে উপস্থিত করলে পুরস্কারের জন্য গ্রহণযোগ্য হয়। বাদশাহ যথাযথ পুরস্কার দিতে আগ্রহী ছিলেন। বিশ হাজার দিরহাম তাঁর নিকট পৌঁছলে তাতে তিনি কষ্ট পান।[৬৩] ঐতিহাসিক ড. যাবিহুল্লাহ সাফা তাঁর অবস্থার পরিবর্তনটি এত বড় করে উপস্থিত করেননি। তাঁর মতামত হল, এই গ্রাম্য জ্ঞানী বুদ্ধিমান ব্যক্তিটির বৃদ্ধাবস্থায় শুণ্যহাতে পরিণত হয়েছিল। যে কারণে কবি তুস নগর থেকে সুলতান মাহমুদের গজনির পথে এগিয়ে যান। তিনি ৩৯৪-৩৯৫ হিজরি সালে সুলতান মাহমুদের সাথে নিবিড় এক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হন। সুলতান মাহমুদের উযির আবুল আব্বাস ফযল বিন আহমাদ ইসফারায়নি ছিলেন সম্পর্ক স্থাপনের অগ্রনায়ক।[৬৪] মুজতবা মিনুভি তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সুলতান মাহমুদের ঘটনাকে অতিরিক্ত করে বর্ণনা করেন নি। বরং *শাহনামা* রচনার পর প্রাপ্তির আশা সম্পর্কে কয়েকটি সম্ভবনার

Dhaka University Institutional Repository


কথা তুলে ধরেন।[৬৫] তিনি এ সময়ে ইচ্ছা পোষণ করে ছিলেন যে, *শাহনামা*কে যেন পরিপূর্ণ করে বাদশার দরবারে উপস্থাপন করা হয়। *শাহনামা* রচনার প্রেক্ষাপটে সুলতান মাহমুদ গজনভির যে কাহিনী তৈরী হয়েছে তা অনেক ঐতিহাসিক অসত্য বলে প্রমাণ করেছেন।[৬৬] ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসে ফেরদৌসির *শাহনামে* রচনাটি অনেক মূল্য রাখে। বাস্তবতা হল এই যে, কবি ৬০ হাজার শ্লোকের এক বিশাল কাব্যগ্রন্থ রেখে যান–বিষয়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

*শাহনামে* প্রাচীন ইরানের বীরত্বগাঁথা ইতিহাস যা কাব্যাকারে রচিত হয়েছে। এ কাহিনীর উৎস হিসেবে *আবেস্তা*, আবু মনসুর ও আবু মুওয়ায়েদ বালখির গদ্য রচনা *শাহনামে*কে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কবি দাকিকি তুসি কাব্যাকারে শাহনামে রচনার হাত দিয়েছিলেন। সমাপ্তের পূর্বেই তিনি গোলামের হাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এত সব ঘটে যাওয়ার পরও কবি ফেরদৌসি কেন পদ্য রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন? হয়তবা তখন ইরানি সমাজ একটি পুরনো ইতিহাস জানার আগ্রহ করেছিল যা পূর্ণভাবে কেউ উপস্থাপন করতে পারেননি। বলতে গেলে সময়ের চাহিদা, নিজের আগ্রহ তাঁকে এ গ্রন্থ রচনায় উদ্বোদ্ধ করে ছিল।[৬৭] তিনি তার মধ্যে নিজস্ব দর্শন, চরিত্রগত বিষয় কাহিনী চিত্রনের মাধ্যমে *শাহনামা*কে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হন। তিনি এ কাব্যটি ত্রিশ বছর অক্লান্ত চেষ্টা ও সাধনার পর সমাপ্ত করেন। অনেকের মতে, তিনি ৩৫ বছর বয়সে *শাহনামা* রচনা শুর করেন এবং শেষ করেন ৭০ বা ৭১ বছর বয়সে। ড. যাবিহুল্লাহ সাফা ৩৭০ হিজরি সালে রচনা শুরুর বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।[৬৮]

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কাব্যসাহিত্যের মধ্যে *শাহনামে* অন্যতম কাব্যরচনা। এ কাব্যের রচনা শৈলী, ভাষা, বৈশিষ্ট- এ সবই সাহিত্যের মানদন্ডে সমৃদ্ধ। এ রচনাটি ইরানের জাতীয় ইতিহাসে গুরুত্ব পেয়েছে এ কারণে যে, কবি ফেরদৌসি যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিশৃংখলা ও রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেও ইরানের অতীতকে চীর সুন্দর ও সজীব করে তুলতে সক্ষম হন। এ রচনাটি শুধু একটি কাহিনীর নাম নয়। এতে যেমন দর্শন আছে তেমনি চরিত্র, প্রজ্ঞা ও বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান বিদ্যমান। এ ছাড়া ইতিহাস ও রূপকথা সমানভাবেই চিত্রিত হয়েছে।[৬৯] বাদশাহ কিউমারস, হোসাঙ্গ, তহমোরস, জামশীদ, জোহাক, ফারীদুন, কায়কোবাদ, কায়কাউস, রোস্তম, কায়খসরু, গোসতাসফ... তাঁদের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী শাহনামার বড় চরিত্র। উল্লেখ্য যে, কোনো পাঠক শাহনামা নিয়ে সামান্য ভাবলে কবি ফেরদৌসির চিন্তা ও মননশীলতার পরিচয় পেয়ে যাবেন। ফেরদৌসির প্রতিটা বিষয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ। কেননা তিনি ছিলেন একজন মহাজ্ঞানী, দার্শনিক ও প্রজ্ঞাবান পুরুষ। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,

Dakha University Institutional Repository


خرد بهتر از هرچه ایزد بداد – ستایش خرد را به از راه داد

خرد راهنمای و خرد دلگشای – خرد دست گیرد به هر دو سرای[70]

–তিনি সব সময় প্রজ্ঞাকে পছন্দ করতেন। এ কারণে যে একজন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি মুর্খ, নাদান ও আকরহীন মানুষকে ভাল হওয়ার চেষ্টা করেন ও তাঁকে অসত্য থেকে বাঁচার সতর্ক করে দেন। তিনি অবজ্ঞতার বিচারে এটিও প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, শাহনামার বিষয়বস্তু প্রজ্ঞাতায় পূর্ণ।

ফেরদৌসির ষাট হাজার বয়েতের *শাহনামে* রচনাটি মধ্যযুগে ভারত-উপমহাদেশের শিক্ষিত সমাজ ব্যতীত প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি বাঙালিদের মধ্যে কখন পৌঁচেছিল, বিষয়টি জানা নেই। তবে প্রসিদ্ধি পাওয়ার পরই বাঙালিদের ঘরে শাহনামার ফারসি বয়েত পাঠ করে শুনানো হত। ফারসি ভাষার *শাহনামে*র পাণ্ডুলিপি বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে বিদ্যমান রয়েছে। বলা যেতে পারে যে, *শাহনামে*র আবেদন বাঙালিদের হৃদয়ে বিশালভাবে স্থান করে নিতে সক্ষম হয়। উল্লেখ্য যে, তাঁর মসনবি রীতির অপর রচনা *ইউসুফ ওয়া জোলায়খা* সম্পর্কেও বাঙালিদের আগ্রহ কম ছিল না। কিন্তু রচনাটি সম্পর্কে ইরানি লেখকগণ দ্বিমতপোষণ করেছেন। নিম্নে মনির উদ্দীন ইউসুফ অনূদিত *ফেরদৌসী শাহনামে* থেকে কবিতা তুলে ধরছি।

সূর্যের মুখের উপর থেকে যবনিকা উঠে গেলে
পূর্ব দিকে উদিত হোল এক স্বপ্নময় আলো।
দুই অপদার্থই সে মুহূর্তে কর্মচঞ্চল হয়ে উঠলো
চোখ থেকে থেকে ধুয়ে মুছে নিলো সমস্ত লজ্জা।[৭১]

## সানাঈ গজনভি (৪৮০ হি.-৫৪৫ হি.)

মহাজ্ঞানী সানাঈ গজনভি ছিলেন গজনভি রাজদরবারের এক উল্লেখযোগ্য কবি। তাঁর মূল নাম; হাকিম আবুল মাজদ মাজদুদ বিন আদম সানাঈ গজনভি। তিনি ষষ্ট হিজরি শতকের একজন শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবেও খ্যাত। এই কবি সুফি ভাবধারায় জীবন-যাপন করতেন বলে ইতিহাসে তিনি একজন সুফি কবি হিসেবেও পরিচিত। কবির জন্মকাল ও জন্মস্থান সম্পর্কে প্রচুর মতভেদ রয়েছে। ড. যাবিহুল্লাহ সাফা তাঁকে পঞ্চম হিজরি শতকের মাঝামাঝি সময়ে গজনিতে জন্মগ্রহণকারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৭২] তাঁর প্রশংসা করে কবিতা গেয়ে যাওয়ার অভ্যাস ছিল। প্রথমে তিনি গজনভি বাদশাহদের প্রশংসায় কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর কবিতার *দিওয়ান* গ্রন্থে সুলতান মাসউদ বিন

Dakha University Institutional Repository

ইব্রাহিম, ইয়ামিন দৌলাহ বাহরাম শাহ বিন মাসউদের প্রশংসায় কবিতা রয়েছে। এ থেকে তাঁর প্রশংসামূলক কাব্য চর্চারবিষয়টি জানা যায়। জীবনের প্রথম দিকে তিনি শুধু ব্যক্তি প্রশংসায় কবিতা রচনা করেছেন। পরে তিনি অনুতপ্ত হয়ে এরফান বিষয়ক কবিতা রচনায় মনোনিবেশ হন।[৭৩] এ কারণে তাঁর কবিতাগুলো দু'টি বিষয়ে বিভক্ত। প্রশংসা ও এরফানমূলক কবিতা।

এ কবির জীবনকাল পরিবর্তনের ব্যাপারে ঐশিক শক্তির প্রভাব থাকার বিষয়টি যৌক্তিক হিসেবে গ্রহণ করা হয়। তাঁকে ভিন্ন জগতে বিচরণের জন্য শরীর ও আত্মা বার বার সতর্ক করে দিচ্ছিল। তিনি যেন নির্জন একাকী বসবাস করে একমাত্র প্রভুর সান্নিধ্যে সময় অতিবাহিত করেন। যে কারণে তাঁর অধিক সময় গজনিতে বসবাস হয়ে উঠেনি। তিনি একা ও নির্জনে বসবাস করার জন্য গজনি পরিত্যাগ করেছিলেন। সে সময় তাঁর খোরাসানে প্রত্যাবর্তনের দিকে দৃষ্টি পড়ে। সেখানে এরফানি জগতের বহু উলামাদের সাহচার্য পান। তাঁর যৌবনকালের বেশ কয়েক বছর বালখ, সারাখস, হেরাত এবং নিশাপুরে অতিবাহিত হয়।[৭৪] এ সময়ে তিনি কাবা শরীফ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করেন। তাঁকে কাবার যিয়ারত এরফানি জগতের চিন্তা চেতনায় শক্তি যোগিয়েছিল। তারপর থেকেই তিনি দুনিয়ার চিন্তা পরিত্যাগ করে এরফানি চিন্তায় মনোনিবেশ করেন। আল্লাহর দিকে মনোনিবেশের পিছনে ভ্রমণকালে আলেম ও আরেফদের সাহচার্য ও পির মাশায়েখদের সাক্ষাতলাভ অনেক ভূমিকা রাখে। এ ছাড়া উস্তাদ আবু ইউসুফ ইয়াকুব হামাদানি ছিলেন তাঁর অন্যতম পথনির্দেশদাতা। এ শেইখের সাহচার্য তাঁকে অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে যায়।[৭৫] যখন তিনি গজনি ছেড়ে খোরাসানে গমন করেন প্রথমে শেইখ আবু ইউসুফ ইয়াকুব হামাদানির সাথে মিলিত হন। সেখানে তিনি একাকিত্ব ও নির্জনে থেকে নিজেকে উৎসর্গ করার পথ গ্রহণ করেন। তাঁরপর থেকে তিনি খোরাসানে একজন সুফিবাদের বড় আলেম হিসেবে পরিচিতি পান।

এ কবির অবদান হিসেবে *দিওয়ান* গ্রন্থটি সাফল্যের পরিচয় বহন করেছে। এতে গজল, কেতা', রুবাই রীতির কবিতায় প্রশংসা, মারাসি, যুহুদ, বিষয়ের আলোচনা রয়েছে। এ *দিওয়ান* কাব্যগ্রন্থে ১৩,৩৪৬ টি শ্লোক পাওয়া যায়। তাঁর *হাদিকাতুল হাকীকাত* (حديقة الحقيقه) রচনাটি সুফিবাদের জন্য একটি উৎকৃষ্টতম রচনা। এটি মসনবি আকারে রচিত হয়। এটিকে *এলাহীনামে* হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। এতে দশটি বাব বা অধ্যায় আছে; তাতে দশ হাজার শ্লোক বিদ্যমান। এ কাব্যগ্রন্থটি সুফিবাদের জন্য একটি উৎকৃষ্টতম রচনা।[৭৬] তিনি এ রচনার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে গভীর প্রেমের পরিচয় দিয়েছেন। সাত শত বয়েতের অপর রচনার নাম *সিয়ারুল উব্বাদ ইলাল*

*মা'দ* (سیر العباد الی المعاد) নামক মসনবি গ্রন্থ। এটিতে মানুষ সৃষ্টির রহস্য, চরিত্র ও প্রজ্ঞা দর্শনের উপর আলোচনা রয়েছে। অপর পাঁচ শত বয়েতের রচনার নাম *কারনামে বালখ* ( کارنامۀ بلخ)। এটিতে তাঁর কৃতিত্বের উপর আলোচনা রয়েছে। তাঁর *তারীকাতুত তাহকিক* (طریقت التحقیق) রচনাটি একটি ছোট্ট কাব্যগ্রন্থ। মৌলভি আকা আহমদ আলি তাঁর *হাপ্ত আসমান* গ্রন্থে অন্য তিনটি মসনবি কাব্যগ্রন্থের কথা বলেছেন। তবে কোন্ তিনটি কাব্যগ্রন্থ সেবিষয়ে নাম উল্লেখ করেননি। এ কবির নামের সাথে *এশকনামে* (عشق نامه ) , *আকলনামে* (عقلنامه), ও *তার্জারবাতুল উলুম* ) (تجربت العلم কাব্যগ্রন্থ সম্পৃক্ত। *বাহরাম ওয়া বেহরুয* (بهرام و بهروز) রচনাটি তাঁর রচনা হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী তাঁর মোট রচনা হল ছয়টি।[৭৭] তিনি ৫২৫ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর রচিত *সানাঈ অবাদ* কাব্যগ্রন্থ থেকে দুটি বয়েত প্রদত্ত হল:

ابتدا می کنم به نام خدا- آن که هست از صفات نقص جدا

اولی آخرو آخری اول- نه ابد خالی است از او، نه اول

در ازل بوده و نبوده و جود- در اباد باشد و بود موجود

আল্লাহর নামে শুরু করছি। যিনি পৃথক সত্তার অধিকারী অদ্বিতীয়। যার প্রথম ও শেষ সবই সমান। শুরুতে যেমনি তেমন সর্বদায় গুণে গুনান্বিত। তাঁর স্থায়িত্ব অস্তিত্ব একই সমান্তরাল। তিনি সবসময় ছিলেন এবং সব সময় থাকবেন।[৭৮]

গজনভি এবং সালযুকি যুগের বেশ ক'জন বাদশাহর রাজত্বের সময়ে কবি সানাঈ বেঁচে ছিলেন। তিনি বিভিন্ন সময়ের ঘটনা, গল্প ও দৃষ্টান্ত, অনুসন্ধান করে চলতেন। কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার পিছনে কী বিষয়টি সাহস যোগিয়েছিল তা পরিস্কার নয়। তাঁর কবিতাগুলো সুফিবাদের সাথে সম্পৃক্ত। সে সময়কালের একজন প্রসিদ্ধ সুফি আহমদ গাজালি তাঁর কবিতা ব্যবহার করতেন। কবিতাগুলোর ভাষা মিষ্টি এবং খুবই সাধারণ। তাতে উপমা, ঘটনা ও চিন্তা, দর্শন– দুটো দিকই রয়েছে।[৭৯] সুফিবাদের কবিতা হিসেবে ষষ্ট হিজরি সালে প্রসিদ্ধি পাওয়া কম গৌরবের কথা নয়। এ ছাড়া ফররুখি সিস্তানি, উনসুরি বালখি, মনোচেহের দামাগানি, মাসউদ সাদ সালমান ও আবু সাঈদ আবুল খায়ের উল্লেখযোগ্য কবি ছিলেন। এই কবির কবিতাও যুগ যুগ ধরে সুফিবাদ ও খোদাপ্রেমিকদের নিকট প্রিয় হয়ে আছে।

## ওমার খৈয়াম (১০১৯ খ্রি.-৫২৭ হি./১১৩৩ খ্রি.)

Dakha University Institutional Repository

ইরানের ইতিহাসে একজন বিজ্ঞ দার্শনিক, সাহিত্যিক ও প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে ওমার খৈয়ামের নাম চির স্মরণীয় হয়ে আছে। নিজস্ব স্বকীয়তা, জ্ঞান বিচক্ষণতা সাহস ও দক্ষতার জন্য তিনি ছিলেন একজন যুগশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। একজন প্রতিভাবান হিসেবে তিনি তাঁর সম-সাময়িকদের থেকে যথেষ্ট সম্মান পেয়েছিলেন। সে সময়ে লোকজন তাঁকে 'ইমাম', 'ফেলসুফ' ও 'হুজ্জাতুল হক' হিসেবে অভিহিত করত।[৮০] তাঁর সময়কালে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ঝগড়া, ফাসাদ ফেৎনা অত্যধিক ছিল। বাতেনি গোষ্ঠীর উদ্ভব ও সুন্নি, শিয়া, আশআরি, মোতাযেলা- বিভিন্ন সময় তর্ক বিতর্কে পরিবেশ উত্তপ্ত করে তুলত। তবে সে সময়েও জ্ঞান বিদ্যার চর্চা ও আলোচনা তাঁদের মাঝে এত বেশি ছিল যে, কখনই সমাজের মানুষ জ্ঞান বিদ্যার আলোচনা থেকে বিমুখ হতোনা।[৮১]

পশ্চিমাদেশে ওমার খৈয়ামকে পছন্দ করেনি এমন মানুষ কমই রয়েছে। ইউরোপ, আমেরিকা এবং এশিয়ায় ওমার খৈয়ামের জন্য একটি আলাদা ভালোবাসা থাকা অনেকাংশেই তাঁর ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। সেই স্থানটি কি বৈজ্ঞানিক ওমার খৈয়াম হিসেবে নাকি কবি হিসেবে তা পরিস্কার নয়। এডওয়ার্ড ফিট জ্যারল্ড তাঁর রুবাইয়াৎ ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করার পর প্রাচ্যের দেশগুলোতে ওমার খৈয়ামের রুবাইয়াৎ নিয়ে বহু হৈচৈ সৃষ্টি হয়। প্রাচ্যবাসীরা রুবাইয়াৎ ভোগ-বিলাস, আরাম-আয়েস, আনন্দ-উল্লাস ও শরাব মাতালের বর্ণনা দেখে কবিকে নাস্তিক ওমার হিসেবে দেখেছেন। অথচ অস্থির পৃথিবীতে তাঁর চিন্তা-চেতনা ছিল সৃষ্টিকর্তার সাথে মিলন ও ভালবাসা। তিনি যেভাবে শরাব ও মাতালের প্রসঙ্গ উপস্থাপন করে রঙ্গিন করে তুলেছেন এটি ছিল তাঁর পৃথিবীর প্রতি অনাস্থা প্রকাশ।[৮২] কাব্য সাধনা যে ইরানীয় জনগণের একটি পৈত্রিক উত্তরাধিকারীসূত্রের ধন তা ভূলে যাওয়া সঠিক হবেনা। সে ধনের মধ্যে কবির জন্ম হয়েছে। বিজ্ঞানের ও জ্ঞানের সাধনাও একটি ইরানি গোষ্ঠীর বড় সম্পদ। ইরানি বর্ষপঞ্জি তৈরির ক্ষেত্রে তাঁর অবদান রয়েছে অনেক। বীজগণিতেও তাঁর অবদানটুকু কম গুরুত্ব রাখে না। তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রেও একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। সে সময় বৈজ্ঞানিক ও জ্যোতিষ- শাস্ত্রবিদ হিসেবে তাঁর ন্যায় আর কেউ সমকক্ষ ছিলনা বলে আমরা জানি।[৮৩] এই পরিসরে আমরা শুধু তাঁর কাব্যসাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করব।

ওমার খৈয়াম নিজে একজন খুবই পরিশ্রমী ও মেধা ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রথমে সেলাই-এর কাজ করে জীবন-যাপন করতেন। অবসর সময়ে নিজেকে একটু তৈরি করতে গিয়ে কবিতা লিখতেন। এটি ছিল তাঁর একটি অভ্যাসগত ব্যাপার। সেই কবিতা তাঁকে নিয়ে পৃথিবীজুড়ে এত আলোড়ন সৃষ্টি করবে, কবি হয়ত তখন ভাবেননি। ইংরেজি, বাংলা, জার্মানি, আরবি, ফরাসি–এসব উল্লেখযোগ্য

Dhaka University Institutional Repository

ভাষায় তাঁর রুবাইয়াৎ অনুবাদ হয়েছে। বাংলা ভাষায় তাঁর রুবাইয়াৎ অনুবাদ করেছেন পঁয়ত্রিশ জনের অধিক ব্যক্তি। তাঁর রুবাইয়াৎ বাংলা সাহিত্যে বিকাশ ঘটেছে। নিম্নে তাঁর রুবাইয়াৎ কাব্যগ্রন্থ থেকে একটি রুবাইয়াৎ তুলে ধরছি:

من می خورم و هر که چو من اهل بود- می خوردن من بنزد او سهل بود

می خوردن من حق ز ازل میدانست- گر می نخورم علم خدا جهل بود

Why, be this juice the Growth of God, who dare
Blaspheme the twisted tendril as a Snare?
A Blessing, We should use it, should we not?
And if a Curse-why, then, who set it there? [84]

কবির রুবাইয়াৎ জিজ্ঞাসা আর প্রশ্নই পৃথিবীর মানুষকে ভাবিয়ে তোলেছে। যেসব জিজ্ঞাসার উত্তর পেতেননা তিনি নিজের কাছে প্রশ্ন রাখতেন। হয়ত তিনি নিজের ভিতর থেকে সে উত্তর পেয়েছিলেন। এ জগতের মানুষের কাছে তাঁর কবিতা প্রিয় কেন? এর কারণও জিজ্ঞাসা কবির রুবাইয়াৎ। আমরা কোথা থেকে এলাম, কোথাইবা আমাদের গমনপথ, কিষের প্রয়োজন- এসব প্রশ্ন কবির ছিল। তাঁর কাব্যসাহিত্য ও দর্শন- এ দুটোই তাঁকে খ্যাতি এনে দিয়েছে।

**<u>প্রসিদ্ধ মসনবি রীতির কাব্য গ্রন্থ</u>**

| লেখক | বিরত্ব ব্যঞ্জক মূলক মসনবি | নৈতিক ও শিক্ষামূলক মসনবি | আধ্যাত্মিক মসনবি | প্রেমমূলক মসনবি |
|---|---|---|---|---|
| ফেরদৌসি | শাহনামে | = | = | লায়লা ওয়া |
| শেখ সাদি | | বূসতান ই সাদি | = | মাজনুন |
| মাওলানা রুমি | | | মাসনাভিয়ে মা'নভি | ০ |
| নেজামি গাঞ্জবি | সেকান্দরনামে | | | খসরু ও শিরীন, লায়লা ও মজনুন |
| আমির খসরু | কিরান উস সাদাইন | | | |
| সানাই গজনভি | | | হাদিকাতুল হাকিকাহ | |
| ফরিদ উদ্দিন আত্তার | | | মানতিকুত তায়ের | |
| মোল্লা জামি | | | | ইউসুফ ওয়া জোলায়খা |

Dhaka University Institutional Repository

## নেজামি গাঞ্জবি (৫৩৫হি./১১৪১খ্রি.-৫৯৯হি./ ১২০৩খ্রি.)

ফারসি কাব্য সাহিত্যের কবি ফেরদৌসি, মাওলানা রুমি, হাফেজ শিরাজি ও শেখ সাদির ন্যায় প্রসিদ্ধ কবি নেজামি গাঞ্জবি। তাঁর আসল নাম ইলিয়াস; পিতার নাম ইউসুফ। এই কবির পুরো নামটি বিভিন্নরূপে বিদ্যমান রয়েছে। যেমন– আবু মুহাম্মদ বিন ইউসুফ বিন মোয়াইয়াদ, আবু মুহাম্মদ ইলিয়াস ইউসুফ বিন মোয়াইয়াদ, আবু মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন আহমদ বিন ইউসুফ, শায়খ জামাল উদ্দিন ইউসুফ বিন মোয়াইয়াদ আরকানজুবি, ইত্যাদি। জামাল উদ্দিন আবু মোহাম্মদ ইলিয়াস বিন ইউসুফ গাঞ্জবি নামটি প্রসিদ্ধ। যে মূল নামেই তাঁকে ডাকা হউক বা কেন তাঁর প্রসিদ্ধি ঘটেছে নেজামি বা নিজামি গাঞ্জবি হিসেবে। তিনি আযারবাইযানের গাঞ্জে বসবাস করতেন বলে তাঁকে গাঞ্জবি বলা হয়।[৮৫] তিনি এখানে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর পূর্ব পুরুষেরা ছিল কোমের অধিবাসী। তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য দিনগুলো সম্পর্কে জানা সম্ভব নয়। বলতে গেলে তাঁর পুরো জীবনকাল লিপিবদ্ধ হয়নি। তবে তিনি জীবনের উল্লেখযোগ্য সময় অতিবাহিত করেছেন নির্জন একাকী সাধনা ও তপস্যায়। একসময় তিনি নিজেকে 'আয়নায়ে গায়েব' অর্থাৎ অদৃশ্যের দর্পণ বলে অভিহিত করেছেন।[৮৬] তাঁর অত্য প্রিয়ভাজন বন্ধু ছিলেন কবি খাকানি। তাঁর সাথে কবিতা, ও বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হত। তিনি বাহবাতুল্য, প্রসংশাকারী ও তোসামোদী কবিদের পছন্দ করতেননা। তিনি সদা স্বাধীন সুন্দর মনে কবিতা রচনা করতে ভালবাসতেন। ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি খাম্‌সা বা পাঞ্জ গাঞ্জ তথা পাঁচটি মসনবির রচয়িতা হিসেবে খ্যাত। মসনবিগুলো হল– *মাখযানুল আসরার* (مخزن الاسرار ), *খাসরু ওয়া শিরীন* (خسرو و شيرين ), *লায়লা ওয়া মাজনুন* (ليلى و مجنون), *হাপ্ত পেয়কার* ( هفت پيكر) এবং *এসকান্দারনামে* (اسكندرنامه)। তাঁর এই মসনবিগুলোতে ত্রিশ হাজার বয়েত রয়েছে।

*মাখযানুল আসরার* তাঁর কবিতা আবৃত্তির প্রথম কাব্যগ্রন্থ। তাতে ৪০টি মাকালা রয়েছে। প্রতিটি মাকালায় ছোট্ট ছোট্ট ঘটনা ও কাহিনী বিদ্যমান। তিনি ঘটনার মাধ্যমে এশ্‌কে হাকীকির রহস্য ও গুড়তত্ত্ব বর্ণনা করেছেন। পুরো মসনবির বিষয়বস্তু এরফানিয়াত ও খোদাতত্ত্ব। এটি তিনি আবৃত্তির ক্ষেত্রে হাকিম সানাঈ –এর অনুসরণ করেছিলেন।[৮৭] এর বয়েত সংখ্যা ২২৬০ টি। এটি তিনি ফখরুদ্দিন বাহরাম শাহের নামে উৎসর্গ করেন। এ রচনার সময়কাল ছিল ৫৭০ হিজরি সন। *খাসরু ওয়া শিরীন* তাঁর দ্বিতীয় মসনবিমূলক রচনা। এতে এক ইরানি শাহযাদির সাথে আরমানি শাহযাদার প্রেমের ঘটনা নিয়ে এশকের বর্ণনা প্রদান করা হয়। কবি নেজামির প্রথম সহধর্মিনী তুর্কি অধিবাসী ছিলেন। এক বছর তাঁর সাথে বসবাসের পর বিয়োগ ঘটে। তিনি তাঁকে চির স্মরণীয় করে রাখার

*Dhaka University Institutional Repository*

জন্য এ গ্রন্থের শেষ দিকে তাঁকে শিরীন নাম উল্লেখ করে সহধর্মিনীর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এটির রচনাকাল ৫৭৬ হিজরি সন। তাতে ৬৫০০ টি বয়েত রয়েছে। তাঁর *লাইলা ওয়া মাজনুন* রচনার একটি প্রেক্ষাপট ছিল। সেসময়ের বাদশাহ তাঁকে আদেশ করেছিল তিনি যেন উভয় ভাষার সম্মিলন ঘটিয়ে এটি রচনা করেন। তিনি এটি ফারসি-কুর্দি ভাষা মিশিয়ে রচনা করেছিলেন। এ কারণে যে, তাঁর মায়ের ভাষা ছিল কুর্দি এবং পিতার ভাষা ছিল ফারসি। তিনি যখন এটি রচনা করেন পিতার ইন্তেকাল ঘটে। এটির রচনাকাল ৫৮৪ হিজরি সন।[৮৮] এতে চার হাজার সাত শত বয়েত পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, কাব্যগ্রন্থের কাহিনীটি আরব দেশের; ইরানীয় নয়। কাহিনিটি তাঁর জন্মের পূর্ব থেকে মানুষের মুখে মুখে শুনা যেত। তিনি এটি কাব্যাকারে রূপ দিয়েছেন।[৮৯] তবে লাইলা মজনুনের প্রেম ঘটনা তাঁর রচনার মাধ্যমেই প্রসিদ্ধি ঘটেছে। পরবর্তী সময়ে মোল্লা জামি ও আমির খসরুর ন্যায় অনেকে তাঁকে অনুসরণ করে উক্ত নামে কাব্য রচনা করেছেন। *হাপ্ত পেয়কার* বা *বাহরাম নামে* বা *হাপ্ত গান্বাদ* রচিত হয় ৫৯৩ হিজরি সনে। এটি বাহরাম গোরের ঘটনাবলি নিয়ে রচিত হয়। তিনি ছিলেন সাসানি যুগের একজন উল্লেখযোগ্য বাদশাহ।[৯০] এতে তাঁর শৈশব ও যুবক কালের ঘটনা ছাড়াও রাজত্বকালের অনেক ঘটনা বর্ণনা দেয়া হয়। বিশেষ করে তাঁর সাতটি মেয়ের ঘটনা স্থান পেয়েছে। এতে ৫১৩৬ টি বয়েত রয়েছে। *এসকান্দরনামে* রচনাটি দুটি খন্ডে বিভক্ত। একটির নাম *সারফনামে* অপরটি *একবালনামে* রাখা হয়। এতে ১০,৫০০ বয়েত রয়েছে।

## নেজামির অনুসরণে মসনবি রচনার নাম

| فیضی | هاتفی | جامی | خسرو | نظامی |
|---|---|---|---|---|
| مخزن الادوار | شاه نامه | تحفت الاحرار | مطلع الانوار(698ه) شمارۂ بیت- 3310 | مخزن الاسرار(582ه) |
| سلیمان و بلقیس | خسرو و شیرین | یوسف زلیخا(888ه) | شیرین و خسرو(698ه) شمارۂ بیت- 4124 | خسرو و شیرین |
| نل و منتی | لیلی و مجنون | لیلی و مجنون(889ه) | مجنون و لیلی(699ه) شمارۂ بیت- 2660 | لیلی و مجنون |
| مرکز ادوار | طیمر نامه | خرد نامۂ اسکندری(890ه) | آینۂ سکندری(699ه) شمارۂ بیت- 4450 | سکندر نامه |
| هفت کشور | هفت نظر | سلسلت الذهب | هشت بهشت(701ه) | هفت پیکر |

Dhaka University Institutional Repository


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | شمارہ بیت- 3350 | |

কবি নেজামির খামসা বা পাঁচটি মসনবিমূলক কাব্যগ্রন্থ ভারত-উপমহাদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তাঁর মসনবিগুলোর অনুসরণ করে প্রথমে ফারসি ভাষায় কবিতা রচনা করেন ভারতের অধিবাসী কবি আমির খসরু। তাঁকে অনুসণ করে উর্দু ভাষায় ও বহু কবিতা রচিত হয়। ভিন্নভাষীরা তাঁর কবিতা গ্রহণ করেছিলেন এটি তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের বড় প্রমাণ। তাঁর রচনায় প্রশংসার চেয়ে বাস্তবতা ও ঘটনা বেশি প্রতিফলিত হয়েছে। ঘটনা ও কাহিনী কাব্যকারে রূপদানের জন্য ফারসি সাহিত্যে তাঁকে একজন কাহিনী কাব্যকার হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়।[৯১] তাঁর বড় বৈশিষ্ট্য হল যে, তিনি কোনো কবিতা অন্য কবির কবিতা অনুসরণে রচনা করেননি। তাঁর উপর অন্য কোন কবির প্রভাব পড়েছে– এমনটিও নয়। ভিতরের যে জ্ঞান, মেধা ও প্রতিভা ছিল তা তাঁকে উজ্জ্বল ও আলোকিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর ভিতর জাতিসত্তা, দেশপ্রেম, দর্শন– প্রচন্ডভাবে বিদ্যমান ছিল।[৯২] এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ফলে তাঁর বহু অনুসারী সৃষ্টি হয়। খাজো কিরমানি, আমির খসরু দেহলবি, হাফেজ শিরাজি, সায়েব, বেদিল প্রমুখ কবিগণ তাঁর অনুসরণ করে কবিতা রচনা করেছেন। এ কবির *হাপ্ত পেয়কার* থেকে দু'টি বয়েত তুলে ধরছি।

ای خرد دیده بود خویش از تو- هیچ بودی نبود پیش از تو

در بدایت بدایت همه چیز - در نهایت نهایت همه چیز

হে বুদ্ধি প্রজ্ঞা তুমি কি কিছু দেখতে পেয়েছ, তোমার সম্মুখে কিছুকি দেখার মত ছিল। তোমার শুরুতেও রয়েছে অনেক দেখার এবং শেষেতে রয়েছে অনেক কিছু।[৯৩]

## ফরিদ উদ্দিন আত্তার (৫১৩ হি.-৬১৮ হি./১২২১ খ্রি.)

শেইখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার মোংগলীয় যুগের সুফিবাদ ধারার অন্যতম শ্রষ্ঠ কবি। তাঁর পিতার নাম আবু বকর ইব্রাহিম বিন ইসহাক। তিনি ছিলেন নিশাপুরের একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ি। যদিও তিনি জ্ঞান দক্ষতার বিচারে কোন কবি বা উস্তাদ ছিলেননা। তবে আধ্যাত্মিক বিষয়ে তাঁর প্রচুর জ্ঞান ছিল। হযরত কুতুবে আলম কুতুব উদ্দিন হায়দার ছিলেন তাঁর আধ্যাত্মিক পির বা উস্তাদ।[৯৪] সে সুবাদে আত্তার শৈশব থেকেই আধ্যাত্মিক ব্যক্তিদের সুন্দর কথা ও বক্তব্যের প্রতি মনোযোগী ছিলেন। তিনি আধ্যাত্মিক ব্যক্তিদের সান্নিধ্য পেতে কোন রকম দ্বিধাবোধ করতেননা। তিনি মাত্র তের বছর বয়সে সুফিদের দর্শনলাভের জন্য নিজ এলাকা থেকে মাশহাদে ভ্রমণ করেন। এভাবেই সুফিদের প্রতি ভালবাসা ও সুফিতাত্ত্বিক জ্ঞান নিজের হৃদয়ে স্থান করে নেয়। তাঁর শিক্ষা জীবনের দিনগুলো ছিল একেবারেই সাধারণ ও সাদাসিধে। নির্ধারিত ব্যক্তি বা একইস্থান থেকে তাঁর শিক্ষালাভ ও

Dhaka University Institutional Repository


জ্ঞানচর্চালাভ হয়ে উঠেনি। পাঠ-শিক্ষার প্রতি তাঁর কোনো রকম আগ্রহ ছিলনা বললেই চলে। তাঁর বিভিন্ন ব্যক্তিদের মাযার জেয়ারত ও ভ্রমণ অভ্যাস ছিল প্রবল। পারস্যের বিভিন্ন জায়গা ছাড়াও তিনি সৌদি আরব, মিসর, সিরিয়া, তুরস্ক ও ভারতের বিভিন্ন ধর্মীয় স্থানে ভ্রমণ করেন।[৯৫] এ সময় তিনি সমাজের জ্ঞানী, ও সুফিদের নিকট থেকে বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তৎকালে নিশাপুরে জ্ঞান-বিদ্যার যে কেন্দ্র ছিল সেখানেও তিনি জ্ঞানী ও সুফিদের থেকে শিক্ষালাভ করেন। ডাক্তারি বিদ্যায়ও তাঁর জ্ঞান সম্পর্কে নির্দিষ্ট বিশেষজ্ঞ কে ছিলেন তা কোথাও উল্লেখ নেই। তিনি যে দু'টি গ্রন্থ রচনা করেছেন তাতে ডাক্তারি পেশার কথা উল্লেখ পাওয়া যায়।[৯৬] এক পর্যায়ে তিনি রোগীদের দেখাশোনা ও ডাক্তারি পেশায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। তবে সবকিছুর উর্ধ্বে সুফিসাধনা ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই সাধনাবলের মাধ্যমে তিনি সুফিবাদের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা লাভ পেয়েছিলেন। সে শিক্ষার কারণেই তিনি রচনায় সুফিবাদের বিষয়গুলো বনর্ণনাদানে সক্ষম হন।

ফরিদ উদ্দিন আত্তার নিশাপুরে সাধারণের মাঝে একজন দোকানদার এবং রোগীসেবক হিসেবেই পরিচিতি ছিলেন। তিনি কিভাবে লেখাপড়ায় এত বিশাল জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন, তা কখনও নিশাপুরের সাধারণ মানুষ অবহিত ছিলনা। নিজের রচনায় সুফিতত্ত্বের বিষয়গুলো কীভাবে বর্ণনাদানে সক্ষম হন, সে বিষয়টিও অনুদঘাটিত থেকে যায়। একমাত্র আধ্যাত্মিক শক্তিবলে বিশাল জ্ঞানের অধিকারী হওয়াটা একটি বিস্ময়কর ব্যাপার। আত্তারের জীবনে জ্ঞান আহরণের সাথে সুফিচর্চার সম্পৃক্ততা শৈশব থেকেই ছিল। শৈশব থেকেই সুফিভাব ও সুফিজ্ঞান নিজের ভিতর স্থান করে নেয়। আত্তার যে সুফিধারার একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন তা বিশাল জ্ঞানের অধিকারী থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়।[৯৭] তিনি ব্যবসার কাজে ও রোগী দেখার সময়েও সুফিধারার –*মুসীবতনামে* ও *এলাহীনামে* দুটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। দু'টি কাব্য গ্রন্থে সুফিবাদের বিষয় যথাভাবে আলোচনা হয়েছে যা অনেক গুরুত্ব রাখে। ফারসি কাব্যসাহিত্যে তাঁর অবদান তাঁকে অধিক বেশি পরিচিতি করে তুলেছে। জীবন ক্ষেত্রে সর্বদায় সুফিবাদ বিষয়টি সম্পৃক্ত থাকার কারণে তাঁর সব রচনা সুফিবাদমূলক হিসেবে স্বীকৃতি পায়। একটি গদ্য রচনা ব্যতীত সবগুলোই তাঁর পদ্য রচনা। গদ্য রচনাটি কাহিনীনির্ভর সুফি-দরবেশদের নিয়ে রচিত হয়। এটির নাম *তাযকিরাতুল আউলিয়া*। এ গ্রন্থে সাতানব্বই বা বাহাত্তর জন আধ্যাত্মিক ব্যক্তির জীবন কাহিনী স্থান পেয়েছে। গ্রন্থে পুরনো ফারসি গদ্য রীতি প্রয়োগ করা হয়। সুফিদের সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল বলে সুফিদের কাহিনী লিপিবদ্ধ করতে তিনি ভুলে যাননি। বলা বাহুল্য, সুফিদের বিভিন্ন ঘটনা তাঁকে এরূপ রচনা লিখতে উৎসাহিত করেছিল।[৯৮] তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থের নাম *মানতেকুত তায়ের*। রচনাটি এশ্‌কে এলাহি তথা খোদা প্রেমের

Dhaka University Institutional Repository

অপুরন্ত জ্ঞান ভাণ্ডার। এটিতে সুফিবাদ সম্পর্কে যথেষ্ট ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। রূপক আকারে পাখিদের বর্ণনার মাধ্যমে প্রেমের সাতটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়। সতর্কথার সাথে এশকের বর্ণনা শুধু যে খোদাপ্রেমিকদের আকৃষ্ট করবে এমনটি নয়। রচনাটি পাঠ করলে যে কাউকে আকৃষ্ট হতে সক্ষম। অপর যে গ্রন্থগুলো সমধিক পরিচিত তন্মধ্যে *দীওয়ান(دیوان)*, *আসরারনামে(اسرارنامه)*, *এলাহীনামে(الهی نامه)*, *মুখতার নামে(مختار نامه)*, *মুসীবাতনামে* (مصیبت نامه) উল্লেখযোগ্য। প্রতিটি কাব্যগ্রন্থে তিন হাজারের অধিক শ্লোক রয়েছে। সব মিলে তাঁর শ্লোক সংখ্যা পঁয়তাল্লিশ হাজারের কাছাকাছি। তাঁর রচনাগুলো মানবিক শাখার সাথে সম্পৃক্ত থাকায় সাধারণের মধ্যেও পাঠের আগ্রহ রয়েছে প্রচুর। বিশেষত তাঁর '*মানতেকুত তায়ের*' (منطق الطیر) রচনাটি ফারসি কাব্যসাহিত্যে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। তিনি ১১৪ টি রচনা লিখেছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর *পান্দনামে* একটি আদর্শবাদী রচনা। এটি এমনই বস্তু যে, পাঠ বা শোনার ইচ্ছে করলে ব্যক্তির চরিত্র ও মন-মানসিকতার পরিবর্তনে সহায়ক হবে। এই কবির মসনবি রচনাগুলো ঘটনা ও গল্প- কাহিনীর মাধ্যমে পূর্ণতা দিয়েছে।[৯৯] বর্ণনার পদ্ধতি ও বিবরণ সূক্ষ্ণ ও রুচিদায়ক। তাঁর ঘটনা বলার উদ্দেশ্য হল, পাঠক ও শ্রোতার মনে দ্রুত রেখাপাত সৃষ্টি করা।

আত্তারের শ্রেষ্টত্ব তাঁর এরফানি গজল। বিশ্বে পরিচিত হওয়ার পিছনে তাঁর এরফানি গজলগুলো বিশেষভাবে অবদান রেখেছে। তিনি যে চিন্তা-চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন তা কবি সানাঈ এর চেয়েও উর্ধ্বে ও প্রাঞ্জলময়ী।[১০০] কবিতায় এশক এলাহির বর্ণনা এতই সহজ ও সরল ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যে, কবিতায় পথিক তাঁর পথ অন্বেষণে বিচ্যুতি হবেনা। সেখানে প্রয়োজন হবে শুধু পথিকের পথচলার।

## মাওলানা রুমি (৬০৪ হি./ ১২০৭ খ্রি.-৬৭২ হি./১২৭৩ খ্রি.)

সুফি ভাবধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি জালাল উদ্দিন মাওলানা রুমি (৬০৪ হি.-৬৭২ হি.)। তাঁর *দিওয়ান* (دیوان) ও *মাসনাভিয়ে মা'নভি* (مثنوی معنوی) উল্লেযোগ্য কাব্যরচনা। এ দু'টি রচনায় এশকে এলাহি তথা খোদা প্রেমের মহিমা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর *মসনবি* কাব্যগ্রন্থে পঁচিশ হাজার বয়েত পাওয়া যায়। বয়েতগুলো আলোকবর্তীকা হিসেবে আল-কুরআন ও হাদিসের প্রতিনিধিত্ব করছে। এতে মানবীয় গুণাবলি সম্বলিত ঘটনা রূপক কাহিনী ও উপমা আকারে উপস্থাপন করা হয়। বর্ণনার ধারা-পদ্ধতিও ফারসি ভাষার অপর কাব্যগ্রন্থের চেয়ে ভিন্ন। পুরো স্থানে আল-কুরআনের আয়াত ও হাদিসের আলোচনা বিদ্যমান রয়েছে। এতে মোট পাঁচ শত আটাশটি আয়াত এবং সাত

শত পঁয়তাল্লিশটি হাদিস রয়েছে। তাতে বিভিন্ন শিরোনামে কাহিনী রয়েছে চার শত ত্রিশটির অধিক।[১০১] বলা যেতে পারে যে, পৃথিবীর অন্যান্য রচিত গ্রন্থের চেয়ে এ গ্রন্থের ভাষা ও আবেদন ভিন্ন। প্রতিটি দপ্তর বা খণ্ডের সূচনায় জালাল উদ্দিন রুমির একটি ছোট্ট ভূমিকা আছে। ভূমিকাটি তিনি নিজে রচনা করেছেন। তাঁর এ মসনবিটি সম্পন্ন হতে দশ বছর সময় অতিক্রান্ত হয়। এটির বিষয় আধ্যাত্মিকতা, প্রেম-সাধনা, প্রেমের আকর্ষণ এবং মানুষ ও মনুষত্ব। মুসলমানদের নিকট এটি *মসনবি শরীফ* তথা 'আল-কুরআনের ভাষ্য' গ্রন্থ হিসেবে পরিচিত।

মরমি সুফি কবি হিসেবে খ্যাত এ কবির জন্মলাভ হয়েছিল ঐতিহ্যমন্ডিত সম্ভ্রান্ত পরিবারে। বংশপরম্পরায় তিনি আবু বকর (রা.) এর বংশধর। তাঁর পিতা বাহা উদ্দিন ওলাদ এবং দাদা আহমদ খতিবি উভয়েই ছিলেন জ্ঞানসাধক ও সুবক্তা। তিনি বালখে জন্মগ্রহণ করে সেখানে জীবনকাল অতিবাহিত করেননি। তিনি পাঁচ বছর বয়সে পিতার সাথে নিজ জন্মভূমি ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হন। তাঁর স্থানান্তরের কারণ হিসেবে সে সময়ের মোঙ্গলীয় রাজনৈতিক অস্থিরতাকে দায়ি করা হয়।[১০২] সুলতান মুহাম্মদ খাওয়ারেযম শাহ এ পরিবারের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেননা। তখন পিতা বাগদাদ হয়ে মক্কা ও দ্বীপপুঞ্জ এলাকায় বসবাস শুরু করেন। নয় বছর মুলতিয়া নামক স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করার পর সুলতান আলাউদ্দিন কায়কুবাদের আমন্ত্রনে তুরস্কের কৌনিয়ায় পাড়ি জমান। তখনকার সময়ে এশিয়া মাইনর এর অর্ন্তভুক্ত কৌনিয়া ছিল একটি প্রাণবন্ত শহর। বর্তমানে যাকে আমরা তুরস্ক বলি এটির নাম ছিল রোম। তিনি সেকারণে মাওলানা রুমি হিসেবেও পরিচিত।[১০৩] অতপর সেখান থেকে পুনরায় বালখে ফিরে আসেননি। তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলো তুরস্কের কৌনিয়ায় অতিবাহিত হয়।

এই সুফি কবির জীবন আলোচনা ক্ষুদ্র পরিসরে বেমানান। তাঁর মসনবি রচনার ক্ষেত্রে কি বিষয়টি প্রভাব রেখেছে একটি অলোচনার বিষয়। ছাব্বিশ হাজার বয়েত সম্বলিত ছয় দপ্তরের বিশাল কাব্য গ্রন্থ নিশ্চয়ই একদিনে মাওলানা রুমির হৃদয়ে আবিস্কার হয়নি। এটি প্রকাশের একটি মাধ্যম বা ভাবাবেগ ছিল। যে কারণে মাওলানা রুমির ভিতর থেকে সবচেয়ে মূল্যবান সুফিবাদী কথামালা অনবরত বের হয়। তাঁর সুযোগ্য পির ছিলেন শামস উদ্দিন তাবরেজি। এই পির তাঁকে একজন আলেম, সুবক্তা ও সুফিতে পরিণত করেছেন। তাঁকে একজন খাটি মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পীরের অবদান অনেক।[১০৪] শামস উদ্দিন তাবরেজি মাওলানা রুমির উপর যে প্রভাব রেখেছেন তা হল জগতে আলো বিকিরণ করণের যাবতীয় মশলার যোগানদাতা। এ বিষয়ের গবেষকগণ একমত যে,

মসনবি রচনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে শাগরীদ হুসসাম উদ্দিনের ভূমিকাই প্রধান। হুসসাম উদ্দিনের শরীর, আত্মা একজন প্রকৃত মানুষ হতে যা প্রয়োজন সবই তৈরি হয়েছিল। তবে প্রকৃত ঘটনা হল এই যে, তখন সময়ের একটি দাবি ছিল যেন একজন মানুষের আগমনে পৃথিবী পূর্ণতা পায়। সে পূর্ণতায় সকলে লাভবান হওয়ার জন্যই *মাসনাভিয়ে মানুভির* সৃষ্টি। গ্রন্থটির আবেদন এত তাড়াতাড়ি ভারতীয় উপমহাদেশে প্রভাব রাখাটা একটি ঐতিহ্যগত বিষয়। কেননা, গ্রন্থটির বিষয়ের দিক দিয়েও মিশ্রণ রয়েছে প্রচুর। ভারতীয়, ইরানীয়, গ্রীক, রোমীয় ঘটনা তাতে বিদ্যমান। স্বভাবত এ অঞ্চলের অধিবাসীদের মাঝেও একাকী ও নির্জনবাসের প্রবণতা রয়েছে। তাঁরা সুফিদের ন্যায় জীবন যাপনে আগ্রহী। ফলে গ্রন্থটি দ্রুত ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে।[১০৫] এ গ্রন্থের আবেদন শুরু থেকে শেষ অবধি প্রেম। এ প্রেম কেন? বহু প্রশ্ন রয়েছে তাঁর এ মসনবি কাব্যগ্রন্থে। তাঁর প্রেমের যন্ত্রণা বিভিন্নভাবে মসনবিতে ব্যক্ত হয়েছে। মধ্যযুগের মুসলমানরা এ গ্রন্থের অনুবাদ করেননি। এটির কারণ ছিল, তখন সাধারণ মানুষও মসনবির পাঠক ছিলেন। এ গ্রন্থটি সবাই খুব যত্নসহকারে পড়তেন। এ ছাড়া এ গ্রন্থের প্রতি শ্রদ্ধা রাখার কারণে অনুবাদের প্রশ্ন ওঠেনি।

এ কবির রচনাগুলো নিম্নরূপ: ১. *কুল্লিয়াতে শামস* (كليات شمس) ২. *মাসনবিয়ে মানুভি* (مثنوی معنوی) ৩. *রুবাইয়াতে মৌলাভি* (رباعيات مولوی), ৪. *ফিহে মা ফি* (فيه ما فيه), ৫.*মাজালিসে সাবআ* (مجالس سبعه) ও ৬. *মাকাতীব* (مکاتيب) প্রভৃতি। নিম্নে মনিরউদ্দীন ইউসুফকৃত *রুমীর মসনবী* গ্রন্থ থেকে মসনবি ও অনুবাদ দেয়া হল।

মূল– হর্ কিসে গর্ তাআতে পেশ আওরন্দ্ - বহ্রে কুর্বে হযরতে বে চুঁ চন্দ্
তু তকর্রব্ জুব । আক্ল ও সির্রে খেশ- নে চু ঈঁশা বর্ কালাম ও বির্রে খেশ।

অনুবাদ মানুষ বিভিন্ন রকম আনুগত্য দ্বারা যখন নিরাকার প্রভুর নৈকট্য লাভে অগ্রসর হয়,
তখন তুমি স্বীয় আত্মার রহস্য ও জ্ঞানের নিকটবর্তী হও, তাঁদের মতো উৎকর্ষ
ও গুণাবলীর উপর নির্ভর করিয়ো না।[১০৬]

মাওলানা রুমির দর্শন সকল ধরণের মানুষের উপর প্রভাব ফেলেছে আশাতীত। তাঁর বাণীগুলো পরমসত্তা ও চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁকে যুগ যুগ ধরে মানুষ বক্ষে ধারন করে রাখবে।

## শেখ সাদি (১১৭৫ খি.- ৬৯২ হি./১২৯৩ খ্রি..)

ফারসি সাহিত্যে নীতিধর্মী কবিতা রচনার জন্য খ্যাত হয়ে আছেন মুসলেহ উদ্দিন শেখ সা'দি শিরাজি। বাল্যকালেই পিতার মৃত্যু ঘটলে তিনি নিরুপায় হয়ে পায়ে হেটে বাগদাদে যান। সেখানে সা'দ বিন যাঙ্গী এক ধনী ব্যক্তির সহযোগিতায় শিক্ষার সুযোগ লাভ করেন। এখানেই তাঁর শৈশব ও

Dakha University Institutional Repository

শিক্ষাজীবনের উল্লেখযোগ্য সময় অতিবাহিত হয়।[১০৭] বিশ বছর বয়সে তিনি কবিতা আবৃত্তি ও চর্চায় মনোনিবেশ করেন। ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে হালাকু খান যখন বাগদাদ আক্রমণ করেন তখন তিনি তাঁর বিরুদ্ধে কবিতা রচনা করেছিলেন। সেসময় তিনি বাগদাদে থাকাটা নিরাপদ মনে করেননি। এ সময় প্রথমে তিনি মক্কায় গমন করেন তারপর তিনি শিরাজে চলে আসেন। উল্লেখ্য যে, শেখ সাদি শৈশব থেকেই কঠিন পরিশ্রমী ছিলেন। তিনি পায়ে হেটে একাধিকবার হজ্জ ও বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেছেন।[১০৮] তাঁর ভ্রমণের দেশগুলো ছিল ভারত-উপমহাদেশ, আরব, মিশর, সিরিয়া, জেরুজালেম ইত্যাদি দেশের উল্লেখযোগ্য স্থান ও শহর। দেশ ভ্রমণকারী হিসেবে তাঁর নাম অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। এই কবির জীবনকাল তিনভাগে বিভক্ত রয়েছে। প্রথম ত্রিশ বছর জ্ঞান অণ্বেষন ও শিক্ষা গ্রহণ, দ্বিতীয় ত্রিশ বছর ভ্রমণ ও অভিজ্ঞতা এবং শেষের সময়গুলো গ্রন্থ রচনা ও নির্জন উপাসনায় ব্যায় হয়।[১০৯] ইরান বিষয়ক ঈ. জি. ব্রাউন বলেন,

> When Sa'di is described (as he often) as essentially an ethical poet, it must be borne in mind that, correct as this view in a certain sense undoubtedly is, his ethics are somewhat different from the theories commonly professed in Western Europe.[১১০]

সাহিত্যের মানদন্ডে তিনি এতটাই উপরে যে, সকলেই তাঁকে একজন ব্যতিক্রমধর্মী সাদি হিসেবে জানেন। তাঁর সাহিত্যকর্ম শুধু যে নৈতিকতার জন্যই প্রসিদ্ধি পেয়েছে তা নয়। তিনি বহুগুণের অধিকারী বাস্তবমুখী ব্যক্তি ছিলেন। যে গুণগুলো তাঁর সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। তাঁর কদর ইরান থেকে সমগ্র জগতে প্রসার পাওয়ার কারণ পরিশ্রম, জ্ঞান ও সুস্থ চিন্তা-চেতনার বিকাশ। তাঁর রচনাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল *গোলেস্তান* (گلستان) ও *বুস্তান* (بوستان) । এ দু'টি রচনা জীবনের দীর্ঘ সময়ের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে রচিত হয়। এ গ্রন্থ সম্পর্কে ঈ. জি. ব্রাউন বলেন, I have spoken almost exclusively of Sa'di's most clebrated and most popular works, the *Gulistan* and the *Bustan,*[১১১] ইসলাম ধর্মের উজ্জ্বল দিকগুলো বিকশিত করার জন্য যে সব গ্রন্থ ইসলামি বিশ্বে পরিচিত হয়ে আছে তন্মধ্যে *গোলেস্তান* অন্যতম। অনেক দেশেই শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্য হিসেবে তাঁদের পাঠ তালিকায় অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। মুল ফারসি ভাষার এ গ্রন্থটি বিশ্বের অনেক ভাষায় অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা হয়েছে। তেমনি বাংলা ভাষায় একাধিক ব্যক্তি অনুবাদ করেছেন। সাদির জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা, চিন্তা চেতনা ও উজ্জ্বল দিকগুলো এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। চলার পথে অসংখ্য ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভ, বিভিন্ন স্থানের নিদর্শনাদির উপর দৃষ্টিদানের পর যে ফল আত্নপ্রকাশ হয় সেটি তিনি এ গ্রন্থে স্থান করে দিয়েছেন। তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, মারেফাত ইত্যাদি বিষয় গ্রন্থে স্থান করে নেয়।[১১২] ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসে এ দুটি রচনার ন্যায় কেউ দক্ষতা দেখাতে পারেননি। তাঁর *কুল্লিয়াতে সাদি* ও *পান্দনামে* অন্যতম রচনা। গজল রচনায় তিনি ছিলেন অন্যরকম

Dhaka University Institutional Repository

পারদর্শী ব্যক্তি। তবে ছোট্ট শ্লোক ও গজলের মাধ্যমে তিনি ইসলাম ধর্মের পবিত্রতাকে স্থান করে দিতে সক্ষম হন। নিম্নে একটি শ্লোক দেয়া হল:

پسری را پدر وصیت کرد- کای جوانمرد یاد گیر این پند

هر که با اهل خود وفا نکند- نشود دوست روی و دولتمند[113]

অর্থাৎ-পুত্রকে পিতা নছিহত করলেন, হে যুবক আমার এ নছিহত গ্রহণ কর। যে ব্যক্তি নিজের আপন লোকের সাথে যথার্থ ব্যবহার করে না সে কখনও বাহ্যত বন্ধু ও জ্ঞানি হবে না।

## আমির খসরু (৬৫১ হি.-৭২৫হি./১৩২৪ খ্রি.)

ইরান, বালখ, তুরস্ক ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ফারসি কাব্যসাহিত্য গুণগত মানের দিক দিয়ে কতটুকু উন্নত ছিল- সে প্রশ্ন কারও মনে উদিত হওয়া শোভনীয় নয়। তবে ইরানীয়দের মাঝে ভারতীয় অঞ্চলের ফারসি সাহিত্য সম্পর্কে সন্দেহ থেকে যেত। ইরানের কবিরা ভারত অঞ্চলের ফারসি কবিতাকে তাঁদের সমকক্ষ ভাবতো না। দীর্ঘ সময় ধরে দুই দেশের মাঝে একটি ব্যাবধান কাজ করে আসছিল। আমির খসরুর লেখনীর মাধ্যমে সে ব্যবধানের অবসান ঘটেছে। একমাত্র কবি আমির খসরু ছিলেন তাঁদের দৃষ্টিতে সমমানের কবি। কবি হফেজ শিরাজি তাঁর কবিতায় কবি আমির খসরুকে 'তোতা পাখি' বলে অভিহিত করেছেন। সম্ভবত সেই থেকে ইরানের কবিরা ভারতের কবিদেরকে মূল্যায়ন করতে শিখেছে। এ কবি ভারতের মোমেনাবাদে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর পিতা ছিলেন ভিন্ন অঞ্চলের বালখের অধিবাসী। চেঙ্গিশ খানের সময়ে পিতা আমির সাইফুদ্দিন মাহমুদ মোমেনাবাদে পাড়ী জমান। এখানেই কবির জন্মলাভ ঘটেছে।[১১৪] এ কবি সম্পর্কে ভারতবাসীর মন্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতের হিন্দুরাও স্বীকার করে নিয়েছেন যে, একমাত্র আমির খসরু আবুল কাশেম ফেরদৌসির ন্যায় ভারতবাসীকে জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভারতীয়দের যে ভাষা দক্ষতার ক্ষমতা আছে তা তিনি স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি মূলত ভারতীয় জাতির পরিচয়ে ফারসি কবিতাকে শক্তিশালী করে তুলেন।[১১৫]

আমির খসরু দেহলবি (৬৫১ হি.-৭২৫ হি.) মধ্য এশিয়ার একজন প্রসিদ্ধ ফারসি কবি। যার চারটি ভাষায় সমান দক্ষতা ছিল এবং তিনটি ভাষায় কাব্য সাহিত্য রচনা করেছেন। সাহিত্য বিদ্যায় তিনি একজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি বলা যায়। সমকালীন যুগে গদ্যে বা পদ্যে তাঁর ন্যায় দ্বিতীয়টি সাহিত্য দক্ষতার প্রমাণ মিলেনা। তিনি কবিতা রচনার ক্ষেত্রে কবি সানাঈ এবং খাকানির দর্শন অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর দশটি মসনবি রীতির কাব্য গ্রন্থ রয়েছে। ঐতিহাসিকমূলক মসনবিগুলো নিম্নরূপ:

*কিরানুস সা'দাইন* (قران السعدين), *মিফতাহুল ফুতুহ* (مفتاح الفتوح), *দৌলারাণী খিজির খান* (دولرانى خضرخان), *নুহ সেপাহার* (نه سپهر), *তুঘলুক নামে* (تغلق نامه) প্রভৃতি। তিনি অন্য পাঁচটি মসনবি রচনায় কবি নেজামির পথ অনুসরণ করে রচনা করেন। রচনাগুলো হল : *মাতলাউল আনওয়ার* (مطلع الانوار), *শিরীন ওয়া খাসরু* (شيرين و خسرو), *মাজুনন ওয়া লায়লা* (مجنون و ليلى), *অয়নায়ে এসকান্দারি* (آينهٔ اسكندرى), *হাস্ত বেহেশ্ত* (هشت بهشت) ইত্যাদি।[১১৬] তাঁর এই কবিতাগুলোর ভাষা খুবই শ্রুতিমধুর এবং কাহিনী চিত্তাকর্ষক। এই পাঁচটি মসনবির বয়েত সংখ্যা ১৭,৯২৬টি। এ ছাড়া তাঁর পাঁচটি *দিওয়ান* রয়েছে। যথা: ১. *তুহফাতুস সিগার* (تحفت الصغر ), ২. *ওয়াসতুল হায়াত* (وسط الحيات) , ৩. *গুররাতুল কামাল* (غرت الكمال), ৪. *বাকিয়ে নাকি* ( بقيهٔ نقيه), ৫. *নেহায়েতুল কামাল* (نهايت الكمال) প্রভৃতি। তাতে বিভিন্ন রীতির কবিতা বিদ্যমান রয়েছে।

আমির খসরু ক্লাসিক ধারার কবি হিসেবে পাক-ভারত উপমহাদেশের একজন বিখ্যাত কবি যা পূর্বে উল্লেখ হয়েছে। বিশেষ করে তিনি একটি স্টাইল বা কাব্যরীতির উদ্ভাবক যা ভারতীয় স্টাইল হিসেবে খ্যাত। এই কবির জন্য এটি কম গৌরবের নয়। তাঁর মেধা ও কাব্য শক্তির পরিচয় তাঁর এই কাব্যরীতি। তিনি ফারসি সাহিত্যে কবি প্রতিভার জন্য 'তুতিয়ে হিন্দ' স্বীকৃতি পেয়েছেন। তিনি কাব্যের গুরু হিসেবে কবি নেজামিকে গ্রহণ করলেও তাঁর মাঝে নতুনত্ব ছিল। কবি নেজামি যেমনিভাবে একটি সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ মসনবি রীতিতে রচনা করেছেন। রচনাগুলো সম্পন্ন করে তিনি ইন্তেকাল করেন। সে হিসেবে তিনি সৃষ্টিশীল ও গুনগত মানের কবি হওয়ার দাবীদার। খসরু একইভাবে তাঁর অনুসরণ করে অতি অল্প সময়ে পাঁচটি মসনবি রীতির কাব্যরচনা সমাপ্ত করেছেন যা এটি কাব্য সাহিত্য রচনার জগতে তুলনাহীন। মূলত তিনি কাহিনী ফুটিয়ে তুলার ক্ষেত্রে একটি ভূমিকা পালন করেছেন যা প্রশংসনীয়।[১১৭] তিনি শব্দ নির্বাচন ও শব্দ অলঙ্কার এবং ভাষার চলমানতার প্রতি উদার ছিলেন। তবে তাঁর কাব্যরচনাগুলোতে তুলনামূলকভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে তিনি পৃথক করে অন্য বিষয়ের প্রতি ধাবিত হননি। তাঁর রচনায় মূল বিষয়টি যথাভাবে সাহিত্যের ভঙ্গিমায় প্রকাশ পেয়েছে।

## হাফেজ শিরাজি (৭২৬ হি./১৪৪০ খ্রি.- ৭৯২ হি./১৩৯০ খ্রি.)

বাংলাভাষী অঞ্চলে যে কবির গুণগান সবসময় শুনা যেত এবং বাংলার মানুষ কবিকে পেতে আগ্রহী ছিলেন তিনি হলেন শামসুদ্দিন মুহম্মদ হাফেজ শিরাজি। হাফেজের কাব্যে যাদের মিলন ঘটেছে তাঁরাই

Dhaka University Institutional Repository


ফারসি কবিতার স্বাদ সম্পর্কে অবগত আছেন। *দিওয়ানে হাফেজ* রচনার জন্য বিখ্যাত কবি হাফেজ শিরাজি শুধু ইরানের কবি হিসেবে খ্যাত নন তিনি ছিলেন বাংলার মানুষদেরও কবি। বলতে গেলে তাঁর কবিপ্রতিভা সমগ্র গোটা ভারতীয় উপমহাদেশকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তিনি ছিলেন মেধা ও তিক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন উদার ও স্বদেশপ্রিয় ব্যক্তি। তবে শিরাজের অন্যান্য কবির চেয়ে তাঁর জীবন ছিল ব্যতিক্রম।[১১৮] তিনি অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সে পিতার বিয়োগ ঘটলে তিনি একটি রুটির দোকানে রুটি বানানোর কাজ নিয়েছিলেন। তিনি কাজের সময়টুকুতে লেখাপড়া নিয়ে ভাবতেন। বলা বাহুল্য যে, তাঁকে দারিদ্রতা জ্ঞান অর্জনের ইচ্ছা দমাতে পারেনি। দোকানের পার্শ্বেই একটি মক্তব ছিল। তিনি সে মক্তবে ভর্তি হয়েছিলেন। সেখানে তিনি আরবি ও ফারসি ভাষার জ্ঞান লাভে সক্ষম হন এবং কুরআন মুখস্থ করেন। এ কারণে তিনি নামের সাথে হাফেজ উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। সহজেই অনুমান করা যায় যে, খাজা হাফেজ শিরাজির শিশুকাল ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির। কঠোর পরিশ্রম, দারিদ্র ও কষ্ট তাঁকে সবসময় আকড়ে ধরে রেখে ছিল। কিন্তু তাঁর জ্ঞান সাধনার ইচ্ছা ও ভালবাসা জীবনকে নিভৃত করতে পারেনি। তাঁর হৃদয়ে কাব্যপ্রতিভা জন্ম নিয়েছিল সে দোকানের রুটি বানানোর কষ্টটি। দোকানেই আলোচনা সভা বসত এবং সেখানে পাশের ছোট বড় কবিরা কবিতা আবৃত্তি করতেন। তিনি তাঁদের কবিতা আবৃত্তি দেখে রুটি বানাতেন আর গুনগুন করতেন। কিন্তু কবিতা তাঁর থেকে অনেক দূরে ছিল। লোকজন তার কবিতা শুনে হাসত, আনন্দ পেত কিন্তু তিনি তা বুঝতেননা। তিনি অনবরত তাল ও লয়হীন, মিলহীন কবিতা আবৃত্তি করতেন। এমনকি এরূপ হাসি রসের কবিতা শুনার জন্য তাঁকে নিয়ে হাস্যরসের আয়োজন করা হত। একবার তিনি ভিষণ কষ্ট পেয়ে ভাল ও শুদ্ধভাবে কবিতা আবৃত্তির জন্য চিন্তায় মনোনিবেশ হন এবং নিজেকে তৈরির প্রত্যয় করেন।[১১৯] এ সময় তিনি আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করেছিলেন।

কবি হাফেজের মধ্যে এশকে এলাহির প্রেম ছিল গভীর। সুফিবাদের যে ধারা তাঁর মধ্যে জাগ্রত হয়েছিল সেটি ছিল অত্যন্ত পরিপূর্ণ ও খুবই শক্তিশালী। যারা তাঁর কবিতা পাঠ করেছেন তাঁরা পরিতৃপ্ত এবং মুগ্ধ হয়েছেন। কাব্যে তাঁর অর্ন্তদৃষ্টি, চমৎকারিত্ব ভাবনা এবং সূক্ষ বুদ্ধি ও কল্পনা শক্তি এতই মোহনীয় পরিপাঠ্য যে, পাঠ মাত্রই কাউকে আকর্ষণ করতে সক্ষম। তিনি ছিলেন জগতের অভিনব এবং অতুলনীয় এক বস্তু। আবদুর রহমান জামি তাঁকে ‘লিসানুল গায়েব’ অর্থাৎ অদৃশ্যের ভাষ্যকার হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। শাহ আবু ইসহাকের সভায় তিনি ছিলেন ফারসি কাব্য সাহিত্যের অন্যতম রত্ন। শিরাজ নগরি ছিল তাঁর নিকট পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নগরি। তিনি এতই ভালবাসতেন যে, কখনো এ নগর ছেড়ে বাইরে কোথাও যাননি।[১২০] এই কবির যে গজল রয়েছে

ফারসি কাব্যের একটি খনিতুল্য। তিনি গজল গেয়ে ফারসি কাব্যের জগতকে আলো থেকে অধিক আলোয় পূর্ণ করে দিয়েছেন। তাঁর একটি গজলের বাংলা অনুবাদ নিম্নে দেয়া হল:

এসো সাকি, এসো, রেখো না বসিয়ে
হাতে হাতে দাও ভর্তি পেয়ালা;
আগে ভাবতাম প্রেম কী সহজ,
আজ দেখি তাতে কী বিষম জ্বালা।[১২১]

## আবদুর রহমান জামি (৮১৭ হি./১৪১৪ খ্রি.-৮৯৮ হি./১৪৯৫ খ্রি.)

ফারসি সাহিত্যে কবি হাফেজ শিরাজি যুগের পর নুরুদ্দিন আবদুর রহমান জামিকে এককভাবে যুগশ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে উল্লেখ করা হয়। হিজরি নবম শতকের মধ্যে তিনিই একমাত্র কবি যার আলোচনা স্বতন্ত্রভাবে ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে। এতে অনুমান করা হয় যে, সে সময় তাঁর সমকক্ষ কোনো কবি বা সাহিত্যিকের আর্বিভাব ঘটেনি। ঘটে থাকলেও তাঁর ন্যায় বিশাল খ্যাতির অধিকারী কেই ছিলেননা। ভারতীয় উপমহাদেশে উক্ত কবির রচনাগুলোর যথেষ্ট কদর রয়েছে। তাঁর কাব্যরচনা অনুসরণ করে বাংলা ও উর্দু ভাষায় বহু কবিতা প্রকাশিত হয়। তাঁর কদর বৃদ্ধির কারণ হল, তিনি হিন্দুস্থানি ধারার কবি হিসেবে পরিচিত। এই ফারসি কবি বাঙালি হৃদয়ে ভালবাসার একটি ক্ষেত্র তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তা না হলে মধ্য যুগ থেকে শুরু করে ঊনিশ ও বিশ শতকেও কবিকে বাংলা ভাষাভাষীরা এতটা স্মরণ করতোনা।

বাংলা সাহিত্যে ফারসি কবি আবদুর রহমান জামি একটি পরিচিত নাম। এ কবির কাব্যরচনা বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে অন্যান্য কবির চেয়ে দ্রুত প্রভাব ফেলেছে।[১২২] তিনি না'ত সাহিত্য রচনার জন্য মুসলিম বিশ্বে খ্যাত হয়ে আছেন। প্রতিটি গ্রন্থের শুরুতে নবি করীম (সা.) এর উপর এক বা দু'টি করে কবিতা রয়েছে। কবিতাগুলো চিত্যাকর্ষক ও হৃদয়গ্রাহী। নবিপ্রেমের উজ্জ্বল প্রতীক হিসেবে এ কবির মূল্য অনেক। তিনি ছিলেন এশ্‌কপূর্ণ হৃদয়ের একজন সুফি ও সাধক পুরুষ। অল্প বয়সেই অধ্যাত্মজ্ঞান এবং সুফিদের প্রতি ভালবাসা তাঁর হৃদয়ে স্থান করে নেয়। তাঁর পিতা আহমদ ছিলেন একজন আলেম, সুফিভক্ত ও খোদাপ্রেমিক মানুষ। পিতা যখন সুফিদের দরবারে যেতেন এবং অলি-আউলিয়াদের কবর জিয়ারত করতেন এসময় আবদুর রহমান জামিও সঙ্গী হতেন। সুফিদের সাক্ষাৎ লাভ এবং কবর জিয়ারত তাঁকে সুফিদের প্রতি ভালবাসা জাগিয়েছে। তিনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁদেরকে শ্রদ্ধা করে চলতেন।[১২৩] এরফানি কবিতা এবং সুফিতত্ত্বমূলক গ্রন্থ রচনা তাঁর অন্যতম

*সাবাহাতুল আবরার* (سبحت الابرار) , *মুরশাদিয়াত* (مرشديت), *ইউসুফ ওয়া জুলায়খা* (يوسف و زليخا) প্রভৃতি সুফিবাদের সাথে সম্পৃক্ত। এ ছাড়া তিনি ছিলেন বহু গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর রচনা সংখ্যা কত ছিল সে হিসেব দেয়া দুষ্কর। ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি অত্যধিক রচনার জন্য চিরজীবী হয়ে আছেন।

আবদুর রহমান জামি একজন ভ্রমণকারী হিসেবেও অনন্য ব্যক্তি। তিনি হেরাত, মারভ, সামারকন্দ, তাশখান্দ, খোরাসান, রেই, হামাদান, কুর্দিস্তান, বাগদাদ, দামেশ্ক, হালব, তাবরীজ ও মক্কা সফর করেন। তাঁর বিভিন্ন স্থানে সফরের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষা গ্রহণ ও বিখ্যাত সুফি-দরবেশের সান্নিধ্যলাভ। ৮৭৭ হিজরি সালে তিনি হজ্জ পালন ও মদিনা শরীফ অবস্থান করেন। হজ্জ পালনের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর।[১২৪] এ ছাড়া তাঁর কয়েকবার মদিনা শরীফে অবস্থানের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়।

আব্দুর রহমান জামি অধিক রচনাকর্মের জন্য একজন পরিশ্রমী লেখক হিসেবে খ্যাত যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর রচনার সংখ্যা সম্পর্কে ঐতিহাসিক রেযা যাদেহ সাফাক উল্লেখ করেছেন ৫৪টি, যাবিহুলল্লাহ সাফার মতে ৪৮টি, আবার কেউ কেউ এ বিষয়ে বিরত থেকে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের কথা বলেছেন। এ কথা সত্য যে, তিনি গদ্য ও পদ্যে, আরবি এবং ফারসি ভাষায় মৃত্যু পর্যন্ত রচনাকর্মে লিপ্ত ছিলেন।[১২৫] সে হিসেবে তাঁর রচনার সংখ্যা অত্যধিক হওয়াই যুক্তিযুক্ত। এ ছাড়া তিনি বাল্যকাল থেকেই কবিতা চর্চা করতেন। কবিতা চর্চায় তাঁর অনেক সময় ব্যায় হয়। তিনি ছোট্টবেলা থেকে হেরাতে অবস্থানকালীন সময়ে কবিতা লেখা শুরু করেন। যে কারণে অতি অল্প বয়সেই তাঁর কবি হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ হয়। তাঁর এই কাব্যচর্চা তাঁকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। এটি ছিল তাঁর বড় অর্জন।[১২৬] কবিতা রচনার মাধ্যমে তিনি যুগের একজন ফারসি ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে 'খাতেমুশ শুআরা' উপাধিটি পেয়েছেন। এ উপাধিটি পাওয়া তাঁর জন্য সহজ ছিল না। কেননা, তখন ফারসি কবিদের মধ্যে যুগশ্রেষ্ঠ কবি হওয়া ছিল একটি কঠিন ব্যাপার।[১২৭] ফারসি সাহিত্যের উন্নতির ক্ষেত্রে আবদুর রহমান জামির অবদান রয়েছে অনেক। নিম্নে রসুলকে উদ্দেশ্য করে তাঁর রচিত একটি প্রসিদ্ধ গজলের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল।

গুল্ যে পেশে তু অমুখ্তা
নাজুক বদনী রা বদনী রা
বুলবুল যে তু অমুখ্তা
শিরীন ছখনী রা ছখনী রা।[১২৮]

Dhaka University Institutional Repository


## জিয়া উদ্দিন নাখশাবি (৮ম হিজরি শতক)

অষ্টম হিজরি শতকের একজন উল্লেখযোগ্য লেখক ও কবি হিসেবে জিয়া নাখশাবির নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি মূলত সামারকান্দের নাখশাব অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। যুবক বয়সে তিনি নাখশাব অঞ্চল থেকে হিন্দুস্তানে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বদায়ুন শহরে তিনি বসবাস শুরু করেন।[১২৯] তিনি বাংলা ভাষাভাষী পণ্ডিতদের মধ্যে *তুতীনামে* রচনার মাধ্যমে পরিচিতি পান। ফারসি সাহিত্যে তাঁর আলোচনা ততটা বিস্তৃত নয়। অনেকে তাঁকে সাহিত্যে কঠিন ও অপরিচিত শব্দ ব্যবহারের কারণে এড়িয়ে যেতেন। তাঁর বাংলাভাষী অঞ্চলে একজন বিশিষ্ট লেখক, কবি ও সংস্কৃত ভাষা বিশেষজ্ঞ হিসেবে সুনাম রয়েছে। তিনি ছিলেন দরবেশপন্থা অবলম্বনকারী একজন সুফি ব্যক্তি এবং নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার মুরিদ।[১৩০] এই কবি ইতিহাসে নাখশাবি ও বদায়ুনি নামে পরিচিত। জীবনের শুরুতে তিনি সামারকান্দের নাখশাবে এবং যুবক বয়সে ভারতের বদায়ুন নামক স্থানে জীবন-যাপন করতেন বলে তাঁকে নাখশাবি বা বদায়ুনি বলা হত। কবি কখন সামারকান্দের নাখশাব অঞ্চল ছেড়ে হিন্দুস্থানের বদায়ুনে এসেছিলেন ইতিহাসে তা উল্লেখ নেই।

তাঁর প্রসিদ্ধ রচনাগুলো হল: *তুতীনামে*, *সাক আসলুক* বা *মুলক ওয়া সুলুক*, *আশরাহ ই মুবাশেরাহ*, *আফসানা ই গিলরীয*, *কুল্লিয়াত ওয়া জুযিয়াত*। সুলুক রচনায় একশত পঞ্চাশটি বন্দ রয়েছে। এতে তাসাউফ, সুফিদের বৈশিষ্ট্য, ঘটনা ও বক্তব্য স্থান করে আছে। তাঁর *তুতিনামে* রচনাটি কাহিনীমূলক গ্রন্থ হিসেবে প্রসিদ্ধ। এটি সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে, এ কাহিনী সংস্কৃত সাহিত্য থেকে চয়ন করা হয়েছে। এ গ্রন্থে সত্তরটি ঘটনা পাওয়া যায়। টিয়া পাখির বক্তব্যের উপর তিনি ঐ কাহিনীগুলো ফারসি ভাষায় প্রকাশ করেন। তবে পাঠকদের নিকট তাঁর ব্যবহৃত ফারসি ভাষা ছিল অত্যন্ত কঠিন। এই গ্রন্থ পাঠ ও মর্মার্থ অনুধাবনে কেউই সক্ষম হতো না। তাঁর সময়ে একজন জ্ঞানী ব্যক্তিকে নির্বাচন করা হয়েছিল যেন কাহিনীটি ছোট্ট ও সুন্দর ভাষায় তা পুনবার প্রকাশ করেন। বায়ান্নটি ঘটনা কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। সে থেকে তুতিনামার কাহিনী একটি মার্জিতরূপ পেয়েছে। এটি ৭৩০ হিজরি সনে সম্পন্ন হয়। পরবর্তীতে এই তুতীনামা কাহিনী বিভিন্ন ব্যক্তির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ ঘটে।[১৩১] তিনি ৭৫১ হিজরি মোতাবেক ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।

## আবুল ফয়জ ফয়জি ( ৯৫৪ হি./১৫৪৭ খ্রি.-১০০১ হি./১৫৯৫ খ্রি.)

তিনি ছিলেন ভারতের কবিদের মুকুট হিসেবে খ্যাত একজন অনন্য প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তি। এ কবির জীবনের অনেক ঘটনাবলি লিখিত হয়নি। তিনি উপমহাদেশে কবি আমির খসরুর পর পুরনো

Dhaka University Institutional Repository


ধারার একজন ফারসি কবি হিসেবে স্বীকৃত। এ কবির প্রাথমিক জ্ঞান পিতার নিকট থেকে প্রাপ্ত হয়েছে। তিনি আরবি ও সংস্কৃত ভাষার বিশেষজ্ঞ ছিলেন। পিতা মোবারক ছিলেন যশখ্যাত একজন বিশিষ্ট পুরুষ। তাঁর পিতা ছিলেন ইয়ামেন দেশের অধিবাসী। দশম হিজরি শতকে ফয়জির দাদা শায়খ খেজার নিজ দেশ ত্যাগ করে আজমিরের নিকটতম স্থান 'নাগর' নামক স্থানে বসবাস শুরু করেন। নাগর স্থানে শেখ মোবারকের জন্ম হওয়ায় তাঁকে নাগরি বলা হয়ে থাকে। নাগর থেকে শেখ মোবারক আগ্রায় বসবাস শুররু করলে এখানেই আবুল ফয়েজ ফয়জি জন্মলাভ করেন।[১৩২] পিতা শেখ মোবারক বাদশাহ আকবরের বন্ধু ছিলেন। এ সুবাদে আবুল ফয়জ ফয়জি বাদশাহ আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় বড় হন। একসময় বাদশাহ আকবর তাঁকে রাজদরবারে চাকুরি প্রদান করেন।

তাঁর কর্ম জীবনের উল্লেখযোগ্য অবদান হলো বিভিন্ন প্রকার রচনাবলি। তিনি গদ্য ও পদ্যে এক শতের অধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তবে এগুলো সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য নেই। অনেক রচনা জীবদ্দশায় প্রকাশ না হওয়ায় তাঁর রচনা বিষয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। তবে এটি প্রসিদ্ধ যে, তাঁর পঞ্চনামা অর্থাৎ পাঁচটি মসনবি গ্রন্থ রয়েছে যা তখন প্রসিদ্ধ ছিল। রচনাগুলো হল– *মারকাযে এদওয়ার* (مرکز ادوار), *নাল ও মানতি* (نل و منتی), *সুলায়মান ওয়া বিলকিস*(سلیمان و بلقیس), *হাপ্ত কেশওয়ার* (هفت کشور)ও *আকবারনামে* (اکبرنامه) প্রভৃতি। এ মসনবিগুলো কবি নেজামির পঞ্চ মসনবির উত্তরে লেখা হয়।[১৩৩] এগুলো তাঁর কাব্যপ্রতিভা বিকাশের অন্যতম পরিচয়। এ ছাড়া তাঁর তফসির, *দিওয়ান* ও গদ্য রচনা রয়েছে। তবে তিনি মসনবি রচনা লিখে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

## আবদুল কাদির বেদিল (১০৫৪ হি.-১১৩৩ হি./১৭২০ খ্রি.)

বাদশাহ আওরঙ্গজেব শাসনামলের (১৬৫৯ খ্রি.-১৭০৭ খ্রি.) কবিদের মধ্যে অন্যতম কবি ছিলেন বেদিল। পিতার নাম মির্যা আবদুল খালেক; বেদিল তাঁর কবি নাম। ভারতের আজিমাবাদে জন্ম গ্রহণ করলেও তিনি ছিলেন একজন তুর্কি সন্তান। কবির বন্ধু ছিলেন বাদশাহ আওরঙ্গজেবের পুত্র শাহজাদা মুহাম্মদ আজম। তাঁর আজিমাবাদে বেশি দিন অতিবাহিত হতে না হতেই শাহজাদা মুহাম্মদ আজমের সাথে বন্ধুত্বের ছিড় ধরে। এটির অন্যতম কারণ ছিল, শাহজাদাকে নিয়ে প্রশংসাসূচক কাব্যরচনা না করা। তিনি বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে আজিমাবাদ থেকে শাহজাহানাবাদে প্রত্যাগমন করেন। তখন এ স্থানেই ছিল ফারসি ভাষার অন্যতম চর্চাকেন্দ্র। ফারসি কাব্যচর্চার মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় এখানে অতিবাহিত হয়।[১৩৪] উল্লেখ্য যে, দীর্ঘ দিন শাহজাদার সাথে বন্ধুত্বের পরও এই কবি প্রতিভা সম্পর্কে শাহজাদা অবহিত ছিলেননা। কিন্তু তিনি শাহজাদার সাথে হিন্দি রীতিতে ফারসি

Dhaka University Institutional Repository

কবিতা আবৃত্তি করতেন। তিনি এতটাই নিজেকে আড়াল করে জীবন যাপন করতেন যে, কিছুতেই অন্যের নিকট তা প্রকাশ  পেতনা। তাঁর সময়ে ফারসি কাব্যসাহিত্য রচনাকারীদের মধ্যেও তিনি অগ্রগামী ভূমিকা রাখেন। তাঁর কাব্যে নিজস্ব পদ্ধতি ও চিন্তা ধারার প্রয়োগ রয়েছে। বিশেষ করে কাব্যে সুফিবাদী চিন্তা চেতনার প্রকাশ একটি লক্ষ্যণীয় বিষয়। তাঁকে মৌসুমী কবিতার সতেজ রীতির একজন উদ্ভাবকও বলা হত।[১৩৫] তবে তাঁর সম্পর্কে মিশ্র ধরণের বক্তব্য পাওয়া যায়। অনেকে তাঁকে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে অভিহিত করেছেন। তবে কেউ কেউ তাঁর অর্ন্তনিহিত প্রতিভার কথা অস্বীকার করেলেও বিলম্বে হলেও তাঁরা তাঁর প্রতিভা সম্পর্কে বুঝতে সক্ষম হন। ভারতের ফারসি ভাষাভাষিদের মাঝে কবি আমির খসরু ও কবি আবদুর রহমান জামির পরই তাঁর স্থান রয়েছে। ড. তওফিক সোবহানি তাঁকে বাংলায় বসবাসের কথা বলেছেন।[১৩৬] তিনি বাংলাদেশে বসবাস না করে ভারতের বংগ প্রদেশে বসবাস করে থাকবেন।

ইরানে তাঁর কৃতিত্ব ও অবদানের কথা অনেকটাই বিলম্বে পৌঁচেছে। অথচ এই কবির মর্যদা ফরিদ উদ্দিন আত্তার, খাজা হাফেজ শিরাজির মতই ভারত, আফগানিস্তান, তাজিকিস্তান ও উজবিকিস্তানে সমাদর ছিল। ১৩৪৩ ইরানি সালে সালাহ উদ্দিন সালজুকির সময়কালে *নাকদে বেদীল* প্রকাশের পর ইরানীয়রা তাঁকে নতুন করে জানতে শুরু করে। ইরানে তাঁর কবিতা ততটা সমাদর না পাওয়ার অন্যতম কারণ ছিল কবিতায় কঠিন শব্দ ও দুর্বোধ্যতা। তিনি কবিতায় কঠিন ও জটিল শব্দ প্রয়োগ করেছেন। তাঁর *দিওয়ানে* সে শব্দগুলোর ব্যবহার পাওয়া যায়। তাঁর *দিওয়ান* (دیوان) ছাড়া কাব্য রচনাগুলো হল– *আরাফাত* (عرفات) , *তাল্‌সামে হিইরাত* (طلسم حیرت), *তোরে মারেফাত* (زور معرفت), *মুহিতে আজম* (محیط عظم ), *তাম্বিহুল মুহুসিন* (تنبیه المهوسین), ইতাদি। এই কবির প্রতিভা ও খ্যাতি ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসে গুরুত্বের সাথে দেখা হয়নি। নিম্নে তাঁর একটি গজল লক্ষ করা যাক।

ما غربت آشیانیم، ای بلبلان! وطن کو؟
هر چند پرفشانیم، پرواز آن چمن کو؟
مارا برون آن در، پا در هوا خروشی است
آنجا که خلوت اوست، امکان یاد من کو

হে বুলবুল! তোমার ঠিকানা কোথায় ? আমরা তো কঠিন বাস্তবতাকে উৎরিয়ে এসেছি। ঐ দূর্বাঘাসের প্রজাপতি কোথায়? সেখানে আমরা ছুটাছুটি করব।

Dhaka University Institutional Repository

আমাদেরকে ঐ দরজার বাইরে রেখেছ, পা উত্তপ্ত বাতাশে। আমার স্মরণ থাকার সম্ববনা কোথায়? ঐখানে যে তার একান্ততা আছে।[১৩৭]

বেদিল পারস্যের শেখ সাদির ন্যায় ততটা উজ্জ্বল প্রতিভার অধিকারী না হলেও জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে অনেকটাই তাঁর ন্যায় সচেতন ছিলেন। এ কবির জীবন দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। তাঁর প্রথম অধ্যায়টি দশ বছর বয়স পর্যন্ত। এ বয়সে তিনি কাব্য রচনার সাথে নিজেকে বেশি করে সম্পৃক্ত রাখতে পারেননি। ১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭২০ খ্রিস্টাব্দ তথা মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর দ্বিতীয় অধ্যায়।[১৩৮] এ সময়ে তিনি শিক্ষা ও কাব্যরচনার সাথে পরিচিত হয়ে ওঠেন। তাঁর অন্য কোন পেশা সম্পর্কে জানা যায় নি। এই ফারসি কবির জীবনের শেষ দিনগুলো অতিবাহিত হয়েছে দিল্লিতে। তিনি ঊনাশি বছর বয়সে দিল্লিতে ইন্তেকাল করেন।

বিশ্ব সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হিসেবে *শাহনামায়ে ফেরদৌসি*, *মসনবি শরিফ*, *রুবাইয়াত*, *গোলেস্তানে সাদি*, *দিওয়ানে হাফেজ* ও *ইউসুফ জোলেখা* কাব্যগ্রন্থের ন্যায় অসংখ্য কাব্য আমাদের মাঝে উপস্থিত। বলতে গেলে, ফারসি কাব্যসাহিত্যের আর্বিভাবকাল থেকে এর চাহিদা ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কাব্য সাহিত্যগুলো শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের অপরূপ নিদর্শন। এ কাব্যসাহিত্যের মাধ্যমে যেরূপ সুফিবাদ, প্রেম, পবিত্র, সত্য ও নৈতিক বিষয়াবলি পরিস্কার হয়ে উঠেছে তা তুলনাহীন। এ সাহিতের গুণাবলি ও দর্শন বাঙালিদের মধ্যেও প্রভাব ফেলেছে। মধ্যযুগে বাঙালিরা ফারসি কাব্যের চর্চা করতেন। সে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বাঙালিদেরও একটি নতুন পরিচয় লাভ হয়।

টীকা ও তথ্য নির্দেশ

১. সোবহানী, তওফিক, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, এন্তেশারাতে জাওয়ার, তেহরান, ১৩৮৮ হি.শা., পৃ. ২৭; নোমানি, শিবলি, *শে'রুল আযম (হিস্‌সেয়ে আওয়াল)*, নজীর আহমদ তাজ ডিপু, লাহুর, ১৩৭০ হি., ভূমিকা-১।

২. মাহাব্বাতি, মেহেদি, *দানিশ ওয়া দানিশমান্দ দার আদাবিয়াতে ফারসি*, ফেযোহেশকাদেহ মুতালেয়াতে ফারহাঙ্গি ওয়া এজতেমাঈ, তেহরান, ১৩৮৮ হি.শা., পৃ. ১।

৩. তুর্কি ও আফগানরা ফারসি ভাষার লালন করেছেন। তাঁদের নিকট নিজ মাতৃভাষার চেয়ে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধময়ী ছিল।

৪. সাফা, যবিহুল্লাহ, *তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান* (জেলদে দোওম), এন্তেশারাতে ফেরদৌসী, তেহরান, ১৩৭৩ হি.শা., পৃ. ৩৫৩।

৫. সাফা, যবিহুল্লাহ, তদেব, পৃ. ৩৪৭।

৬. ফারসি সাহিত্যে প্রেমের কবিতা আল্লাহকে নিয়ে রচিত হয়। সে প্রেমের কবিতাগুলো ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। কতক কবিতা সরাসরি খোদা তায়ালার প্রশংসা কতক তাঁর গুণ-কীর্তির প্রতি সম্বোধিত হয়।

৭. বাদাখশানি, মির্যা মকবুল বেগ, *আদাব নামে ইরান*-২, ইউনির্ভাসিটি বুক এজেন্সি, লাহুর, ১৯৬৭, পৃ. ৬৯।

৮. মুতাহ্হরী, শহীদ আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা, *ইসলাম ও ইরানের পারস্পরিক অবদান*, (অনুবাদক এ. কে. এম. আনোয়ারুল কবীর) কালচারাল কাউন্সেলরের দফতর, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৫১; ইয়াহাকি, মুহম্মদ জাফর, *কুল্লিয়াতে তারিখে আদাবিয়াতে ফারসি*, সাযেমানে ইরান, তেহরান, ১৩৮৯ হি.শা., পৃ. ১৫।

৯. মুর্তাজা মুতাহ্হরী, শহীদ আয়াতুল্লাহ, তদেব, পৃ. ৯১।

১০. কাব্যে মূল বিষয়টি উপস্থাপনের পূর্বে আল্লাহ ও রসুলের প্রশংসা করা সকল কবিদের মাঝেই উপস্থিত রয়েছে। কবিদের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে, কাব্যে পবিত্র বিষয়গুলো স্থান করে দেয়া।

১১. সুফিধারার কাব্যরচনাগুলো মানব উন্নয়নের সহায়ক। মানুষের মুক্তির জন্য বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। তদ্রুপ অনেক গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ হয়েছে।

১২. তাফাজ্জলি, আহমদ, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান পিশ আয ইসলাম*, এন্তেশারাতে সুখান, তেহরান, ১৩৭৮ হি.শা., পৃ. ১৮।

১৩. তাফাজ্জলি, আহমদ, তদেব, পৃ. ৩১০।

১৪. সামীসা, সীরুস, *অশনায়ী বা আরোয ওয়া কাফিয়া*, এন্তেশারাতে ফেরদৌস, তেহরান, ১৩৭২, পৃ. ১৬।

১৫. সাফা, যাবীহুল্লাহ, *তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান* (জেলদে আওওয়াল), এন্তেশারাতে ফেরদৌসী, তেহরান, ১৩৭১ হি.শা., পৃ. ১২০।

১৬. কাব্য সাহিত্য চর্চায় সূচনা পর্বের মধ্যে সামানি যুগকে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এ যুগের কবি কাব্যের সুচনাকারী হিসেবে চিহ্নিত। মুলত ইসলাম ধর্ম ইরানে প্রবেশ করার পর সাহিত্য ঠিক সেভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বড় ধরণের যে কাব্য রচনার বিকাশ ঘটে হিজরী তৃতীয় শতকের পূর্বে নয়।

১৭. নোমানি, শিবলি, *শে'রুল আযম (হিস্সেয়ে আওয়াল)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫।

১৮. তদেব, পৃ. ১৫।

১৯. তদেব, পৃ. ১৬।

২০. সাফা, যাবীহুল্লাহ, *তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান (জেলদে আওওয়াল)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭০-৭১।

২১. প্রথম ফারসি কবি হিসেবে ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসমূলক গ্রন্থে বিভিন্ন ব্যক্তির নাম রয়েছে। যেমন- ১. মুহাম্মদ বিন ওয়াসীফ, ২.বাহরাম গুর, ৩. আবু হাফস হাকিম, ৪. আবুল আব্বাস মারভাযি, ৫. হানযেলা বাদগেসি, ৬. ফিরুজ মাসরেকি ও ৭. আবু সালিক গুরগানি প্রমুখ। তাঁরা প্রত্যেককেই প্রথম কবি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে অনুমান হয় যে, ফারসি কাব্যের সুচনাকালে বহু কবিতা আবৃত্তিকার ছিলেন।

২২. মুতাহ্হরি, শহীদ আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯; নোমানি, শিবলি, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১।

২৩. বাদাখশানি, মির্যা মকবুল বেগ, *আদাবনামে ইরান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪; আবদুল্লাহ বিন তাহির এ মর্মে আদেশ দিয়েছিলেন যে, ইরানের সকল ফারসি গ্রন্থ ধ্বংসে পরিণত করা হউক। তখন তাঁর এ আদেশে শুধু ফারসি গ্রন্থের ধ্বংস সাধিত হয়নি যারা ফারসি ভাষায় রচনা করতেন তাঁদের মেধা ও প্রতিভাকে ধ্বংস করে দেয়া হয়।

২৪. বাদাখশানি, মির্যা মকবুল বেগ, তদেব, পৃ. ৪৫; পারস্যবাসী ইসলামধর্মকে আরবের ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করে নি বরং তাঁরা এটি সমগ্র জাতির ও পৃথিবীর ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেছিল। যে কারণে তাঁরা দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেও আরবি ভাষা গ্রহণ করে নি।

২৫. ফেরদৌসির *শাহনামা* একটি জাতীয় কাব্যগ্রন্থ। এটি নির্ভেজাল ফারসি ভাষায় রচিত। আরবগোষ্ঠী থেকে ফারসি ভাষাকে মুক্ত করার জন্যই তাঁর এরূপ প্রচেষ্টা।

২৬. সাফা, যাবিহুল্লাহ, *তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান*, (জেলদে দোওম), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৫; ইকরাম, মোহম্মদ ইকরাম, ফেরদৌসি ওয়া যাবানে ফারসি, ইকরাম, মোহাম্মদ ইকরাম, *দানিশ*, ইসলামাবাদ, সংখ্যা ৯৮, পায়িয ১৩৮৮, পৃ. ১৪৩।

২৭. নোমানি, শিবলি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬।

২৮. সোবহানি, তওফিক, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭; কাহদুয়ি, মহম্মদ কাজেম, *গোযিদেয়ে আয তারিখে আদাবিয়াতে ফারসি বাদ আয ইসলাম তা পায়ানে সালযুকি*, অপ্রকাশিত, পৃ. ২।

২৯. সোবহানি, তওফিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫।

৩০. সাফা, যবিহুল্লাহ, *তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান*, (জেলদে আওয়াল), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৮।

৩১. সাফা, যবিহুল্লাহ, তদেব, পৃ. ৩৫৯।

৩২. সাফা, যবিহুল্লাহ, পৃ. ৪১১; নোমানি, শিবলি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫।

৩৩. সোবহানি, তওফিক, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৫; নোমানি, শিবলি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২।

৩৪. সাফা, যবিহুল্লাহ, *তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান* ( জেলদে দোওম), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৫।

৩৫. সাফা, যবিহুল্লাহ, তদেব,পৃ. ৩৩৭।

৩৬. তদেব, পৃ. ৩৩৫।

৩৭. তদেব, পৃ. ৩৩৬ ।

৩৮. তদেব, পৃ. ৭২।

৩৯. Rypka, J., Poets and prose wrirers of the late Saljuq and Mongol periods, *The Cambridge History of Iran V.5*, Boyle, J. A. (Edited), Cambridge University press, Great Britain, 1968, p. 551.

৪০. সোবহানি, তওফিক, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২।

৪১. সাফা, যবিহুল্লাহ,পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৪।

৪২. তদেব, পৃ. ৩০৮; যায়নালি, বাকের, *এরফান ওয়া তাসাউফ দার আসরে এলখানানে মোগাল*, এন্তেশারাতে কারকুস, তেহরান, ১৩৮২ হি.শা., পৃ. ২৩।

৪৩. সাফা, যবিহুল্লাহ, তদেব, পৃ. ৩৫৮।

৪৪. তদেব, পৃ. ৩৬৩।

৪৫. রুদাকি: একটি গ্রামের নাম যা সমরকন্দে অবস্থিত। বর্তমানে রোদাক গ্রামটি কোথায় অবস্থিত সে সম্পর্কে বাস্তবসম্মত তথ্য নেই। এ রোদাক সম্পর্কে দ্বিমত বক্তব্য রয়েছে। একটি নামেই পাঁচটি গ্রামের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। বোখারা, সামারকান্দ, তাজিকিস্তান, নাখশাব ও রোদাক। উপাধি হিসেবে তাঁর নামের সাথে স্থানটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। – সোবহানি, তওফিক, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯।

৪৬. দু'টি গ্রন্থই প্রসিদ্ধ। ভারতে সংস্কৃত ভাষায় এ দুটি গ্রন্থের প্রচার পেয়েছে সর্বাধিক। তিনি প্রসিদ্ধ এ দুটি গ্রন্থের ভাব অনুসরণ করে রচনা করেছেন। নতুনত্ব ও চমক দু'টোই রয়েছে। তবে তাঁর রচিত গ্রন্থ দুটি পাওয়া কঠিন।

৪৭. মিনুভি, মোজতাবা, *ফেরদৌসি ওয়া শেরে উ*, এন্তেশারাতে আনজুমানে আসারে মিল্লি, তেহরান,১৩৪৬, পৃ. ১২৭।

৪৮. সাফা, যবিহুল্লাহ, *তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান*, (জেলদে আওয়াল), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭১।

৪৯. ফরোযানফার, বদিউয যামান, *সুখান ওয়া সুখনাওয়ার*, এন্তেশারাতে খাওয়ারেযামী, তেহরান, ১৩৬৯ হি.শা., পৃ. ১৮।

৫০. নোমানি, শিবলি, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪।

৫১ সাফা, যাবিহুল্লাহ, *তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান*, (জেলদে আওয়াল), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭২।

৫২. কাহদুয়ি, মহম্মদ কাজেম, *গোযিদেয়ে আয তারিখে আদাবিয়াতে ফারসি বাদ আয ইসলাম তা পায়ানে সালযুকি*, অপ্রকাশিত, পৃ.৩;আহমদ আলী, আকা, *হাফত আসমান*, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাঙ্গাল, কলিকাতা, ১৮৭৪, পৃ. ১১।

৫৩. সাফা, যাবিহুল্লাহ, *তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান*, (জেলদে আওয়াল), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮০।

৫৪. তদেব, পৃ. ৩৭৮।

৫৫. আহমদ আলী, আকা, *হাফত আসমান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০।

৫৬. উদ্ধৃতি, উদ্দীন, মুহম্মদ মনসুর, *ইরানের কবি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮, পৃ. ৩।

৫৭. আহমদ আলী, আকা, *হাফত আসমান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০।

৫৮. সুবহানি, তওফিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯।

৫৯. তদেব, পৃ. ১১৮।

৬০. মিনুভি, মোজতাবা, *ফেরদৌসি ওয়া শেরে উ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬।

৬১. বাংলা গ্রন্থ: বাংলা ভাষায় কবি ফেরদৌসীকে জানার জন্য তিনটি গ্রন্থকে অধিক গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। গ্রন্থগুলো হলো–*পারস্য প্রতিভা*, *ইরানের কবি* ও মনির উদ্দিন ইউসুফ অনূদিত *ফেরদৌসী শাহনামা*। এই তিনটি গ্রন্থে তাঁর দারিদ্রতা ও স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্তির বিষয়ে ঘটনার কথা জানা যায়। অনেক জীবনীকার কবির দারিদ্রতা এবং স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্তিকে অতিরঞ্জিত করে তোলেছেন। কবি ফেরদৌসি সম্পর্কে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে যে ঘটনাটি প্রচলিত আছে তা কতটুকু সত্য–একটি বিবেচ্য বিষয়।

৬২. বাদাখশানি, মির্যা মকবুল বেগ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪ ও ১৪৮।

৬৩. কাযভিনি, আল্লামা মুহম্মদ, (সম্পাদক) *নিযামি অরোযি সামারকান্দি চাহার মাকালা*, এন্তেশারাতে অয়দীন, তাবরিয, ১৩৮৭, পৃ. ৫৮-৫৯।

৬৪. সাফা, যাবিহুল্লাহ, *তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান*, (জেলদে আওয়াল), পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭০।

৬৫. মিনুভি, মোজতাবা, *ফেরদৌসি ওয়া শেরে উ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

৬৬. ফরোযানফার, বদিউয যামান, *সুখান ওয়া সুখনাওয়ার*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১।

৬৭. কাহদুয়ি, মহম্মদ কাজেম, *গোযিদেয়ে আয তারিখে আদাবিয়াতে ফারসি বাদ আয ইসলাম তা পায়ানে সালযুকি*, অপ্রকাশিত, পৃ. ৭; মিনুভি, মোজতাবা, *ফেরদৌসি ওয়া শেরে উ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬-৫৭।

৬৮. সাফা, যাবিহুল্লাহ, *তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান*, (জেলদে আওয়াল), পূর্বেক্ত, পৃ. ৪৬৭।

৬৯. ফরোযানফার, বদিউয যামান, *সুখান ওয়া সুখনাওয়ার*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬।

৭০. মাহাব্বাতি, মেহেদি, *দানিশ ওয়া দানিশমান্দ দার আদাবিয়াতে ফারসি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯।

৭১. ইউসুফ, মনির উদ্দীন (অনূদিত), *ফেরদৌসী শাহানামা ১ম খণ্ড*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ১৬৫।

৭২. সাফা, যাবিহুল্লাহ, *তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান ২য় খণ্ড*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫৩; সায়ফ, আবদুর রেযা, ও মারাকাবি, গোলাম হোসাইন, *মাসনাভীহায়ে সানাঈ*, এন্তেশারাতে দানেশগাহে তেহরান, তেহরান, ১৩৮৯ হি.শা., পৃ. ৭।

৭৩. সাফা, যাবিহুল্লাহ, *তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান* ( জেলদে দোওম), পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫৩।

৭৪. শাকিবা, পারভিন, *শেরে ফারসি আয আগায তা এমরুয*, এন্তেশারাতে হীরমান্দ, তেহরান, ১৩৭৩ হি.শা., পৃ. ৯৬।

৭৫. সাফা, যাবিহুল্লাহ, *তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান* ( জেলদে দোওম), পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫৬।

৭৬. শাকিবা, পারভিন, *শেরে ফারসি আয আগায তা এমরুয*, পূর্বোক্ত,পৃ. ৯৭।

৭৭. সায়ফ, আবদুর রেযা, ও মারাকাবি, গোলাম হোসাইন, *মাসনভীহায়ে সানাঈ*, এন্তেশারাতে দানেশগাহে তেহরান, তেহরান, ১৩৮৯ হি.শা., পৃ. ১৩।

৭৮. সায়ফ, আবদুর রেযা, ও মারাকাবি, গোলাম হোসাইন, *মাসনভীহায়ে সানাঈ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২।

৭৯. সায়ফ, আবদুর রেযা, ও মারাকাবি, গোলাম হোসাইন, ঐ, পৃ. ৭।

৮০. হালভি, আলি আসগর, তারিখে ফালাসিফে ইরানি, এন্তেশারাতে যাওয়ার, তেহরান, ১৩৮১ হি.শা., পৃ. ৩৮৫।

৮১. হালভি, আলি আসগর, *তারিখে ফালাসিফে ইরানি*, পৃ. ৩৮৯।

৮২. বাদাখশানি, মির্যা মকবুল বেগ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৯ ; কাইউম, আবদুল, (সম্পাদক) *মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ রচনাবলী ১ম খন্ড* , বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ১২১।

৮৩. কাইউম, আবদুল, (সম্পাদক) *মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ রচনাবলী* পৃ. ১১৫।

৮৪. খৈয়াম, হাকীম ওমার, *রোবাইয়াতে হাকিম ওমার খৈয়াম (ফারসি, এঙ্গলিসি, আরবি, আলমানি, ফারান্সে)* মোয়াসেসে এন্তেশারাতে নেগাহ, তেহরান, ১৩৮৭ হি.শা., পৃ. ৩১।

৮৫. যারুতিয়ান, ডক্টর বেহরুয, *আন্দিশেহায়ী নিজামি গান্জেঈ*, এন্তেশারাতে অইদীন, তেহরান, ১৩৮২ হি.শা., পৃ. ২৩।

৮৬. যারুতিয়ান, ডক্টর বেহরুয, *আন্দিশেহায়ী নিজামি গান্জেঈ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩, ১৭।

৮৭. সোবহানি, তওফিক, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৯।

৮৮. যারুতিয়ান, ডক্টর বেহরুয, *আন্দিশেহায়ী নিজামি গান্জেঈ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯ ও ২০।

৮৯. সোবহানী, তওফিক, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২০।

৯০. সাফা, যাবিহুল্লাহ, *তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান* ( জেলদে দোওম), পৃ. ৮০৫।

Dhaka University Institutional Repository


৯১. নেজামি গাঞ্জুবির পাঁচটি মসনবী রীতির কাব্যগ্রন্থে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কাহিনী রয়েছে। তাঁর ন্যায় কাহিনীগুলোর চিত্রায়নে অন্য কোন কবি প্রসিদ্ধি পায় নি। এ কারণে তিনি একজন সফল কাহিনীকার কবি হিসেবে খ্যাত।

৯২. যারুতিয়ান, ডক্টর বেহরুয, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২।

৯৩. নেজামি, *হাপ্ত পেয়কার*, মুম্বাই, ১২৯৮ হি. পৃ. ২।

৯৪. নোমানি, শিবলি, *শে'রুল আযম (হিস্সেয়ে দোওম)*, নজীর আহমদ তাজ ডিপু, লাহুর, ১৩৭০ হি., পৃ. ১০।

৯৫. নোমানি, শিবলি, *শে'রুল আযম (হিস্সেয়ে দোওম)*, পৃ. ১১-১২।

৯৬. সাফা, যাবিহুল্লাহ, *তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান* ( জেলদে দোওম), পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫৯।

৯৭. সাফা, যাবিহুল্লাহ, পৃ. ৮৫৯।

৯৮. সাফা, যাবিহুল্লাহ, পৃ. ৮৬০।

৯৯. সাফা, যাবিহুল্লাহ, পৃ. ৮৬৪।

১০০. বাকের যায়নালি, *এরফান ওয়া তাসাউফ দার আসরে এলখানানে মোগাল*, এন্তেশারাতে কারকুস, তেহরান, ১৩৮২ হি.শা., পৃ. ৬১।

১০১. নাম বিহীন, *আহওয়াল ওয়া আসারে মৌলাভী*, এন্তশারাতে ওযারাতে এত্তেলাত, ইরান, ১৩৫২, পৃ. ২৫-২৬।

১০২. যায়নালি, বাকের *এরফান ওয়া তাসাউফ দার আসরে এলখানানে মোগাল*, পৃ. ৮২; পাল, হরেন্দ্র চন্দ্র, সুফি কবি জালালুদ্দীন রূমী, *সাহিত্য পত্রিকা*, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১ম সংখ্যা ১৩৮০, পৃ. ৩।

১০৩. ঐ, পৃ. ৮২; পাল, হরেন্দ্র চন্দ্র, সুফি কবি জালালুদ্দীন রূমী, পৃ. ১-২।

১০৪. জুনায়দি, আজিমুল হক, (সংকলক) *মাসিরে আযম*, এজোকেশনাল বুক হাউস, আলিগড়, ১৯৮০, পৃ. ১৯৭।

১০৫. বাকের যায়নালি, *এরফান ওয়া তাসাউফ দার আসরে এলখানানে মোগাল*, পৃ. ৯১।

১০৬. ইউসুফ, মরিউদ্দীন, *রুমীর মসনবী*, ওসমানিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, ১৩৭৩, পৃ. ১৫৭।

১০৭. জুনায়দি, আজিমুল হক, (সংকলক) *মাসিরে আযম*, পৃ. ১৮৬।

১০৮. জুনায়দি, আজিমুল হক,পৃ. ১৮৬।

১০৯. সোবহানি, তওফিক, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮০।

১১০. Browne, Edward G., *A Literary History of Persia V. 2,* Cambridge At the University Press, 1959, P. 530.

১১১. Browne, Edward G., *A Literary History of Persia V. 2,* P. 532.

১১২. সাদি, মুসলেহ উদ্দিন শেখ, *গুলেস্তানে সাদি* (সম্পাদনায় গোলাম হুসাইন ইউসুফি), এন্তেশারাতে খোওয়ারেযমি, তেহরান, ১৩৭৪, পৃ. ২৫।

১১৩. সাদি, মুসলেহ উদ্দিন শেখ, *গুলেস্তানে সাদি, তদেব*, পৃ. ১৫৮।

১১৪. ফেরেশ্তা, মুহাম্মদ কাসেম, *তারিখে ফেরেশ্তা দাওয়াযদা মাকালা*, মাতবায়ে মাজেদি, কানপুর, ১৯০৮, পৃ. ১০৬; ইসলাম, আজহারুল, আমীর খসরু, *মাসিক মোহাম্মদী*, ৭ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৪১, পৃ. ৮৩০।

১১৫. কানুনগো, শ্রীকালিকারঞ্জন, আমীর খুসরু-কৃত 'দেবলারাণী-খিজির খাঁ' কাব্য, *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*, ৪র্থ সংখ্যা, ৪৬শ বর্ষ, ১৩৪৬, পৃ. ২৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

১১৬. জুনায়দি, আজিমুল হক, (সংকলক) *মাসিরে আযম*, পৃ. ২২৪ ।

১১৭. Rypka, J., Poets and prose wrirers of the late Saljuq and Mongol periods, *The Cambridge History of Iran V.5*, Boyle, J. A. (Edited), p. 609; আহমদ, জহুর উদ্দিন, শাখসিয়াত, মাসনাবী নিগারি আমির খসরু, *দানিশ*, পাকিস্তান, ৮০ বাহার, ১৩৮৪, পৃ. ৪১ ।

১১৮. জুনায়দি, আজিমুল হক, (সংকলক) *মাসিরে আযম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১০ ।

১১৯. তদেব, পৃ. ২১০-২১১ ।

১২০. তদেব, পৃ. ২১২-১৩ ।

১২১. মখোপাধ্যায়, সুভাষ, *হাফিজের কবিতা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ১ ।

১২২. শাফাক, সাদেক রেযা যাদেহ, তারিখে আদাবিয়াতে ইরান, এন্তেশারাতে দানেশগাহে পাহলাভি, তেহরান, ১৩৫২, পৃ. ৫৩৪ ; বাঙালিদের মাঝে আবদুর রহমান জামি প্রথম শাহ মুহম্মদ সগীরকৃত *ইউসুফ জোলেখা* কাব্যের মাধ্যমে পরিচিত হন। বাংলা কাব্যে তাঁর প্রভাব বিদ্যমান থাকলেও যারা উর্দু ও ফারসির চর্চা করতেন তাঁদের মাঝে বহু পূর্ব থেকেই তিনি পরিচিত। বিশেষ করে নাতে রাসুল রচনায় তিনি একজন অদ্বিতীয়।

১২৩. শাফাক, সাদেক রেযা যাদেহ, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩১ ।

১২৪. শাফাক, সাদেক রেযা যাদেহ, পৃ. ৫২২; ইয়াহাকি, মুহাম্মদ জাফর, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান ১ ও ২*, ওযারাতে অমুযেশ ওয়া পারওয়ারেশ, তেহরান, ১৩৭৭ হিশা., পৃ. ২০৩ ।

১২৫. জুনায়দি, আজিমুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৭-৮ ।

১২৬. শাকীবা, পারভীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৫ ।

১২৭. কাইউম, মোহাম্মদ আবদুল সম্পাদিত, *মোহম্মদ বরকতুল্লাহ রচনাবলী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ২২৯ ।

১২৮. কাইউম, মোহাম্মদ আবদুল সম্পাদিত, *মোহম্মদ বরকতুল্লাহ রচনাবলী*, পৃ. ২৩৪ ।

১২৯. সাফা, যাবীহুল্লাহ, *তারীখে আদাবিয়াত দার ইরান জেলদে সূওম-২*, এন্তেশারাতে ফেরদৌস, তেহরান, ৯ম প্রকাশ ১৩৭২হি.শা., পৃ. ১২৯৪ ।

১৩০. দেহখোদা, আলী আকবর, *লুগাত নামে দেহখোদা (৮০ তম খণ্ড)*, তেহরান, ইরান, ১৩৪১ হি., পৃ. ৩৯৫ ।

১৩১. দ্রষ্টব্য, কেরাগাযলো, আলি রেযা যাকাওতি, *কেস্সেহায়ে আমেয়ানে ইরানি*, এন্তশারাতে সুখান, তেহরান, ১৩৮৭ হিশা., পৃ.৩৯-৪১ ।

১৩২. বাদাখশানি, মির্যা মকবুল বেগ, *আদাব নামে ইরান১*, পূর্বোক্ত,, পৃ. ৬৩৬; ইকরাম, এস এম, *রূদে কাউচার*, পৃ. ১৪৮ ।

১৩৩. জুনায়দি, আজিমুল হক, (সংকলক) *মাসিরে আযম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৬; শাফাক, রেযা যাদেহ, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, পৃ. ৫৭৮ ।

১৩৪. সোবহানি, তওফিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২০; জুনায়দি, আজিমুল হক, তদেব, পৃ. ২৪৯; ওয়াহেদ দোস্ত, মাহুশ, ভিযেগীহায়ে বুনিয়াদিনে গাযলে মির্যা আবদুল কাদের বেদিল দেহলভি, *দানিশ*, সংখ্যা-৯৩, ইসলামাবাদ, তাবেস্তান ১৩৮৭, পৃ. ১৯৪ ।

১৩৫. জুনায়দি, আজিমুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৯ ।

*Dhaka University Institutional Repository*

১৩৬. সোবহানি, তওফিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২০।

১৩৭. নায়া, সায়্যেদ ইউসুফ, (ভূমিকা ও সম্পাদনা) *গুযিদেয়ে গাযালিয়াতে বেদীল দেহলাভী,* মুয়াসেসে এন্তেশারাতে কাদয়ানি, তেহরান, ১৩৭৮, পৃ. ২২১।

১৩৮. জাফর, সায়্যেদ আহসান, মিরযা আবদুল কাদের বেদীল আয দীদগাহে মুনতাকেদানে ইরানি, *দানেশ,* পাকিস্তান, বাহার ১০০-১৩৮৯, পৃ. ১২১।

## সহায়ক গ্রন্থাবলি


| | | | |
|---|---|---|---|
| ১. | ড. তওফিক সোবহানী | : | তারিখ ই আদাবিয়াত ইরান |
| ২. | বদীউয যামান ফরুযানফার | : | সুখান ওয়া সুখনাওয়ার |
| ৪. | মেহদী মাহাব্বতী | : | দানিশ ওয়া দানিমমন্দ দার আদাবিযাত ফারসি |
| ৫ . | আগা আহমদ আলী | : | হাপ্ত আসমান |
| ৬. | বাকের যায়নালি | : | এরফান ওয়া তাসাউফ দার আসরে এলখানানে মোগাল |
| ৭. | একবাল ইয়াগমাঈ (সম্পাদনায়) | : | দাস্তানহায়ে আশেকানে আদাবিয়াতে ফারসি |
| ৮. | আহমদ তাফাজ্জলি | : | তারিখে আদাবিয়াতে ইরান পেশ আয ইসলাম |
| ৯. | মগবুল বেগ বাদাখশানী | : | তারিখ ই আদাবিয়াত ইরান (১-২) |
| ১১. | Edward G. Browne | : | A Literary History of Persia (V.3) |
| ১২. | Edward G. Browne | : | A Literary History of Persia (V.4) |
| ১৩. | J. A. Boyle (Edited) | : | The Cambridge History of Iran V.5 |

Dhaka University Institutional Repository

# সপ্তম অধ্যায়: বাংলা কাব্যে ফারসি কাব্যের নন্দনতত্ত্বের প্রভাব

ফারসি কাব্যসাহিত্যে প্রায় তিন শ' ছন্দ রয়েছে। যেসব ছন্দ, মধুর ও প্রচলিত সেসব ছন্দ খাজা হাফিজ শিরাজি ও মাওলানা রুমি তাঁদের কাব্যে স্থান করে দিয়েছেন।[১] প্রতিটি ছন্দের এক একটি করে নাম রয়েছে। যেমন– হেযাজ, রামাল, রেজায ইত্যাদি। বলে রাখা প্রয়োজন যে, ফারসি কাব্যশিল্প অনেক পুরনো ও শক্তিশালী। এ কাব্যের অলঙ্কার ও শিল্পরূপ ইসলামি যুগে গঠিত হয়েছে। অপরদিকে বাংলা কাব্যের শিল্পগুণ একটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

## ফারসি কাব্যের অলঙ্কার

### ফারসি কবিতা

কবিতা আবৃত্তি করে গেয়ে যাওয়ার প্রবণতা প্রাচীনকাল থেকে ইরানিদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। সেসব কবিতা উঁচু নীচু স্বরে সুর করে গাওয়া হত। তাঁদের অধিকাংশ কবিতাই মূলত মুখস্থ ছিল। লিখে রাখার ইচ্ছে কাররই তখন ছিল না। ইসলাম পূর্বযুগের কবিতার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন আবেস্তা গ্রন্থের 'ইয়াশতাহা' অংশে উল্লেখ আছে। এটি ছাড়া ইসলাম পূর্ব যুগের অন্যান্য কবিতা শৈল্পিকগুণে সমৃদ্ধ নয়। ইরানি জাতি আশকানি (২৫০ খ্রি.পূ.- ২২৫ খ্রি.) ও সাসানি যুগে (২২৬ খ্রি.- ৬৫১ খ্রি.) ফারসি কাব্যের চর্চা করতেন।[২] তাঁদের লিখিত নির্দশনাবলির মধ্যে *আবেস্তা* গ্রন্থটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রাচীন গ্রন্থ। এ ছাড়া বিভিন্ন স্থানে খোদাইকৃত লিপিও সে প্রমাণ রাখে। যেখানে বিচ্ছিন্ন ও ক্ষুদ্র আকারে ছোট্ট ছোট্ট ছন্দে কবিতা রয়েছে। জরথুস্ত্রীয় ধর্মীয় গ্রন্থ *আবেস্তায়* যে পাঁচটি ভাগ রয়েছে তন্মধ্যে 'ইয়াসনাহা' অংশটি অন্যতম। এ অংশের গাহানগুলো প্রাচীন ফারসির কবিতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। জরথুস্ত শিষ্যদের মাঝে ধর্ম বিষয়ে গুনগুন করে যেভাবে কবিতা আবৃত্তি করতেন সেগুলোর নাম দেয়া হয় 'গাহান'[৩]। ইয়াসনাহার পুরো অংশে 'গাহান' রয়েছে। যা এক ধরনের গীতিধর্মী কবিতা বা প্রশংসাসূচক কাব্য। পারস্যে ইসলাম ধর্ম আত্নপ্রকাশের পূর্বে কবিতা চর্চা

Dakha University Institutional Repository

হত। *আবেস্তা* গ্রন্থে 'ইয়াসনাহা' অংশটি সে দিকেরই ইঙ্গিত বহন করছে। এ ছাড়া *ভিচ ও রামিন* রচনাটির মূল ভাষা ছিল পাহলভি আশকানি। এটি ইসলামি যুগে কাব্যাকারে ফারসি ভাষায় অনূদিত হয়। এটিও একটি প্রাচীন যুগের কাব্যচর্চার জন্য প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা যেতে পারে।[৪] হাখামানশি যুগের বাদশাহদের কতক খোদাইকৃত লিপিতে ছন্দ মিলের প্রমাণ রয়েছে। সে থেকেও ফারসি ভাষার কবিতার ছন্দ মিলের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। ফারসি কবিতা আবৃত্তির ধারাটি সাসানি যুগ বা তৎপরবর্তী সময় থেকে সূচিত হলেও ছন্দ নামকরণ ও কাব্যে আরুজ (عروض) ও বালাগাত (بلاغت) এক কথায় কাব্যে অলঙ্কার -এর প্রয়োগ হতে অনেক সময় অতিবাহিত করতে হয়। এক শ্রেণির গবেষক এই ফারসি ছন্দশাস্ত্রকে আরবি কবিতার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে দাবি করেন। ইরানি লেখকগণ এ কথা স্বীকার করে নিয়েছেন যে, ফারসি কবিতা আরবি কবিতার উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও ব্যবহারের জন্য এর নিয়ম-কানুনগুলো নিজেদের সৃষ্টি। কেননা, ইরানি জাতি প্রাচীনকাল থেকে কবিতা চর্চা করে আসছেন।[৫] সে দিক থেকে তাঁদের কাব্যরীতিটিও অনেক পুরনো। মাদি যুগে পদ্যরীতির প্রচলন ছিল। তাঁদের কবিতার বিষয়বস্তু ছিল জাতির উত্থান ও বীরত্ব।[৬] ইরানের পশ্চিম অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রাচীন রীতি অনুসরণ করে কবিতা আবৃত্তি করত। তাঁদের কাব্যরীতিতে আট থেকে বার হেজা (Syllable) ছিল। এমনকি কবিতার শেষে মিল পাওয়া যেত।[৭] এ সময়ে তাঁরা দু'ভাবে কবিতা আবৃত্তি করতেন। একটি ছিল নাজমে হিজাই ও অন্যটি নাজমে জারবি। নাজমে হিজাই ধারার মধ্যে ভারতীয় কবিতা অর্ন্তভুক্ত রয়েছে। প্রাচীন ভারত ও ইরানের কবিতাগুলো আট হিজাইর মাধ্যমে আবৃত্তি করা হয়। হিন্দুদের বেদ ও পুরান তাঁর উৎকৃষ্টতম নমুনা। আবেস্তা গ্রন্থের 'ইয়াশতাহা' অংশে আট হিজাই বিশিষ্ট কবিতা রয়েছে।[৮] এটি প্রাচীন ফারসির রূপকে ধারণ করেই গঠিত হয়েছে। আশকানি বাদশাহগণ যে ভাষা ব্যবহার করতেন সে ভাষার নাম দেয়া হয় 'আশকানি ভাষা'। এই পাহলভি আশকানি ভাষায়ও কাব্যচর্চা হত। এ সময়ের যে নিদর্শন পাওয়া যায় তা অনেকেই মনে করেন এটি জরথুস্তের বা হযরত ঈসা (আ.)-এর নিদর্শন। সে নিদর্শনের মাঝে কাব্যরূপটি বিদ্যমান রয়েছে।[৯] প্রাচীন ও মধ্যস্তরের শুরুতে যে সব কবিতা আবৃত্তি করা হত অনেকাংশই ছিল প্রশংসাসূচক কবিতা। জরথুস্তের ধর্মগ্রন্থে যে কবিতা রয়েছে সেখানেও জরথুস্ত্রের প্রশংসায় রচিত। তবে সেসময় এমন বিষয়ও কাব্যচর্চা হত যা ছিল বিরত্ব ও চরিত্রমূলক।[১০] ধর্মীয় মজলিসে ছন্দের তালে তালে কবিতা আকারে যা উপস্থাপিত হত তা ছিল এক ধরনের গীতি কবিতা। এ থেকে আমারা ইরানিদের মধ্যে গান গাওয়ার যে প্রচলন পাই তা প্রত্যক্ষ করি। তৃতীয় হিজরি শতক থেকে ভিন্ন ধারায় কবিতা চর্চার প্রচলন শুরু হয়েছে। ইরানিদের মাঝে এরূপ কবিতার ছন্দ ও কবিতার ধরন পদ্ধতি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা চলে। ফলে তাঁরা ছন্দপ্রকরণ ও অলঙ্কার বিষয়ে গ্রন্থ

Dhaka University Institutional Repository

রচনা করেন। উল্লেখ্য যে, পূর্বের কবিতার ধারা ছিল একেবারে সাধারণ বা সাদাসিদে। তবে কবিতার মধ্যে ছন্দ মিল থাকা একটি অপরিহার্য বিষয় হিসেবে সবসময় বিদ্যমান ছিল। নতুন বা পুরাতন যে কোন ধরনের কবিতা হউক তাতে ছন্দমিল বিদ্যমান থাকবে। সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে গদ্যের বিপরীত হলো কবিতা। যেখানে চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিযুক্ত কথা ছন্দ আকারে উপস্থাপন করা হয়।[১১] ছন্দের মাধ্যমে কবিতা শ্রোতাকে আকর্ষণীয় করে তোলে। যে কবিতায় ছন্দ ও তাল নেই সেটি আবরণহীন কবিতা। কবিতায় ছন্দ-মিল ও অলঙ্কার থাকা কাব্যশৈলীর একটি গুণগত পরিচয়।[১২]

## ফারসি কাব্যের বিশেষ রূপ

**১. কাসীদে বা কসীদা (قصیده):** আরবি কাস্‌দ শব্দের অর্থ হলো ইচ্ছা, উদ্দেশ্য, বাসনা প্রভৃতি। যেহেতু কবি কবিতা আবৃত্তির ক্ষেত্রে একটি ইচ্ছাপোষণ করে থাকেন সে থেকেই ফারসি কবিতায় স্বতন্ত্র নাম দেয়া হয়েছে কসীদা। সাধারণত এটি প্রশংসা বা নিন্দাবাচক বা শোকগাঁথামূলক কবিতাকে বুঝিয়ে থাকে। যেমন- কারো প্রশংসা বা কল্যাণের জন্য কবিতা রচনা করা হলে সেটি কসীদায় পরিণত হয়।[১৩] কসীদার শ্লোক সংখ্যা বিশ থেকে সত্তর পর্যন্ত হয়ে থাকে। এ ধরনের কবিতায় একই ছন্দ ও অন্ত মিল থাকা অপরিহার্য। এই রূপটি ফারসি কাব্যের নিজস্ব নয়; বরং আরবি কাব্য সাহিত্য থেকে এসেছে। তবে কসীদায় শ্লোক সংখ্যা হওয়া নিয়ে নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নেই। ১৮ থেকে ২০ শ্লোক এবং অনেক সময় তার চেয়ে বেশি ১৫০ শ্লোক পর্যন্ত পাওয়া যাবে। অনেক কবিদের *দিওয়ানে* কসীদার শ্লোক সংখ্যা ১৮ এর নীচে ও ১৫০ শ্লোকের উপরে বিদ্যমান রয়েছে।[১৪]

কসীদার অনেকগুলো প্রকার রয়েছে। কসীদায় কখনো কারও প্রশংসা বা বড়ত্ব প্রকাশ করে থাকলে মাদ্‌হিয়ে (مدحیه) আবার কারো খারাপ ও মন্দ প্রকাশ করে থাকলে হাজভিয়ে (هجویه) বলে। হাসি-ঠাট্টা বা রসিকতামূলক কসীদার নাম হাযলি (هزلی)। তদ্রুপ এন্তেকাদি (انتقادی), শেকোভে (شکویه), ফাখরিয়ে (فخریه), হাস্‌বিয়ে (حسبیه), মারসিয়ে (مرثیه) ও তা'যিয়াত (تعزیت) প্রকারগুলো বিশেষ বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে থাকে।[১৫] প্রকারগুলো কসীদাকে অধিকতর সমৃদ্ধ করে তোলেছে। এ কথা সত্য যে, ফারসি কাব্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের নাম হলো কসীদা। সে কসীদায় যেসব কাব্যশৈলী উপস্থিত থাকা প্রয়োজন তন্মধে উল্লেখযোগ্য হল: মাতলা' (مطلع), তাগায্‌যুল (تغزل), তাখাল্লুস (تخلس), মাকতা' (مقطع) প্রভৃতি। এ সবের প্রতিটি শব্দই কাব্যের শিল্পগুণের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন- কসীদার শেষ শ্লোককে মাকতা' বলে। যদি সে শ্লোকটি সুন্দর ও তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ বহন করে তখন তাঁকে 'হুসনে মাকতা' হিসেবে অভিহিত করা হয়ে

থাকে।[১৬] এগুলো যে শুধু ফারসি কসীদামূলক কাব্যের বৈশিষ্ট্য তা নয়; মূলত ফারসি কবিতার ধারাটি এভাবেই শিল্পসমৃদ্ধ হয়ে গড়ে ওঠেছে।

ফারসি কবিদের মধ্যে কসীদা রচনায় যাঁরা বিশেষভাবে পারদর্শী তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন: রুদাকি সামারকান্দি (মৃ. ৩২৯ হি.), দাকিকি তুসি (মৃ.৩৬৯ হি.), ফাররুখি সিস্তানি (মৃ. ৪২৫ হি.), উনসুরি বালাখি, (মৃ. ৪৩৮ হি.) মনোচেহেরি দামগানি (মৃ. ৪৩২ হি.), গোযায়ের রাযি (মৃ. ৪২৬ হি.), কেতরান তিবরিযি (মৃ. ৪৬৫ হি.), নাসির খসরু কোবাদিয়ানি (মৃ. ৪৮১ হি.), মাসউদ সাদ সালমান (মৃ. ৫২৫ হি.), কামাল উদ্দিন ইস্পাহানি (মৃ. ৫৩৫ হি.), সাদি শিরাজি (মৃ. ৬৯৫ হি.), আমির খসরু দেহলাভি (মৃ. ৭২৫ হি.) ও সালমান সাভযি (মৃ. ৭৭৯ হি.) প্রমুখ।[১৭]

২. গাযাল (غزل) : বাংলা ভাষায় শব্দটি গজল নামে পরিচিত। এ শব্দটি আরবি। এটির অনেক অর্থ রয়েছে। যেমন– প্রেম, প্রণয়, প্রেমালাপ প্রভৃতি। মূলত মহিলাদের সাথে কথা বলা ও প্রেমের আলাপ করাকে গজল বলে। এক কথায় গজল হলো প্রেমময়ী কথা। ফারসি ভাষায় গযলের চারটি পরিভাষাগত অর্থ রয়েছে। যথা- ১. টুকরো কয়েকটি শ্লোকের সমষ্টির নাম গজল। ২. প্রেমের গান গাওয়া। ৩. প্রেমিকসুলভ কবিতা বলা ও ৪. প্রচলিত গীত গাওয়া। সংজ্ঞা অনুযায়ী এটি এমন একটি কবিতা, যার মধ্যে 'হাম ওযন' এবং 'হাম কাফিয়া' হবে। অর্থাৎ কবিতায় একই ছন্দ ও একই অন্তমিল পাওয়া যাবে। কবিতার প্রথম ছত্র হবে মাতলা'। যে কবিতায় ৫ বা ১৪ টি শ্লোকে একই ছন্দ, এক অন্তমিল কাফিয়া এবং মাতলা বিদ্যমান থাকবে। বয়েতের সংখ্যা কখনো ১৯ বা ২০ থাকা বিষয় নয়।[১৮]

প্রথম দিকের গজল কবিতা আবৃত্তি ঠিক আজকের নিয়ম মাফিক হতো না। অনেকটা কসীদার ন্যায় কবিতা আবৃত্তি করা হত। তৃতীয় ও চর্তুথ হিজরি শতক থেকে গজল কবিতা ক্রমান্বয়ে বিস্তৃতি হতে থাকে। তবে গজল কবিতা কোনো কালেই অবহেলিত ছিল না।[১৯] গজলের উদ্ভাবক হিসেবে কবি রুদাকি, কবি শাহীদ বালখি এবং কবি দাকিকিকে গণ্য করা হয়। গজল কবিতায় বিষয়বস্তুর অনুসারে স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান রয়েছে। কখনো গজলে কেত্‌আবন্দ কবিতা লেখা হয়ে থাকে। যার মধ্যে দুই বা ততোধিক শ্লোক হতে পারে। গজলের শেষের শ্লোকে কবির বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়। প্রথম দিকে গজল শুধু প্রেম নিবেদনের জন্য ব্যবহৃত হতো। পরিবর্তনশীল সময়ের সাথে তার মধ্যে তাসাউফ ও উত্তম চরিত্রের বিষয়গুলো অর্ন্তভুক্ত হচ্ছে।[২০] এই গজল কবিতা ইরানিদের সৃষ্টি। আরবরা কসীদায় প্রেমের

Dakha University Institutional Repository

ঘটনাবলি বর্ণনা করে থাকেন। যাকে তারা 'নাসীব' বলে অভিহিত করেছেন। এই 'নাসীব' হলো কসীদার একটি অংশ। ইরানি কবিগণ গজলকে কাব্যসাহিত্যের সৃষ্টিশীল বস্তু হিসেবে গণ্য করে থাকেন। ফারসি সাহিত্যের বহু কবি গজল রচনা করেছেন। প্রথম দিকের গজলে কোনো বিশেষ ধরনের বিষয় সম্পৃক্ত ছিল না। কবি রুদাকি যুগ ও তাঁর পরবর্তী সময়ের দিকে এসে গজলের মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য যোগ হয়েছে। এটি শুধু প্রেম নিবেদন বা আশেক-মাশুকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি। একটি বিষয় থেকে বেড়িয়ে সুফি ভাবধারা, প্রজ্ঞা-দর্শন ও চরিত্র ইত্যাদি বিষয়েও গজল রচনা শুরু হয়েছে।[২১]

গজলে প্রেমের কাহিনী বর্ণনার দিকটি বহু পুরনো। এ ক্ষেত্রে হানজালে বাদগীসির অবদান স্মরণযোগ্য। তৃতীয় হিজরি শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে গজলে প্রেম বিষয়টি উপস্থিত রয়েছে। প্রেমপূর্ণ গজল তৃতীয় হিজরি শতকের পর পূর্ণমাত্রায় বিস্তার লাভ করে। তবে গজলে কোনরূপেই অত্যধিক শব্দ ও বাক্য ব্যবহারের মাধ্যমে দীর্ঘ বক্তব্য দেয়া সমীচীন নয়। সংক্ষিপ্ত রূপে প্রেমের কাহিনী বর্ণনাই গজলের উদ্দেশ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।[২২] হৃদয়গ্রাহী গজল হিসেবে কবি রুদাকির গজল প্রশংসাযোগ্য। তিনি গজলে বিশেষ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। এটি এ কারণে যে, তাঁর গজল অতুলনীয় ও সৃষ্টিশীল ছিল। তাঁর সমসাময়িক কবি বালখিও ভাল গজল আবৃত্তি করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে গজলে কবি ফররুখি, কবি সানাই, কবি মুয়িযি খ্যাতি লাভ করেছেন।[২৩] চতুর্থ ও পঞ্চম হিজরি শতকেও কবিরা ভাল গজল উপহার দিয়েছেন। এসব গজলে সুফিবাদী ধারা মিশ্রিত ছিল। তখন তাঁদের গজলে এরফান ও আখ্লাক একটি প্রধান বিষয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ ক্ষেত্রে ফরিদ উদ্দিন আত্তার, শেখ সাদি শিরাজি ও মাওলানা রুমি প্রমুখ কবি অন্যতম।

**৩. কেত্এ (قطعه):** এর আভিধানিক অর্থ হল- টুকরো ও খণ্ড-বিখণ্ড। পরিভাষাগতভাবে শব্দটির অর্থ বিস্তৃতিভাবে করা হয়ে থাকে। কয়েকটি অন্তমিলবিশিষ্ট কবিতাকে বলা হয় কেত্এ। যেখানে একটি ওযন ও মিলের মধ্যে সমন্বয় থাকবে। প্রথম কয়েকটি কবিতায় মাত্লা হওয়া প্রয়োজন নেই। অনেক কবি কেত্এ লিখেছেন। যে সব কবির *দিওয়ান* রয়েছে তাতে কেত্এ অবশ্যই পাওয়া যাবে।[২৪] এটি ফারসি কাব্যের ছন্দশাস্ত্রের কাঠামোতে গঠিত।

**৪. রুবাই /রোবাঈ (رباعى) :** চার চরণ বিশিষ্ট ও দুই শ্লোকের কবিতাকে রুবাই বলা হয়। এ ধরণের কবিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের একই অন্ত্যমিল থাকতে হবে। কখনো কখনো চারটি চরণই একই অন্ত্যমিলের হয়ে থাকে। কবিতায় একটি অপরটির সাথে সম্পর্ক রেখে মিল পাওয়া

রুবাই রীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রুবাই শব্দটি আরবি। যার অর্থ হলো চৌপদি, চর্তুগুণ। এটিকে কবিতার একটি রীতির নাম দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ চার পঙ্‌তি বিশিষ্ট কবিতাকে রুবাই বলে। যার প্রথম, দ্বিতীয় এবং চর্তুথ পঙ্‌তি একই অন্ত্যমিল হবে। তবে চারটি পঙ্‌তি অন্ত্যমিল হওয়া দোষের কিছু নয়। পুরনো কবিদের মধ্যে চার পঙ্‌তিতে অন্ত্যমিল হওয়ার প্রচলন রয়েছে। তৃতীয় পঙ্‌তিটি কাফিয়া হওয়া থেকে মুক্ত। এটিই উত্তম পদ্ধতি। রুবাই রীতিতে মিলটি 'বাহরে হেজাজ মুসাম্মান আখরাব' হয়ে থাকে। এ ধরনের ছন্দরীতি কবিতা রচনায় ওমার খৈয়াম প্রসিদ্ধ।[২৫] রুবাই রীতির কবিতায় তিনটি বিষয় বিদ্যমান রয়েছে। যথা- প্রেম, সুফিবাদ ও দর্শন। এ ক্ষেত্রে কবি রুদাকি, শাহিদ বালখি, ফাররুখি, উনসুরি, নিজামি গাঞ্জুবি, সানাই, আত্তার নিশাপুরি, মাওলানা রুমি ও ওমার খৈয়াম বিশেষ অবদান রেখেছেন। নিম্নে শাহিদ বালখির একটি রুবাই রীতির কবিতা তুলে ধরা হল।

دوشم گذر افتاد به ویرانهٔ طوس – دیدم جغدی نشسته جای طاووس

گفتم چه خبر داری ازین ویرانه- گفتا خبر این است که افسوس افسوس [26]

গত রাতে তুসের বিরান ভূমি দেখেছি, একটি পেঁচা ময়ূরের স্থানে বসে আছে। আমি তাকে বললাম, এই বিরান ভূমির কী সংবাদ আছে? সে বলল, সংবাদ তো একটিই, আফসোস আফসোস।

**৫. মসনবি/ মাসনাভী (مثنوی)** : উৎপত্তিগতভাবে মসনবি শব্দটি আরবি। এর শাব্দিক অর্থ হলো, দুই দুই। পরিভাষাগতভাবে কবিতার প্রতিটি লাইনে মিল থাকাকে মসনবি বলে। মিলটি একই ধরনের; তবে মিলের ধারা হবে ভিন্ন। সাধারণত মসনবি দুই চরণবিশিষ্ট কবিতাকে বলা হয়ে থাকে। যার প্রতিটি শ্লোকেরই ভিন্নতর অন্ত্যমিল রয়েছে। এর ছন্দ মাত্রা একই হয়ে থাকে। এ ধরনের কবিতার বিষয়বস্তু কাহিনী, অধ্যাত্নবাদ বা উত্তম চরিত্র বিষয়ক হলে কোন সমস্যা নেই। এ ছাড়া ইতিহাস ও গল্প বর্ণনার ক্ষেত্রে উৎকৃষ্টতম পদ্ধতি হলো মসনবি।[২৭] ঐতিহাসিক ঘটনা, প্রেমের ঘটনা, কল্পকাহিনী, এরফান ও হেকমত পূর্ণ কবিতা মসনবি রীতির একটি বৈশিষ্ট্য। ফারসি কাব্য সাহিত্যের অন্যতম সৃষ্টি ও আকর্ষণীয় কাব্যরীতি মসনবি কবিতা। গবেষকদের মধ্যে কেউ এটি আরবীয়দের অবদান হিসেবে মন্তব্য করে থাকেন। তবে এটির তাৎপর্যপূর্ণ ভিত্তি নেই। প্রাচীন আরবি সাহিত্যে মসনবির অস্তিত্ব পাওয়া যায়না। যদিও সে সময় ইতিহাস ও ঘটনাবলি কবিতা আকারে লেখা হয়েছিল।[২৮] তবে এ কথা স্বীকার করে নিতে হবে যে, ফারসি কবিতায় ইতিহাস বিষয় যেভাবে উপস্থিত আছে আরবি কবিতায় তদ্রুপ নেই। ঘটনাবলি ও ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রে মসনবি পদ্ধতিটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি পদ্ধতি। আরবি সাহিত্যে মসনবি রীতির কবিতা শুরু থেকেই অনুপস্থিত রয়েছে। ফারসি সাহিত্যে মসনবি আঙ্গিকের কবিতার মাধ্যমে ঘটনা, ইতিহাস, চরিত্র ও সুফিতত্ত্ব বিষয়াবলি তুলে ধরা

Dhaka University Institutional Repository


হয়। যেহেতু পারস্যে সবচেয়ে নানা ধরনের ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। তাই কবিতায় বর্ণনার জন্য মসনবি পদ্ধতিটি উৎকৃষ্টতম। কবিতার ছাঁচে ধারাবাহিকভাবে বিষয়াবলি বর্ণনা করতে অধিকতর সহজ হয়। কাব্যের মাধ্যমে ঘটনাবলি স্থায়িত্বদানের জন্য মসনবি পদ্ধতিটি একটি ভালো দিক।[২৯] তাতে ঘটনাটি ছন্দমিলের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়।

মসনবি পদ্ধতিতে সমস্ত কবিতায় ছন্দের মিল রয়েছে। কোথাও কোনো ধরনের ছন্দ মিল না পাওয়া গেলে সেটি মসনবি রীতির কবিতা নয়। এ রীতির কবিতায় পঙ্‌তি সংখ্যার মধ্যে এক ধরনের স্বাভাবিকতা পাওয়া যাবে। বিষয়ের মধ্যেও কোনো ধরনের ব্যতিক্রম বা তারতম্য নেই বরং সাধারণ মানের। যেমন– প্রেম ভালবাসা, সুফি ভাব ধারা, ঘটনা, চরিত্র, ইত্যাদি। যে কোনো বিষয় মসনবি রীতির কবিতায় পাওয়া একেবারেই স্বাভাবিক। কবিতা রচনার ক্ষেত্রে মসনবি এমন এক পদ্ধতি যেখানে কবি তার বিষয়গুলো সহজভাবে ব্যক্ত করতে পারেন। প্রথম রুদাকি সামারকান্দি অকপটে নাসর বিন সামানির নির্দেশে *কালিলা ও দিমনা* মসনবি পদ্ধতিতে রচনা করেছেন। পরবর্তীতে তাঁর অনুসুরণ করে অন্য কবিরাও এ ধারায় কবিতা রচনা করতে মনোযোগী হন। মসনবি রীতিটি সবার নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণেই কবি রুদাকি অল্প সময়ে মসনবি রচনার প্রসার ঘটিয়েছেন। ফারসি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিগণ মসনবিমূলক রচনা ছাড়া প্রসিদ্ধি পাননি। প্রতিটি খ্যাতনামা কবির মসনবিমূলক কাব্যরচনা বিদ্যমান রয়েছে। এ কারণে ফারসি সাহিত্যে মসনবি পদ্ধতির কবিতা বিশালভাবে প্রসার ঘটেছে। ফারসি কবিদের মধ্যে এ রীতি বদ্ধমূল যে, তাঁরা মসনবি পদ্ধতিতে কাহিনী চিত্রিত করার মাধ্যমে উপদেশ, নসহিত প্রদানে বেশি সচেষ্ট ছিলেন। মসনবি কবিতা পাঠের মাধ্যমে যেমন কোনো ঘটনা সহজভাবে বুঝা যায় তেমনি ঘটনার বিবরণের সাথে সাথে চরিত্র সংশোধন, জীবন ও মানবতাবোধ জাগ্রত করে তোলে। ঐতিহাসিক ঘটনাবলির বর্ণনা প্রদানে মসনবি রীতির ব্যবহার ও গুরুত্ব অত্যধিক। যেমন–ফেরদৌসির *শাহনামে* (شاهنامه), নেজামি গাঞ্জুবির *খামসা* (خمسه), দাকিকীর *গোশ্তাসেব* নামে (گشتاسب نامه) , ও মাওলানা রুমির *মসনাবিয়ে মনুভি* (مثنوی معنوی) উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।[৩০] নিম্নে *বুস্তানে* সাদি থেকে মসনবি রীতির একটি গল্প কথা উপস্থাপন করা হল।

سگی پای سحرانشینی گزید- به خشمی که زهرش ز دندان چکید
شب از درد بیچاره خوابش نبرد- به خیل اندرش کودکی بود خرد[31]

কোন একদিন কুকুরের পায়ে কাঁটা ফুটল অস্থির হয়ে সে ক্ষতস্থানে চাটতে লাগল।
রাত তাঁর অতিবাহিত হল ব্যাথায়- তার কাছেই ছিল বুদ্ধিমত্তা ছোট্ট বাচ্চা।[৩১]

## দু'টি বিশেষ নামের কবিতা

১. মর্সিয়া (مرثیه): শব্দটি মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত। মূলত কারো মৃত্যুর পর আফ্‌সোস বা দুঃখ কষ্টের বর্ণনা দানকে মর্সিয়া বুঝায়। যেখানে মৃত ব্যক্তির গুণগান বা প্রশংসা থাকবে। অতি নিকটের পরিবার -পরিজন বা বন্ধু-বান্ধব, বাদশাহ বা মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির উপর ব্যাথা ও কষ্টের কথা ধর্মের নিয়ম অনুযায়ী ব্যক্ত করা হয়ে থাকে।[৩২] মর্সিয়া সাধারণত মাতমকে বলা হয়ে থাকে। ফারসি সাহিত্যে প্রশংসা ও শোকগাথা কবিতা একই সময় উৎপত্তিলাভ করেছে। প্রশংসিত ব্যক্তির উপর যেমন প্রশংসা করে কবিতা আবৃত্তি করা হয় তেমনি মৃত্যুর পর ঐ ব্যক্তির উপর শোকমূলক কবিতা পাঠ করা হয়। কবি তাঁর অনুভব, ভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে কবিতা রচনা করে থাকেন। কবি রুদাকি, আবুল হাসান, ফেরদৌসি ও হাফিজ স্ব স্ব পুত্রের উদ্দেশ্য করে মর্সিয়া পাঠ করেছিলেন। গজল, কেত্‌এ, কসীদা রীতির কবিতা মর্সিয়া হতে পারে।[৩৩] এটি কোনো বিশেষ ব্যক্তি এবং কারবালার হৃদয় বিদারক কাহিণীর সাথে সম্পৃক্ত নয়। সাধারণত ফারসি সাহিত্যে ইমাম হোসাইন (রা.) ও তাঁর সাথীদের শাহাদাত এবং দুঃখ কষ্টের বর্ণনাকে মর্সিয়া কবিতা হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়। আরবদের মধ্যে মর্সিয়া কবিতার রেওয়াজ রয়েছে। তবে তাঁদের মর্সিয়া কবিতা ততটা প্রসিদ্ধ নয়। কবি ফররুখি, শেখ সাদি ও কবি আমির খসরু মর্সিয়া রচনা করেছেন। ফারসি সাহিত্যে কারবালার ঘটনা বর্ণনায় মর্সিয়া কবিতা পরিচিতি পেয়েছে। মূলত কবিদের সব যুগে মর্সিয়া কবিতা রচিত হয়েছে।

২. হামাসে (حماسه): এটির অর্থ হলো বীরত্বগাথা। ফারসি সাহিত্যে বীরত্ববিষয়ক কবিতাকে হামাসে বলে। এ ধরনের কবিতা জাতির সৌর্যবীর্যের পরিচয় বহন করে থাকে। এ জাতীয় কবিতা দেশের জন্য সুনাম ও স্বীকৃতি এ দু'টোই কাম্য সম্ভব। বীরত্ব সৃষ্টি ও প্রাচীন সাহিত্য হিসেবে হামাসে কবিতার প্রসিদ্ধি আছে। একটি দেশের যুদ্ধ-বিগ্রহ, বীরত্ব ও গৌরবগাথা ইতিহাস বুঝানোর জন্য হামাসে রীতির কবিতা রচিত হয়। এধারার কবিতায় জাতীয় শক্তির পরিচয় তুলে ধরাই উদ্দেশ্য। এতে কবি ইতিহাসকে কল্পনা ও শব্দতুলির মাধ্যমে জাগ্রত করে রাখার চেষ্টা করেন।[৩৪] তবে হামাসে রীতির কবিতাও যে কোনো যুগের সেরা কাব্যসাহিত্য হতে পারে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বীরত্ববিষয়ক কবিতা রচনা প্রাচীন সহিত্যের রীতিসমূহের একটি। যদিও যুদ্ধ, বীরত্ব ও লড়াই ইতিহাসের বিষয়ের সাথে ততটা সম্পৃক্ত নয়। বীরত্বগাথা কাহিনী পদ্য আকারে উপস্থাপন ফারসি কাব্য সাহিত্যের একটি বৈশিষ্ট্য। প্রথম বীরত্বগাথা কাহিনী হিসেবে শাহনামাকে সে ক্ষেত্রে উপস্থাপন করা যেতে পারে। তবে এটি চরিত্র সংশোধন, প্রেম নিবেদন ও প্রভু চেনার দর্শনের বিষয় হতে মুক্ত

নয়। বীরত্বমাখা ঘটনা প্রথমে কেচ্ছা কাহিনী আকারে উপস্থাপন করা হত। যেমন সোহরাব রুস্তমের কাহিনী। প্রাচীন ইরানে তখন অনেকের হৃদয়ে স্বভাবত এসব বীরত্বমূলক ঘটনা বিদ্যমান থাকত। সাধারণ মানুষ তাঁর বংশধরদেরকে বীরত্বের কাহিনী গর্ব করে বলতেন। তখন তা লিখে রাখার মত বিষয় ছিল না বলে কেউ লিখে রাখে নি।[৩৫] যখন লিখে রাখার সময় এসেছে তখন থেকেই হামাসে লেখা শুরু হয়। যেমন ফেরদৌসির সময়ে সোহরাব রোস্তমের কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে। তা থেকেই প্রসিদ্ধি পেয়েছে কাব্যাকারে হামাসে কাহিনী। কবি ফেরদৌসির শাহনামা হামাসে কাব্য হিসেবে পরিগণিত হয়।

হামাসে ধাঁচের কবিতার উদ্ভব ঘটেছে গ্রীক সাহিত্যে। আভিজাত্য ও মাতৃভূমির গৌরবের কথা লেখা হত হামাসায়। কবিরা কল্পনাশক্তির মিশ্রণে গ্রীক ইতিহাস ফুটিয়ে তুলার উদ্দেশ্য হামাসা লিখতেন। ফারসি সাহিত্যেও তদ্রুপ হামাসায় যুদ্ধ কাহিনী ও পূর্ববর্তী বংশের গৌরবের কথা রয়েছে। সেই সাথে জাতিকে জাগ্রত করে তুলার ও শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। যাতে হামাসে পাঠের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।[৩৬] হামাসে তিনটি বৈশিষ্টের মাধ্যমে পাওয়া যেতে পারে। কাহিনী, বীরত্ব ও কবিত্বমূলক হিসেবে। সকল জাতির মধ্যে বীরত্বমূলক কাহিনী থাকলেও হামাসে নেই। যেমন–আরবি কবিতায় হামাসে রীতির প্রচলন নেই।

ফারসি কাব্যে ঘটনা আকৃতিতে শোক গাঁথা ও দোআ গজল, মসনবি, রুবাই, কসীদা রীতির মাধ্যমে ব্যবহার হয়। তবে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গযল রীতিটি। গজলের ক্ষেত্রে যে ভাব ও রস পাওয়া যায় তা একমাত্র প্রেমিককে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে।[৩৭]

### ফারসি কবিতার ছন্দরীতি

ফারসি ভাষাটি ইন্দো-ইউরোপীয় গোত্র থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে- যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়। এ গোত্রের শাখাগুলো একটি নির্দিষ্ট নিয়মের ভিত্তিতে পরিচয় লাভ করে থাকে। যেমন, এক শাখার মধ্যে যে গুণগত বিষয় আছে তা সব শাখার মধ্যে পাওয়া যাবে। আওয়ায বা ধ্বনি একই নিয়মে সকল ভাষায় প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। স্বর উচু বা নিচু হওয়ার বিষয়টিও একই নিয়মে সকল শাখায় বিদ্যমান। যে কারণে কবিতার মধ্যেও স্বর ওঠা নামা করে থাকে। এটিও একটি ইন্দো-ইউরোপীয় গোত্র শাখার বৈশিষ্ট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।[৩৮] সংস্কৃত ও বৌদ্ধ ভাষার কবিতায় স্বর ওঠা-নামার বিষয়টি উপস্থিত রয়েছে। মূলত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য হলো স্বর উঠা-নামা করা। এ শাখার

Dhaka University Institutional Repository


ভাষাগুলোর কাব্যছন্দেও তা পাওয়া যায়। কবিতায় স্বরের যে উঠা-নামা হয়ে থাকে এটিকে আলাদা করে দেখার কোন অবকাশ নেই।

ফারসি সাহিত্যে ছন্দ সর্ম্পকিত বিদ্যার নাম হলো এলমে আরুজ। যাকে ছন্দশাস্ত্র হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। কবিতায় ছন্দ মাত্রা ও ছন্দ মাত্রার প্রকরণ নিয়ে আলোচনা করাই এ বিদ্যার মূল উদ্দেশ্য।[৩৯] ইরানি জাতি ছন্দশাস্ত্রের জ্ঞান পেয়েছিল আরবদের থেকে। ওযন, বাহর ও আরকান ইত্যাদি আরবি শব্দ যা ছন্দ মাত্রার পরিভাষা হিসেবে গণ্য করা হয়। বিশেষ করে ইসলাম পরবর্তী সময়ে ইরানিগণ আরবি ভাষার প্রতি মনোযোগের কারণে তাঁদের ছন্দশাস্ত্রে এসব পরিভাষা গ্রহণ করেছিল। সে থেকে ফারসি কাব্যে আরবির নিয়ম-কানুন প্রবেশ করেছে।[৪০] তবে নিজেদের কাব্যধারা ও রীতি অর্ন্তভুক্ত হওয়ায় তাঁরা নতুন ছন্দশাস্ত্র তৈরী করতে সক্ষম হয়। এ শাস্ত্রের প্রধান বিষয়গুলো হল নিম্নরূপ:

১. শে'র (شعر): এটির অর্থ জানা, জিজ্ঞাসা করা। সাধারণত এটির কবিতার অর্থটিই প্রসিদ্ধ। যে কারণে মিল জাতীয় বক্তব্যকে কবিতা বলা হয়ে থাকে।

২. ওযন/ওজন (وزن): এ শব্দটির অর্থ হলো মাপ দেয়া। দুই বাক্যে সমতা অনুযায়ী স্বরের উঠা নামা সমান থাকার নামই ওযন।

৩. বাহার (بحر): কবিতার মাত্রা বা ছন্দকে বাহার বলে। নির্দিষ্ট কতগুলো শব্দের সমষ্টি যার উপর ভিত্তি করে কবিতার তাল বা ওযন সঠিক বা ভুল নির্ণয় করা হয়।

৪. তাক্তি'(تقطیع): এ শব্দের অর্থ, টুকরো টুকরো করা। কবিতায় টুকরো টুকরো করে ওজনের বৈশিষ্ট্যগুলো দেখানো হয়।[৪১]

ফারসি কাব্যের জন্য যে ছন্দজ্ঞান রয়েছে আধুনিক গবেষকগণ সেগুলো কবিতার মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁদের দৃষ্টিতে কবিতার উপাদানগুলো নিম্নরূপ:

১. বেইত (بیت) : শব্দটি আরবি। এর অর্থ হলো বাড়ি, ঘর। শব্দটি সাধারণত 'বয়েত' হিসেবে পরিচিত। দ্বিপদী শ্লোক বা কবিতার পঙতিকে বুঝিয়ে থাকে। বেইত কবিতাকে বিস্তৃত ও ছোট্ট করে। পাশাপাশি দুটি লাইন অর্থ বুঝালে বেইত হয়। সে বেইতের একটি লাইনকে বলে মেছ্রা।

২. কাফিয়ে (قافیه) : এটি কবিতার অন্ত্যমিল কে বুঝিয়ে থাকে। পরিভাষায় একটি বর্ণ বা কয়েকটি নির্দিষ্ট বর্ণের নাম যা বিভিন্ন শব্দের মধ্যে নির্দিষ্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কাফিয়া পদ্ধতিগতভাবে সবসময় 'মাতলা'য় দুই পঙতির শেষে এবং বাকি সব পঙতির দ্বিতীয় পঙতিতে হবে ।

Dhaka University Institutional Repository

৩. রাদিফ (رديف) : ক্রম বা ধারাবাহিকতা বুঝাতে রাদিফ শব্দটির অর্থ প্রকাশ করে। যে বর্ণ বা শব্দ ছন্দমিল থাকার পর নির্দিষ্ট করে ব্যবহার করা হয়। কাব্যের জন্য এ উপাদান গুরুত্বপূর্ণ। কেউ কেউ এটিকে কাব্যের উপাদান হিসেবে উল্লেখ করেননা।

## কাব্যময়ী বর্ণনা:

কবিতাকে প্রাঞ্জল ও কাব্যিক গুণাগুণে সমৃদ্ধ করার জন্য কবির অনেক ধরনের চিন্তা-চেতনা প্রকাশ করতে হয়। এর মধ্যে বাক্যে শব্দ অর্থবহ করে তোলা ও একই শব্দের অনেকগুলো অর্থ থেকে একটি গ্রহণ করা। সাধারণত কবি কবিতাকে কাব্যময়ী করার জন্য যে বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন তা নিম্নে তুলে ধরা হল:

তাশ্‌বীহ (تشبيه): এর অর্থ হলো উপমা। যখন কোন দুটি বস্তু একটি বিশেষণের উপর একত্রিত হয় তখন সেটিকে তাশবীহ বলে। এতে চারটি অংশ রয়েছে। ১. মুশাব্বাহ, ২. মুশাব্বাহ বিহ, ৩. ওজহে শিবেহ ও ৪. আদাতে শিবেহ। ফারসি কবিতায় তাশবীহ বেশি পরিমাণে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।[৪২] এটি এমন একটি বিষয় যে, বস্তুর তুলনা বা ব্যক্তির তুলনা কবিসূলভ আচরণের ভিত্তিতে করা হয়। বস্তুত এটি একটি কবিতা বর্ণনার পদ্ধতি।

এস্তেআরে (استعاره) : কবিতায় মোসাব্বাহকে পরিত্যাগ করে মোসাব্বাহ বিহ কে গ্রহণ করার নাম হলো এস্তেআরে।

কেনায়া (كنايه) : কবিতায় মোসাব্বাহ অর্থাৎ তুলনীয় শব্দ উল্লেখ থাকার পর কোনো আলামত থাকার কারণে মোসাব্বাহ বিহ অর্থাৎ যার সাথে শব্দের তুলনা করা হয়েছে তা উদ্দেশ্য হওয়া যেটি উহ্য আছে।

মাজায (مجاز) : যে শব্দটি যে অর্থের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে কবিতায় তা গ্রহণ না করে অন্য একটি অর্থ উদ্দেশ্য করার নাম মাজায।[৪৩]

ফারসি কবিতায় প্রেমের বর্ণনা দানে প্রিয়সীর সুন্দর চেহারা, কথা বলার মধ্যে মিষ্টতা, চলনে যে স্বাভাবিকতা রয়েছে এসব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে গুণ বর্ণনা করা হয়। এটি কবিতা রচনার বড় বৈশিষ্ট্য।

*Dhaka University Institutional Repository*

# বাংলা কাব্যশৈলী

## মধ্যযুগের বাংলা কবিতা

বাঙালির ফারসি কাব্যের সাথে পরিচয় হয় দ্বাদশ শতক থেকে। ফারসি ভাষা রাজকীয় ভাষার সুবাদে ফেরদৌসির *শাহনামা* থেকে শুরু করে ফরিদ উদ্দিন আত্তারের *মানতিকুত তায়ের* কাব্যগ্রন্থ বঙ্গে পঠিত হত। বহু বাঙালি কবি কাব্যের উপাদান ফারসি থেকে গ্রহণ করেছেন। তা না হলে বহু ইরানি ফারসি কাব্যগুলোর পাণ্ডুলিপি বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে পাওয়া যেত না। মুসলমান কবিগণ শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলোকে অবলম্বন করেই কাব্য রচনা করেছেন।[৪৪] অবশ্য আজকের কবিতা পাঠের ন্যায় তখন কবিতার চর্চা ছিল না। যেসব কাব্য কাহিনীমূলক এর অধিকাংশই সুর করে পঠিত হতো। মধ্যযুগের বাংলা ছন্দের বিষয় নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে সুরের বিষয়টি নিয়ে অলোচনা করা প্রয়োজন। তখন বর্তমানের নিয়ম নীতি মেনে কেউ বাংলা কবিতা আবৃত্তি করতনা। প্রথম দিকে যে সুর করে বাংলা কবিতা আবৃত্তি করা হত সেটি ছিল ফারসি গজল রীতির ন্যায়।[৪৫] ফারসি ভাষার যে গজল কবিতা রয়েছে সে গজলের ন্যায় কবিতা গেয়ে যাওয়া হত। এ ছাড়া বাংলা ছন্দে একই মিলের পুরাবৃত্তি এবং অতিপর্ব পয়ার রয়েছে। এই পদ্ধতিটি গজল রীতির অনুরূপ। ফারসি ভাষায় গজলের যে ছন্দ তা মধ্যযুগের বাংলা কবিতায় বিদ্যমান রয়েছে বলা যায়।[৪৬] এটা সত্য যে, মধ্যযুগে সুর ধরে টেনে টেনে কবিতা পাঠ করা হত। সেটি এক ধরণের দীর্ঘ টান ছিল। সেকালে মানুষের কাছে ছন্দের ঝংকার কম মোহকর ছিল না। অধাত্ম-ইতিহাসের এবং সাহিত্য ইতিহাসের উষাকালে এই ভাবেই বাকপথে মানবমনীয়ার যাত্রারম্ভ করেছিল বাকুপথাতীতের দিকে। আদি ভারতীয় আর্য ভাষার ছন্দের রীতিও ছিল অক্ষরমাত্রিক। অর্থাৎ প্রধাণত চরণে অক্ষরের নির্দিষ্ট সংখ্যার উপরে ছন্দের রূপ নিভৃত হত।[৪৭] বাংলা কবিতা কখন থেকে শুরু হয়েছে এখানে আমরা সে সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন মনে করছিনা। বস্তুত পঞ্চদশ শতকের পূর্বের কবিতাগুলো সম্পর্কে কোনো মন্তব্য নয়। ষোড়শ শতক থেকে বাংলা কবিতার রীতিমত আরম্ভ ধরা হয়ে থাকে। মধ্যযুগের শেষের দিকে বাংলা কাব্যের গতি থেকে আরম্ভ ধরা কোনো দোষের হবেনা। এ সময় বাংলা কবিতা দু'ভাবে পাওয়া যেত। গান ও কাহিনী হিসেবে।[৪৮] গীতময় কবিতা থেকে কবিতায় পয়ার ছন্দ আসে।

## বাংলা কাব্যের ছন্দ

ছন্দ শাস্ত্রের ব্যবহার ভারতীয়দের মধ্যে অনেক আগ থেকেই বিদ্যমান রয়েছে। বিশেষত হিন্দুদের মাঝে ছন্দ জ্ঞান বেশি পাওয়া যায়। তাঁদের পুস্তকগুলো ছন্দবদ্ধ কাব্যে রচিত। তাঁদের এ রকম করার কারণ হলো সহজভাবে যেন মুখস্থ করা সম্ভব হয়। প্রথাগত ভাবেই শ্লোকের প্রতি তাঁদের ঝোক

Dhaka University Institutional Repository


অনেক বেশি।[৪৯] বেদ, পুরাণ, ভারত গ্রন্থে ছন্দ মিলের যে শ্লোক রয়েছে তা কেবল ভারতীয়দের সাথে তুলনা করা চলে। ভারতিদের এই ছন্দজ্ঞানের মাধ্যমেও অনুধাবন করা যায় যে, বাঙালি কবিরা কবিতা সৃষ্টিতে কোন অংশে দুর্বল ছিল না। আবু রায়হান আলবেরুনি ভারত অবস্থানকালে ছন্দজ্ঞানের প্রশংসা করেছেন। তাঁর গবেষণায় সাহিত্য সংস্কৃতির বিষয়টি অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে। তিনি তাদের কাব্য রচনায় আরুজ (عروض) , কাফিয়ে (قافيه) –এর ন্যায় ছন্দ মাত্রা দেখতে পেয়েছেন। এ থেকে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে, বাঙালি মুসলমান কবিরা ফারসি কবিতার ধরন পদ্ধতি অনুসরণ করতে গিয়ে ছন্দজ্ঞান কি তাঁদের থেকে পেয়েছিলেন ? না নিজেদের মাঝেই ছন্দজ্ঞানের প্রতিভা ছিল। আমরা এখানে বিষয়টির আলোচনা অত্যন্ত প্রয়োজন মনে করছি। প্রথমতঃ বাংলা সাহিত্যে ছন্দ বিদ্যা ফারসি সাহিত্যের আরুজ (عروض) এর ন্যায়। হিন্দুরা ছন্দ শাস্ত্রে পারদর্শী ছিল। তাঁদের অনেক পুস্তক ছন্দোবদ্ধ কাব্যে রচিত হয়েছে। এটি একারণে যে, ছন্দ মুখস্থ করতে সহজ হত বিধায় ছন্দের মাধ্যমে তাঁরা কাব্যকারে পুস্তক রচনা করতে ভালবাসতেন।[৫০] বাংলা কাব্য সাহিত্যে ছন্দ নিয়ে বাংলা বই রচনা হয়েছে আধুনিক যুগে। বাংলা ছন্দে শ্লোক নিয়ে যেসব গ্রন্থ রয়েছে তাতে ফারসি কাব্যের রীতি ও কায়দা কানুনের সাথে মিল রয়েছে। বাংলায় যেমন– সমিল দুই পঙতির শ্লোককে বলে তেমনি যুগ্মক বা দ্বিপঙক্তিক শ্লোক। চার পঙতির শ্লোককে বলে চতুষ্পঙ্ক্তিক বা চতুষ্ক। তদ্রুপ ফারসি কাব্যে মসনবি ও রুবাই রীতিমূলক কবিতাও উক্ত নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। কবিতার মধ্যে এক ধরনের মিল থাকা আবশ্যক–এটি একটি সাধারণ মত। বাংলা কাব্যের রীতি ও নিয়ম কানুনগুলো ফারসি কাব্যের বৈশিষ্ট্যের সাথে কতটুকু সম্পৃক্ততা রাখে তা বিবেচ্য বিষয়।

## বাংলা ছন্দশাস্ত্র

মধ্যযুগে বাংলা ভাষায় ছন্দশাস্ত্র সম্পর্কে কোনো গ্রন্থ পাওয়া যায়নি। যেসব গ্রন্থ আধুনিককালে ছাপা হয়েছে তা আধুনিক যুগের কবিতা নিয়ে রচিত। এসব গ্রন্থে মধ্যযুগের কাব্যের ছন্দ সম্পর্কে আলোচনা একেবারেই কম। যে কারণে মধ্যযুগের কবিতার ছন্দ-অলঙ্কার ও কাব্যের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানার সুযোগ নেই বললেই চলে।

ছন্দ বলতে একটি মাপ (Measure) ও মাত্রাকে বুঝায়। প্রতিটি কবিতার লাইনের মধ্যে মাপ আছে। এটি করা হয় কবিতার অক্ষর গুণে গুণে। কবিতার এক একটি লাইনকে চরণ বলে। প্রত্যেক চরণে নির্দিষ্ট মাপ থাকা বাঞ্চনীয়। যেমন– ১০, ১২, ১৮, ২২ অক্ষরের চরণ।[৫১] তাতে যে মিল ও অলঙ্কার ফুটে ওঠে তা ছন্দশাস্ত্র অনুযায়ী গঠিত।

Dakha University Institutional Repository

বাংলা ছন্দের তিনটি ভাগ রয়েছে। যথা– অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দ। প্রতিটি আবার ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত। এসব ভাগের মধ্যে সিদ্ধাচার্যের চর্যাপদ রয়েছে। এটিকে বাংলা ছন্দের উৎস হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়।[৫২] মধ্যযুগে মুসলিম কবিদের রচিত কাব্যগ্রন্থগুলো পুথি কাব্য হিসেবে পরিচিতি পেলেও তাতে কাব্যের অলঙ্কার ও রীতি-নীতি বিদ্যমান। এ কাব্যগুলো নিশ্চয় বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বাংলা কবিতার জন্ম সপ্তম বা দশম শতকে হলেও মুসলিম কবিরা রীতি নিয়ম মাফিক কবিতা রচনা করেন নি –তা যথার্থ নয়। তাঁরা নিয়ম মেনে কবিতা রচনা করেছেন। তাঁদের কাব্যরচনা পরবর্তী সময়ে আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

## প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা

বাংলা সাহিত্যে ফারসির প্রভাব দেদীপ্যমান ও উজ্জ্বল। এ প্রভাবের বিষয়টি সম্পর্কের মাধ্যমে দেখা যেতে পারে। ফারসির মসনবি ও গযল রীতি উর্দু ও তুর্কি ভাষায় প্রভাব ফেলেছে। আঠার শতকের শেষ দিকের উর্দু কবিরা ফারসির সকল কলা-কৌশল ও নিয়ম-কানুন নিয়ে কাব্যরচনা করেছেন। বাংলা ভাষায় প্রভাবের বিষয়টি একই ধারায় বিচার করা যেতে পারে। *আবেস্তা* গ্রন্থের সাথে বেদ গ্রন্থের মিল থাকায় সে প্রভাবটি পরিস্কার হয়ে ওঠেছে। দুটি 'প্রাচীন কাব্যগ্রন্থের ছন্দমিল'[৫৩] বিশেষ তাৎপর্য রাখে। অপরদিকে আধুনিক যুগের কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায় ফারসি ছন্দের প্রভাবের বিষয়টি বাংলা গবেষকগণ স্বীকার করেছেন। মধ্যযুগের মুসলিম কবিদের কাব্যরচনায় সে প্রভাব অধিকতর উজ্জ্বল ও স্পষ্ট। যদিও সে সম্পর্কে বাঙালি গবেষকদের কোনো ধরনের উভয় ভাষার লেখ্যরূপ ভিন্ন রয়েছে।

মাওলানা রুমি লিরিকধর্মী বক্তব্যই মসনবি রীতির কাব্যের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। আধ্যাত্মিকভাবে তিনি এতটা যুক্তির প্রতি মনোনিবেশ না করে নিজের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে তা ফুটিয়ে তুলেছেন। তবে সঙ্গীত কী না স্পষ্ট নয়। এটিও যে এক ধরণের সঙ্গিত তা অনুমান করা ভুল হবে না। কেননা, তাঁর মসনবি রীতির কবিতা ফরিদ উদ্দিন আত্তার, হাফিজ শিরাজি ও শেখ সাদি থেকে একেবারেই ভিন্ন। তাঁর কবিতার ছন্দ বাংলা কাব্যে প্রভাব পড়াটা খুবই স্বাভাবিক।[৫৪]

### পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দ কবিতা

সাধারণত মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে ছন্দের যে ধারা রয়েছে তা ফারসি কাব্যের মসনবি বা গজলের ন্যায়। বাংলা পুরনো ছন্দের মধ্যে পয়ার ও ত্রিপদী হলো প্রধান। এ গুলো মসনবির রীতির ন্যায়

Dhaka University Institutional Repository


গঠিত হয়েছে। মধ্যযুগের চর্যাপদ সাধন সঙ্গীত একটি তুলণীয় বিষয়। যোগপন্থী চর্যাসাধকগণ চর্যাগান করতেন। তাঁদের গানে যে গীত ছিল তা সেমার ন্যায়। ইরানে সেমা বা নৃত্যগীতের প্রচলন মূলত মাওলানা রুমির যুগ থেকে শুরু হয়। বৈষ্ণব ও সুফিরা নিজ নিজ ধর্মপালনের ক্ষেত্রে অধ্যাত্ম পিপাসা নিবারণের জন্য এক ধরণের সেমা করতেন।[৫৫] এ থেকে বাংলা কাব্যে মসনবির প্রভাব পরিস্কার ও সুস্পষ্ট। এ ছাড়া মসনবি কবিতা বাংলা পয়ার ছন্দের মতই পাঠ করা হয়ে থাকে।

## বাংলা মর্সিয়া কাব্য

বাংলা মর্সিয়া কাব্য মূলত মর্সিয়া সাহিত্য হিসেবে পরিচিত। বঙ্গে ফারসি ভাষায় মর্সিয়া কবিতার উদ্ভব ও বিকাশ কখন হয়েছিল স্পষ্টত কোন ব্যাখ্যা নেই। মধ্যযুগে বাংলা ভাষায় মর্সিয়া কবিতা সৃষ্টি হয়। সাধারণত শিয়া মুসলিমদের নিকট কারবালার কাহিনী একটি হৃদয় বিধারক ঘটনা। এই কারবালার ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রথম ইরানে মর্সিয়া কবিতা সৃষ্টি হয়েছে। মুঘল যুগে ফারসি কাব্য সাহিত্য বিস্তৃতির সাথে সাথে মর্সিয়া সাহিত্যও বিস্তার লাভ করে। বাংলা ভাষায় এই মর্সিয়া সাহিত্য কোন ফারসি কবিতাকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠেছিল সে বিষয়ে নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। তবে *মকতুল হোসেন*, *জঙ্গনামা* ইত্যাদি কাব্যরচনা বাংলা সাহিতে উপর প্রভাবের কথা জানা যায়। নিম্নে *শাহ গরীবুল্লাহ ও জঙ্গনামা* থেকে কবিতা উদ্ধৃত হল:

ইমাম হাসান বেহেশত গেলেন চলিয়া।
মাটির পিঞ্জিরা রহে দুনিয়ায় পড়িয়া ॥
পড়িল দারুণ শোকে মোমিন দেলেতে ।
আশুরার চাঁদের দিন সেই মদিনাতে ॥[৫৬]

ইরানের বহু কবি ভারতে আগমনের পর ভারতেও মর্সিয়া কাব্যধারা রচনার প্রসার ঘটেছে। যেমন– বাদশাহ শাহজাহানের রাজদরবারে কবি হাজি মুহম্মদ জান কুদসি স্বীয় যুবক পুত্রের অকাল মৃত্যুতে শোকগাথা হিসেবে মর্সিয়া কবিতা রচনা করেন। মোল্লা যুহুরি ও কবি জামালিও এ বিষয়ে কবিতা রচনা করে অবদান রাখেন।[৫৭] এভাবে ভারতে ফারসি ভাষায় মর্সিয়া কবিতা রচনার পর ধীরে ধীরে বাংলা ভাষায় এর প্রভাব পড়তে থাকে।

## দোভাষী পুথিকাব্য

দোভাষী পুথি পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত হয়। আলাদা বৈচিত্রের জন্য এতে 'তোটক' ও 'চৌপদী' ব্যবহার করা হয়েছে। এটা সত্য যে, ফারসি কাব্যের অনুকরণে দোভাষী পুথিকাব্য গঠিত হয়। এতে ফারসি কাব্যের প্রত্যক্ষ্য শৈল্পিক প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে। এ জাতীয় পুথিতে মাঝে মধ্যে 'পয়ার' ও

Dhaka University Institutional Repository


'ত্রিপদি' ছন্দ ব্যবহার করা হয়। এটি এক তালীয় ভাবকে দুর করার জন্য এসেছে।[৫৮] উল্লেখ্য যে, দোভাষী পুথিতে ফারসি ভাবধারা অনুকরণের বিষয়টি খুবই স্পষ্ট। ছন্দের মধ্যে যে একঘেয়েমি ভাব রয়েছে তা মসনবি রীতির কবিতার অনুরূপ। মসনবি রীতির যে ছন্দ ঠিক একই রীতির ছন্দ পুথি কাব্য সাহিত্যে বিদ্যমান।[৫৯] বাঙালি কবি কাব্য রচনার ক্ষেত্রে যে শিল্প-গুণের পরিচয় দিয়েছেন তা পুথি কাব্যে হুবহু পাওয়া যায়।

## কবিতায় বিশেষ নিদর্শন

মুসলমান লেখকদের কবিতার শুরুতেই আল্লাহ ও রসুল প্রশংসা রয়েছে। বহু মুসলিম কবি পিতা মাতার গুণ সম্বলিত কবিতা লিখেছেন। তারপর মূল আলোচনার পূর্বে বাদশাহ বা কোনো জ্ঞানীর আলোচনা করেছেন। নামের উপাধি বা কবি নাম  ইত্যাদিও কবিতায় বিদ্যমান রয়েছে। বাংলা কবিতায় ভণিতার ব্যবহারটি নিজস্ব নয়। বহু আগ থেকেই ফারসি কবিতায় ভণিতার ব্যবহার রয়েছে। কবি নিজামি ও কবি জামি তাঁরা কবিতায় নিজের নাম উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া তারিখ লিখন যেমন- জন্ম বা মৃত্যু সন, রচনা লিখার সন, বিশেষ ঘটনার সময়কাল প্রভৃতিও ফারসির রীতি। বিশেষ জলসা বা অনুষ্ঠানকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য কবি শেষে বা কবিতার কোনো অংশে ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এসব নিদর্শন বা রীতি বাংলা কাব্যশৈলীর অনুসৃত নয়, বরং এরূপ স্টাইল ফারসি কবিতায় বহু পূর্ব থেকেই উপস্থিত রয়েছে। বাংলাকাব্যে 'নামা' সংযোজন যেমন–সিকান্দরনামা, নুরনামা ও নসিহতনামা বাংলার নিজস্ব পদ্ধতি নয়। এটিও ফারসি কাব্যগ্রন্থের নামানুসারে বহু বাংলাকাব্যে 'নামা' শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে।[৬০]

ফারসি কাব্যে দুই চরণ ও চার চরণের শাহনামা, মসনবি ও রুবাইয়াৎ কাব্য বাংলা কবি চণ্ডিদাসের পূর্বেই গড়ে ওঠেছে। এ দেশীয় মুসলমানরা *শাহনামা* ও *মসনবির* চর্চা করতেন। এ রীতিগুলো ধীরে ধীরে বাংলা কাব্যে স্থান করে নেয়। পনের বা ষোল শতকের মুসলমানদের কোনো বাংলা কাব্যই ফারসি কাব্যের প্রভাব থেকে মুক্ত নয়।[৬১]

আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলা কবিতার বিশেষ রীতিগুলো ফারসি কাব্যের রীতি থেকে মুক্ত নয়। বাংলা পয়ার ছন্দ মসনবি রীতিরই অনুরূপ। ফারসি 'রুবাই' কবিতার ন্যায় বাংলায় চতুষ্পদী জাতীয় কবিতা রয়েছে। এ ছাড়া মর্সিয়া কবিতা ফারসি কাব্যসাহিত্যের একটি অংশ। এটির

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাব বাংলা কাব্যে সরাসরি দেখা যায়। আমরা বলতে পারি যে, মধ্যযুগের বাংলা কবিতায় ফারসি কাব্যের রীতি ও কাব্যশৈলীর প্রচুর প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে।

## টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. শামিসা, সিরুস, *অশনায়ি বা আরোজ ওয়া কাফিয়া*, এন্তেশারাতে ফেরদৌস, তেহরান, ১৩৭৩ হি.শা., পৃ. ২৭।

২. শামিসা, সিরুস, *অশনায়ি বা আরোজ ওয়া কাফিয়া*, তদেব, পৃ. ১৫; গোয়ারি, সোযান, *আদাবিয়াতে ফারসি ওয়া তাহাবুলাতে অন*, এন্তেশারাতে বেহজাত, তেহরান, ১৩৮৬ হি.শা., পৃ. ২২।

৩. গাহান: গাহান শব্দটির প্রচলন বাংলা ভাষায় নেই। গাথা শব্দের অর্থ হলো, পালা গান বা কাহিনী কাব্য। তখন পালা গান প্রচলিত ছিল। গাহান সে ধরণের পালা গান। ফারসি ভাষায় শব্দটির অর্থ– গান, গীতি, উচ্চ স্বরের কবিতা ইত্যাদি। জরথুস্তের ধর্মীয় অনুশাসন ও নীতিগুলো উচ্চ স্বরে পাঠ করা হতো। এটি জরথুস্তের সময়কালে উৎপত্তি ঘটে।–কাসেমি, মোহসেন আবুল, *শে'র দার ইরান পিশ আয ইসলাম*, এন্তেশারাতে তুহুরী, তেহরান, ১৩৮৩ হি.শা., পৃ. ৮।

৪. কাসেমি, মোহসেন আবুল, *শে'র দার ইরান পিশ আয ইসলাম*, তদেব, পৃ. ১৬৫।

৫. সাবেত যাদেহ, মনসুরেহ, *বাহুর ওয়া আওযানে আশারে ফারসি*, এন্তেশারাতে যাওয়ার, তেহরান, ১৩৮৮ হি.শা., পৃ. ২২।

৬. খানলরি, পারভেজ নাতেল, *ওয়াযনে শে'রে ফারসি*, এন্তেশারে দানেশগাহ তেহরান, তেহরান, ১৩৩৭ হি.শা., পৃ. ২০২।

৭. কাসেমি, মোহসেন আবুল, *শে'র দার ইরান পিশ আয ইসলাম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৩।

৮. কাসেমি, মোহসেন আবুল, তদেব, পৃ. ৬৪।

৯. তদেব, পৃ. ৬৩।

১০. তদেব, পৃ. ১৬৫।

১১. খানলরি, পারভেজ নাতেল, *ওয়াযনে শে'রে ফারসি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩।

১২. সাবেত যাদেহ, মন্‌সুরেহ, *বাহুর ওয়া আওযানে আশ্‌আরে ফারসি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১।

১৩. নিকুবাখ্‌ত, নাসের, *তাহলীলে শে'রে ফারসি*, সাযেমানে মোতালে, বায়নাল মেলালি, তেহরান,সাযেমানে মোতালে' ওয়া তাদভিনে কুতুবে উলুমে ইনসানি দানেশগাহা, ১৩৮৯হি.শা., পৃ. ৫৯।

১৪. নিকুবাখত, নাসের, *তাহলীলে শে'রে ফারসি, তদেব*, পৃ. ৫৯; গোয়ারি, সোযান, *আদাবিয়াতে ফারসি ওয়া তাহাবুলাতে অন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯।

১৫. নিকুবাখ্‌ত, নাসের, *তাহলীলে শে'রে ফারসি*, তদেব, পৃ. ৫৯।

১৬. নিকুবাখ্‌ত, নাসের, তদেব, পৃ. ৬১।

১৭. যে ক'জন কবির নাম উল্লেখ রয়েছে তা সংখ্যায় অনেক কম। মূলত ফারসি কাব্যের সকল কবিই কাসিদা রচনায় পারদর্শী। বিশেষ করে প্রাথমিক সময়ের কবিগণ সবাই কাসিদা রীতিতে কবিতা রচনা করেছেন। সে হিসেবে কসীদা রচনাকারী কবির সংখ্যা হবে হাজারের অধিক।

১৮. সীমাদাদ, *ফারহাঙ্গে এস্তলাতে আদাবি*, এন্তেশারাতে মারওয়ারিদ, তেহরান, ১৩৮৭ হি.শা., পৃ. ৩৫২-৫৩।

১৯. গোয়ারি, সোযান, *আদাবিয়াতে ফারসি ওয়া তাহাবুলাতে অন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০।

২০. তদেব, পৃ. ৩০।

২১. সীমাদাদ, *ফারহাঙ্গে এস্তলাতে আদাবি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫২।

২২. হাকেমি, ইসমাইল, *তাহকিক দরবারেয়ে আদাবয়াতে গেনাই ইরান*, এন্তেশারাতে দানেশগাহ, তেহরান, তেহরান, ১৩৮৬ হি.শা., পৃ. ৩২।

২৩. হাকেমি, ইসমাইল, *তাহকিক দরবারেয়ে আদাবয়াতে গেনাই ইরান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২।

২৪. নিকুবাখত, নাসের, *তাহলীলে শে'রে ফারসি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭; গোয়ারি, সোযান, *আদাবিয়াতে ফারসি ওয়া তাহাবুলাতে অন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩।

২৫. গোয়ারি, সোযান, *আদাবিয়াতে ফারসি ওয়া তাহাবুলাতে অন*, পৃ. ২৬; নিকুবাখত, নাসের, *তাহলীলে শে'রে ফারসি*, পৃ. ২৯।

২৬. নিকুবাখত, নাসের, (উদ্ধৃতি) *তাহলীলে শে'রে ফারসি*, তদেব, পৃ. ৩৩।

২৭. তদেব, পৃ. ৭১।

২৮. সীমাদাদ, *ফারহাঙ্গে এস্তলাতে আদাবি*, এন্তেশারাতে মারওয়ারিদ, তেহরান, ১৩৮৭ হি.শা., পৃ. ৪২৬; শামীসা, সিরুস, *আনওয়া ই আদাবি*, নাশরে মিতরা, তেহরান, ১৩৮৬ হি.শা., পৃ. ২৯৪।

২৯. শামীসা, সিরুস, *আনওয়া ই আদাবি*, তদেব, পৃ. ২৯৪।

৩০. তদেব, পৃ. ২৯৪-৯৫।

৩১. নিকুবাখত, নাসের, (উদ্ধৃতি) *তাহলীলে শে'রে ফারসি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬।

৩২. সীমাদাদ, *ফারহাঙ্গে এস্তলাতে আদাবি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৪।

৩৩. শামীসা, সিরুস, *আনওয়া ই আদাবি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৪; সাকলায়েন, গোলাম, *বাংলায় মর্সিয়া সাহিত্য*, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৪, পৃ. ৭ ও ১৩-১৪।

৩৪. শামীসা, সিরুস, *আনওয়া ই আদাবি*, তদেব, পৃ. ৬০।

৩৫. তদেব, পৃ. ৬২।

৩৬. হাকেমি, ইসমাইল, *তাহকিক দরবারেয়ে আদাবয়াতে গেনাই ইরান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬।

৩৭. শামীসা, সিরুস, *আনওয়া ই আদাবি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১।

৩৮. খানলরি, পারভেজ নাতেল, *ওয়াযনে শে'রে ফারসি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩।

৩৯. মুঈযুদ্দিন, মোহাম্মদ, *রাহনুমায়ে সুখান*, ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, ঢাকা, ১৯৬০, পৃ. ৯২।

৪০. সাবেত যাদেহ, মনসুরেহ, *বাহুর ওয়া আওযানে আশআরে ফারসি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২।

৪১. মোহাম্মদ মুঈযুদ্দিন তাঁর *রাহনুমায়ে সুখান* গ্রন্থে উল্লিখিত অংশ এলমে আরোযের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

৪২. সীমাদাদ, *ফারহাঙ্গে এস্তলাতে আদাবি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৩।

৪৩. মোহাম্মদ মুঈযুদ্দিন তাঁর *রাহনুমায়ে সুখান* গ্রন্থে উল্লিখিত অংশ 'এলমে বায়ান' এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository


৪৪. দ্রষ্টব্য, আহমদ, ওয়াকিল, *মধ্যযুগে বাংলা কাব্যের রূপ ও ভাষা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৭৫-৭৮।

৪৫. সেন, সুকুমার, *ভাষার ইতিবৃত্ত*, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলিকাতা, দ্বাদশ সংস্করণ ১৯৭৫, পৃ. ৩৮২।

৪৬. সেন, সুকুমার, *ভাষার ইতিবৃত্ত*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৪।

৪৭. সেন, সুকুমার, *ভাষার ইতিবৃত্ত*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭০ ও ৩৮৪।

৪৮. মজুমদার, মোহিতলাল, *কাব্য-মঞ্জুষা ২য় ভাগ*, অশোক পুস্তকালয়, কলিকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ১৬।

৪৯. আলবেরুনি, *ভারততত্ত্ব*, (অনুবাদক আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ) বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৭৫।

৫০. আলবেরুনি, *ভারততত্ত্ব*, (অনুবাদক আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ), পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫।

৫১. মজুমদার, *মোহিতলাল, কাব্য-মঞ্জুষা ২য় ভাগ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭।

৫২. অলিউল্লাহ, কাজী মুহম্মদ, *বাংলা ছন্দ ও অলঙ্কার পরিচয়*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৫৬।

৫৩. প্রাচীন কাব্যগ্রন্থের ছন্দমিল: বেদ ও আবেস্তা গ্রন্থের ভাষা কাছাকাছি স্থানে অবস্থিত হওয়ায় দু'টি গ্রন্থের ছন্দও একই রূপ। প্রাচীনকালে আবেস্তার গাথা অংশটি সুর করে আবৃত্তি করা হত। প্রাচীন বাংলায় যে ছন্দ রয়েছে আবেস্তা গ্রন্থেও একই ছন্দ বিদ্যমান। – শ্রী সুকুমার সেন, *ভাষার ইতিবৃত্ত*, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলিকাতা, দ্বাদশ সংস্করণ ১৯৭৫, পৃ. ৯৬ ও ৩৭৩; অলিউল্লাহ, কাজী মুহম্মদ, *বাংলা ছন্দ ও অলঙ্কার পরিচয়*, পৃ. ৫৭।

৫৪. কাদির, আবদুল, বাঙলা ছন্দের বিবর্তন, *সাহিত্য পত্রিকা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, শীত ১৩৮০, পৃ. ৭।

৫৫. আহমদ, ওয়াকিল, *মধ্যযুগে বাংলা কাব্যের রূপ ও ভাষা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ২।

৫৬. জলিল, মুহম্মদ আবদুল, *শাহ গরীবুল্লাহ ও জঙ্গনামা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ১৭১।

৫৭. সাকলায়েন, গোলাম, *বাংলায় মর্সিয়া সাহিত্য*, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৪, পৃ. ১৩-১৪।

৫৮. সাকলায়েন, গোলাম, ফকীর গরীবুল্লাহ, *বাঙলা একাডেমী পত্রিকা*, ঢাকা, ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৬৮, পৃ. ১।

৫৯. আদম উদ্দিন, এ কিউ এম., পুঁথি সাহিত্য শাখার সভাপতির অবিভাষণ, *মাসিক মোহাম্মদী*, ঢাকা, ১৭ বর্ষ ১০ ও ১১ সংখ্যা-১৩৫১, পৃ. ৪৫৬।

৬০. আহমদ, ওয়াকিল, *মধ্যযুগে বাংলা কাব্যের রূপ ও ভাষা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯-৮০।

৬১. তদেব, পৃ. ১৩।

Dakha University Institutional Repository


## সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. মনসুরেহ সাবেত যাদেহ : বাহুর ওয়া আওযানে আশআরে ফারসি

২. ইসমাইল হাকেমি : তাহকিক দারবারেয়ে আদাবিয়াতে গেনাই ইরান

৩. সিরুস শামীসা : আনওয়া ই আদাবি

৪. পারভেজ নাতেল খানলরি : ওয়াযনে শে'রে ফারসি

৫. গোলাম সাকলায়েন : ফকীর গরীবুল্লাহ

৬. শ্রী সুকুমার সেন : ভাষার ইতিবৃত্ত

৭. প্রবোধচন্দ্র সেন : নূতন ছন্দ-পরিক্রমা

৮. ওয়াকিল আহমদ : মধ্যযুগে বাংলা কাব্যের রূপ ও ভাষা

৯. মোহাম্মদ মুঈযুদ্দিন : রাহনুমায়ে সুখান

১০. মোহিতলাল মজুমদার : কাব্য-মঞ্জুষা ২য় ভাগ

Dhaka University Institutional Repository

# অষ্টম অধ্যায়: ফারসি কাব্য-প্রভাবিত মধ্যযুগের বাঙালি কবি

ইন্দো-ইরানিয়ান ভাষাগোষ্ঠীর অন্যতম শাখা হলো ফারসি ভাষা। এ ভাষার উৎস স্থল প্রাচীন ভাষা-সভ্যতার লীলাভূমি ইরান তথা পারস্য। প্রায় দু'শত বছর পূর্বে এ ভাষাটি মধ্য এশিয়ার বৃহৎ অঞ্চলের রাজ ভাষা ছিল। সে সময় বঙ্গ দেশের কথ্য ও লেখ্য ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার পাশাপাশি ফারসি ভাষাও ব্যবহৃত হত। সে কারণে এ অঞ্চলের বাংলা ভাষাভাষী মানুষ ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাঁরা বাংলা ভাষায় অনুরূপ রচনার মাধ্যমে সেই ভালবাসা প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করেননি। বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে এই রচনাগুলোর অবদান অপরিসীম। আমরা বাংলা সাহিত্যে এমন কয়েক শত কাব্যরচনার সন্ধান পাই যেগুলো ফারসি কাব্যের প্রভাবেই রচিত হয়েছে।

## এক. বাংলা কাব্যের রূপ ও রচনার ধারা

মধ্যযুগের বহু বাঙালি মুসলিম কবি আত্মপরিচয় রেখে যান নি। যে সব কাব্যে তাঁদের আত্মবিবরণী রয়েছে তা অতি সামান্য। সেখানে কোনো ধারাবাহিক বিবরণী নেই। তাঁদের জীবনকাল এবং রচনাকাল নিয়ে যে সমস্যা আছে তা নিরসন করা অনেকটাই কঠিন। এ যুগের বাংলা সাহিত্য নিয়েও নানা কৌতুহল রয়েছে। তবে আমাদের এ আলোচনায় বাঙালি কবিদের জীবন কাহিনী বেশি গুরুত্ব পাবে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে অযাচিত বক্তব্য বিষয়ে ড. আহমদ শরীফ রচিত *সাহিত্য তত্ত্ব ও বাঙলা সাহিত্য* গ্রন্থের 'বাঙলা সাহিত্যের আধার যুগের ইতিকথা' শিরোনামে সমালোচকদের যে উত্তর তিনি দিয়েছেন তা সঠিক হিসেবে মেনে নেয়াই যথার্থ। তাঁর নিকট কখনই মুসলিম যুগ বর্বরতার যুগ ছিলনা। বরং মুসলিম যুগকে বাংলা সাহিত্যের উন্নতির যুগ বলাই যুক্তিযুক্ত। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন, 'তুর্কী বিজয়ে কেবল সদ্ধর্মীদেরই পীড়নমুক্তির নি:শ্বাস পড়েনি, বাঙলা ভাষারও সুদিনের শুরু হয়েছে।'[১] তেরো ও চৌদ্দ শতকে যদিও ফারসি কাব্য প্রভাবিত কোনো বাংলা কাব্যগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় নি। তবে তা প্রমাণ করে না যে, সে সময় বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা

Dakha University Institutional Repository

হতনা। বরং সে সময় প্রচুর বাংলা সাহিত্য রচনা হয়ে ছিল। বলা বাহুল্য যে, তা প্রকাশের মুখ দেখেনি। এ যুগের বাংলা গবেষকদের থেকেও এ কথা উচ্চারিত হয়েছে যে, তুর্কি বিজয় প্রাক্কালে প্রায় দু'শ বছর বাংলা সাহিত্য রচনা হয় নি তা সঠিক নয়। তখন সাহিত্য রচনা হয়েছিল। হয়ত কোনো কারণে তা আমাদের হাতে এসে পৌঁছেনি। যেহেতু তখন হিন্দু শাসনের পতন ও সেই সাথে সংস্কৃত ভাষা সাহিত্য যুগের অবসানের মধ্য দিয়ে মুসলিম শাসনের ভিত্তি এবং ফারসি ভাষার সূচনা ঘটে- যা এটি একটি নতুন যুগের বার্তা বহন করেছে। রাজনৈতিক শক্তির উত্থান-পতন ও ভাষা-সংস্কৃতির পরিবর্তনের ফলে বাংলা রচনায় ধীরগতি আসা স্বাভাবিক।

আমরা বিষয়টি এভাবেও ব্যাখ্যা দিতে পারি। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতক বাঙালি জীবনের একটি পরিবর্তনশীল অধ্যায়। তখন নতুন রাজশক্তির অভ্যুদয়ে শিক্ষা ও জ্ঞান বুদ্ধির চর্চা ব্যহত হয়। এ শতকে মুসলমান তুর্কিরা বঙ্গ দেশ জয় করে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হন। যদিও মুসলমান রাজত্ব স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করতে তাঁদের অনেক সময় ব্যায় হয়। স্বভাবত তখন ইসলাম প্রবেশের ফলে বঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা জাগে। এ সময়ে বহু ধর্মপরায়ণ দরবেশ ও সুফি বঙ্গে আগমন করে ইসলাম প্রচারে ব্যাস্ত থাকেন। বঙ্গের সকল স্থানে তুর্কি শাসক সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় ইসলামের আলো দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করে। এ সময়ে মুসলমানদের মাঝে সাহিত্য রচনার কোনো চিন্তা-ভাবনা ছিল না। সময় ও বাস্তবতার কারণেই তাঁদের এ অবহেলার সূত্রপাত ঘটে। তখন বাংলার মুসলমানদের মধ্যে দুই শ্রেণির মুসলমান ছিল। বিদেশাগত ও নও মুসলিম হিসেবে এ দুই শ্রেণির মুসলমান সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে কতটুকুই বা উপযোগী ছিল- তা ভাবনার বিষয়। তাঁদের মধ্যে কোন শ্রেণিই তখন সাহিত্যসৃষ্টির কথা ভাবতে পারে নি।[২] যে কারণে ত্রয়োদশ শতকে মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য রচনার প্রমাণ না পাওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত কবিতা গান ও ছড়াগান প্রচলিত ছিল। চর্তুদশ শতকেও বাঙ্গলার মুসলমানদের নিজ ভাষায় সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করাটা ছিল অনেকাংশে কষ্টকর। এ সময়ে মুসলমানগণ সংস্কৃত ভাষার অবয়ব থেকে মুক্তিলাভের কল্পনা করতে পারে নি। তাঁরা এ সময় হিন্দুদের সাথে ঘরোয়া ও সামাজিক পরিবেশে জীবন-যাপন করত। ইসলাম ধর্মের শিক্ষা তাঁদেরকে হিন্দুদের থেকে পৃথক করতে পারে নি। বলা বাহুল্য যে, ইসলামের যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা ছিল তা তাঁদের মাঝে প্রভাব রাখতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। বলা যায় যে, হিন্দুদের সাথে ঘনিষ্টতার ফলে তাঁদের মধ্যে সাহিত্য রচনা প্রকাশমান ছিল খুবই

সামান্য। বিভিন্ন গ্রামীণ উৎসবে লোকায়াতধর্মী ছড়া গান ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ধর্ম কাহিনীর অবতারণা করা হত। এ গুলো ছিল খণ্ড খণ্ড আকৃতির। তবে একটি সাংস্কৃতিক পরিবর্তনে মুসলমানদের মনে যে আশার আলো জাগিয়েছিল এটিই তাঁদেরকে বহু দূরে এগিয়ে নিয়ে যায়। মূলত বঙ্গে মুসলমান আগমনের প্রথম দেড়শত বছর মুসলমান সমাজে বাংলা ভাষা প্রবেশের সময় ছিল।[৩] খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতক থেকে বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান প্রকাশমান হতে থাকে। এ সময়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেক অর্জন করতে সক্ষম হয়। হিন্দু-সম্প্রদায় মুসলমানদেরকে নানাভাবে সহযোগিতা ও শাসকশ্রেণির সুদৃষ্টির ফলে বাংলা ভাষা এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে প্রসার পেতে থাকে। রাজ ভাষা ফারসির সাথে বাংলা ভাষা ব্যবহারের ফলে সংস্কৃত ভাষাটি সংকুচিত হয়ে পড়ে। শুধুমাত্র হিন্দুধর্মজগতে ব্যবহার ছাড়া অন্য কোথাও সংস্কৃত ব্যবহার হতো না। মূলত খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতক ছিল বাংলা সাহিত্যের শিশুকাল। বাংলার সুলতান ও মুসলমানগণ– সবাই এ সময়ে বাংলা সাহিত্যের উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করেন। সুলতানগণ কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহ দানে এগিয়ে আসতে কার্পণ্যবোধ করেন নি। সুলতান হোসেন শাহ ছিলেন একজন বিদ্যা ও ন্যায়পরায়ণ শাসক। তিনি বাংলা রচনা বৃদ্ধির জন্য মুসলমানদের প্রেরণা দান ও উৎসাহ যুগিয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যে নতুন করে গতি আনয়নের ক্ষেত্রে হোসেন শাহের অবদান অনেক। তাঁর সময়কাল থেকে মুসলমানদের কবিতা কিচ্ছা-কাহিনীর ন্যায় রচিত হতে থাকে। ইসলাম ধর্মের যে সব কাহিনীগুলো শ্রেষ্ঠ সে সব কাহিনী কবিতা আকারে প্রকাশ ছিল এ যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। খ্রিস্টীয় ষোলদশ শতক থেকে দেশীয় ভাষায় রচনা তৈরিতে মুসলমানগণ অগ্রগামী ভূমিকা রাখেন। এ সময়ে বঙ্গে ইসলাম ধর্ম স্থিতিশীল অবস্থায় ছিল। ইসলাম ধর্ম হিন্দু-সমাজেও প্রভাব রাখে। ধর্মভিত্তিক সাহিত্য সৃষ্টি এই শতকের একটি বড় অবদান। এ বিষয়ে যে পরিমান রচনা তাঁরা রেখে গিয়েছেন তা নানাভাবে প্রশংসনীয়। তাঁদের গৌরবময় অবদান দিনের পর দিন যেভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে তা নিম্নের উক্তিটিতে প্রমাণ করে। সাহিত্য বিশারদ আবদুল করিম বলেন, 'সপ্তদশ শতককে বাঙ্গালার মুসলিম সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্বর্ণময় যুগ বলা যায়।'[৪] তবে তিনি সংশয় প্রকাশ করেছেন যে, এ যুগের অনেক রচনা পাওয়াটা দুষ্কর। খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকে ফারসি সাহিত্যের অনুবাদ বেশি হয়েছে। উল্লেখযোগ্য বাংলা সাহিত্য অবদানের ক্ষেত্রে হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানগণ এগিয়ে ছিল। অষ্টাদশ শতকে বাঙালি জীবনে বিপর্যয় দেখা দেয়। এ সময়েও সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে এক ধরনের মানসিক বাধা ছিল। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলার কারণে সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। এই অসুস্থ

Dhaka University Institutional Repository


সমাজের প্রভাব সাহিত্যেও প্রতিফলন ঘটে। তবুও মুসলমানরা যে বাংলা সাহিত্য রচনায় অপূরণীয় ভূমিকা পালন করেছেন তা অস্বীকার করার মত নয়।

## দুই. মুসলমানদের কাব্যরচনা

মধ্যযুগে মুসলমানদের রচনা সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যায় তাতেও বিস্মিত হতে হয় যে, তাঁরা কী পরিমাণ বাংলা রচনা রেখে গিয়েছিলেন। আমরা এ বিষয়ে আধুনিক কালের বাংলা সাহিত্যিক এবং সমালোচকদের মন্তব্য গ্রহণ করতে পারি। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ *প্রাচীন মুসলমান কবিগণ* শিরোনামে ৮৫ জন কবির রচনার তালিকা উপস্থাপন করেছেন।[৫] যাঁদের নাম একমাত্র তাঁর রচনাটি প্রকাশ না পেলে জানা যেতো না। হয়তবা এমন অনেক রচনাও রয়েছে যে গুলো সে সময়ের প্রসিদ্ধ রচনা ছিল। রচয়িতা ছিলেন একজন ফারসি ভাষার পণ্ডিত বা ফারসি ভাষার অনুবাদক। সে সম্পর্কে আমরা অনেকেই অবহিত নই। তাঁর এ তালিকাটি মধ্যযুগের কবিদের নিয়ে তৈরী করা হয়। তাঁদের প্রত্যেকেরই রচনা ছিল। তিনি লিখেন

> এই তালিকাভূক্ত কবিগণের প্রায় সকলেই বিশুদ্ধ বাঙ্গালা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিয়াছেন, অথচ রচিত গ্রন্থাদির আরবী পারসীর নামকরণ করিয়াছেন। অনেকগুলি আরবী পারসী ধর্ম্মগ্রন্থের অনুবাদ বিধায় এরূপ নামকরণ অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে।[৬]

মধ্যযুগের বাংলা দলিলপত্র, বাংলা রচনা এবং বাংলা পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে সাহিত্য বিশারদের মন্তব্য নানা দিক দিয়ে গুরুত্বের দাবি রাখে। অনুবাদ ছাড়াও ভাব গ্রহণ, বিষয় নির্বাচন ও অনুকরণ, গ্রন্থনাম ব্যবহার –এ সব আরবি–ফারসির রচনা থেকে গ্রহণ করা হয়। তাঁর এই বক্তব্যে শুধু যে অনুকরণের কারণেই বাংলা গ্রন্থের নাম হুবহু রাখা হয় তা পরিস্কারভাবে ফুঠে উঠেছে। তিনি পৃথকভাবে ফারসি বা আরবি গ্রন্থের পরিচয় উপস্থাপন করেন নি। কোন্ গ্রন্থের অনুবাদ বাংলা গ্রন্থটি তাও বলেন নি। তবে তাতে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে যে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য অনেকাংশে আরবি-ফারসি নির্ভর ছিল। বাংলা সাহিত্যে ফারসির প্রভাবের মূলে ধর্ম একটি বড় বিষয় হিসেবে অবদান রেখেছে তা সত্য। এ অঞ্চলে ধর্মীয় ভাষা হিসেবে আরবি ভাষার কদর সবসময় ছিল। এ কারণে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাবের কথা আলোচনা এলে আরবি ভাষার প্রভাবের কথা নির্বিঘ্নে এসে যায়। এর অর্থ এই নয় যে, আরবি কাব্যের প্রভাব বাংলা সাহিত্যে পড়েছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে আরবির প্রভাব কেমন ছিল তা একটি প্রশ্নযোগ্য বিষয়। অবশ্য তখন ধর্মীয় ভাষা হিসেবেও ফারসির কদর বা গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠত না। ইসলাম ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে ফারসি ভাষার রচনাই বেশি ভূমিকা রেখেছে। আরবি ভাষায় রচিত অনেক ধর্মগ্রন্থ যেমনিভাবে ফারসিতে অনূদিত হয়েছে তেমনি ধর্ম বিষয়ে মৌলিক গ্রন্থও

Dhaka University Institutional Repository

ফারসি ভাষায় রচিত হয়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সমালোচক এবং গবেষকগণ আরবি ভাষার প্রভাবের বিষয়টি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেন বলে আমরা বিশ্বাস করি। বাংলা সাহিত্যে আদৌ এ ভাষার প্রভাব সাহিত্যের বিচারে নয়। এ প্রসঙ্গে আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্য সমালোচক ও গবেষক সৈয়দ আলী আহসানের একটি মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি আরবি ভাষার চর্চা সম্পর্কে বলেন, '..... সেখানে আরবী ভাষার চর্চা হত সন্দেহ নেই। কিন্তু তা কেবল ধর্ম চর্চার আবশ্যিক প্রয়োজনেই সাহিত্য চর্চার উদ্দেশ্য নয়।'[৭] এ সময় দু' একটি আরবি রচনার অনুবাদ হয়েছে রসে তা প্রভাব বলা যায় না। আরবি ভাষার যে শব্দগুলো মধ্য যুগের বাংলা কাব্য সাহিত্যে রয়েছে তাও ফারসি প্রভাবজাত শব্দ। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মধ্যযুগে ফারসি ভাষার পুস্তক ভারতীয় উপমহাদেশে বিবিধ কারণে সমাদৃত ছিল। বিশেষত ইসলাম ধর্ম প্রচারে এই ভাষায় সহজভাবে ব্যাখ্যা দেয়ায় ফারসি পুস্তিকাদি অধিক গ্রহণীয় হয়ে ওঠে। এ ভাষায় সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও ধর্ম বিষয়ে প্রচুর রচনা বিদ্যমান থাকায় জ্ঞান আহরণের অভাব অনুভূত হতনা। তখন এ অঞ্চলের মুসলিম শাসকরাও ফারসি ভাষা জানতেন এবং এ ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। যাঁদের মাধ্যমে এ অঞ্চলে ইসলাম প্রবেশ এবং বিস্তৃতি লাভ করে তাঁদের একটি বড় অংশের প্রয়োগিক ভাষাও ছিল ফারসি। ফলে মুসলিম বাংলা ভাষাভাষীদের নিকট ভাষার পার্থক্য মূল বিষয় ছিলনা। মুসলমান কবিগণ ফারসি কাব্য সাহিত্যকে সত্য পথ অনুসরণের বাহক হিসেবে গণ্য করতেন। যে কারেণে ফারসি ভাষার ধর্মশাস্ত্র ও প্রেমোপাখ্যানমূলক কাব্যগ্রন্থের অনুবাদগুলোতে ইসলামি ভাবধারা গৃহীত হয়েছে। তাঁদের স্বাধীন অনুবাদের ক্ষেত্রেও ইসলাম ধর্ম একটি বিষয় ছিল।[৮] এ কথা বলা যায় যে, বাংলা ভাষাভাষীদের মাঝে বাংলা রোমান্টিক কাব্যগুলো প্রথমে ফারসি কাব্য সাহিত্যের মাধ্যমে প্রচার লাভ করেছে। বাঙালি কাব্য রচয়িতাগণ সুন্দর সহজভাবে ফারসি ভাষার অনুবাদ করতে পারদর্শী ছিলেন। অবশ্য অনেক অনুবাদ নিজস্ব ভাবধারায় ব্যাক্ত হয়। ফলে তাঁদের অনুবাদেও মার্জিত রূপ প্রকাশ পেয়েছে। আমরা তথ্যানুসন্ধানের ভিত্তিতে এ কথা বলতে পারি যে, ফারসি কাব্য সাহিত্যের প্রভাব বাঙালি কবিদের মধ্যে একদিনে সৃষ্টি হয়নি। বহুদিন ধরে ধর্ম, সংস্কৃতি ও দু'টি ভাষার বন্ধন বিদ্যমান থাকায় তাঁদের হৃদয়ে ভালবাসা সৃষ্টি হয়। সে ভালবাসাই ফারসি ভাবধারা অনুসৃত বাংলা ভাষায় কাব্য সৃষ্টিতে উজ্জীবিত করে তোলে। ফলে ফারসি কাব্যের অনুবাদ বা ভাবধারা গ্রহণের বিষয়টি বিশেষ করে বাঙালি মুসলমান কবিদের মধ্যে বেশি পাওবা যায়। বাঙালি মুসলমান কবিগণ ফারসি কাব্য রসে সিক্ত হয়ে বাংলা কাব্যরচনায় উৎসাহিত হয়েছিলেন। তা না হলে তাঁরা রোমান্স থেকে শুরু করে ধর্মীয় ভাবধারায় উপদেশমূলক কবিতা রচনায় উদ্বুদ্ধ হতনা। সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় তাঁদের সমান তালে দখল রাখা কম গৌরবের কথা নয়।

Dakha University Institutional Repository

মধ্যযুগে ফারসি কাব্য প্রভাবিত কতজন মুসলমান কবি ছিলেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দানের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়না। যেহেতু সময়টি ছিল মুসলিম শাসনের যুগ এবং ইসলাম ধর্ম ও ইসলাম প্রসারের যুগ। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের *পুঁথি-পরিচিতি* গ্রন্থের শেষে মুসলমান কবি ও তাঁদের রচনা নিয়ে একটি তালিকা দেয়া আছে। সেখানে একশত বিরাশি জন কবির রচনা বিদ্যমান থাকার উল্লেখ পাওয়া যায়।[৯] বাংলা সাহিত্যের গবেষক ড. আহমদ শরীফ মধ্যযুগের কবিদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে একটি তালিকা দিয়েছেন। সেখানে আশি জন বাংলাভাষী কবি ও তাঁদের রচনার নাম রয়েছে।[১০] এমনও অনেক কবি রয়েছেন তাঁদের সম্পর্কে আমরা ওয়াকিফহাল নই। সে সব কবিদের মধ্যে ফারসি কাব্যের প্রভাব থাকাই স্বাভাবিক। অবশ্য বাংলা কাব্য রচনায় শুধু ফারসি কাব্যের প্রভাব নয় বরং ফারসি গদ্যেরও প্রভাব রয়েছে। আমরা গদ্য রচনার প্রভাব সম্পর্কে অন্য স্থানে আলোচনা করব। এবার আমরা হিন্দু কবিদের উপর ফারসি কাব্যের প্রভাব নিয়ে আলোকপাত করছি। মধ্যযুগে হিন্দুরাও ফারসি ভাষা শিখতেন এবং এ ভাষায় অনেক গ্রন্থও রচনা করেছেন। হিন্দু বাংলা ভাষাভাষী কবিদের রচনায় সে প্রভাব সামান্যই বলে মনে হয়। কবি বড়ুচণ্ডিদাস (খ্রি. ১৫ শতক), কবি বিদ্যাপতি (খ্রি. ১৫ শতক) এবং কবি জয়ানন্দ (খ্রি. ১৬ শতক)– প্রমুখ কবিদের কাব্যরচনা নিয়ে বাংলা সমালোচকদের মাঝে ফারসি কাব্যের প্রভাবের বিষয়ে কোন মন্তব্য নেই। কবি বিজয় গুপ্ত, কবি বিপ্রদাশ, কবি যশোরাজ খান এবং কবি ভারতচন্দ্র সম্পর্কে আমরা যথেষ্ট তথ্য পাই না। তাঁদের কবিতায় ফারসি কবিতার প্রভাব রয়েছে বলে আমরা মনে কবি। বিশেষত হিন্দু কবি বড়ু চণ্ডিদাশ সম্পর্কে একই মন্তব্য করা যেতে পারে। তিনি একজন সাধক ও সরল মনের কবি ছিলেন। তাঁর রচিত *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যটি বাংলা সাহিত্যের বড় নিদর্শন। তাঁর এ কাব্যে ফারসি শব্দের বহু ব্যবহার পাওয়া যায়। এ রচনায় রাধা ও কৃষ্ণ চরিত্রে মাওলানা রুমির মসনবির প্রভাব থাকাটা স্বাভাবিক। বাংলা সাহিত্য সমালোচকদের একটি মন্তব্য হল, 'ইরানী সূফীতত্ত্বের প্রভাবেই ভারতে অদ্বৈতবাদ ও ভক্তিবাদ প্রসার লাভ করে।'[১১] বৈষ্ণব পদাবলিতে যে সুফি কবিদের প্রভাব পড়েছে এ তথ্য একটি বড় প্রমাণ রাখে বলে আমাদের বিশ্বাস। যদিও বাংলা সাহিত্যের কোনো গবেষক বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য করেন নি। অপরদিকে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (৫১৩ হি.-৬২৭ হি.), জালাল উদ্দিন রুমি (৬০৪ হি.-৬৭২ হি.), খাজা হাফেজ শিরাজি (৭২৬ হি.-৭৯১ হি.) এবং শেখ মুসলেহ উদ্দিন সাদির প্রভাব সম্পর্কে কোনো মন্তব্য নেই।[১২] এটা নিশ্চিত যে, ফারসি সাহিত্য বলতে শুধু তাঁদের রচনাগুলোর মধ্যেই সীমিত নয়। যেসব কবির রচনা ভারতীয় উপমহাদেশে বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে সেগুলোই বার বার আলোচনায় এসে যায়। যেসব কবির রচনা ইসলাম, এরফান ও তাসাউফ থেকে মুক্ত আমরা সেসব কবির আলোচনা থেকেও বিরত

Dhaka University Institutional Repository

থাকবো। কারণ, মধ্য যুগে ধর্মের সাথে বাংলা সাহিত্যের একটি সম্পর্ক ছিল এবং যে সম্পর্কটি ফারসির রয়েছে। এমন বহু ফারসি কবিতার গ্রন্থ রয়েছে সে সব গ্রন্থ গভীরভাবে অবলোকন করার সদিচ্ছা নেই। বাংলা সাহিত্য সমালোচকগণ শুধু রোমান্স ও ধর্ম বিষয় সম্বলিত কয়েকটি ফারসি কাব্যের কথা বলেছেন। এই চার কবির রচনা সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে মধ্যযুগে যেমন প্রসিদ্ধ ছিল ঠিক এখনও সেইরূপ আছে। যদিও এই ফারসি ভাষার চার কবির কাব্যের প্রভাবের বিষয়টি পরিস্কার নয়। আমরা বলতে পারি যে, নিসন্দেহ তাঁদের কাব্যসাহিত্য বাংলা কাব্যে প্রভাব রেখেছে। বাঙালিদের মাঝে তাঁদের বিশাল প্রভাবের কথা হয়ত আমরা অবগত নই। উদাহরণ হিসেবে নিম্নে বড়ু চণ্ডিদাস রচিত পদাবলি উপস্থাপন করা হল।

কে না বাঁশী বা এ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে
কে না বাঁশী বা এ বড়ায়ি গোঠ গোকুলে ॥
আকুল শরীর মোর বে আকুল মন ।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন ॥[১৩]

মাওলানা রুমি বাঁশির সাথে আত্মার সম্পর্ক করে মসনবি আঙ্গিকের কাব্য রচনা করেছেন। তাতে দেখা যায় যে, মসনবির প্রথম কয়েকটি শ্লোকের সাথে উল্লিখিত পদাবলির হুবহু মিল থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। বড়ুচণ্ডিদাস বাংলার সুলতান সেকান্দর শাহের রাজত্বকালে সভাকবি ছিলেন। এ সময় তাঁর মাঝে ফারসির প্রভাব পড়েনি তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কেননা, তাঁর শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্যে যেরূপ ফারসি শব্দের ব্যবহার মিলে তাতে তাঁর ফারসি শিক্ষার পরিচয় পরিস্কার হয়ে ওঠে। যেমন– কামান সদৃশ্য, খরমুজা কান্ধড়ী, বাকী বৈল, মজুরি সহিআঁ ইত্যাদি শব্দ। তাঁর ন্যায় অনেকে চরিত্র সংশোধন, দেহ ও আত্মার পরিশুদ্ধি, পবিত্রতা, সুফিকথা বিষয়ে কাব্য রচনা করেছেন। হিন্দুদের কাব্যরচনায় এক ধরণের সুফিবাদ পাওয়া যায়। সে সব রচনা তথ্য না থাকায় ফারসির প্রভাবের বিষয়টি পরিস্কার করা আদৌ সঠিক হবে না। এ ছাড়া কোন্ কাব্যটি কোন্ পৃক্ষাপটে রচিত হয়েছে তা জানা অনেক কঠিন।

রূপগোস্বামী কাব্য, ব্যাকরণ, সাংখ্য, বেদান্ত, ইত্যাদি বিষয়ে অসামন্য পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। সংস্কৃত শিক্ষা শেষে সপ্তগ্রামের বিখ্যাত ফারসি পণ্ডিত ফকরুদ্দিন গাজির নিকট রাজ্য ভাষা ফারসি ও আরবি ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করেন। এ সময় ফারসি কবিদের কবিতা পাঠ করেন নি– এমনটি বিশ্বসযোগ্য নয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর ফারসি শিক্ষাগ্রহণের বিষয় উল্লেখ আছে। তাঁর জীবন পরিবর্তনের অন্যতম দিক হলো আরবি ফারসি শিক্ষালাভ। এতে তাঁর জীবনে পরিবর্তনের সূচনা হয়। তিনি এক সময় ব্রাম্মন্য কুসংস্কার ত্যাগ করে মুসলমান রাজার অধীনে চাকুরি করেন।

Dhaka University Institutional Repository


গৌড়েশ্বরের দবীরখাস রাজস্ব বিভাগের প্রধান হিসেবে দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। সে সুবাদে তিনি মুসলিম সম্প্রদায়ের আচার, সংস্কৃতি, নিয়ম কানুন ও রাজা প্রজার মধ্যে সুসম্পর্কের প্রকৃত রূপ দেখতে পান। শেষ বয়সে তিনি বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এ সময় তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন। যার কারণে তিনি উজ্জ্বলনীলমণির মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাদান তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।[১৪]

মধ্যযুগের মুসলমানদের ফারসি কাহিনীনির্ভর কাব্যরচনার তালিকা

| | |
|---|---|
| ১. আমীর হামজা | ২৫. কায়দানী কিতাব |
| ২. ইউসুফ-জোলেখা | ২৬. দজ্জালনামা |
| ৩. জঙ্গনামা | ২৭. জৈগুণের পুথি |
| ৪. সা'আতনামা | ২৮. ফক্করনামা/মল্লিকার হাজার সওয়াল |
| ৫. শাহ পরীর কেচ্ছা | ২৯. দাকায়েকুল হাকায়েক |
| ৬. লালমনের কেচ্ছা | ৩০. জয়কুম রাজার লড়াই |
| ৭. ইব্লিছনামা | ৩১. দুল্লা মজলিস |
| ৮. অছিয়তনামা | ৩২. মুসার সওয়াল |
| ৯. মুওতনামা | ৩৩. লালমতি সয়ফুল মুলুক |
| ১০. ওফাত-ই-রসূল | ৩৪. লায়লী মজনু |
| ১১. কিফায়তুল মুসল্লিন | ৩৫. হজনামা |
| ১২. কেয়ামতনামা | ৩৬. সেকান্দরনামা |
| ১৩. গুলে বকাউলী | ৩৭. সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামান |
| ১৪. নুরনামা | ৩৮. শবে মেরাজ |
| ১৫. জেবুল মুলক সামারেখ | ৩৯. হপ্ত পয়কর |
| ১৬. মুক্তুল হোসেন | ৪০. নবীবংশ |
| ১৭. জহর মহরা | ৪১. ফিকরনামা |
| ১৮. ছিফতনামা | ৪২. মল্লিকযাদার পুথি |
| ১৯. তোতি ময়না | ৪৩. শীরনামা |
| ২০. তোতীনামা | ৪৪. হয়রাতুল ফিকহ্ |
| ২১. মুফিদুল মুমেনীন | ৪৫. সিরাজ কুলুব |
| ২২. তালনামা | ৪৬. হাতেম তাই |
| ২৩. তোহফা | |
| ২৪. জ্ঞান বসন্তবাণী | |

অনুসন্ধানের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, বহু মুসলিম কবির বাংলা কাব্যরচনায় ফারসি কাব্যের প্রভাব রয়েছে। যাদের প্রত্যেকেরই এক বা একাধিক রচনা বিদ্যমান রয়েছে। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক গবেষক মুহম্মদ হবীবুল্লাহ বাংলা সাহিত্য সম্মেলনে মুসলমান রচনাবলির একটি তালিকা দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি মুসলমান কবিগণের '৮৩২৫ খানা পুস্তক'[১৫] রচনার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি সংখ্যায় যে বেশি প্রকাশ করেননি তাঁর বক্তব্যে তা প্রতীয়মান হয়। এটি মুসলমান

Dhaka University Institutional Repository


বাঙালি কবিদের রচনার একটি বিশাল সংখ্যা। এসব রচনার মধ্যে ফারসির প্রভাব থাকাটাই স্বাভাবিক। অনেক বাংলা লেখক যেমন পিরের আদেশে ফারসি রচনার ধারায় বাংলা কাব্যরচনা করেছেন তেমনি নিজ দায়িত্ব সচেতনতার কথা ভেবেও ফারসি ভাষার অনুরূপ বাংলা কবিতা লিখেছেন। এসব কাব্য রচনা মূলত ধর্ম, দর্শন ও কাহিনীনির্ভর ছিল। আমরা বলতে পারি যে, ফারসি কাব্যের প্রভাব সামগ্রিকভাবে বাংলা কাব্যসাহিত্যে এসেছে। এটি কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ কাব্যের উপর নয়। যখন যে রচনাটি বেশি প্রসিদ্ধ ছিল ঠিক তখন সে রচনাটি একাধিক বাঙালি কবির মধ্যে প্রভাব ফেলেছে। ফলে আমরা বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন কবির একই নামের বাংলা রচনা দেখতে পাই। এসব রচনার উৎস ও প্রেক্ষাপট দেখতে গিয়েও ফারসির প্রভাবের বিষয়টি বেরিয়ে আসছে যা দু'টি ভাষার সম্পর্ক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির বিষয়টি প্রতিভাত হয়। আমরা এসব রচনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন মনে করছি।

## তিন. প্রভাবিত শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি

### মুহম্মদ সগির

শাহ মুহম্মদ সগির বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিদের মধ্যে একজন উল্লেখযোগ্য কবি হিসেবে স্বীকৃত। এ কবির জীবনমানসে যে কাব্য ধারা সূচিত হয়েছিল তা বাংলা সাহিত্যকে নতুনরূপ দান করেছে। তিনিই একমাত্র প্রথম মুসলিম কবি, যিনি ঐশী প্রেম কাহিনী রচনায় মুসলমানি ভাব ও রসে বাংলা সাহিত্যকে সিক্ত করেছেন। বাংলা সাহিত্যে আদর্শভিত্তিক কাব্য-রচনার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনেক। যে প্রেম কাহিনী নিয়ে তিনি কবিতা রচনা করেছেন সেটি মূলত একজন নবির ঘটনা। তিনি ভিন্ন ভাষায় রচিত নবির ঘটনাটি বাংলা ভাষায় রূপ দেন। এ কবির জীবনী যেভাবে উল্লেখ আছে তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। মধ্যযুগের অনেক রচয়িতা নিজ জীবন বৃত্তান্ত লেখে যাননি। তথাপিও তাঁরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক নামে অমর হয়ে আছেন। এ কবির একটি কাব্যরচনার কথা উল্লেখ রয়েছে যার নাম হল, *ইউসুফ জোলেখা*[১৬]। এটি সম্পাদনা করেছেন ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক। রচনাটির ভাষা ও শব্দের প্রয়োগ দেখে অনেকে তাঁকে পঞ্চদশ খ্রিস্টাব্দের বা পরবর্তী সময়ের কবি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। রচনায় জন্মতারিখ এবং জন্মস্থানের কথা কোথাও উল্লেখ নেই। রচনাটি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল নিদর্শন। এ রচনাকে ভিত্তি করে মধ্যযুগের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাখ্যা দেয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository


কবির পিতা, মাতা ও জীবন সংসারের বিষয়টি এখনো অনুদঘাটিত। কাব্যে পাণ্ডিত্যলাভ এবং শিক্ষাগুরু সম্পর্কেও কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তাঁর বংশ সম্পর্কে এনামুল হক বলেন, 'কবি মুহম্মদ সগির বাংলার কোন দরবেশ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিবেন।[১৭] এ উক্তি থেকে কবির একটি আধ্যাত্মিক পরিচয় মিলে। কবি দরবেশ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন–এটি সংশয়ের মত নয়। কেননা, তাঁর রচনাটিই বস্তুত সে দিকে ইঙ্গিত করছে। সাধারণত পির-দরবেশ ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিদের মধ্যেই এরূপ জ্ঞানের মিলন ঘটে। যারা অধিকতর আরবি ও ফারসি জ্ঞানের অধিকারী তাঁরাই ইউসুফ জোলেখার কাহিনীর ন্যায় ইসলাম ধর্মের আদর্শভিত্তিক কাহিনী রচনা করে থাকেন। তিনি যে সে সময়ে ফারসি শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন –এ বিষয়টিও খুবই পরিস্কার। যদিও তাঁর ফারসি শিক্ষার বিষয়টি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নেই। স্বভাবত সে সময় আরবি ও ফারসি জ্ঞানের প্রতি সবারই একটি আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। ধর্ম শিক্ষালাভের জন্য আরবি ফারসি শিক্ষা ছিল বাধ্যকতামূলক। সে দিক থেকেও কবি আলাদা ছিলেন না। আধুনিক কালের গবেষকগণ ফারসি সাহিত্য সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নন। সে কারণেও অনেক তথ্য অলিখিত থেকে যায়। আমরা তাঁকে বাঙালি কবিদের মধ্যে একজন অন্যতম ফারসি বিশেষজ্ঞ হিসেবে উল্লেখ করছি। ইসলাম ধর্মের প্রভাব কবির মধ্যে রেখাপাত সৃষ্টি করেছিল। সে সময়ে কবি এরূপ কাহিনী নির্বাচন করে বাংলাভাষীদের মাঝে খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন। এটি কবির ইসলামের প্রতি উদার ও ভালবাসার প্রকাশ ঘটিয়েছে। এ প্রসঙ্গে কবি বলেছেন,

পুরাণ কোরান মধ্যে দেখিলুঁ বিশেষ।
ইছুফ জলিখা বাণী 'অমৃত' অশেষ ॥
কহিমু কিতাব চাহি সুধারস পুরি।
শুনহ ভকত জন শ্রুতি- ঘট ভরি ॥
দোষ খেম গুণ ধর রসিক সুজন।
মোহাম্মদ ছগির ভণে প্রেমক বচন ॥[১৮]

এই মুসলিম কবির জীবনী সম্পর্কে যে মন্তব্য রয়েছে রচনাটির বর্ণনা পদ্ধতিকে ভিত্তি করে সূচিত হয়। রচনায় স্পষ্ট করে কোথাও রচনার কাল বা জীবন কাল উল্লেখ নেই। রচনায় চট্টগ্রামি শব্দের বহুল ব্যবহার থাকায় ডক্টর এনামুল হক তাঁকে চট্টগ্রামি বলেছেন। আবার 'মহা নরপতি গ্যেছ' লেখা থাকায় তাঁকে সুলতান গিয়াস উদ্দিন আযম শাহের সময়কালের কবি হিসেবে মতামত দিয়েছেন।[১৯] যে কারণে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই কবির জীবনকাল সম্পর্কে বিশাল মতভেদ দেখা দেয়। তিনি

Dhaka University Institutional Repository


একজন পূর্ববঙ্গের এবং মধ্যযুগের প্রথম সাড়ির বাঙালি কবি। একজন সৎ ও সাহসী ব্যক্তি হিসেবেও তাঁর সুনাম রয়েছে। কবির ভাবনায় নিজ দেশ ও স্বভাষার প্রতি ভালবাসার প্রকাশ দেখতে পাই।

## জৈনুদ্দিন

খ্রিস্টীয় পনের শতকের বাংলা সাহিত্যের অপর কবির নাম কবি জৈনুদ্দিন। এ কবি সম্পর্কেও বেশি কিছু জানা সম্ভব হয় নি। তাঁর একটি মাত্র রচনা রয়েছে। রচনাটির নাম *রসূল বিজয়*[২০]। এটির সম্পাদনা করেন ড. আহমদ শরীফ। এ রচনাটির কতক অংশের কবিতাকে ভিত্তি করে তাঁর জীবনকাল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়ে থাকে। এসব আলোচনা তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা নয়। তিনি সুলতান ইউসুফ শাহের সভাকবি ছিলেন। *রসূল বিজয়* শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ (১৪৭৪ খ্রি.-১৪৮১ খ্রি.)- এর আদেশে রচিত হয়। তাঁর ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ের জ্ঞান সম্পর্কে বাংলা রচনায় কোনো আলোচনা নেই। তাঁর *রসূল বিজয়* কাব্যগ্রন্থটি রচিত হয় ১৪৭৪-১৪৮২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। যদিও ড. আহমদ শরীফ এটির রচনাকাল উল্লেখ করেছেন ১৪৭৪ খ্রিস্টাব্দ।[২১] কাব্যের শিরোনাম দেখে বুঝা যায় যে, এটি একটি যুদ্ধ সংক্রান্ত রচনা। এতে হুজুর (সা.) –এর যুদ্ধের কাহিনী রয়েছে। কাব্যটি রচনার সময় কবি কোনো ফারসি পুস্তিকা দেখেছিলেন কী না তা তিনি বলে যান নি। এ রচনা সম্পর্কে এনামুল হক মন্তব্য করেছেন এভাবে, 'কবি জৈনুদ্দীনের ''রসূল বিজয়'' ঠিক মৌলিক রচনা নহে। গল্পটি কবি কোন ফারসী পুস্তক হইতে লাভ করিয়া থাকিবেন। তবে ইহা যে হুবহু ফারসীর অনুবাদ নহে, তাহা পুস্তকটি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়।'[২২] কবি কাহিনী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ফারসি ভাষার রচনা অনুসরণ করেছিল বলে অনুমিত হয়। আমরা এ সম্পর্কে একটি মন্তব্য দেখতে পাই শ্রী অসিত কুমার রচিত গ্রন্থে। তিনি বলেন, 'রসুলবিজয় কাহিনী কোন প্রাচীন ফার্সী কাব্য হইতে গৃহীত হইয়াছে বটে, কিন্তু কাব্য রচনার রীতিটি বাঙলা মঙ্গলকাব্যের ধারা অনুসরণ করিয়াছে।'[২৩] উক্তিতে মনে হল যে, তখন এ জাতীয় ফারসি কাব্যরচনার অস্তিত্ব ছিল। তবে এটি কোন্ ফারসি ভাষার কাব্যরচনা থেকে অনূদিত হয়েছে তা নির্দিষ্ট করা যায় নি। রচনাটির ভাব-কাহিনী এবং রস ফারসি ভাষার *শাহনামার* সাথে মিল থাকাটা যুক্তিযুক্ত। তিনি *শাহনামা পাঠ* করে সেই আদলে এটি রচনা করেছেন তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর রচনাটি একটি ঐতিহাসিক এবং কাহিনীনির্ভর কাব্যরচনা। তাঁর পূর্বে কেউ এ ধরনের কাব্যরচনা করেননি। আমরা বলতে পারি যে, তিনি আবুল কাশিম ফেরদৌসীর *শাহনামার* ভাব-কাহিনী অবলম্বনে *রসূল বিজয়* কাব্যটি রচনা করেছেন। এ সংক্রান্ত কাব্যরচনা বাংলা সাহিত্যে এটিই প্রথম। এর ঘটনা কোনো একটি মূল গ্রন্থ থেকে নেয়া

হলেও কাহিনীটি তিনি কল্পনার মাধ্যমে চিত্রিত করেছেন। বাংলা সাহিত্যে রচনাটি বিভিন্ন দিক দিয়ে প্রশংসার দাবী রাখে। নিম্নে কবি জৈনুদ্দিনের কবিতা প্রদত্ত হল:

॥ রসুল-পক্ষীয়দের রণসজ্জা ॥

...মহাবল জথ বীর প্রচণ্ড প্রতাপ ॥
দুই শত মণের কাবাই দিলেক যে গাএ।
বিশ মণের শিরত্রাণ শিরে শোভা পাএ ॥
ধনুর্বাণ হস্তে করি টোন ভরি শর।
সপ্ত শত মণের গদা বজ্রের দোসর ॥[২৪]

এই কবির জীবনকাল সম্পর্কে আধুনিক গবেষকদের মাঝে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। সুলতান আহমদ ভূঁইয়া এশটি প্রবন্ধে তাঁকে সপ্তদশ শতকের কবি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর 'সপ্তদশ শতকের কবি জয়নুদ্দীন ও তাঁহার 'জঙ্গনামা' কাব্য' শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়।[২৫] তবে কবির জীবনকাল নিয়ে এত ব্যবধান আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্য কোনো লেখকের আলোচনায় উপস্থিত নেই। আমরা তাঁকে কাব্যের বিষয় ও লেখার ধরন-পদ্ধতি দেখে শাহ মুহম্মদ সগিরের পরে স্থান দিয়ে থাকি।

## দৌলত উজির বাহরাম খান

ষোল শতকের অন্যতম প্রসিদ্ধ কবি দৌলত উজির বাহরাম খান। বাহরাম খান তাঁর মূল নাম; দৌলত উজির উপাধি। তিনি চট্টগ্রামের জাফরাবাদের শাসনকর্তা নিজাম শাহের দিওয়ান ছিলেন। তাঁর পিতার নাম মোবারক খান। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর শিক্ষা জীবন, পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানচর্চা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য নেই। যে কারণে তাঁর শিক্ষা জীবন ও সাহিত্যিক অবদান বিষয়ে মূল্যায়ন করা কঠিন হয়ে পড়ে। কবি বাহরাম খান ফারসি শিক্ষায় শিক্ষিত একজন প্রথিতযশা ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যে বিষয়ে কাব্যসাধনা করেছেন তা ফারসি ভাষার সাথে সম্পৃক্ত। এই কবি বাংলা ভাষায় *লাইলী মজনু*[২৬] কাব্য রচনা করে বিখ্যাত হয়ে আছেন। তিনি কোথাও ফারসি কাব্যের প্রভাব সম্পর্কে কাব্য রচনায় বক্তব্য রেখে যাননি। তবে কবির রচনায় ফারসি কাব্যের প্রভাব কতটুকু ছিল সে বিষয়টি পরিস্কার করা প্রয়োজন। এ সম্পর্কে বাংলা সাহিত্য সমালোচক ও গবেষক ড. এনামুল হক বলেন, ''লায়লী মজনু' ফারসী কবি জামীর ঐ নামীয় কাব্যের ভাবানুবাদ। স্থানে স্থানে মূল ঘেষা অনুবাদ যেমন আছে, স্বাধীন রচনাও তেমন দেখা যায়।'[২৭] ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ লিখেন, 'কবি ফারসী হইতে বিষয়বস্তু গ্রহণ করিলেও কোনও বিশেষ কাব্যের অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়না।'[২৮] তাঁর পূর্বে

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষার কোনো কবি এ নামে কাব্যরচনা করেননি। এ সম্পর্কে সুকুমার সেন বলেন, 'এটিই বোধ করি বাংলায় লায়লা মজনুর সর্বোৎকৃষ্ট অনুবাদ।'[২৯] তাঁদের মন্তব্যে স্পষ্টভাবে ফারসি কাব্যরচনা থেকে অনুবাদ করার বিষয়টি বার বার উচ্চারিত হয়েছে। এটিও যে ফারসি কাব্যের প্রভাবে রচিত গ্রন্থ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। *লায়লী-মজনু* কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনকারী ড. আহমদ শরীফ বলেন

> ফারসী ও সংস্কৃত সাহিত্যের জ্ঞানে, প্রভাবে এবং আদলেই মধ্যযুগে পাক-ভারতের আঞ্চলিক ভাষাগুলোর সাহিত্যিক বুনিয়াদ তৈরী হয়েছে এবং বিকাশের পথও হয়েছে সুগম- এ সত্য আজ আর বলবার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু তাই বলে কোনো কবির শক্তি-সামর্থ সম্বন্ধে সংশয় রাখার কারণ দেখিনে।[৩০]

ড. আহমদ শরীফ ফারসি কাব্যের প্রভাবের বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন। এটি একটি অনুবাদ বা ফারসি রচনার অনুসরণে রচিত গ্রন্থ– এ ব্যাপারে সন্দেহ থাকার অবকাশ নেই। তবে এটির রচনাকাল সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য রয়েছে। ড. এনামুল হকের মতে, বাহরাম খানের *লাইলী-মজনু* নামক রচনাটি ১৫৬০-১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়।[৩১] ঐতিহাসিক ড. আব্দুল করিম যে মতামত দিয়েছেন এর উপর ভিত্তি করেই রচনাটির সময়কাল গ্রহণ করা হয়ে থাকে। তিনি বলেন

> কবি বাহরাম খান সপ্তদশ শতকের প্রারম্ভেই (আনুমানিক১৬০০-১৬০৭ খ্রিস্টাব্দ) পিতার মৃত্যুর পর নিজাম শাহ সুরের অধীনে পিতৃ পরিত্যক্ত দৌলত-উজীর পদে নিযুক্ত হন এবং ঐ সময়কালের মধ্যেই লায়লী-মজনু রচনা করেন।[৩২]

কবির জীবন সম্পর্কে অন্য কোনো তথ্যবহুল আলোচনা নেই। নিম্নে কবির রচনা থেকে একটি উদ্ধৃতি দেয়া হল:

চতুর্দশ ভুবন সৃজিলা করতার।
অনন্ত অরূপ কৈলা অনেক প্রকার ॥
দশদিক সপ্তদ্বীপ ভুবন স্থাপিত।
বিবিধ বিধানে যুত রূপ নিযোজিত ॥
কৌতুকে সৃজিলা প্রভু করিয়া গৌরব।
এ মহী মণ্ডল মধ্যে আরব দুর্লভ ॥[৩৩]

## দোনাগাজী

মধ্যযুগে সাধারণ মুসলিম জনগণের মাঝে আনন্দরস সঞ্চার করেছেন ষোল শতকের অপর কবি দোনা গাজী চৌধুরী। এ নামটি তাঁর মূলনাম ছিল কী না তা জানা নেই। 'দোনা গাজী' একটি উপাধি হওয়া যুক্তিযুক্ত। বাংলা সাহিত্যে কবি দোনা গাজী সম্পর্কে বিবিধ বক্তব্য রয়েছে। তবে তিনি *সায়ফুল মুলক*

Dhaka University Institutional Repository


*বদিউজ্জামাল*[৩৪] কাব্য লিখে বিখ্যাত হয়ে আছেন– যা সবার নিকট গ্রহণযোগ্য। এ কাব্য গ্রন্থটি এক ধরনের কাহিনী কাব্যের প্রথম রচনা। এটি সম্পাদনা করেছেন ড. আহমদ শরীফ। রচনার কোথাও ফারসি ভাষা বা সাহিত্যের প্রভাবের বিষয়টি উল্লেখ না থাকায় তিনি রচনাটি মৌলিক হিসেবে মতামত দিয়েছেন। আমরা এ নামের হুবহু ফারসি রচনা পাই। এ কারণে ফারসি কাব্যের প্রভাবের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখার প্রয়োজন মনে করছি। নিম্নে কবি দোনা গাজী চৌধুরীর কবিতার অংশ প্রদত্ত হল:

রাজা মহাদেবী দুই করএ বিলাপ
কান্দএ সকল লোক ভাবি মনস্তাপ।
পাত্র পরিজন সবে চিন্তিয়া হৃদএ
রাজশোকে রাজ্যনাশ অরাজক ডএ।
সবে মিলে মন্ত্রণা করিল একমতি
বৃদ্ধ এক পাত্র কহে হই আগুসারি।[৩৫]

তাঁর এ কাব্যে সামাজিক দিকটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের চাহিদা পূরণে তিনি অনন্য ভূমিকা রেখেছেন। কেননা, বহুদিন ধরে *সায়ফুল মুলুক বদিউল জামাল* উপাখ্যানটি ফারসি ভাষায় রচিত হয়ে এক শ্রেনি সমাজের আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। বাংলা ভাষাভাষীদের মনোভাব বুঝতে পেরে তাঁর চেষ্টার কোনো ঘাটতি ছিল না। এটি আমাদের কম গৌরবের কথা নয় যে, তিনি প্রথম বাংলা ভাষায় কাহিনীটি কাব্যের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন।

## সৈয়দ সুলতান

*নবীবংশ*[৩৬] কাব্যরচনার জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন সৈয়দ সুলতান। তিনি ছিলেন ষোল শতকের একজন যুগশ্রেষ্ঠ কবি। একজন সুফি ও পীর হিসেবেও তাঁর খ্যাতি আছে। তাঁর পীরের নাম সৈয়দ হাসান। *নবী বংশ* কাব্যটি রচনা করতে যেয়ে কবি কোনো প্রভাবের কথা উল্লেখ করেননি। ফারসি ভাষায় গদ্য ও পদ্যে এ ধরনের একাধিক রচনা আছে। কবি সম্ভবত গদ্য ও পদ্য উভয় ধরনের রচনা দেখে ছিলেন। রচনাটি লেখার ক্ষেত্রে *শাহনামার* ধরন-পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন বলে অনুমিত হয়। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এ কাব্যরচনাটি আরবি থেকে অনূদিত হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন।[৩৭] মূলত এটি ফারসি *কাছাছুল আম্বিয়া* রচনার সাথে মিল রয়েছে। নিম্নে কবির রচিত *নবী বংশ দ্বিতীয় পর্ব* থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হল:

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নৈরাকার
অর্ধেক যে আছিল কথা করিমু প্রচার।
যে রূপে আদম সফি হইল উতপন
কহিল কিঞ্চিত কিছু সে সব বিবরণ।
দ্বিতীএ প্রণাম করি রসুল আক্ষার
নুর মুহম্মদের যে করিমু প্রচার।[৩৮]

এ কবির বহু রচনা সম্পর্কে একাধিক বক্তব্য রয়েছে। মূলত তিনি *নবীবংশ* বৃহৎ আকারে রচনা করেছেন। খণ্ডগুলো পৃথকভাবে একাধিক স্থানে পাওয়ায় অনেকগুলো রচনার কথা উল্লেখ করা হয়। এ কবি সম্পর্কে গবেষণা করেছেন ড. আহমদ শরীফ। তিনি এক প্রসঙ্গক্রমে বলেন, 'পূর্বে রচিত আরবী-ফারসী নবী কাহিনীকে আদর্শ করে সৈয়দ সুলতান স্বাধীনভাবে তাঁর *নবীবংশ* রচনা করেছেন।'[৩৯] তাঁর এ উক্তিতে প্রমাণ মিলে যে, তিনিও একজন ফারসি কাব্য প্রভাবিত বাঙালি কবি।

## শাহ বারিদ খান

বিদ্যাসুন্দর কাব্যের রচয়িতা শাহ বারিদ খান ছিলেন ষোল শতকের অন্যতম প্রসিদ্ধ কবি। তাঁর কাব্যে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক শব্দ থাকায় ড. আহমদ শরীফ তাঁকে একজন চট্টগ্রামের কবি হিসেবে নির্ণয় করেছেন। বাংলা গবেষকগণ একমত যে, তিনি চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।[৪০] বাংলা সাহিত্যে এই কবির অবদান ছোট করে দেখার অবকাশ নেই। তিনি তিনটি রচনা রেখে গিয়েছেন। তাঁর *রসুল বিজয়* ও *হানিফার দিগ্বিজয়*– এ দু'টি রচনা ফারসি কাব্যের ভাব-ভাষা অবলম্বনে রচিত হয়। অবশ্য ড. আহমদ শরীফ তাঁর কবিতাগুলো সম্পাদনার ক্ষেত্রে কোনো স্থানে প্রভাবের বিষয়টি উল্লেখ করেন নি। *রসুল বিজয়* কাব্যের শিরোনামগুলো হল 'আলির কৃতিত্ব', 'জয়কুমের পুত্রশোক', 'আলি ও মুলক শাহর লড়াই', 'খাখানের যুদ্ধ', 'কাওয়াসের যুদ্ধ', 'জয়কুম কন্যা' ও 'খরাইলের বিবাহ' ইত্যাদি। এ রচনাটি সম্পর্কে কবি বলেন,

সাবিরিদ খান পদ রচিল উপাম
নবীজয় বাক্য চক্র জঙ্গনামা নাম ॥[৪১]

কবির বক্তব্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এটি ফারসি কাব্যের জঙ্গনামা অনুকরণে রচিত হয়। এই কবি সম্পর্কে আধুনিক বাংলা গবেষকগণ ফারসি কাব্যের প্রভাবের বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন। তিনিও ফারসি কাব্যের প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন না বলা যায়। আমরা তাঁর রচনা দেখে সে বিষয়টি অনুমান করতে পারি। নিম্নে *হানিফার দিগ্বিজয়* কাব্যরচনা থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হল:

Dakha University Institutional Repository


নূর মোহাম্মদ হৈলা যার হোন্তে পয়দা কৈলা
সৃষ্টি কৈরা এতিন ভূবন।
যার হেতু নিরঞ্জন দুনিয়া করিলা সৃজন
আকাশ পাতাল মর্ত্য স্থান ॥[৪২]

কাব্যে ফারসি প্রভাবের বিষয়টি স্পষ্ট নয়। এতে যুদ্ধের ঘটনাটি বড় করে দেখানো হয়েছে। কাব্যের আঙ্গিক ও রূপ দেখে মনে হল, এটি একটি জঙ্গনামা। এটির বিষয় কারবালার কাহিনীর সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। এ জাতীয় রচনায় ফারসির প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে।

## আলাওল

সতের শতকের মুসলমান কবির মধ্যে সৈয়দ আলাওল অন্যতম প্রসিদ্ধ কবি। তিনি ছিলেন বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দি, আরবি ও ফারসি ভাষায় সুপণ্ডিত। তাঁর ন্যায় এত বড় পণ্ডিত ও বহু গ্রন্থপ্রণেতা হিন্দুদের মধ্যেও বিরল।[৪৩] এই কবির একাধিক রচনার মধ্যে *হপ্তপয়কর, তোহফা, সায়ফুল মুলক* ও বদিউজ্জামাল এবং *সিকান্দরনামা* অন্যতম। এরূপ নামের রচনাগুলো ফারসি কাব্যগ্রন্থের নামের সাথে সম্পৃক্ত। এখানে আমরা তাঁর সম্পর্কে বাংলা সাহিত্যের ক'জন শ্রেষ্ঠ মনীষীর মন্তব্য উল্লেখ করছি। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ বলেন, 'আলাওলের সমুদয় গ্রন্থই অনুবাদ। প্রাচীন হিন্দী কবি মালিক মোহাম্মদ জায়সীর ''পদুমাবৎ" এর বাঙ্গালা অনুবাদ ''পদ্মাবতী" ব্যতীত তাঁহার অপর সমস্থ গ্রন্থই ঐ নামীয় পারস্য গ্রন্থের অনুবাদ।'[৪৪] এতেই প্রমাণিত হয় যে, আলাওল মধ্যযুগের একজন ব্যতিক্রমধর্মী কবি ছিলেন। তাঁর সমস্ত রচনা ছিল ফারসি কাব্য সাহিত্যকে নিয়ে। ভাষাবিদ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, 'তিনি পারশ্য কবি নিযামী গাঞ্জুবির (১১৪৯খ্রি.-১২০৩খ্রি.) বিখ্যাত কাব্যপঞ্চকের মধ্যে হফ্ত *পয়কার* ও *সিকান্দরনামার* অনুবাদ করেন।'[৪৫] এ উক্তিতেও পরিস্কার যে, আলাওলের এ নামের রচনাগুলো ফারসি কাব্যগ্রন্থের অনুবাদ। বাংলা সাহিত্য গবেষক সুকুমার সেন লিখেন, 'সোলেমানের অনুরোধে আলাওল ফারসী ধর্মনিবন্ধ তোহফার অনুবাদ করেছিলেন ১০৭৩ হিজরিতে (১৬৬০ খ্রী)।'[৪৬] তাঁর অপর একটি মন্তব্য হল, 'মাগনের অনুরোধে আলাওল ফারসী আখ্যায়িকাকাব্য 'সয়ফুল-মুলুক বদিউজ্জামাল'-এর অনুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।'[৪৭] এ দু'টি উক্তিতে ফারসি কাব্যসাহিত্যের প্রভাবের বিষয়টি কবি আলাওলের মধ্যে বিশালভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর *সয়ফুল-মুলুক বদিউজ্জামাল* কাব্যরচনা সম্পর্কে সাহিত্য বিশারদ বলেন, 'আলাউল কোন অজ্ঞাতনামা পারস্য কবির কাব্য অবলম্বনে এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।'[৪৮] তিনি 'তোহফা' সম্পর্কে বলেন, 'আলাওল বৃদ্ধাকালে এই সামাজিক গ্রন্থখানি পারস্য হইতে অনুবাদ করিয়াছেন।'[৪৯] চট্টগ্রামের ইতিহাস লেখক

Dhaka University Institutional Repository


মাহবুবল আলম অনুরূপ রচনার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি উর্দু গ্রন্থের উদ্বৃতি দিয়ে লিখেন ,'প্রধান মন্ত্রী মাগন কবি আলাওলকে দিয়া অনুবাদ করান ফার্সী হইতে বাঙ্গালায় : (১) পদ্মাবতী, (২) জুক-কলন্দর, (৩) হফৎ পয়কার, (৪) ছয়ফুল মুলুক বদিয়জ্জমাল প্রভৃতি।'[৫০] উক্ষিখিত মন্তব্যের বিষয় দেখে বুঝা যায় যে, আলাওল একজন ভাল, সুদক্ষ ফারসি অনুবাদক ছিলেন। তিনি ফারসি কাব্যগ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করে হুবহু গ্রন্থ নাম ব্যাবহার করেছেন। অবশ্য তাঁর অনুবাদের ধরন-পদ্ধতি বর্তমান সময়ের অনুবাদের চেয়ে ভিন্ন। এ সম্পর্কে মনসুর উদ্দীন বলেন,

> তিনি সম্পূর্ণ সিকান্দরনামাটি ''এক এক বয়ত হস্তে এক এক পয়ার'' হিসেবে অনুবাদ করিতে পারেন নাই। করিতে পারাও সম্ভব নয়। কারণ বাংলা ভাষার চেয়ে পার্সী ভাষা ঢের বেশী সমৃদ্ধশালী, সুতরাং তিনি যাহা করিয়াছেন তাহাও অভূতপূর্ব।[৫১]

আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ বলেন,

> সেকেন্দার নামা' পারস্য মহাকবি নেজামী কর্তৃক আদৌ পারস্য ভাষায় বিরচিত হয়। আলাওল তাহাই ভাষান্তরিত করেন। সে কালের ভাষান্তরকে কেহ সাধারণ অর্থে গ্রহণ করিবেন না ; তাহার অর্থ অনেক স্থলেই 'নূতন সৃষ্টি'। এই কাব্যও কতটা সেইরূপ মনে করিতে হইবে।[৫২]

এ সম্পর্কে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, 'দাক্ষিণাত্যের কবি গওয়াসী হি. ১০৩৫ বা ১৬২৬-২৭ খ্রী. ঐ নামীয় কাব্য ফারসীতে রচনা করেন। আলাউলের কাব্যের সহিত তাহার তুলনা না করিলে আলাউল গওয়াসীর কাব্যের অনুবাদক কি না, বলা যায় না।'[৫৩] উল্লিখিত মন্তব্যে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আলাওল একজন সুদক্ষ অনুবাদকই নন একজন ভাষাবিদও। তিনি মূল কাহিনী উপস্থাপনের ক্ষেত্রে যতটা স্বাধীন ছিলেন তার চেয়ে বেশি সংযত ছিলেন অনুবাদের মাধ্যমে বিষয়টির প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশ করা। তাঁর অনুবাদ সম্পর্কে ড. মুহম্মদ এনামুল হক বলেন,

> আলাওল যাহা করিলেন, তাহা ফারসীর সুকুমার সাহিত্য সংশ্লিষ্ট বিষয়। সুতরাং ইহা জাতিধর্ম্ম - নিবির্বশেষে সকলের নিকট যে প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার ''হপ্ত পয়কর'', ''সেকান্দরনামা'', সয়ফুল মুলক -বদীউজ্জামাল'' প্রভৃতি কাব্য ফারসী সাহিত্যের সবর্বজন প্রশংসিত উচ্চদরের সাহিত্য। এই কাব্যগুলির অনুবাদে বাঙ্গালা ভাষা সত্যই সম্পদশালিনী হইয়া উঠে।[৫৪]

কবির অনুবাদের বিষয়টি সকলের কাছেই গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। এ কারণে ড. আহমদ শরীফ বলেন, 'আলাউল মুখ্যত অনুবাদক। পদাবলীই কেবল তাঁর মৌলিক রচনা।'[৫৫] এ বক্তব্যেও কবির অনুবাদে পারদর্শীতার কথা ব্যাক্ত হয়েছে। *তোহফা-ই-নাসাই*[৫৬] কাব্যটি ভারত উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক শায়খ ইউসুফ গাদা ১৩৯৩ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন। এটি ফারসি ভাষায় ইসলাম ধর্ম বিষয়ে কাব্যাকারে রচিত হয়। এ কাব্যটিতে ৭৭৬ টি দ্বিপদী শ্লোক রয়েছে। তাঁর *তোহফা- ই-নাসাঈ* এর অনূদিত গ্রন্থের নাম *তোহফা* বা *তত্ত্ব উপদেশ*। তিনি এটির অনুবাদ সমাপ্ত করেন ১০২৬

মঘি সন মোতাবেক ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে। এটি রচনার জন্য মহামাত্য সোলায়মানের অবদান অপরিসীম। তিনি এটি রচনার জন্য কবিকে আদেশ করেছিলেন। কবির রচনায় তা উল্লেখ আছে। নিম্নে কবি আলাওল বিরচিত *তোহফা* থেকে কবিতার দু'টি ছত্র উদ্ধৃতি হিসেবে দেয়া হল।

দ্বিতীয় বাবেত শুন ইমান বয়ান।
পুণ্যে কর্মে ফল নাহি বেগর ইমান ॥
ফয়গাম্বর সকাল না হৈত অবতার।
কেহনা পারিত নিরঞ্জন চিনিবার ॥
এক স্বামী সত্য চিত্তে প্রত্যয় করিয়া
যেই মত দিলে, সেই মুখেত কহিবা ॥[৫৭]

## নসরুল্লাহ খোন্দকার

সতের শতকের শেষ দিকের উল্লেখযোগ্য কবির নাম নসরুল্লাহ খোন্দকার। তাঁর পিতার নাম শরীফ মনসুর খোন্দকার।[৫৮] এ পরিবারের সদস্যগণ ফারসি ভাষার চর্চা করতেন। তাঁর রচিত কাব্যগুলো হল: *জঙ্গনামা, মুসার সওয়াল* ও *শরীয়ৎনামা*। কাজী দীন মুহম্মদ বলেন, ''মুসার সওয়াল' কাব্যখানি মোহাম্মদ নসরুল্লাহ খাঁ ঐ নামীয় কোন এক ফারসী কেতাব হতে অনুবাদ করেছেন।'[৫৯] এ রচনাটি সম্পর্কে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন,' নসরুল্লাহ ফারসী পুস্তক অবলম্বনে ইহা রচনা করেন।'[৬০] তিনি কবির কয়েকটি পঙ্ক্তি ব্যবহার করেন এভাবে ,

বাঙ্গালা না বুঝে এই ফারসী কিতাব ।
না বুঝি ফারসী ভাষে পাএ মনস্তাপ ॥
তে কারণে ফারসী করিলুম হিন্দুয়ানী
বুঝিবারে বাঙ্গালা সে কিতাবের বাণী ॥'[৬১]

রচনার নাম দেখেও বুঝা যায় যে, এতে মুসা (আ.) তুর পাহাড়ে আল্লাহর সঙ্গে যে কথোপকথন করেছেন সে বিষয়ের আলোচনা রয়েছে। এই বাংলা রচনায় ফারসির প্রভাবের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে।

## শেখ পরান

সতের শতকের অন্যতম কবি শেখ পরান। তাঁর *নূরনামা*[৬২] এবং *নসীহৎ নামা* নামক দু'টি কাব্যরচনার উল্লেখ পাওয়া যায়। রচনা সম্পর্কে ড. এনামুল হক বলেন, ''নসীহৎনামা' গ্রন্থটি মৌলিক

রচনা নহে। ইহা ঐ নামীয় কোন ফারসী গ্রন্থের অনুবাদ অথবা ফারসী ভাষায় লিখিত ধর্মীয় কথার সার-সংগ্রহ।'[৬৩] তিনি এ প্রসঙ্গে কবির একটি উক্তি ব্যবহার করেছেন। উক্তিটি হল নিম্নরূপ :

ফারছি ভাষে সেই কথা আছিল লিখন
বাংলা ভাষায় কৈলুং বুঝিতে কারণ ॥[৬৪]

*নূরনামা* শীর্ষক ফারসি কাব্যগ্রন্থ বিদ্যমান রয়েছে। তবে *নসীহৎ নামা* নামের কোন পদ্য রচনার সন্ধান পাওয়া যায় না।

## মুহম্মদ খান

আমরা ফারসি কাব্য প্রভাবিত সতের শতকের কয়েকজন কবির সন্ধান পাই। তন্মধ্যে মুহম্মদ খান অন্যতম। তিনি কারবালার কাহিনী রচনায় একজন প্রসিদ্ধ কবি। সৈয়দ সুলতানের অন্যতম শিষ্য হিসেবেও তাঁর পরিচিতি আছে। এই কবির ফারসি শিক্ষা সম্পর্কে বাংলা সাহিত্যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নেই। তাঁর রচনাগুলো হল: *সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ*, *হানিফার লড়াই*, *আসহাব নামা*, *মকতুল হুসৈন*, *কিয়ামৎ-নামা*, *দজ্জালনামা*, *কাসিমের লড়াই* প্রভৃতি। তাঁর *মক্তুল হুসেন*[৬৫] একটি বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ। এতে এগারটি পর্ব আছে। এ রচনাটিও ফারসি থেকে অনূদিত। এনামুল হক বলেন, '"মকতুল হোসেন" এই নামীয় ফারসী গ্রন্থেরই ভাবানুবাদ।'[৬৬] তাতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনিও ফারসি কাব্যের প্রভাব থেকে মুক্ত নন। কবির মনে সে সময়ের ফারসি রচনাগুলো যথেষ্ট প্রভাব রেখেছে। নিম্নে *মক্তুল হোসেন* কাব্যগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি থেকে কবিতার উদ্ধৃতি দেয়া হল:

মুক্তুল হোছেন কথা অমৃতের ধার ।
জে পড়ে জে শুনেপুন্য পায়ন্ত অপার ॥
নবি বংস লাগি জেবা অনুসোচ করে।
পাপে থু মোচন হএ নরকে না পড়ে ॥
আমির হোছন বংস জন্ম ঘণনিধি।
সর্ব্ব সাস্ত্রে বিসারদ নব রস 'দধি ॥[৬৭]

## আবদুন নবি

আবদুন নবির *আমির হামজা*[৬৮] নামক কাব্যরচনাটি বাংলা সাহিত্যের বড় সংযোজন। বাংলা ভাষায় আমির হামজা কাহিনী রচনার জন্য তাঁর অবদানকে ছোট করে দেখার অবকাশ নেই। তিনি এটি ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন। রচনাটি সম্পর্কে এনামুল হক বলেন, 'ফারসী 'দাস্তান-ই-আমীর

Dhaka University Institutional Repository


হামজা' অবলম্বন করিয়া এই বৃহৎ পুস্তকটি রচিত।'[৬৯] এ গ্রন্থ সম্পর্কে কবির একটি উক্তি নিম্নে দেয়া হল।

'আমির হামজা কিশ্চা ফারসি কিতাব ।
ন বুঝিআ লোকের মনেত পাই তাব ॥
বঙ্গেত ফারসি ন জানয় সব লোক ।
কেহ কেহ বুঝি কেহ ভাবে জেনা সোঁক ॥'[৭০]

এ নামে ফারসি ভাষার গদ্য ও পদ্য রচনা রয়েছে। কোন রচনা থেকে কবি অনুবাদ করেছেন সে সম্পর্কে কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে রচনাটি সম্পর্কে ড. এনামুল হকের পরিস্কার মতামত হল এই যে,

> ইহা ফারসী কাব্যের অবিকল অনুবাদ নহে ; ছায়াবলম্বনে লিখিত। সুতরাং ইহাকে অনেকটা কবির স্বাধীন রচনাও বলা যাইতে পারে। পুস্তকের সর্ব্বত্র কবিত্ব নাই সত্য, কিন্তু ভাষা সর্ব্বত্র বেশ স্বচ্ছন্দ গতিতে চলিয়াছে। যুদ্ধ বর্ণনায় কবি ফারসীর আদর্শই গ্রহণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ভাষার প্রাণ্জল্যতা ও সারল্যে তাহা বেশ উপভোগ্য হইয়াছে।[৭১]

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আবদুন নবী ফারসি সাহিত্যের বিষয়গুলো বাংলাভাষীদের মাঝে যথাযথভাবে তুলে ধরার জন্য চেষ্টা করেছেন। তিনি নিজেও স্বীয় রচনায় ফারসি কাব্যের প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন।

## শেখ সেবরাজ চৌধুরী

শেখ সেবরাজ চৌধুরী ছিলেন আনুমানিক সতের শতকের শেষ ভাগের কবি। তাঁর দু'টি রচনার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এ দু'টি রচনার নাম *মল্লিকার হাজার সওয়াল* এবং *কাসেমের লড়াই*। ড. এনামুল হক বলেন, ''মল্লিকার হাজার সওয়াল'' নামক কাব্যখানি ফারসী ''ফক্কর নামার ''ভাবানুবাদ।'[৭২] সাহিত্য বিশারদের মতামত হল, একাধিক রচনার মধ্যে *ফক্করনামা* কোন ফারসি গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত হয়েছে।[৭৩] রচনা সম্পর্কে কবি বলেন,

'ফক্করনামা করি আছএ কিতাব
কহিমু যতেক কথা আছে পরস্তাব ॥
সকলে না বুঝে দেখি ফারসী বচন
কহিলুঁ বাঙ্গালা ভাবে বুঝিতে কারণ ॥'[৭৪]

Dakha University Institutional Repository


কাব্যে ফারসি প্রভাবের বিষয়টি উল্লেখ দেখে বুঝা যায় যে, কবি ফারসির প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন না। তবে এ ধরনের ফারসি রচনাগুলো কোথায় রয়েছে তা পরিস্কার করে বলা যাচ্ছে না।

## আবদুল হাকিম

সতের শতকের শেষ এবং আঠার শতকের শুরুর দিকের অন্যতম কবি আবদুল হাকিম। তাঁর জন্ম তারিখ ও জন্ম স্থান নিয়ে মতভেদ আছে। একাধিক মতে তিনি নোয়াখালি জেলার অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতার নাম আবদুর রাজ্জাক। পিরের নাম শিহাব উদ্দিন মুহম্মদ।[৭৫] তিনি যে সময়ে বড় হয়েছেন সেটি ছিল সাহিত্য চর্চার যুগ। গোটা ভারত-উপমহাদেশে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য উন্নতির একটি সীমারেখায় পৌঁচেছিল। তখন হিন্দু-মুসলমান উভয়বিদ সাধারণ জনগন পর্যন্ত ফারসি ভাষা চর্চা করত। সেমতে কবি ফারসি শিক্ষা গ্রহণ ব্যতীত ছিলেন না। এ সম্পর্কে গবেষক রাজিয়া সুলতানা তাঁর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে *আবদুল হাকিম কবি ও কাব্য* গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর মতে কবি একজন বাংলা, সংস্কৃত, আরবি ও ফারসি ভাষার সুদক্ষ পণ্ডিত ছিলেন। অপর দিকে কবি পিরের মুরিদ হওয়ায় তাঁর ফারসি ভাষা জানার পরিচয় মিলে। কেননা, তখন সুফিধারার লোকেরা পিরের নিকট থেকে ফারসি ভাষার তালিম পেতেন। কবি শুধু একজন সাধারণ মুসলমান ছিলেন না। তিনি ছিলেন সুফিবাদী ও তরিকতপন্থী একজন অনন্য ব্যক্তি। এ কবির রচনা সম্পর্কে গবেষক রাজিয়া সুলতানা লিখেন, ‘আবদুল হাকিম রচিত গ্রন্থের মধ্যে এ-পর্যন্ত ৫টি কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। যথা–এক, ‘ইউসুফ জলিখা’, দুই, ‘নূরনামা’, তিন, ‘দুররে মজলিশ’ চার, ‘লালমোতি সয়ফুলমুলক’, এবং পাঁচ, ‘হানিফার লড়াই’।’[৭৬] বাংলা-সাহিত্য সমালোচকদের মতে তাঁর বেশির ভাগ রচনা ফারসি কাব্যের অনুবাদ বা অনুসরণে রচিত হয়। তিনি বাংলা ভাষায় যেসব উপদেশ ও নীতিজ্ঞান লিখেছেন সেসবের উৎস ফারসি ধর্মীয় গ্রন্থ।[৭৭] আমরা এ কবির রচনায় ফারসি কাব্যের প্রভাব সম্পর্কে বাংলা সাহিত্য সমালোচকদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোকপাত করতে পারি। কবির একটি রচনা সম্পর্কে সাহিত্য বিশারদ বলেন, ‘আবদুল হাকিমের ‘ইউসুফ জোলেখা’ কাব্য জামীর উক্ত নামধেয় কাব্যের স্বাধীন অনুবাদ।[৭৮] এ থেকে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে, রচনাটি অনুবাদ, মৌলিক নয়। গবেষক রাজিয়া সুলতানা বলেন,‘ মোল্লা জামীর ফারসী কিতাব ‘ইউসুফ ওয়া জলিখা’, অনুসরণে আবদুল হাকিম আনুমানিক ১৬৩৭ খ্রী: ‘ইউসুফ জলিখা’ কাব্য রচনা করেন। এই গ্রন্থটি সম্ভবত: কবির যুবা বয়সের রচনা।’[৭৯] *ইউসুফ জোলেখা* কাব্যরচনা সম্পর্কে কবি নিজে বলেন,

মোল্লা জামীর বাক্য শিরেতে ধরিয়া
আবদুল হাকিমে কহে বাঙ্গালা রচিয়া ॥

Dakha University Institutional Repository

ইছুপ জলিখার কিস্‌সা হইল সমাপ্ত

ফারসী কিতাব বাঙ্গলা পদন্ত ॥[৮০]

কবিতায় অনুবাদের বিষয়টি স্পষ্ট করে দেয়া আছে। অতএব তাঁর এই বাংলা কাব্যরচনাটি অনুবাদ বিষয়ে সন্দেহ থাকার কথা নয়। আমরা তাঁর *নূরনামা* রচনা সম্পর্কে একই মন্তব্য পাই। রাজিয়া সুলতানা লিখেন, 'নূরনামা' একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ। ধর্ম বিষয়ক এই গ্রন্থটি 'নূরনামা' নামক ফারসী কাব্যের আংশিক বা পুরোপুরি ভাবানুবাদ।'[৮১] এ সম্পর্কে গবেষক ড. শহীদুল্লাহ বলেন, 'কবি সম্ভবতঃ ফারসী হইতে ইহা অনুবাদ করেন।'[৮২] স্পষ্টত: এ দু'টি মন্তব্যে ফারসির প্রভাব পরিস্কারভাবে বুঝা যায়। অতএব এ রচনাটি ফারসি কাব্যের অনুবাদ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। এ কাব্যগ্রন্থটি সম্পাদনা করেন অধ্যাপক আলি আহমদ। তিনি রচনাটির উৎস সম্পর্কে 'নূরনামা গ্রন্থ দেখে নূরনামা লিখিত হয়েছে' বলে মন্তব্য করেন। সেই *নূরনামা* কোন ভাষার গ্রন্থ ছিল তা উল্লেখ করেননি। তিনি বলেন 'আরবী বা ফারসি ভাষার কোন নূরনামার গ্রন্থ ছিল কি না আমাদের জানা নেই।'[৮৩] যদিও তিনি বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন সত্য, তবে রচনাটির উৎস ফারসি ভাষার গ্রন্থ ছাড়া অন্য ভাষার নয়। এ সম্পর্কে অধ্যাপক আলী আহমদ সম্পাদিত 'বঙ্গ ভাষায় গ্রন্থ রচনার কারণ' শিরোনাম থেকে কবির দু'টি চরণ উদ্ধৃত হল:

তে কাজে নিবেদি বাঙ্গেলা করিয়া রচন।

নিজ পরিশ্রম তোষ আমি সর্বজন ॥

আরবী ফারসী ভাষে নাহিক ফরাগ।

দেশী ভাষে বুঝিতে ললাটে নাই ভাগ॥[৮৪]

এই সম্পাদিত গ্রন্থের পঙ্‌ক্তিগুলোর উপর একটি নোট দেয়া আছে। নোটে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি *নুরনামার* কাব্য বলে উল্লেখ করা হয়। পঙ্‌ক্তিতে দুটি চরণ এরূপ:

নূরের সৃজন কাব্য করি ভঙ্গভাষা।

রচি আম্মি সভানের পুণ্য-কর আশা ॥

শুনিতে ফারসী ভাসে অন্য জন মুখে।

তাল মতে বুঝিতে না পারি মন সুখে ॥[৮৫]

কবির এ ভাষা থেকে বুঝা যায় যে, ফারসি ভাষায় নবি করীম (সা.) -এর বৃত্তান্ত রয়েছে। কাব্যগ্রন্থে একটি শিরোনাম হল 'নূরনামা গ্রন্থের প্রতি ইমাম গাজ্জালী ও সুলতান মুহাম্মদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন'। এ থেকেও পরিস্কার হয়ে ওঠে যে, মূল রচনাটি ফারসি ভাষার এবং এটি আধুনিক সময়কালের রচনা নয়। *নূরনামা* রচনাটি তৎকালীন সময়ে প্রসিদ্ধ ছিল। রাজিয়া সুলতানার মতে, ফারসি ভাষার

পদ্যরচনা *নূরনামা* থেকেই বাংলা *নূরনামার* সৃষ্টি। হিন্দী বা উর্দু গ্রন্থ এই নুরনামার উৎস নয়। এ কবির *দুররে মজলিশ* রচনা সম্পর্কে একই মন্তব্য করা যেতে পারে। গবেষক রাজিয়া সুলতানা লিখেন, 'সাইফুজ জাফর রচিত ফারসী কাব্য 'দুররুল মজলিশ' এর ছায়া অবলম্বনে এই কাব্য রচিত।'[৮৬] কবির *লালমোতি সয়ফুলমুলক* রচনাটি মৌলিক কাব্য হিসেবে অনেকে মন্তব্য করেছেন। তবে এ সম্পর্কে দীন মুহম্মদ বলেন, 'আলোচ্য গ্রন্থটি ফারসী উপাখ্যানের অনুবাদ হলেও কবি মৌলিকত্বের দাবী রাখে।' আমরা বলতে চাই যে, *সিকান্দরনামা* কাব্যের সাথে এ কাব্যের যোগসূত্র পাওয়ায় এটিও ফারসি কাব্যের প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। তাঁর অপর একটি রচনার কথা ড. এনামুল হক উল্লেখ করেছেন। এটির নাম *শিহাবুদ্দীননামা*। এ রচনাটি সম্পর্কে ড. এনামূল হক বলেন, 'পুস্তকটি কবির পীর শিহাবুদ্দীন মুহম্মদ সাহেবের উপদেশাবলী বা জীবনী নহে; ইহা ফারসী ধর্মীয় পুস্তকের সারসংগ্রহ।'[৮৭] এ কাব্যটিকে গবেষক ড. শহিদুল্লাহ *নসীহতনামা* বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি নিম্নে কবির একটি পঙ্‌তি উদ্ধৃতি হিসেবে উল্লেখ করেন।

ফারছী ভাষে সেই কথা আছিল লিখন
বাংলা ভাষায় কৈলুং বুঝিতে কারণ॥[৮৮]

যদিও কবির ভাষায় প্রভাবের বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। এখনও বাংলা রচনা ও মূল ফারসির টেক্স পাওয়া নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। আবদুল হাকিম কবি ও কাব্য গবেষক রাজিয়া সুলতানা এ রচনাটি সম্পর্কে কোনো তথ্য দেন নি। তবে *শিহাবুদ্দীননামা* কাব্যগ্রন্থটি কাজী দীন মুহম্মদ দেখেছিলেন বলে মনে হল। তিনি কাব্যপাণ্ডুলিপির পত্র সংখ্যা উল্লেখ করেছেন ১৪৫ টি এবং এটি অনুলিখিত হয় ১৭৩৫ খ্রিস্টাব্দে।[৮৯] আমরা স্পষ্টভাবে বলতে পারি যে, কবি আবদুল হাকিম ফারসি কাব্যের প্রতি আসক্ত ছিলেন। তাঁর রচনাগুলো ফারসি কাব্য থেকেই পুষ্টি সাধন করা হয়।

### খোন্দকার নওয়াজিস খান

শতের শতকের শেষ ও আঠার শতকের শুরুর দিকের অন্যতম প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন খোন্দকার মুহম্মদ নওয়াজিস খান। তিনি *গুলে বকাওলী* কাব্য রচনার জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। কবির পিতার নাম মুহম্মদ ইয়ার খোন্দকার। তিনি ছিলেন চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানার অর্ন্তগত সুখছড়ি গ্রামের অধিবাসী।[৯০] পিতা বাল্যকাল থেকেই তাঁর লেখাপড়ার জন্য সুব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। যে কারণে লেখাপড়ায় কোন ধরনের কষ্ট কবিকে করতে হয়নি। ফারসি ও বাংলা শিক্ষা যে পিতার মাধ্যমে লাভ হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। তবে তাঁর শিক্ষক ও শিক্ষাকেন্দ্র সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। কবির পির ছিলেন মৌলভি আতাউল্লাহ। যদিও পির তাঁকে ফারসি শিক্ষা ও নীতিশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ

Dhaka University Institutional Repository


রচনায় উৎসাহ যুগিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি গীত ও গান রচনা করতে ভালবাসতেন।[৯১] তাঁর কাছ থেকে তিনি সুফিবাদের শিক্ষা গ্রহণ করেন। এতে বুঝা যায় যে, তিনি সুফিতত্ত্বের অধিকারী ছিলেন এবং ধর্ম শিক্ষায় একজন বিজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনার নাম *গুলে বকাওলী*। এটির সম্পাদনা করেন রাজিয়া সুলতানা। তিনি এটির সম্পাদনাকালে এ নামীয় কয়েকটি বাংলা পাণ্ডুলিপি দেখেন। যা তিনি ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। ভূমিকায় কোথাও কোন্ ফারসি পাণ্ডুলিপি সামনে রেখে পাণ্ডুলিপির পাঠ সম্পাদনা করেছেন– এমনটি তিনি বলেননি। বাংলা কাব্যসাহিত্যে এ রচনার গুরুত্ব অনেক। এটি তিনি কখন লিখে ছিলেন রচনার তারিখ কোথাও উল্লেখ নেই। এ কাব্যরচনাটি সম্পাদনাকালে রাজিয়া সুলতানাও রচনাকাল নির্ণয় করেননি। অনুমান করা হয় যে, এটি তাঁর প্রথম রচনা। রচনা প্রসঙ্গে রাজিয়া সুলতানা বলেন, ‘গুলে বকাওলী কাহিনীর আদি লেখক ইজ্জতুল্লাহ না হলেও অনুমান করা যায় যে, নওয়াজীস খাঁ ইজ্জতুল্লাহর কাব্য অনুসরণে গুলে বকাওলী রচনা করেন।’[৯২] এ উক্তি থেকে অনুমান করা যায় যে, কবি ইজ্জতুল্লাহর কাব্য রচনাটি কবি নওয়াজীস খাঁ দেখেছিলেন। তিনি যে ফারসি কাব্যের প্রভাব থেকে মুক্ত নন তা পরিস্কার হয়ে ওঠে। এটি স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ রায়ের আদেশে ও তাঁর অনুপ্রেরণায় রচিত হয়েছিল। আমরা *গুলে বকাওলী*[৯৩] নামের রচনা সম্পর্কে যে তথ্য পাই তাতে স্পষ্ট ভাষায় বলতে পারি যে, কবির রচনার পূর্বে *গুলে বকাওলী* ফারসি ও উর্দু ভাষায় রচিত হয়েছিল। প্রথম রচনা করেন শেখ ইজ্জতুল্লা'হ বাঙালি। রচনার নাম *তাজুল মুলক গুলে বকাওলী*। এটি রচিত হয় ১১৩৪ হিজরি মোতাবেক ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে। এই ফারসি কাব্যের প্রভাব কবি নওয়াজিস খানের উপর প্রত্যক্ষভাবে পড়েছে। এ কাব্যের উৎস ফারসি কাব্য গ্রন্থ।[৯৪] নিম্নে *গুলে বকাওলী* কাব্যরচনা থেকে কবিতার উদ্ধৃতি দেয়া হল :

আয় পিতামহী তুমি প্রাণ অবতার।  
এক বাক্য জিজ্ঞাসিমু চরণে তোমার ॥  
নিষ্কপটে সত্য করি কহ মোর স্থান ।  
মন প্রবোধিতে পুছি তোমা বিদ্যমান ॥  
এই বেশোয়ার কীর্তি শুনিয়া শ্রবণে।  
মহা মহা লোক আইসে খেলিতে কারণে ॥[৯৫]

এ নামে বাংলা ভাষায় মুহম্মদ মুকীম এবং মুহম্মদ আলী কাব্যরচনা করেন। তবে কবি নওয়াজিস খানের গুলে বকাওলি বাংলা সাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

## হেয়াত মামুদ

জারিগান ও জঙ্গনামা রচনার জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন কবি হেয়াত মামুদ। এ কবির জন্মগত উপাধি শাহ এবং গুণগত উপাধি কাজি। তিনি ছিলেন আঠার শতকের অন্যতম প্রসিদ্ধ বাঙালি কবি। তিনি কাজি মসিউর উদ্দিন নামক পীরের মুরিদ ছিলেন। তাঁর পীর তাঁকে ধর্ম, দর্শন ও চরিত্র বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন।[৯৬] ফারসি শিক্ষা গ্রহণের জন্য কোনো পৃথক উস্তাদের নাম না পাওয়া গেলেও তিনি যে পীর থেকে ফারসি শিক্ষা লাভ করেছিলেন তা বলা যায়। উচ্চ বংশীয় একজন ধার্মীক, নম্র ও ভদ্র ব্যক্তি হিসেবেও তাঁর পরিচিতি কম ছিল না। গবেষক মযহারুল ইসলাম বলেন, ‘কবি হেয়াত মামুদ যে অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার রক্তে পাঠান ও বাঙালী রক্তের মিশ্রণ ঘটিয়াছিল।’[৯৭] তাঁর পিতা কবির মাহমুদ ছিলেন একজন সাহিত্যামোদী ও বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি। সবসময় তিনি ধর্ম এবং সমাজ সেবায় নিয়োজিত থাকতেন। এ পরিবাররটি কাজি পরিবার হিসেবেও খ্যাত ছিল।[৯৮] যে কারণে সমাজের সাধারণ মানুষ কবিকে একজন কাজি হিসেবেও শ্রদ্ধা করতেন। সুবক্তা, সাধক এবং ধার্মিক হিসেবে তিনি ছিলেন এক অনন্য ব্যক্তি। সে সময় কবির মধ্যে যে প্রতিভাগুলো ছিল তা খুব কম ব্যক্তির মধ্যেই পাওয়া যেত। যদিও তাঁর শিক্ষা ও জ্ঞান বিদ্যা অর্জনের বিষয়টি এখনও অলিখিত আছে। তিনি যে, সে সময়ের সকল শিক্ষায় পারদর্শী ছিলেন তার রচনাগুলো দেখে সহজেই অনুমান করা যায়। তখন ফারসি ভাষা ও সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়া একটি গৌরবের বিষয় ছিল। তিনি ফারসি ভাষার জ্ঞান লাভ করেছিলেন। সম্ভবত পির-মুরিদ সম্পর্ক ও ধর্মের প্রতি অগাধ বিশ্বাস তাঁকে ফারসি শিক্ষার প্রতি গভীর ভালবাসা জাগিয়েছিল। যে কারণে কবির মধ্যে ফারসি কাব্যসাহিত্য প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। তাঁর রচনায় অত্যধিক ফারসি শব্দ ও বাক্যের ব্যবহার রয়েছে। আমরা এ বিষয়ে গবেষক মযহারুল ইসলামের একটি উক্তি উল্লেখ করছি। উক্তিটি নিম্নরূপ:

> হেয়াত মামুদের কাব্যে আলৌকিক কাহিনী বা আজগুবি কল্পনার পরিচয় যতটুকু পাওয়া যায় তাহার মূলে রহিয়াছে ঐ জাতীয় ফারসি কাব্যের প্রভাব–এগুলি তাহার ব্যক্তিগত কল্পনার সৃষ্ট নহে। ফারসী সাহিত্যের সৌন্দর্য ও শিল্পকলা কবি হেয়াত মামুদের কবি মানসকে বিশেষ ভাবে মুগ্ধ করিয়াছিল।[৯৯]

এ কবির প্রসিদ্ধ চারটি রচনা হল: *জঙ্গনামা*, *সর্বভেদবাণী*, *হিতজ্ঞানবাণী* ও *আম্বিয়াবাণী*। তিনি *জঙ্গনামা* কাব্যটি ১৭২৩ খ্রিস্টাব্দের কোনো এক সময়ে রচনা করেন। পূর্বে রচিত এরূপ নামের কাব্যরচনার চেয়ে এটি একটি পৃথক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রচনা। সপ্তদশ শতকে মুহম্মদ খানের *মুক্তাল হুসেন* কাব্যটি কারবালার কাহিনী নিয়ে রচিত হয়। এটিও ছিল ফারসি কাহিনীর অনুসরণে রচিত কাব্যগ্রন্থ। পরবর্তীতে শাহ গরীবুল্লাহ কর্তৃক *জঙ্গনামা* কাব্যগ্রন্থটি সাধারণের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তাঁর

রচনাটিও ফারসি গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত। কবি হেয়াত মামুদ এ গ্রন্থ রচনায় কোন ফারসি কাব্যরচনার অনুসরণ করেছিলেন নির্দিষ্ট করে তা বলেন নি। তবে তিনি স্বীকার করেছেন যে, এটি ফারসি কাব্যের অনুসরণে রচিত হয়। কবি *জঙ্গনামা* কাব্যে বলেন,

হেয়াত মামুদে কহে শুনহ সভায়।
পারসীর কথা আমি রচিনু বাঙ্গালাএ ॥[১০০]

গ্রন্থটি বাংলার মুসলিম সমাজের জন্য একটি প্রিয় গ্রন্থ। এটি বটতলার ছাপাখানা থেকে বহুবার ছাপা হয়েছে। তাঁর *সর্বভেদবাণী* বা চিত্ত-উত্তান রচিত হয় ১৭৩২ খ্রিস্টাব্দে। রচনাটির মাঝে ফারসি কাব্যের প্রভাব রয়েছে। সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিষ্ণু শর্মার *পঞ্চতন্ত্র*[১০১] ফারসি ভাষায় অনুবাদ হয়। কবি এই ফারসি রচনার ভাব অবলম্বন *করে সর্বভেদবাণী* কাব্য রচনা করেছেন। তাঁর *হিতজ্ঞানবাণী* ও *আম্বিয়াবাণী* -এ দুটি রচনা ফারসি ভাষায় রচিত ধর্মীয় গ্রন্থের ভাবানুবাদ। তিনি প্রথম গ্রন্থটি রচনা করেন ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে। *এটি ঈমান আকায়েদ ও প্রয়োজনীয় মাস্‌লা-মাসায়েল সম্পর্কিত রচনা*। এক কথায় তিনি ধর্মের বিষয়গুলোকে কাহিনী আকারে রচনা করেন। এটিও ফারসি গ্রন্থের অনুসরণে রচিত হয়। তিনি বলেন

ফারছির কথা সব আনী বাঙ্গালাত
পদবন্ধ করি কহে মহম্মদ হেয়াত
হিত্যগ্যানবাণী ভাই সুন সবর্ব্বজন
মোছলমান হয়া পূজা না কর কখন ॥[১০২]

তাঁর *আম্বীয়াবাণী* কাব্যরচনার তারিখ ১৭৫৮ খ্রিস্টাব্দে। এতে কবি কোথাও ফারসির প্রভাবের কথা উল্লেখ না করলেও নবী কাহিনীমূলক গ্রন্থ অনুসরণ করেই তিনি এটি রচনা করেছেন। কেননা, তাঁর রচনার পূর্বেই ফারসি ভাষায় *কাসাসুল আম্বিয়া* লেখা হয়। কবি যে ফারসি রচনাদি সম্মুখে রেখে বাংলায় কাব্য রচনা করেছেন তা থেকে বিষয়টি পরিস্কার হয়ে ওঠে।

### সৈয়দ নুরুদ্দিন

এ শতকের অন্যতম মুসলিম কবির নাম সৈয়দ নুরুদ্দিন। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ আজিজ। শাহ মোহাম্মদ জাহিদ ছিলেন কবির ধর্মগুরু। তাঁর প্রতি কবির পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল। যে কারণে কবির মনে ফারসি রচনার প্রভাব পড়ে। তিনি বাংলা সাহিত্যে একক কোনো কাব্যরচনার জন্য ততটা পরিচিত নন। তাঁর রচনাগুলো হল: *দাকায়েকুল হাকায়েক*, *মুসার সওয়াল*, *বুরহানুল আরেফীন* এবং *রাহাতুল কুলুব*।[১০৩] তিনি ফারসি গ্রন্থের নাম অনুসরণ করে নিজ রচনায় নাম ব্যবহার করেছেন।

যদিও তাঁর রচনাগুলো হুবহু অনুবাদমূলক নয়। এতে ফারসি গ্রন্থের কাহিনী ও পদ্ধতি সংযোজিত হয়েছে বলা যায়।

## আবদুস সামাদ

আনুমানিক আঠার শতকের শেষ এবং উনিশ শতকের শুরুর দিকের অন্যতম কবি ছিলেন আবদুস সামাদ। এই কবি শেখ সাদির *গোলিস্তান* এবং *বোস্তান* আংশিকভাবে অনুবাদ করেছেন।[১০৪] বাংলা সাহিত্যে এ কবির আলোচনা গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপন হয়নি। তিনি ফারসি রচনা অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে স্থান করে আছেন। তাঁর কাব্য রচনাটি সম্পর্কে সাহিত্য বিশারদ বলেন, 'ইরাণি কবি শেখ সা'দীর বিখ্যাত গ্রন্থ 'গুলিস্তা'র স্বাধীন অনুবাদ।'[১০৫] তাঁর সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি তথ্য পাওয়া যায়নি।

## শাহ গরিবুল্লাহ

দোভাষী পুথিকার রূপে পরিচিত কবি ফকির গরিবুল্লাহ বা শাহ গরিবুল্লাহ। তিনি ছিলেন বর্ধমান জেলার অধিবাসী। সে সময় তাঁর নিকট ফারসি, উর্দু, হিন্দি ও বাংলা পরিচিত ভাষা ছিল। যে কারণে দোভাষী পুথি রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর আত্ম-পরিচয় মেলা ভার। তবে তিনি বাংলা সাহিত্যে দোভাষী কবিতা সৃষ্টি করে খ্যাত হয়ে আছেন। দোভাষী পুথি সৃষ্টিতে বাংলা কাব্যে তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। দোভাষী পুথি কাব্যের বিষয় ও পরিধি ফারসি কাব্যের আলোচনা ও ধারা থেকে ভিন্ন নয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য পুথি হল –*আমীর হামজা*, *ইউসুফ জোলেখা*, *জঙ্গনামা* ও *সোনাভান*। তিনি যে *আমীর হামজা* কাব্য রচনা করেছেন তাতে ইরানের বাদশাহ নওশেরওয়ানের সাথে আমীর হামজার যুদ্ধ কাহিনী উল্লেখ আছে। এটি অন্য রচয়িতাদের আমির হামজার কাহিনী থেকে পৃথক কী না তা স্পষ্ট নয়। এ কাব্যগ্রন্থটি ফারসি *দাসতান ই আমীর হামজার* অবলম্বন করে রচিত হয়।[১০৬] উল্লেখ্য যে, এ নামে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে ফাসি ভাষায় রচিত গল্পাকারে পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়েছে। তাঁর *জঙ্গনামা* কাব্যগ্রন্থটি কারবালার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়। তিনি কাব্যটি *মক্তুল হুসেন* ফারসি রচনাকে সামনে রেখে রচনা করেন। এ সম্পর্কে তিনি তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন,

ফারসী কেতাব ছিল মোক্তাল হোচেন।
তাহা দেখি কবিতায় করিনু রচন ॥[১০৭]

Dhaka University Institutional Repository


তাঁর রচনার পঙ্ক্তি দেখে অনুমান করা যায় যে, কবি ছিলেন একজন ফারসি ভাষার পণ্ডিত। ফারসি কাব্যরচনা থেকে তিনি সকল ভাব ও বিষয় গ্রহণ করেছেন। এ কবির তিনটি রচনাই ফারসি কাব্যসাহিত্যের সাথে সম্পৃক্ত। তাঁর *জঙ্গনামা* কাব্যরচনা থেকে কবিতার উদ্ধৃতি দেয়া হল।

হোসেনের হাল শুনি নবী পেরেশান।
আক্কার কুদরত পরে হইল হয়রান ॥
তার পরে হজরত আইলেন ঘরে ।
হাসান হোসেন কোথা পুছেন ফাতেমারে ॥[১০৮]

## সৈয়দ হামজা

পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী সৈয়দ হামজা (১৭৫৫ খ্রি.-১৮১৫ খ্রি.) ছিলেন ফকির গরীবুল্লাহর কাব্য শিষ্য। তিনি অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে *মধুমালতী*, *আমীর হামজা*, *জৈগুণের পুথি* ও *হাতিমতাই* কাব্যরচনা করে বিখ্যাত হয়ে আছেন।[১০৯] সে সময় বাঙালি মুসলমানরা তাঁর কাব্য পাঠ করে তৃপ্তি লাভ করতেন। কেননা রচনাগুলো দোভাষী বাংলায় লেখা হয়েছিল। এ কাব্যগুলোর বিষয় ও ভাষা এতটাই সহজ যে, গ্রামের সাধারণ বাঙালি মুসলমানরা পাঠে স্বাদ পেতেন। বাংলা কাব্যে নতুন ভাষারীতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁর অন্য একটি পরিচয় রয়েছে। তিনি ছিলেন দোভাষী বাংলা রীতির অন্যতম অগ্রনায়ক। মুসলমানরা তাঁর রচনা পাঠে ভিন্ন স্বাদ অনুভব করতেন বলা যায়। তাঁর সম্পর্কে সুকুমার সেন বলেন, 'সৈয়দ হামজা ইসলামি বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বড় কবি।'[১১০] কবি ফারসি শিক্ষা সম্পর্কে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর এ রচনাগুলো ফারসি রচনাদির সাথে সম্পৃক্ত। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ *আমীর হামজা* রচনা থেকে যে দু'টি পঙ্ক্তি উদ্বৃত করেন তা হল এই:

জার জে বাসাএ তারা খোসালেতে রহে।
হামজার গোলাম হামজা এই বাত কহে ॥[১১১]

তিনি যে, নতুন করে কাহিনী উপস্থাপনে একজন বিজ্ঞ সাহিত্যিক ছিলেন তাঁর উক্তিতে পরিস্কার হয়ে ওঠেছে। তাঁর *মধুমালতী* পুথিটি সৈয়দ আলী আহসান ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদনা করেছেন। তিনি সম্পাদনাকালে ফারসি কাব্যগ্রন্থের সন্ধান পান। তবে এ গ্রন্থের উপর ফারসি কাব্যের প্রভাবের বিষয়টি উল্লেখ করেননি। তিনি ভূমিকায় মুহম্মদ কবীরের *মধুমালতীর* উপর ফারসির প্রভাব রয়েছে– সে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তাঁর এ সম্পাদিত গ্রন্থের ৫২ পৃষ্ঠার ভূমিকায় *মধুমালতী* কাব্যরচনা বিষয়ে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। তবে এটি অনুবাদ বা ভাবানুবাদ– সে বিষয়টি কোথাও নেই।[১১২] চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে *কিসসায়ে মধুমালত ও মনুওর* নামের একটি ফারসি পাণ্ডুলিপি ছিল। তিনি

Dhaka University Institutional Repository


সম্পাদনাকালে সেই পাণ্ডুলিপির সহযোগিতা নিয়েছেন। তিনি 'মধুমালতী ঃ একটি ফারসি পুথি' শিরোনামে প্রবন্ধ লিখে বাংলা সাহিত্যের উৎস সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাতে ফকির মুহম্মদ রচিত ফারসি *মধুমালতীর* কথা জানা যায়।[১১৩] আমরা সৈয়দ হামজার রচনাবলি দেখে নিশ্চিত হয়েছি যে, তাঁর প্রতিটি রচনা ফারসি কাব্যরচনার প্রভাব থেকে মুক্ত নয়।

## অন্যান্য প্রতিভাবান কবি

এখানে অন্য কয়েকজন মুসলিম কবির আলোচনা নিয়ে আসা সমীচীন মনে করছি। বাংলা সাহিত্যে কবীর নামে একাধিক ব্যক্তির নাম রয়েছে। যেমন– কবীর, শেখ কবীর ও মুহম্মদ কবীর। শেখ কবীর নামের বাঙালি মুসলিম কবি সম্পর্কে আমাদের আলোচনা করা প্রয়োজন। তিনি ছিলেন একজন পদকর্তা। তিনি সুলতান নাসির উদ্দিন নসরত শাহের সময়কালে (১৫১৯ খ্রি.-১৫৩২ খ্রি.) আর্বিভূত হন।[১১৪] সাধারণত মুসলিম পদকর্তাগণ সুফি সাধনার ধারাকে তাঁদের কবিতায় স্থান করে দেন। ফারসি সাহিত্যের মরমি কবিতাগুলো তাঁর মাঝে প্রভাব ফেলেছে। তা না হলে তিনি সুফি প্রেমধর্মী পদাবলি রচনা করতে পারতেন না। মুহম্মদ কবীর *মনোহর মধুমালতী* কাব্য রচনা করেছেন। এটিও কোনো এক ফারসি রচনার বাংলা অনুবাদ।

মুসলিম কবি শেখ ফয়জুল্লাহর রচনাগুলো প্রকাশ্যে অনুবাদ বা ভাবানুবাদের বিষয়টি উত্থাপন করা যায় না। তাঁর মাঝে এশক এবং প্রেম সাধনা জাগ্রত ছিল। তাঁর রচিত *গোর্খ বিজয়*, *গাজী বিজয়*, *সত্যপীর*, *জয়নালের চৌতিষা* ও *রাগনামা* অন্যতম। এ কথা সত্য যে, পূর্ববর্তী বাঙালি মুসলিম কবিদের প্রভাব তাঁর মধ্যে ছিল। যদিও রচনাগুলো ফারসি কাব্য সাহিত্যের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত নয়। তবুও তিনি ফারসি কাব্যের ধারা ও নিয়ম-নীতি থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন না।

*নূরনামা* ও *নসিহতনামা* কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা শেখ পরান। বাংলা সাহিত্যে এ কবির আলোচনা গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপিত হয় নি। এই কবি ফারসি সাহিত্যেরও একজন সেবক ছিলেন। ড. এনামুল হক বলেন, 'নসীহৎনামা গ্রন্থটি মৌলিক রচনা নহে। ইহা ঐ নামীয় কোন ফারসি গ্রন্থের অনুবাদ অথবা ফারসী ভাষায় লিখিত ধর্মীয় কথার সার -সংগ্রহ।'[১১৫] এ কথা থেকে স্পষ্টত বুঝা যায় যে, তাঁর মাঝে ফারসি কাব্যের প্রভাব ছিল।

Dhaka University Institutional Repository


সুফি কবি হিসেবে খ্যাত শেখ চান্দ ছিলেন বহু গ্রন্থের প্রণেতা। কবি শেখ চান্দ বা চাঁদ চারটি রচনার জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন। রচনাগুলো হলো: *রসুল বিজয়*, *তালিবনামা*, *কিয়ামতনামা* ও *হরগৌরী সংবাদ* প্রভৃতি । *রসুল বিজয়* কাব্যটিতে আদম আ. থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত বর্ণনা রয়েছে। এ কাব্যগ্রন্থটি যে ফারসি *কাসাসুল আম্বিয়া* রচনা থেকে নেয়া হয়েছে তাঁর বিবরণ পাই নিম্নের উক্তিতে।

ফতে মামদের সুত সেক চান্দ নাম।
গুরুর আঙ্গাএ পাচালি রচিলাম যনুপাম ॥
কাচাছোল আম্বিয়া এক কিতাবেত সুনি।
পাচালিয়া বন্দে [তাকে] পুস্তকে পুনি ॥[১১৬]

কবির পিরের নাম শাহদৌলা। তিনি সবসময় পিরের আস্তানায় বসবাস করতেন। এর মাধ্যমে তাঁর আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জিত হয়।

## সুফিমতের উদ্ভব ও কাব্য বিচার

মধ্যযুগে বাঙালি মুসলমান সকলেই আরবি ফারসি চর্চা করতেন। তাঁদের মাঝে অনেকে ভাষা বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং ফারসি, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার জ্ঞান রাখতেন। তখন ফারসি শিক্ষিত মুসলমান পাঠক যথেষ্ট ছিল। তবে খাঁটি বাংলা ভাষার পাঠক তুলনাহারে কম থাকাটাই ছিল স্বাভাবিক। মুসলমান কবিগণ বাংলা ভাষায় মার্জিত রূপ ব্যবহার করতে গিয়ে নিজের রচনায় ভিন্ন ভাষা ব্যবহারের কথা বলেছেন। যেমন– আবদুল হাকিম ও মুহম্মদ কবীর 'হিন্দুয়ালি' ও 'দেশী' ভাষা বলে উল্লেখ করেন।[১১৭] তাঁরা সে সময় কোন ধরনের পাঠক চেয়েছিলেন– বিষয়টি স্পষ্ট নয়। হয়ত তখন আরবি ফারসি মিশ্রিত বাংলা ভাষাই সবচেয়ে ব্যবহার হতো বেশি। সবার নিকট বাংলা ভাষা গ্রহণীয় ভাষা ছিল।

বাঙালিদের মাঝে সুফিমতের উদ্ভব একদিনে হয়নি। একটি পরিবেশ ও সুন্দর স্থান ছিল বলেই সুফিধারার বিকাশ ঘটেছে। বাঙালি কবিরা সুফি সাধক ছিলেন। অনেক কবি তাঁদের কবিতায় পির ও পিরের আশ্রয়ে জীবন-যাপনের কথা বলেছেন। তাঁদের মাঝে সুফি ভাবধারা জাগ্রত ছিল। যদিও এটি ছিল তাত্ত্বিক ও মরমিয়াবাদে পরিপূর্ণ। তাঁরা কখনো ইসলামকে পরিত্যাগ করে সুফিধারায় গমন করেননি।[১১৮]

Dhaka University Institutional Repository


ফারসি রচনাদির অনুবাদ ও ভাবানুবাদমূলক যে বাংলা গ্রন্থ রয়েছে তা বর্ণনা দান অনেকাংশেই কষ্টতুল্য। মুসলমান কবিদের একটি বড় অংশই ফারসি রচনানাদির প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। যে কারণে একটি প্রসিদ্ধ ফারসি রচনার বাংলা ভাষায় বহু কাব্য রচনা তৈরি হয়েছে। এই সামান্য পরিসরে তা উল্লেখ করা একরূপ অসাধ্য বটে।

যাঁরা আরবি ফারসির চর্চা করতেন শুধু তারাই যে বিশাল বাংলা কাব্যের জ্ঞান ভাণ্ডার রেখে গিয়েছেন তা সত্য। কারবালার ঘটনা, হানিফার যুদ্ধ কাহিনী, নবি কাহিনী, মুসার কাহিনী এবং অন্যান্য প্রেম কাহিনীগুলো ফারসি ভাষার গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে। আরবি ফারসির জ্ঞান ব্যতীত এসব রচনা তৈরি হয়নি। ফারসি জানা বাঙালি মুসলিম কবিরা যে জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন তা থেকে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে বলা যায়। পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, মধ্যযুগের বাঙালি কবিগণ ফারসি কাব্যের প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেননা। তাঁদের রচনার বিড়াট অংশই ফারসি কাব্য-সাহিত্যের সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। যদিও রচনার অনেক পাণ্ডুলিপি আমাদের কাছে নেই। আমরা তাঁদের অবদান সম্পর্কে যতটুকু জানতে পেরেছি তাতে আমাদের বিস্ময় হতে হয় যে, মধ্যযুগের বাঙালি কবিগণ কোনো অংশেই কম গৌরবের অধিকারী ছিলেননা। তাঁদের ইসলাম ধর্মমূলক ও মুসলিম কাহিনীকাব্যগুলোতে ফারসি কাব্যের যথেষ্ট প্রভাব ফুটে ওঠতে দেখা যায়। তাঁরা প্রত্যেকেই ফারসি ভাষার বিশাল জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ফারসি ভাষাকে বুকে ধারণ করে বাংলা ভাষা সাহিত্যের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা চিরদিন অটুট থাকুক।

<u>টীকা ও তথ্যনির্দেশ</u>

১. শরীফ, আহমদ, *সাহিত্য তত্ত্ব ও বাঙলা সাহিত্য*, বিদ্যা প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ২৫।

২. ইকবাল, ভূঁইয়া সম্পাদিত, *নির্বাচিত রচনা আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ১৬৮; হক, মুহম্মদ এনামুল, নুতন দৃষ্টিতে পুরানো বাংলা, *মাসিক মোহাম্মদী*, ১৫শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, আষাড়, ১৩৪৯, পৃ. ৪৩৫।

৩. হক, মুহম্মদ এনামুল, নুতন দৃষ্টিতে পুরানো বাংলা, তদেব, পৃ. ৪৩৫ ও ৪৮২।

৪. ইকবাল, ভূঁইয়া সম্পাদিত, *নির্বাচিত রচনা আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ*, পৃ. ১৬৯; হক, মুহম্মদ এনামুল, নুতন দৃষ্টিতে পুরানো বাংলা, *মাসিক মোহাম্মদী*, তদেব, পৃ. ৫৩৫।

৫. ইকবাল, ভূঁইয়া সম্পাদিত, *নির্বাচিত রচনা আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ*, তদেব, পৃ. ২৬-২৯

৬. ইকবাল, ভূঁইয়া সম্পাদিত, তদেব, পৃ. ২৬।

৭. আহসান, সৈয়দ আলী, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস মধ্যযুগ*, বাতায়ন প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৬।

৮. আহমদ, ওয়াকিল, *বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান*, খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ২৩।

৯. শরীফ, আহমদ সম্পাদিত, *আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংকলিত পুথি-পরিচিতি*, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮, পরিশিষ্ট-ক।

১০. শরীফ, আহমদ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৫, পরিশিষ্ট-ক।

১১. হাই, মহম্মদ আবদুল, ও শরীফ, আহমদ সম্পাদিত, *মধ্যযুগের বাঙলা গীতি-কবিতা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৮, পৃ.-ক।

১২. উল্লিখিত চার জন কবির ফারসি রচনাগুলো ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের ঘরে পঠিত হত। তাঁদের প্রভাব বাংলা সাহিত্যের চেয়ে সমাজের সর্বস্তরে রয়েছে। কেননা তখন বাংলায় ফারসি ভাষার ব্যবহার ও প্রচলন ছিল।

১৩. হাই, মহম্মদ আবদুল, ও শরীফ, আহমদ সম্পাদিত, *মধ্যযুগের বাঙলা গীতি-কবিতা*, (উদ্বৃতি) পূর্বোক্ত, পৃ. ৬।

১৪. রহমান, লুৎফর, *বাংলা সাহিত্যে নন্দনভাবনা প্রাচীন ও মধ্যযুগ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৯৮।

১৫. ৮৩২৫ খানা পুস্তক: সংখ্যার হিসাবটি আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, ড. আহমদ শরীফ ও ড. ওয়াকিল আহমদের গ্রন্থে সংযোজিত তালিকা অনুযায়ী করা হয়। এ সংখ্যাটি কবিগণের একটি তালিকার দিকে ইঙ্গিত করছে। এটি মৌলিক ও গ্রহণযোগ্য। –হবীবুল্লাহ, মুহম্মদ, *আমাদের সাহিত্য*, বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সমিতি রজত-জুবিলি:১৯৪১, মাহবুব শাহ কুরাইশী সম্পাদিত, মীর্জ্জাপুর স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৯৪১, পৃ. ৮।

১৬. *ইউসুফ জোলেখা*: এটি একটি এশক ও প্রেমপূর্ণ কাব্য গ্রন্থের নাম। বাংলা ভাষায় এ নামের গ্রন্থ রচনার জন্য তিন জন কবির নাম প্রসিদ্ধ আছে। শাহ মুহম্মদ সগির, আবদুল হাকিম ও ফকির গরিবুল্লাহ। - শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ, *বাংলা সাহিত্যের কথা ২য় খণ্ড*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ২৪২-৪৩।

১৭. হক, মুহম্মদ এনামুল, *মুসলিম বাংলা-সাহিত্য*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ ২০০১, পৃ. ৪৫।

১৮. হক, মুহম্মদ সম্পাদিত, *শাহ মুহম্মদ সগীর বিরচিত ইউসুফ-জোলেখা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ৪।

১৯. হক, মুহম্মদ এনামুল, *মুসলিম বাংলা-সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪।

২০. *রসুল বিজয়*: একটি বাংলা কাব্যগ্রন্থের নাম। এ নামে কবি জৈনুদ্দিন, সৈয়দ সুলতান, শা'বারিদখান, নসরুল্লাহখান এবং শেখ চান্দ বাংলা কাব্য রচনা করেন। –হক, মুহম্মদ এনামুল, *মুসলিম বাংলা-সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৭-৬৮।

২১. শরীফ, আহমদ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৩।

২২. হক, মুহম্মদ এনামুল, *মুসলিম বাংলা -সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮।

২৩. বন্দোপাধ্যায়, শ্রী অসিতকুমার, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৭৩, পৃ. ৬৯৬।

২৪. শরীফ, আহমদ (সম্পাদক) রসুল বিজয় জয়েন উদ্দীন বিরচিত, *সাহিত্য পত্রিকা*, বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, শীত সংখ্যা ১৩৭০, পৃ. ১৩৮।

২৫. দ্রষ্টব্য– ভূঁইয়া, সুলতান আহমদ, সপ্তদশ শতকের কবি জয়নুদ্দীন ও তাঁহার জঙ্গনামা কাব্য, *বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা*, মাঘ-আষাঢ় ১৩৮৩-৮৪, পৃ. ১-৩২।

২৬. *লাইলী মজনু:* একটি রোমান্টিক বাংলা কাব্যগ্রন্থের নাম। উক্ত নামে ফারসি ভাষায় নেজামি গাঞ্জবি, আমির খসরু ও আবদুর রহমান জামির রচনা রয়েছে। এ নামে মুহম্মদ খাতের কাব্য রচনা করেছেন। গ্রন্থটি অনুবাদ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। –শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ, *বাংলা সাহিত্যের কথা ২য় খণ্ড*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৩।

২৭. হক, মুহম্মদ এনামুল, *মুসলিম বাংলা -সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮।

২৮. শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ, *বাংলা সাহিত্যের কথা ২য় খণ্ড*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৩।

২৯. সেন, সুকুমার, *ইসলামী বাংলা সাহিত্য*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৮০, পৃ. ১০৭।

৩০. শরীফ, আহমদ সম্পাদিত, *দৌলত উজির বাহরাম খাঁ বিরচিত লায়লী মজনু*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৬৬, পৃ. ৮৯।

৩১. হক, মুহম্মদ এনামুল, *মুসলিম বাংলা-সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭।

৩২. করিম, আবদুল, *বাংলা সাহিত্যের কালক্রম*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৪।

৩৩. শরীফ, আহমদ, সম্পাদিত, *দৌলত উজির বাহরাম বিরচিত লায়লী মজনু*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৬, পৃ. ১৫।

৩৪. *সায়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল:* একটি রোমান্টিক কাব্য গ্রন্থের নাম। এ নামে চার জন কবির কাব্যরচনা রয়েছে। দোনাগাজী চৌধুরী, আলাওল, ইব্যাহীম ও মালে মুহম্মদ। – খানম, মাহমুদা, *মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে হিন্দী সুফী কাব্যের প্রভাব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৩৭২।

৩৫. শরীফ, আহমদ সম্পাদিত, *দোনা গাজী বিরচিত সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ. ৬৪।

৩৬. *নবীবংশ :* একটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। এতে দু'টি খণ্ড রয়েছে। প্রথমটির মধ্যে রসুল (সা.) এর পূর্বের আদম (আ.) থেকে ঈসা (আ.) পর্যন্ত নবীদের জীবনী নিয়ে আলোচনা করা হয়। দ্বিতীয় খন্ডে রসুল চরিত, শব ই মিরাজ, ওফাত ই রসুল, জয়কুম রাজার লড়াই, জ্ঞান প্রদীপ এবং পদাবলি কাব্য রয়েছে। এ ধরণের রচনা মুসলিম কাহিণীর অন্তর্ভুক্ত। কাহিণীগুলোর মধ্যে সৈয়দ সুলতানের নবীবংশ শ্রেষ্ঠ ও বৃহৎ। – হক, মুহম্মদ এনামুল, *মুসলিম বাংলা-সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯।

৩৭. শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ, *বাংলা সাহিত্যের কথা ২য় খণ্ড*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৭।

৩৮. শরীফ, আহমদ সম্পাদিত, *সৈয়দ সুলতান বিরচিত নবী বংশ দ্বিতীয় খন্ড*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮, পৃ. ৩।

৩৯. শরীফ, আহমদ, *সৈয়দ সুলতান তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৭৫।

৪০. ইসলাম, আজহার, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৩২।

৪১. শরীফ, আহমদ সম্পাদিত, *শা'বারিদ খান গ্রন্থাবলী*, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৬, রসুল বিজয়, পৃ. ৭৯।

৪২. শরীফ, আহমদ সম্পাদিত, *শা'বারিদ খান গ্রন্থাবলী*, তদেব, পৃ. ৩৮।

৪৩. হক, মুহম্মদ এনামুল, *মুসলিম বাংলা -সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৬।

৪৪. ইকবাল, ভূঁইয়া সম্পাদিত, *নির্বাচিত রচনা আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯।

৪৫. শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ *বাংলা সাহিত্যের কথা ২য় খণ্ড*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৮।

৪৬. সেন, সুকুমার, *ইসলামী বাংলা সাহিত্য*, পৃ. ৩৫।

৪৭. সেন, সুকুমার, তদেব, পৃ. ঐ।

৪৮. শরীফ, আহমদ সম্পাদিত, *আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংকলিত পুথি-পরিচিতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬৫।

Dhaka University Institutional Repository


৪৯. করিম, মুনশী শ্রী আবদুল সংকলিত, *বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ*, ২৪৩/১ নং সার্কুলার রোড, কলিকাতা, ১৩২১, পৃ. ২৮।

৫০. আলম, মাহবুবল, *চট্টগ্রামের ইতিহাস [পুরানা আমল]*, ১ম নয়ালোক প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ৪র্থ মুদ্রণ ১৯৬৫, পৃ. ১৬৩।

৫১. চৌধুরী, মোমেন সম্পাদিত, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী প্রথম খণ্ড*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ১৭৯।

৫২. করিম, মুনশী শ্রী আবদুল সংকলিত, *বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩।

৫৩. শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ, *বাংলা সাহিত্যের কথা ২য় খণ্ড*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৮।

৫৪. মুসা, মনসুর সম্পাদিত, *মুহাম্মদ এনামুল হক-রচনাবলী (২য় খণ্ড)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৯৪।

৫৫. শরীফ, আহমদ সম্পাদিত, *আলাউল বিরচিত সিকান্দরনামা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ৩।

৫৬. *তোহফা ই নাসায়েহ*: এটি একটি উপদেশপূর্ণ নীতিশাস্ত্রমূলক কাব্যগ্রন্থ। লেখক তাঁর ছেলেকে উদ্দেশ্য করে এটি রচনা করেন। তাতে ইসলামের যে নীতি ও কার্যগুলো বর্ণিত হয়েছে পরিবর্তনযোগ্য নয়। এটি আলাওলের একটি অনূদিত গ্রন্থ।- হক, মুহম্মদ এনামুল, *মুসলিম বাংলা -সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৮।

৫৭. কোরায়শী, গোলাম সামদানী সম্পাদিত, *কবি আলাওল বিরচিত তোহফা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ. ৩৪।

৫৮. করিম, আবদুল, *বাংলা সাহিত্যের কালক্রম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯।

৫৯. মুহম্মদ, কাজী দীন, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ৩৩৭।

৬০. শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ, *বাংলা সাহিত্যের কথা ২য় খণ্ড*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৩।

৬১. উদ্ধৃত, শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ, তদেব, পৃ. ২৫।

৬২. *নূরনামা* : মুসলিম সৃষ্টিতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে যেসব কাব্য রচিত হয়েছে তন্মধ্যে এটি অন্যতম।চার জন কবির নামে নূরনামা কাব্যরচনা পাওয়া যায়। ১. শেইখ পরান, ২. কবি রাজ্জাক–নন্দন আবদুল হাকীম ৩. আব্দুল করিম খোন্দকার ও ৪. মীর মুহম্মদ শফি। হক, মুহম্মদ এনামুল, *মুসলিম বাংলা-সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৮।

৬৩. হক, মুহম্মদ এনামুল, *মুসলিম বাংলা-সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯।

৬৪. উদ্ধৃত, হক, মুহম্মদ এনামুল, তদেব, পৃ. ১০৯।

৬৫. *মক্তুল হোসেন*: মর্সিয়া সাহিত্যের অন্যতম বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ। কারবালার কাহিনী নিয়ে রচিত হয় এটি। বাংলা সাহিত্যে এ নামের কাব্যরচনার জন্য মুহম্মদ খান প্রসিদ্ধ। এছাড়া কবি আবদুল হাকিম, গরিবুল্লাহ, ইয়াকুব-প্রমুখ অনুরূপ কাব্য রচনা করেছেন। – হক, মুহম্মদ এনামুল, *মুসলিম বাংলা-সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৯।

৬৬. মুসা, মনসুর সম্পাদিত, *মুহাম্মদ এনামুল হক-রচনাবলী (২য় খণ্ড)*, পৃ. ১০৩।

৬৭. শরীফ, আহমদ সম্পাদিত, *আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংকলিত পুঁথি-পরিচিতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৮।

৬৮. *আমির হামজা*: *আমির হামজা* মধ্যযুগের একটি কাব্যরচনার নাম। রচনাটি মহানবি (সা.) এর চাচা আমির হামজার বিরত্ব কাহিনী নিয়ে রচিত হয়। এ নামে অপর কাব্যরচনা করেন আবদুন নবি ও ফকির গরিবুল্লাহ।–আহসান, সৈয়দ আলী, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস মধ্যযুগ*, পূর্বেক্ত, পৃ. ২২৭।

৬৯. হক, মুহম্মদ এনামুল, *মুসলিম বাংলা -সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪০।

৭০. শরীফ, আহমদ সম্পাদিত, *আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংকলিত পুঁথি-পরিচিতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬।

৭১. মুসা, মনসুর সম্পাদিত, *মুহাম্মদ এনামুল হক-রচনাবলী (২য় খণ্ড)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৬।

৭২. মুসা, মনসুর সম্পাদিত, তদেব, পৃ. ১১৪।

৭৩. শরীফ, আহমদ সম্পাদিত, *আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংকলিত পুথি-পরিচিতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৭।

৭৪. উদ্ধৃত, শরীফ, আহমদ সম্পাদিত, তদেব, পৃ. ৩৫৮।

৭৫. হক, মুহম্মদ এনামুল, *মুসলিম বাংলা -সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৩।

৭৬. সুলতানা, রাজিয়া, *আবদুল হাকিম কবি ও কাব্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৪৮।

৭৭. আহমদ, ওয়াকিল, *বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত*, খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানী, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ২০৪।

৭৮. শরীফ, আহমদ সম্পাদিত, *আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংকলিত পুথি-পরিচিতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯।

৭৯. সুলতানা, রাজিয়া, *আবদুল হাকিম কবি ও কাব্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮।

৮০. শরীফ, আহমদ সম্পাদিত, *আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংকলিত পুথি-পরিচিতি*, (উদ্ধৃত) পূর্বোক্ত, ১৯।

৮১. সুলতানা, রাজিয়া *আবদুল হাকিম কবি ও কাব্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯।

৮২. শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ, *বাংলা সাহিত্যের কথা ২য় খণ্ড*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৯।

৮৩. আহমদ, আলী সম্পাদিত, *আবদুল হাকিম বিরচিত নূরনামা*, কেন্দ্রীয় বাংলা-উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা, ১৯৭০, পৃ. ১০।

৮৪. আহমদ, আলী সম্পাদিত, *আবদুল হাকিম বিরচিত নূরনামা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪।

৮৫. আহমদ, আলী সম্পাদিত, তদেব, পৃ. ১৪।

৮৬. সুলতানা, রাজিয়া, *আবদুল হাকিম কবি ও কাব্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯।

৮৭. হক, মুহম্মদ এনামুল, *মুসলিম বাংলা -সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৬।

৮৮. শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ, *বাংলা সাহিত্যের কথা ২য় খণ্ড*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫০।

৮৯. মুহম্মদ, কাজী দীন, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ৩৪৪।

৯০. সুলতানা, রাজিয়া সম্পাদিত, *নওয়াজীসখান বিরচিত গুলে বকাওলী*, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭০, পৃ. ১।

৯১. খোন্দকার নওয়াজিস খানের *গীতাবলী* নামে তিনটি পাণ্ডুলিপি আবদুল করিম তাঁর পুথি পরিচিতি গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। পুথি নং ৪১৮, ৪১৯ ও ৪২০।

৯২. সুলতানা, রাজিয়া সম্পাদিত, *নওয়াজীসখান গুলে বকাওলী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ভূমিকা- তিন।

৯৩. *গুলে বকাওলী* : এটি একটি প্রেম ভালোবাসামূলক কাব্যগ্রন্থ। এতে মুসলিম প্রেমের কাহিনী রয়েছে। এ নামে দশ জন বাংলা লেখক গদ্য ও পদ্যে রচনা করেছেন। –খানম, মাহমুদা, *মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে হিন্দী সুফী কাব্যের প্রভাব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৭।

৯৪. বাংলা সাহিত্যের আধুনিক গবেষকগণ *গুলে বাকাওলি* রচনাটি নিয়ে অনেক ধরনের মন্তব্য করেছেন। লেখকের রচনাটি মৌলিক হওয়ার বিষয়ে কেউই একমত হতে পারেন নি। যেমন– এটির কাহিনী কী হিন্দি ছিল না ফারসি ভাষায় ছিল। মূল রচয়িতা, মৌলিকত্ব, অনুবাদ ইত্যাদি, ইত্যাদি। ড. আহমদ শরীফ, ড. এনামুল হক ও আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ প্রমুখ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ নামের সাথে সংশ্লিষ্ট ফারসি ভাষায় রচিত পাণ্ডুলিপির একাধিক কপি গবেষকের নজরে পড়েছে। এগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাণ্ডুলিপি শাখায় ও এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে। কোনোটিই কাব্যরচনা নয়– গদ্যের ছাঁচে লেখা। তাজুল মুলক ও বাকাওলির কাহিনীও গদ্য। প্রথম দিকের কয়েকটি পত্রে কবিতা উল্লেখ থাকলেও বাকী পুরো অংশে কোন কবিতা নেই। এ সব পাণ্ডুলিপির উপরে ফারসি ভাষায় নাম রয়েছে নিম্নরূপ। যেমন– قصہ تاج الملوک ( কিসসেয়ে তাজুল মুলুক), گل بکاولی ( গুলে বাকাওলি) এবং نا معلوم (নাম বিহীন)। এসব

কাহিনী ইরানীয় কোন লেখকের রচনা থেকে প্রকাশ ঘটে নি। এটি এ দেশীয় একটি প্রেমমূলক কাহিনী। রচয়িতা শায়খ ইজ্জত উল্লাহ বাঙ্গালি একজন কাহিনীকার ও রচনাকার হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এ ছাড়া দেখুন– পাণ্ডুলিপি কিসসেয়ে তাজুল মুলুক, এ সো ঢা/ ফা. ২৫, পৃ. ৭।

৯৫. সুলতানা, রাজিয়া সম্পাদিত, *নওয়াজিস খান বিরচিত গুলে বকাওলী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮।

৯৬. ইসলাম, আজহার, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ২০২।

৯৭. ইসলাম, মযহারুল, *কবি হেয়াত মামুদ*, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, ১৯৬১, পৃ. ৬।

৯৮. ইসলাম, মযহারুল, *কবি হেয়াত মামুদ*, তদেব, পৃ. ৯।

৯৯. তদেব, পৃ. ২৬।

১০০. তদেব, পৃ. ১৫।

১০১. পঞ্চতন্ত্র :এটি ভারতীয় উপমহাদেশের কাহিনী সমৃদ্ধ সংস্কৃত ভাষার প্রথম রচনা। বাদশাহ নওশিরওয়ানের সময়ে প্রথম পাহলবি ভাষায় অনুবাদ করা হয়। মধ্যযুগে এর কাহিণীর ন্যায় কাব্যরচনা হয়েছে। –ইসলাম, মযহারুল, *কবি হেয়াত মামুদ*, পৃ. ৫১।

১০২. তালিব, মুহম্মদ আবু, হায়াৎ মাহমুদ, *বাঙলা একাডেমী পত্রিকা*, ঢাকা, ৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৮, পৃ. ৫০।

১০৩. হক, মুহম্মদ এনামুল, *মুসলিম বাংলা-সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৪।

১০৪. শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ, *বাংলা সাহিত্যের কথা ২য় খণ্ড*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৬।

১০৫. আহমদ শরীফ সম্পাদিত, *আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংকলিত পুঁথি-পরিচিতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪।

১০৬. আহসান, সৈয়দ আলী, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস মধ্যযুগ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৭।

১০৭. শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ, *বাংলা সাহিত্যের কথা ২য় খণ্ড*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২১।

১০৮. জলিল, মুহম্মদ আবদুল, *শাহ গরীবুল্লাহ্ ও জঙ্গনামা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ১০২।

১০৯. শরীফ, আহমদ সম্পাদিত, *আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংকলিত পুঁথি-পরিচিতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২।

১১০. সেন, সুকুমার, *ইসলামি বাংলা সাহিত্য*, পৃ. ৯৩।

১১১. সেন, সুকুমার, তদেব, পৃ. ১২।

১১২. আহসান, সৈয়দ আলী সম্পাদিত, *আমরি হামযা বিরচিত মধুমালতী*, বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৩৮০, পৃ. ভুমিকা।

১১৩. দ্রস্টব্য– আহসান, সৈয়দ আলী, *সমকাল*, ১২তম বর্ষ দশম-দ্বাদশ সংখ্যা, ১৩৭৬।

১১৪. হক, মুহম্মদ এনামুল, *মুসলিম বাংলা -সাহিত্য*, পৃ. ১০৯।

১১৫. হক, মুহম্মদ এনামুল, তদেব, পৃ. ৫৩।

১১৬. শরীফ, আহমদ সম্পাদিত, *আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংকলিত পুথি-পরিচিতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭০।

১১৭. ভট্টাচার্য, শ্রী পরেশচন্দ্র, *সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পরিচয়*, জয়দুর্গা লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ৪২০।

১১৮. শরীফ, আহমদ, *সাহিত্য তত্ত্ব ও বাঙলা সাহিত্য*, বিদ্যা প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৩৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

## সহায়ক গ্রন্থাবলি


১. মোমেন চৌধুরী সম্পাদিত : মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী প্রথম খণ্ড

২. সুকুমার সেন : ইসলামী বাংলা সাহিত্য

৩. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক : মুসলিম বাংলা -সাহিত্য

৫. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : বাংলা সাহিত্যের কথা ২য় খণ্ড

৬. আবদুল করিম : বাংলা সাহিত্যের কালক্রম

৭. আহমদ শরীফ সম্পাদিত : *আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংকলিত পুথি-পরিচিতি*

৮. মুনশী শ্রী আবদুল করিম সংকলিত : বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ

৯. ভূঁইয়া ইকবাল সম্পাদিত : নির্বাচিত রচনা আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ

১০. মনসুর মুসা সম্পাদিত : মুহাম্মদ এনামুল হক-রচনাবলী (২য় খণ্ড)

১১. আহমদ শরীফ সম্পাদিত : আলাউল বিরচিত সিকান্দরনামা

১২. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত : শাহ মুহম্মদ সগীর বিরচিত ইউসুফ-জোলেখা

১৩. রাজিয়া সুলতানা : আবদুল হাকিম কবি ও কাব্য

১৪. রাজিয়া সুলতানা সম্পাদিত : নওয়াজীসখান গুলে বকাওলী

১৫. আহমদ শরীফ : সৈয়দ সুলতান তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ

১৬. আহমদ শরীফ সম্পাদিত : দৌলত উজির বাহরাম খাঁ বিরচিত লায়লী মজনু

১৭. মহম্মদ আবদুল হাই ডক্টর আহমদ শরীফ সম্পাদিত : মধ্যযুগের বাঙলা গীতি-কবিতা

১৮. আহমদ শরীফ : বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য

১৯. কাজী দীন মুহম্মদ : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

২০. ড. মযহারুল ইসলাম : কবি হেয়াত মামুদ

২১. ড. আহমদ শরীফ : সাহিত্য তত্ত্ব ও বাঙলা সাহিত্য

২২. আলী আহমদ সম্পাদিত : আবদুল হাকিম বিরচিত নূরনামা

২৩. গোলাম সাকলায়েন : বাংলায় মর্সীয়া সাহিত্য

২৪. ওয়াকিল আহমদ : বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত

Dhaka University Institutional Repository

# নবম অধ্যায়: অনূদিত বিশেষ কয়েকটি বাংলা কাব্যগ্রন্থ

মধ্যযুগে অনুবাদের মাধ্যমেও বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে। অনুবাদের দ্বারা এক ভাষার শিল্পসম্পদ অন্য ভাষায় বিকশিত হলেও দোষের কিছু নয়। যে কোনো একটি প্রসিদ্ধ রচনার অনুবাদ অন্য ভাষায় হওয়া যুক্তিযুক্ত। অনুবাদটি সাহিত্যের মানে সমৃদ্ধ হলে উভয় ভাষার রচনা বেশি গ্রহণযোগ্যতা পায়। তবে মধ্যযুগের অনুবাদ আক্ষরিক না ভাবানুবাদ তা বুঝা খুবই কঠিন। তখনকার সময়ে বাংলা বা ফারসি রচনা একাধিক বার হাতে লিখে কপি হত। যে কারণে লেখকের কোন্‌টি মূল রচনা তা বুঝা যেতনা। তদ্রুপ অনুবাদকের অনুবাদের কপিটি নিয়েও সমস্যা থেকে যেত। অনুবাদ নাকি লেখকের রচনা কোথাও লেখা না থাকলে নিররূপন করা একেবারেই দুঃসাধ্য।

## মধ্যযুগের বাংলা অনুবাদ

অনুবাদ সাহিত্য যে কোনো ভাষাকে শ্রীবৃদ্ধি করে থাকে। ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধির জন্য অনুবাদ সাহিত্য একটি বড় মাধ্যম। যদি তা শ্রুতিমধুর এবং সাবলিল হয় তখন সেটি অধিকতর গ্রহণীয় হয়ে ওঠে। সমাজে যে ভাষার সাহিত্য রচনার চাহিদা থাকে সে ভাষার সাহিত্যকর্মের অনুবাদ হয় বেশি। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অনুবাদকর্ম ছিল প্রধান একটি বিষয়। অনুবাদের মাধ্যমে ফারসি ভাষার সাহিত্যকর্ম বাংলায় প্রবেশ ঘটেছে।[১] বাহ্যত বাংলা ভাষায় সমৃদ্ধ সাহিত্যের অনুবাদ হয়েছে প্রচুর। সংস্কৃত ও ফারসি সাহিত্য দু'টোই উন্নত সাহিত্যের অধিকারী। তবে মধ্যযুগে সবচেয়ে ফারসি ভাষার রচনাগুলো বাংলা সাহিত্যকে উন্নত করেছে। বাঙালি মুসলিম কবিরা তাঁদের অনুবাদের মাধ্যমে সে পরিচয় দিয়েছেন। আরবি ভাষা ধর্মীয় ভাষা হিসেবে আর্বিভূত হওয়ায় শুধু উল্লেখযোগ্য প্রাথমিক পর্যায়ের ধর্ম বিষয়ের কয়েকটি রচনা অনুবাদ হয়। এগুলো বাংলা ভাষার অনুবাদকর্মে অনেকাংশেই মার্জিত রূপ পেয়েছে বলা যায়। মধ্যযুগের কোনো কোনো বাংলা অনুবাদমূলক গ্রন্থ মূল গ্রন্থের সমতুল্য হয়েছে বলে বাংলা সাহিত্য সমালোচকগণ মনে করেন।[২] অবশ্য মধ্যযুগের অনুবাদ সম্পর্কেও

Dhaka University Institutional Repository

স্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই বরং ত্রিমুখী মতামত রয়েছে। অনেক অনুবাদ হুবহু বা আক্ষরিক নয়। অনুবাদে নিজস্ব মতামত প্রয়োগ ব্যতীত সাহিত্য সৃষ্টির লক্ষে বহু শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করা হয়। বাংলা সাহিত্য সমালোচকগণ অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের উন্নতির দিকটিও গ্রহণ করে নিয়েছেন। অনুবাদকগণ বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধির জন্য অন্য ভাষার উপর কতটুকু নির্ভরশীল ছিলেন তা দেখার বিষয় নয়। গবেষণা অনুযায়ী দেখা যায় যে, মধ্যযুগের উল্লেখযোগ্য কাব্যসাহিত্য ভাব অবলম্বন ও অনুবাদের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। বলা যায় যে, মুসলমান কবিদের অনেক রচনাই অনুবাদ ও অনুকরণের মাধ্যমেই সমৃদ্ধ হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ড. আহমদ শরীফের একটি উক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেন, 'প্রতিভাধর কেউ সাধারণত বাঙলা রচনায় হাত দেননি, অর্থাৎ সংস্কৃতে কিংবা ফারসীতে লিখবার যোগ্যতা যাঁর ছিল, তিনি বাঙলায় সাধারণত লেখেন নি।'[৩] এটা সত্য যে, মধ্যযুগে যাঁরা ফারসি ভাষা জানতেন এবং বুঝতেন তাঁরা সাধারণত ফারসি ভাষায় গ্রন্থ রচনা করতেন। ফারসি রচনায় দক্ষত অর্জন ব্যতীত অন্য দিকে তাঁদের দৃষ্টি পড়ত কম। উল্লেখ্য যে, মুসলমান পরিবারের মধ্যে ফারসি ভাষার প্রতি পৃথক শ্রদ্ধা ও ভালবাসা বিদ্যমান ছিল। সেসময় মুসলমানদের মাঝে বাংলা ভাষা ততটা ফারসি ভাষার সমকক্ষ হতে পারেনি। যে কারণে বাঙালি মুসলমান কবিদের প্রকৃত ও মৌলিক বাংলা রচনায় হাত দিতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়। আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্য সমালোচকগণ মধ্যযুগের মুসলিম সাহিত্যের মধ্যে অনুবাদ এবং অনুকরণের দিকটি বেশি দেখতে পেয়েছেন। কেননা, বাংলা সাহিত্য সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বহু অনুবাদমূলক গ্রন্থের ভূমিকা ছিল লক্ষ করার মত। যেগুলো মধ্যযুগের মুসলমানদের বড় অবদান হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়। মুসলমান লেখকদের পাশাপাশি হিন্দুরাও কতক গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন। তবে তাঁদের অনুবাদ ততটা বিশাল পরিসরে ছিলনা।[৪] যেমনটি মুসলিম বাঙালি কবিরা অগণিত অনুবাদ সাহিত্য রেখে যেতে সমর্থ হন। ভাষাবিদ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর *বাংলা সাহিত্যের কথা* গ্রন্থে 'ফারসির অনুবাদ' অংশে বাংলা অনুবাদের প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যাক্ত করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে, সাধারণের জন্যে ফারসি থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদের প্রয়োজন ছিল। যারা ফারসি জানত না তাঁদের বাংলা সাহিত্যেও জ্ঞান ছিল অল্প। শুধুমাত্র তাঁদের কথা বিবেচনা করেই প্রসিদ্ধ ফারসি গ্রন্থের অনুবাদ করা হয়।[৫] তবে সে সময় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতি কতটুকু হয়েছিল তা বিবেচ্য বিষয়। এ প্রসঙ্গে আহমদ শরীফ বলেন, 'মূলত ফারসী ও হিন্দী গ্রন্থের অনুবাদের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে আমাদের উপাখ্যান-সাহিত্য এবং আরবী ও ফারসী থেকে অনূদিত হয়েছে আমাদের ধর্ম ও যুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থগুলো।'[৬] এটা স্বীকার করে নিতে হয় যে, তখন অনুবাদের ধরন পদ্ধতি ছিল একেবারে ভিন্ন। আক্ষরিক অনুবাদের চেয়ে ভাব ও বিষয়ের প্রতি নজর দেয়া হত বেশি। বর্তমানের অনুবাদের মত মধ্যযুগের সাহিত্যিকরা শুধু বাক্যের

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ নিয়ে ভাবতেন না। অনুবাদকের নিজের মতামত ও ভাষা প্রয়োগের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুবাদে প্রভাব ফেলত। সে কারণে অনুবাদে গ্রহণ ও বর্জনের দিকটি পরিস্ফুট ছিল। ফলে বহু অনুবাদ হুবহু বা আক্ষরিক হয়নি। কাব্যের অনুবাদে ছন্দের প্রতি দৃষ্টি রাখাও কবিদের একটি দায়িত্ব ছিল।[৭] যে কারণে অনূদিত গ্রন্থও মূল কাব্যের সমতুল্য হয়েছে। কবির কাব্য প্রতিভার বিষয়টিও অনেক গুরুত্ব দেয়া হত। তাই আমরা অনুবাদের মধ্যমে কবিপ্রতিভার বিকাশ ঘটতে দেখতে পাই।

## ইউসুফ জোলেখা: শাহ মুহম্মদ সগির

### গল্পের কাহিনী

বাইবেল ও কুরআনে হযরত ইউসুফের (আ.) ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। কুরআনে ইউসুফ (আ.) ও জুলায়খার যে প্রেমের বর্ণনা পাওয়া যায় তা থেকেই ইউসুফ জোলায়খার কাহিনী প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। ফারসি সাহিত্যে ইউসুফ ও জুলায়খার কাহিনীটি একটি আদর্শিক কাহিনী হিসেবে পরিচিত। এ কাহিনীটি পদ্য ও গদ্য আকারে বিভিন্ন সময় রচিত হয়েছে। রচনাগুলো একই সাথে ধর্মীয় ও তাত্ত্বিক।[৮] বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে দু'জন ফারসি কবির রচনা জনসমাজে অলোড়ন সৃষ্টি করেছে বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি আবুল কাসিম ফেরদৌসির অন্যটি আবদুর রহমান জামির কাব্যরচনা। এ দুই কবির দু'টি রচনায় ইউসুফ ও জোলায়খার প্রেম নিবেদনকে কেন্দ্র করে পবিত্র কুরআনের ঘটনা কাব্যাকারে উল্লেখ হয়েছে। অপরদিকে দু'টি কাব্যের কাহিনী পবিত্র কুরআন থেকে নেয়া হলেও এ দু'টি ফারসি রচনা প্রকৃত ও মৌলিক।

### বাংলা কাব্য

বাংলা সাহিত্যে এরূপ নামের পাঁচ জন কবির কাব্যরচনা রয়েছে। শাহ মুহম্মদ সগির, আবদুর রজ্জাক নন্দন, আবদুল হাকিম, শাহ্ গরীবুল্লাহ ও আবদুন নবি। আমাদের আলোচনার বিষয় হলো শাহ মুহম্মদ সগির রচিত ইউসুফ জেলেখা কাব্যগ্রন্থটি। এটি সম্পাদনা করেন ডক্টর এনামুল হক। নিশ্চয় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শাহ মুহম্মদ সগিরের *ইউসুফ জোলেখা* কাব্যগ্রন্থটির মূল্য রয়েছে অনেক। যদিও এ রচনাটি লেখকের জীবনী জানার একমাত্র অবলম্বন ছিল। বলতে দ্বিধা নেই যে, লেখকের আত্মজীবনীর কোনো অংশ ও রচনার প্রেক্ষাপট গ্রন্থের কোথাও উল্লেখ নেই। শুধু মাত্র গ্রন্থ রচনার কাল নিরূপনে বিভিন্ন মতামত ও যৌক্তিক বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে। এ গ্রন্থটির সাথে বাংলা সাহিত্যের ধরন-পদ্ধতি, সাহিত্যের মান ইত্যাদি বিষয় সম্পৃক্ত। বিশেষত মধ্যযুগের কাব্য রচনার আঙ্গিক ও প্রভাবের বিষয়টি এ রচনার মাধ্যমে প্রতীয়মান করা হয়ে থাকে।

### মুহম্মদ সগিরকৃত ইউসুফ *জোলেখা*

শাহ মুহম্মদ সগির কৃত *ইউসুফ জোলেখা* কাব্যগ্রন্থটি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বড় নিদর্শন হিসেবে দেখা হয়। এ সম্পর্কে আহমদ শরীফ বলেন, 'লিখিত বাঙলা সাহিত্যের নিদর্শন হিসেবে তথা আদি বাঙলা কাব্য হিসেবে শাহ মুহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ জোলেখা' কাহিনী স্বীকৃতি পাচ্ছে সম্প্রতি।'[৯] এ রচনার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে কাহিনী কাব্যের সূচনা ঘটে। তাঁর পূর্বে কোনো মুসলিম কবি প্রেম সম্বলিত কাহিনী দিয়ে বাংলা কবিতা রচনা করেননি। এ রচনাটি সম্পর্কে এমন একাধিক উক্তি রয়েছে যে, তিনি ফারসি কাব্য *ইউসুফ জোলেখা*কে ভিত্তি করে এটি রচনা করেন। এ প্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্য সমালোচক মনসুর উদ্দীন বলেন

> ইউসুফ জলিখার কাহিনী কোরান শরীফে পাওয়া যায়। আবুল কাশেম ফেরদৌসী এবং মোল্লা নূরুদ্দীন জামী ফার্সী ভাষায় ইউসুফ জলিখা গ্রন্থ রচনা করেন। ফার্সী গ্রন্থ অবলম্বনেই সগীরের গ্রন্থ রচিত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হয়।[১০]

তাঁর এই মন্তব্যে শাহ মুহম্মদ সগির কোন্ ফারসি কবির গ্রন্থ অবলম্বনে এটি রচনা করেছেন এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়না। গবেষক ড. আহমদ শরীফ এ রচনার ক্ষেত্রে 'কিতাব চাহিয়া ইউসুফ জোলেখা' মন্তব্য করেছেন। তাতে এ গ্রন্থটি মৌলিক হিসেবে বিবেচনায় আনা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন

> ফারসীতে সর্বপ্রথম বিখ্যাত কবি ফিরদৌসী  য়ূসুফ যুলয়খার প্রেমকাব্য লিখেন। কিন্তু কেহ কেহ তাহা অস্বীকার করেন। যাহা সর্ববাদিসম্মত তাহা এই যে, মুল্লা জামী (১৪১৪ খ্রি.-১৪৬২ খ্রি.) এই বিষয়ে এক কাব্য রচনা করেন।[১১]

এই বক্তব্যের মধ্যেও স্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই যে, কোন্ ফারসি কবির কাব্য অবলম্বলনে শাহ মুহম্মদ সগিরের *ইউসুফ জুলায়খা* রচিত হয়। যদিও তাঁর এই বক্তব্যে মোল্লা জামির প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে তথাপি তিনি তা মনে করেন না। এ কারণে যে, রাজ-প্রশস্তি বর্ণনায় নিম্নোক্ত দ্বিপদী শ্লোক আবিস্কারের পর কবি সগিরকে আব্দুর রহমান জামির পরবর্তী কবি হিসেবে নির্ধারণ করতে জটিলতা সৃষ্টি হয়। দ্বিপদী শ্লোকটি হল এই:

রাজেশ্বর মধ্যে ধার্মিক পণ্ডিত।
দেব অবতার নৃপ জগত বিদিত ॥
মনুষ্যের মধ্যে জেহ্ন ধর্ম অবতার ।
মহা নরপতি গ্যেছ পৃথিবীর সার ॥[১২]

Dhaka University Institutional Repository

শেষের পঙ্ক্তিতে মহা নরপতি গ্যেছ উল্লেখ থাকায় ড. এনামুল হক কবিকে গিয়াস উদ্দিন আযম শাহের সম-সাময়িক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ফলে ফারসি কবি জামি রচিত *ইউসুফ জোলায়খা* কাব্যের অনুকরণে কবির এ রচনাটি রচিত হয়েছে বলা কঠিন হয়ে পড়ে। কেননা, গিয়াস উদ্দিন আযম শাহের শাসন কাল ছিল ১৩৮৯-১৪১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। অপরদিকে মাওলানা জামির জীবনকাল ১৪১৪-১৪৯২ খ্রিস্টাব্দ। কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে গবেষক ড. এনামুল হক বলেন

> এই কাহিনী বাইবেল ও কুরআন শরীফে আছে; ফিরদৌসী ও জামীর য়ূসুফ-জলিখায়ও আছে। বাইবেল ও কুরআন শরীফে শুধু গল্পের কাঠামো এবং অন্য দুই গ্রন্থে পল্লবিত। সগীর জামীর (১৪১৪-১৪৯২) পূর্ববর্তী কবি। এই কাব্য প্রণয়নে তিনি ফিরদৌসীকে কতখানি অবলম্বন করিয়াছেন, সে বিষয় গবেষণা - সাপেক্ষ।[১৩]

ড. এনামুল হক স্পষ্ট করে বলেননি যে, সগিরের রচনাটি ফারসি গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত হয় নি। উপরের উক্তিগুলোতে যদিও সরাসরি অনুবাদের কথা পাওয়া যায় না। তবে ফারসি কাব্যগ্রন্থের সাথে বাঙালি কবির রচনা সম্পৃক্ত থাকার বিষয়টি অমূলক নয়। বাংলা সাহিত্যের অনেক সমালোচক মনে করেন যে, তাঁর *ইউসুফ জোলেখা* রচনাটি ফারসি কাব্যের ভাবানুবাদ। তিনি যদি একান্তই ফারসি কবি জামির কাব্য অনুবাদ বা ভাব গ্রহণ না করে থাকেন সগিরের কাব্যে ফারসি কাব্যের প্রভাবের বিষয়টি বার বার উচ্চারিত হতো না। এ কারণে আমরা আলোচ্য গবেষণায় শাহ মুহম্মদ সগিরের রচনা সম্পর্কে বেশি পর্যালোচনা করার প্রয়োজন বোধ করছি। পঞ্চদশ শতকের পূর্বে কবির জন্মকাল নির্ণয় করা হলে কোনোভাবেই তাঁর রচনা আবদুর রহমান জামির রচনার অনুসরণে নয়, এমনটি মনে করেন ডক্টর এনামুল হক। তিনি বলেন, 'কাব্যটি সুলতান গিয়াসুদ্দীন আযম শাহের রাজত্ব-কালে (১৩৮৯-১৪১০খ্রি.) রচিত হয়।'[১৪] তবে এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক এবং বাংলা সাহিত্যিকদের মাঝে দ্বিমত পরিলক্ষিত হয়েছে। এ সম্পর্কে বাংলা সাহিত্য সমালোচক সুকুমার সেন বলেন

> ডক্টর হক ''গ্যেছ'' ''গিয়াস'' -এর কথ্যরূপ ধরে তাঁর সিদ্ধান্ত করেছেন। কিভাবে ''গিয়াস '' ''গ্যেছ'' হয়েছে তার কোন নির্দেশ তিনি দেন নি। একথা ছেড়ে দিলেও বইটি যে অত পুরানো তার কোন প্রমাণ তিনি উপস্থাপিত করেন নি। সুতরাং শাহ মুহম্মদ সগীরের গ্রন্থ যে চর্তুদশ পঞ্চদশ শতাব্দীর রচনা তা উপস্থাপিত উপাদান থেকে স্বীকার করা যায় না।[১৫]

মাত্র একটি শব্দের মাধ্যমে কবির জীবন কাল নির্বাচন করা অধিকতর ঝুকিপূর্ণ। তাঁর পরিচয় লাভের জন্য যে সব উপাদান থাকা প্রয়োজন তা তিনি উপস্থাপন করেন নি। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ড. আবদুল করিম *বাংলা সাহিত্যের কালক্রম* গ্রন্থে 'শাহ্ মোহাম্মদ সগীরের ইউসুফ জোলায়খা' পৃথক শিরোনামে ইতিহাসের আলোকে তথ্যবহুল আলোচনা করেছেন। ইতিহাসের গবেষক ডক্টর আবদুল করিমের মতামত হল, 'সুলতান গিয়াস-উদ্দীন-মাহমুদ শাহের রাজত্ব কালে (১৫৩২-১৫৩৮খ্রী.) কবি

শাহ মোহাম্মদ সগীর তাঁর ইউসুফ জোলায়খা কাব্য রচনা করেন।'[১৬] বলাবাহুল্য, আব্দুর রহমান জামির *ইফসুফ জোলায়খা* কাব্য রচিত হয় ১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দে। এ রচনাটি চল্লিশ বছর পর বঙ্গের একজন কবির রচনায় আসা অস্বাভাবিক নয়। লক্ষ্যণীয় যে, কবির জীবনকাল ও গ্রন্থ রচনার সময় নিয়ে ঐক্যমতে পৌঁছা সম্ভব হয়নি। ড. এনামুল হক মুহম্মদ সগির রচিত *ইউসুফ জোলেখা* কাব্যটি সম্পাদনা করেন। তাঁর সম্পাদিত কাব্য ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। তিনি এ গ্রন্থে কাব্যের রচনাকাল এবং কবির আর্বিভাবকাল সম্পর্কে দীর্ঘ বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। তাঁর বক্তব্যে বার বার শাহ মুহম্মদ সগিরকে পনের শতকের কবি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি কবি শাহ মোহাম্মদ সগিরের ভাষা, কবি জৈনুদ্দিন বা তৎসমসাময়িক মালাধর বসুর ভাষা হইতে প্রাচীন।'[১৭] তিনি শাহ মুহম্মদ সগিরকে মাওলানা জামির পূর্ববর্তী কবি মনে করেন। তাঁর দৃষ্টি-ভঙ্গিতে ফারসি কাব্যগ্রন্থ অবলম্বনে এটি রচিত হয়েছে, এমনটি দেখা যায় না। অথচ যারা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করেছেন তাঁরাও আবদুর রহমান জামির কাব্যরচনার অনুকরণের কথা বলেছেন। কেননা, উপমহাদেশে তৎকালে আমির খসরু, নিজামি গাঞ্জুবি ও আব্দুর রহমান জামি সকলের নিকট অধিক পরিচিত কবি ছিলেন।'[১৮] তাঁদের কাব্যরচনা বাংলা সাহিত্যে প্রভাব ফেলার বহুবিধ কারণ রয়েছে। সে কারণে সাধারণত সগিরের রচনাটি কবি জামির *ইউসুফ জুলায়খা* কাব্যের অনুসরণে রচনা হওয়ার কথা বলা হয়। কিন্তু এ বিষয়টি স্পষ্ট করে যেমন কবি কোথাও বলে যাননি তেমনি বিষয়টির সমাধানও পরবর্তী কোন সময়ে মেলেনি। সুতরাং এটি একটি অমীমাংসিত বিষয়। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গবেষক রাজিয়া সুলতানা কবিকে ফারসি কবি আবদুর রহমান জামির পরের কবি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি এ বিষয়ে অনেকগুলো যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। তন্মধ্যে তাঁর প্রথম যুক্তি হল আবদুল হাকিমের কাব্যটি:

মোল্লা জামীর বাক্য শিরেতে ধরিয়া
আবদুল হাকিম কহে পাঞ্চালী রচিয়া।

তাঁর দ্বিতীয় যুক্তি হল, শাহ মুহম্মদ সগির যদিও প্রকাশ্যে উৎসের কথা বলেন নি। তিনি যেভাবে বলেছেন এটি তাঁর উৎসের একটি প্রমাণ। কবি বলেন

বচন রতন মণি যতনে পুরিয়া
প্রেমরসে ধর্মবাণী কহিমু ভরিয়া।
ভাবক ভাবিনী হৈল ইসুফ জলিখা
ধর্মভাবে করে প্রেম কেতাবেতে লেখা।

Daka University Institutional Repository

তিনি উক্ত আলোচনার মাধ্যমে তাঁকে কবি আবদুর রহমান জামির পরবর্তী কবি হিসেবে নির্ণয় করেছেন।[১৯] অপরদিকে বাংলা গবেষকগণ স্বীকার করে নিয়েছেন যে, গ্রন্থটি মৌলিক নয়। কোনো না কোনো গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত হয়েছে।

## ফারসি গ্রন্থ ইউসুফ জোলেখা

ফারসি কবি নুরুদ্দিন আবদুর রহমান জামির সাতটি মসনবি কাব্যগ্রন্থকে বলা হয় 'হাফ্‌ত আওরঙ্গ'[২০]। এই 'হাফ্‌ত আওরঙ্গ' এর পঞ্চম কাব্যরচনা হল *ইউসুফ জুলায়খা*। তিনি এই কাব্যটি ১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন। তাঁর এ গ্রন্থটি ভারত উপমহাদেশে অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, শাহ মুহম্মদ সগিরের হাতে রচনাটি তাৎক্ষণিক বা কিছুদিন পরে আসা কোনো অমূলক ঘটনা নয়। আমরা শাহ মুহম্মদ সগির কাব্যরচনার সম্পাদিত পাঠ এবং আবদুর রহমান জামি রচিত *ইউসুফ জুলায়খা* ফারসি কাব্যরচনার মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছি। বলাবাহুল্য যে, সগিরের রচনাটি হুবহু কাব্যের আক্ষরিক বা স্বাধীন অনুবাদ নয়।[২১] কোনো কোনো কাব্যংশ নিজের আবার কতক কাব্যের সাথে ফারসি কাব্যের ধারাবাহিকতা বিদ্যমান রয়েছে। ফারসি কাব্যরচনা থেকে রস, ভাব ও কাহিনী অনুসরণের ক্ষেত্রে তিনি কতটুকু গ্রহণ করেছেন– সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়া কঠিন কিছু নয়। যদিও তাঁর রচনার সম্পাদিত পাঠের সাথে আবদুর রহমান জামি রচিত *ইউসুফ জুলায়খার* বর্ণনা পদ্ধতির হুবহু মিল নেই। তবে সগিরের রচনায় জোলেখার জন্ম বৃত্তান্ত, জোলেখার প্রথম স্বপ্ন, প্রেমানুরাগ, দ্বিতীয় স্বপ্ন এবং তৃতীয় স্বপ্নের বর্ণনা কাহিনী আবদুর রহমান জামির ন্যায় একই বৃত্তে অংকিত। ফারসি কবি আবদুর রহমান জামি রচিত *ইউসুফ জুলায়খা* কাব্যগ্রন্থে মূল কাহিনী আলোচনার পূর্বে আল্লাহ ও রসুল প্রশংসা, রসুল প্রেম, নবির মহিমা প্রকাশ, এশক, পিরের প্রশংসা, বাদশাহর প্রশংসা ও কাব্য রচনার প্রেক্ষাপট প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা রয়েছে।[২২] ফারসি ভাষার কবিদের যে কোনো কাব্যগ্রন্থে মূল কাহিনী উপস্থাপনের পূর্বে এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। শাহ মুহম্মদ সগিরের কাব্যে ফারসি কাব্যের অনুরূপ হুবহু মিল না পেলেও কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে। তিনি কাহিনী আলোচনার পূর্বে 'আল্লাহ ও রসূল বন্দনা', 'মাতাপিতা ও গুরুজন বন্দনা', 'রাজ প্রশস্তি' ও 'পুস্তক রচনার কথা' প্রভৃতি শিরোনামে কবিতা লিখেছেন।[২৩] অপরদিকে ফারসি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে যে ধারা পাওয়া যায় তাঁর এই বাংলা কাব্যে একই ধারা বিদ্যমান। তিনি কাহিনী চিত্রায়নে যে ভাব ও পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন কিছুটা ফারসি কাব্যের সাথে তুলনীয়। সে ক্ষেত্রে তাঁকে ফারসি কবি আবদুর রহমান জামির কাব্যগ্রন্থের অনুকরণ করে কাব্যরচনা করেছেন বলে মত দেয়া যেতে পারে। জামির রচনাটির

ন্যায় তিনিও কাব্যাকারে একইভাবে কাহিনী বর্ণনা করেছেন। যে কারণে তাঁর রচনাটি আবুল কাসেম ফেরদৌসির রচনার সাথে তুলনা করা সঠিক হবে না। 'ইউসুফ ওয়া যোলায়খায়েয়ে ফেরদৌসি'[২৪] ছাড়া সমর্কে ইরানের ঐতিহাসিকগণ এ নামে তাঁর একক মূল রচনা থাকার ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করেছেন। আমাদের মাঝে আবুল কাসেম ফেরদৌসি রচিত এ নামের কোনো ফারসি পাণ্ডুলিপি নেই। *নাওয়ালকিশোর ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত যে কপিটি পাওয়া গিয়েছে এ রচনাটির নাম জোলাইখায়ে ফেরদৌসি*।[২৫] এ কপির পাঠের সাথে কবি সগিরের বাংলা পাঠ মিলাতে চেষ্টা করেছি। তাতেও দেখা যায় যে, শাহ মুহম্মদ সগিরের কাব্যরচনাটি এই ফারসি রচনার অনুকরণকৃত নয়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলা রচনাটি হুবহু অনূদিত গ্রন্থ না বলে ফারসি কাব্যের অনুকরণে রচিত হয়েছে বলা যেতে পারে। সেটি আবদুর রহমান জামির রচনার অনুসরণে রচিত হওয়া সমীচীন হবে।

## তুলনামূলক আলোচনা

অনুবাদের সঠিক বিচার করার জন্য ফারসি কাব্যগ্রন্থটির মূল পাঠ উপস্থিত থাকা প্রয়োজন রয়েছে। দু'টি পাঠের সাথে কবিতা মিলানো ছাড়া কাব্য বিচার অসম্ভব। তাই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কবি আবদুর রহমান জামি ও শাহ মুহাম্মদ সগিরের কাব্যরচনা থেকে কিছু অংশ তুলে ধরছি।

ফারসি পাঠ:

<u>در نیام منام دیدن زلیخا بنوبت اول</u>

شب خوش هم چو صبح زندگانی    نشاط افزا چو ایام جوانی

ز جنبش مرغ و ماهی آرمیده    حوادث پای درد دامن کشیده[26]

যুবা বয়সের দিনগুলোর মত আনন্দ উৎফল্ল। ফুটন্ত গোলাপের মত একটি রাত। মাছ, পাখি সকলেই আরাম করেছে। নতুনত্ব খুশির বার্তা নিয়ে এসেছে।

বাংলা পাঠ:

<u>জোলেখার প্রথম স্বপ্ন</u>

একরাত্রি সঘন আছিল ঘনঘোর    শয্যা সুখে সখী সঙ্গে নিদ্রা যায় ভোর ॥

পক্ষিগণ নীরব বিরল জীব জন্তু    সে সুখে আঁখিত মাত্র সুখে হইল তন্তু ॥

রক্ষিগণ নিদ্রায় আকুল ঘোরমতি    অচেতন সর্বজন জেন মৃত্যু গতি ॥

জলিখা কুমারী বালা জৌবন সম্পদ    চৈতন্য হারাই নিদ্রা যায় নিশবদ ॥[২৭]

Dakha University Institutional Repository

ফারসি পাঠ:

<u>در خواب دیدن زلیخا حضرت یوسف را نوبت دوم</u>

خوش آندل کاندر و منزل کند عشق　　زکار عالمش غافل کند عشق

درورفشنده برقی بر فروزد　　که صبر و هوش را خرمن بسوزد

نماند دروی از اندوه سلامت　　شود کاهی برو کوه ملامت...[28]

হৃদয়টা খুবই ভাল যে, প্রেমের একটি বাসা বানিয়েছে। প্রেম দুনিয়ার সব কাজ থেকে দুরে রেখেছে। হৃদয়ে উজ্জ্বল বিদ্যুত চমকাচ্ছে যেন ধৈর্য ও বুদ্ধিকে শেষ করে দিচ্ছে। শান্তিতে থাকার লেশ মাত্র হৃদয়ে নেই। যেন অশান্তির পাহাড় সেখানে বাসা বাধছে।

বাংলা পাঠ:

<u>জোলেখার দ্বিতীয় স্বপ্ন</u>

রুদিতে রুদিতে এক নিশি গোঞাইলা　　কতণি্ঞত ঘূর্ণিত নয়নে নিদ্রা আইলা ॥

নিশি শেষে উষা কালে দেখিলা প্রতেক　　সেহিসে লাবণ্য অনন্ত রূপ রেখ ॥

দেখিয়া কুমারী তান গেলেন্ত নিকট　　প্রণামিয়া ভজিল পরশি পদ - ঘট ॥

বিশেষ বুলিলা বাণী বিনয় ভকতি　　ন জানিলুঁ কুলশীল হও কোন জাতি ॥[২৯]

উল্লিখিত দু'টি পাঠের মধ্যে ভাবানুবাদের সম্পর্ক রয়েছে। দু'টি কাব্যগ্রন্থের শিরোনাম একই ধরনের। তবে ফারসি কাব্যের প্রতিটি শ্লোকের হুবহু বাংলা অনুবাদ পাওয়া যায়নি। হুবহু অনুবাদ পাওয়া যাবে, এমনটি ভাবা আমাদের ঠিক হবে না। বাংলা কাব্যে অনেক ফারসি শ্লোকের অনুবাদ নেই। কবি তাঁর স্বাধীন অনুবাদের ক্ষেত্রে নিজস্ব কথা তুলে ধরেছেন।

## লায়লা ও মাজনুন: দৌলত উজির বাহরাম খান

### কাহিনীর উৎস

রূপকথার মতো লায়লা ও মজনুন কাহিনীটি আরব দেশের বলা হলেও বস্তুত এর প্রসিদ্ধি ঘটেছে পারস্যে। পারস্যের কবিদের মাধ্যমে 'কায়েস' ও 'লায়লা'র প্রেম একটি বাস্তব কাহিনীতে পরিণত হয়। প্রেম কাহিনীর ক্ষেত্রে যে সব কবির নাম প্রসিদ্ধ তন্মধ্যে কবি নেজামি গাঞ্জুবি, কবি আমির খসরু ও কবি আবদুর রহমান জামি অন্যতম। এ সব কবির রচনা মধ্যযুগে বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলে প্রসিদ্ধ ছিল। বাঙালি জনসাধারণ তাঁদের রচনা পাঠ করে উজ্জীবিত হতেন।[৩০] তাঁদের মাধ্যমে এ কাহিনী

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষার উপর প্রভাব রেখেছে। তবে বাংলা সাহিত্যে কাহিনীটি প্রভাব রাখার জন্য কোন্ ফারসি কবির রচনাটি ভূমিকা রেখেছিল তা পরিস্কার নয়। কেননা, কবি দৌলত উজির বাহরাম খান কাহিনী রচনার সময় প্রভাবের কথা লিখে যান নি। যে কারণে এ কাব্যরচনা সম্পর্কে একটি অস্পষ্টতা থেকে যায়।

## বাংলা কাব্য গ্রন্থ

মধ্যযুগে দৌলত উজির বাহরাম খান রচিত *লায়লা ও মজনুন* কাব্যগ্রন্থটির কদর ছিল অনেক। এ কাব্যগ্রন্থটির ন্যায় কোনো কবি কাব্যরচনা করতে সক্ষম হন নি। রচনাটির মৌলিকত্ব নিয়ে বাংলা গবেষকগণ প্রশ্ন উত্তাপন করেছেন। যদিও কবি কোথাও কোন প্রকার প্রভাব বা সম্বন্ধ উল্লেখ করেন নি। কিন্তু ফারসি কাব্যের সাথে এ কাব্যের সম্পর্ক রয়েছে প্রচুর। অপরদিকে ফারসি কাব্যের প্রভাব থেকে কবি মুক্ত নন –এটিও দৃড়তার সাথে বলা যাচ্ছে না। গবেষক ডক্টর আহমদ শরীফ দৌলত উজির রচিত *লায়লী মজনু* কাব্য রচনাটি সম্পাদনা করেছেন। তিনিও অনুবাদের বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন। এতে রয়েছে হামদ, না'ত, আসহাব প্রশস্তি, রাজ-প্রশস্তি, পীর-স্তুতি, মজনুর জন্ম ও শৈশব, লায়লীর পরিচয় ও রূপ বর্ণনা, লায়লী ও মজনুর প্রেম নিবেদন, মাতা কর্তৃক লায়লীকে ভর্ৎসনা ইত্যাদি শিরোনাম। মূলত তাঁর এ কাব্যগ্রন্থটি অনেক দীর্ঘ। মধ্যযুগে লায়লি ও মজনুর প্রেমকাহিনী বাঙালিদের কাছে প্রিয় ছিল। সাধারণ মানুষ কাহিনী শুনে আপ্লুত হতেন। কেননা, মধ্যযুগের সাহিত্য ক্ষেত্রে লায়ল মজনু কাব্য নানা গুণে অনন্য। এ কাহিনীর আবেদন ও মানবিক দিকগুলো পাঠকের হৃদয়কে স্পর্ষ করেছিল। পাঠক তা পাঠ করে নিজের ভিতর মহৎ হওয়ার অনুপ্রেরণা পেতেন।[৩১]

## ফারসি কাব্য গ্রন্থ

ফারসি ভাষা ও সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য কাহিনীর মধ্যে লাইলি ও মজনুর প্রেম কাহিনী একটি। এটি এতটাই জনপ্রিয় যে অনেক কবি তাঁদের রচনায় উপমা বা শিক্ষা গ্রহণের জন্য 'লাইলি মজনুর প্রেম' কথা উল্লেখ করেছেন। কেউবা এ নামে কাহিনী লিখে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন– কবি নেজামি (১১৪৯ খ্রি.-১২০৩ খ্রি.), আমির খসরু(১২৩৫ খ্রি.-১৩২৫ খ্রি.), আবদুর রহমান জামি (১৪১৪ খ্রি.-১৪৯২ খ্রি.) ও কবি আবদুল্লাহ হাতিফি (মৃ.১৫২১খ্রি.) প্রমুখ। যে সব কবি শুধু কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁদের সংখ্যাই দশের অধিক রয়েছে। এ ছাড়া অনেকে 'লাইলি ও মজনু'র প্রেম কাহিনীকে নিজেদের রচনার সাথে সংযুক্ত করে প্রেমকাব্য তৈরি করেছেন। ফারসি কবির কাব্য রচনা

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে সমধিক পরিচিত। এ কাহিনীটি বহুরূপে বিস্তার লাভ করেছে।[৩২] তবে সবচেয়ে কবি নিজামি ও আবদুর রহমান জামির রচনা বাংলা সাহিত্যে প্রভাব রাখে।

কবি নেজামি গাঞ্জুবির (১১৪৯ খ্রি.-১২০৩ খ্রি.) তৃতীয় মসনবি কাব্য গ্রন্থের নাম *লাইলি ও মাজনুন*। এটির রচনাকাল ৫৮৪ হিজরি মোতাবেক ১১৮৮ খ্রিস্টাব্দ। এ কাব্য রচনায় চার শত দ্বিপদী শ্লোক রয়েছে।[৩৩] অপর রচয়িতার নাম ভারত উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ ফারসি কবি আমির খসরু (৬৫১/৬৫৫-৭০৫/৭২৫হি.)। তিনি রচনা করেন *মজনুন ও লায়লা* নামে একটি কাব্যগ্রন্থ। এটি রচিত হয় ৬৯৮ হিজরি মোতাবেক ১২৯৮ খ্রিস্টাব্দে। এটির দ্বিপদী শ্লোক সংখ্যা-২৬৬০টি।[৩৪] ফারসি ভাষার অন্যতম ক্ল্যাসিক ধারার শেষ খ্যাতিমান কবি আবদুর রহমান জামি (১৪১৪খ্রি.-১৪৯২খ্রি.) অনুরূপ নামের একটি কাব্যরচনা করেন। এটি ৮৮৯ হিজরি মোতাবেক ১৪৮৪ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়। তাতে ৩৭৬০ টি দ্বিপদী শ্লোক পাওয়া যায়।[৩৫] এ নামে ভারতের করি আবদুল্লাহ হাতেফি (মৃ. ১৫২১ খ্রি.) একটি কাব্য রচনা করেন। তাঁর রচনার তারিখ ৯৩৯ হিজরি মোতাবেক ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দ। আমরা ফারসি ভাষার মূল পাঠ মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করেছি।[৩৬] কোন ফারসি কবির রচনার সাথে বাংলা রচনাটি তুলনীয় করা যায়।

## নেজামির ফারসির পাঠ

কবি নিযামির গ্রন্থটিতে মূল পাঠের পূর্বে অনেকগুলো কবিতার শিরোনাম রয়েছে। সাধারণত ফারসি কবিরা গ্রন্থের কাহিনী শুরুর পূর্বে যেমনটি বিভিন্ন শিরোনামে কবিতা উল্লেখ করেন। তাঁর কাহিনীটি শুরু হয়েছে নিম্নরূপ:

<u>آغاز داستان عشق لیلی و مجنون</u>

گوینده داستان چنین گفت      آن لحظه که در این سخن س

کز ملک عرب بزرگواری      بوداست بخوبتر دیاری[37]

এমন করে একটি গল্প বলা হয়ে থাকে। ঐ সময়ে এ কাহিনী বিষয়ে কথার ঝড় বয়ে যেত। কোন এক বড় আরব দেশ। যে, দেশটি খুবই সুন্দর ছিল।

উল্লেখ্য এ অংশটি বাংলা কবিতায় নেই। কবি নেজামির রচনার সাথে এ কাব্যগ্রন্থের সাদৃশ্য রয়েছে এমন একটি অংশ নিম্নে দেয়া হল।

<u>عاشق شدن لیلی و مجنون بر یکدگر</u>

هر کودکی از امید و از بیم      مشغول شده بدرس تعلیم

| | |
|---|---|
| با آن پسران خرد پیوند | هم لوح نشسته دختری چند |
| هر کس ز قبیله وزجای | جمع آمده در ادب سرای |
| قیس هنری بعلم خواندن | یاقوت لبش بدرفشاندن[38] |

<u>একে অপরের প্রতি ভালবাসা।</u>

শৈশবকাল আশা নিরাশার মধ্যে পাঠশালায় লেখা পড়ায় ব্যস্ত থাকে। পরস্পর জুটি বেঁধে একই বেঞ্চে ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া করতে বসে। যে কোনো গোত্র ও স্থানের যে কেউ একত্রিত হয় পাঠশালায়। কায়েস জ্ঞানী এসেছে বিদ্যা অর্জনে। তার পদ্মরাগ মণি রঙের ওষ্ঠ চমকাচ্ছে।

### বাংলা পাঠ

কাহিনী শুরুর পূর্বে আল্লাহ ও রাসুল প্রশংসা ও কবির পরিচয় রয়েছে। শুরুতে যেসব শিরোনাম রয়েছে তন্মধ্যে মজনুর বিরহ-বিলাপ, লায়লীর সঙ্গে মজনুর সাক্ষাৎ, মজনুর জন্য পিতা মাতার বিলাপ, লায়লীর বিরহ বিলাপ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। একটি শিরোনামে কবিতা নিম্নরূপ:

<u>লায়লী ও মজনুর প্রেম বিনিময়</u>

লায়লী কমলমুখী সখীগণ সঙ্গে।
শিবিরেত গমন করিলা মনোরঙ্গে ॥
বিচ্ছেদ হইল  যদি প্রাণনাথ সনে।
দরশন উপায় চিন্তএ মনে মনে ॥[৩৯]

### মন্তব্য ও সমালোচনা

কবি দৌলত উজির বাহরাম খানের কাব্যগ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তাতে কাহিনীর চিত্র ঠিক যেভাবে রয়েছে এটি কি নিজের তৈরি নাকি সংগৃহীত– সে ব্যাপারে আধুনিক বাংলা গবেষকদের মাঝে প্রচুর সন্দেহ রয়েছে। গবেষক ডক্টর এনামুল হক বলেন, 'মজনুর চিত্রখানি খানিকটা জামীর ও খানিকটা ভোজ প্রবন্ধের অনুপ্রেরণায় চিত্রিত হওয়ায়, ইহার সহিত উক্ত দুই চিত্রের মধ্যে কোন চিত্রের মিল নাই বলিয়া আপাত দৃষ্টিতে ভ্রম জন্মে।'[৪০] তিনি বাংলা কাব্যের এই প্রেমধর্মী রচনাটি শুধু কবির নিজস্ব বলতে আপত্তি করেছেন। এ কাব্যরচনার কাহিনিটি কবি নিজামি বা জামির কাব্যগ্রন্থ থেকে গ্রহণ করলেও অনেক নাম ও ঘটনার স্থান নিজস্ব পদ্ধতিতে করা হয়েছে। তাতে লেখকের স্বাধীন চেতনার প্রকাশ ঘটেছে বলা যায়।[৪১] কাব্যের মধ্য দিয়ে তিনি নৈতিক শিক্ষা দিতে

Dhaka University Institutional Repository


চেয়েছেন। এটিও একটি ফারসি কাব্য প্রভাবের ফল। বোধ করি অনুবাদ যেভাবে হওয়া প্রয়োজন ছিল ঠিক সেভাবে হয় নি সত্য। সে যুগের অনুবাদের ন্যায় তাঁর অনুবাদটিও যে যথার্থ হয়েছে সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই।

## সিকান্দরনামা: আলাওল

কবি আলাওলের একটি কাব্য রচনার নাম *সিকান্দরনামা*। পূর্বে এ নামে বাংলা ভাষায় কাব্য রচিত হয় নি। বলা যায় যে, কবি এ রচনার মাধ্যমে বাংলা কাব্য সাহিত্যকে পূর্ণতা এনে দিয়েছেন। এ রচনাটি সম্পাদনা করেন ড. আহমদ শরীফ। তিনি ভূমিকায় কবি আলাওলের পাণ্ডিত্য ও তাঁর পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে সারগর্ভ বক্তব্য তুলে ধরেছেন। আলাওল একজন ভাল অনুবাদক ছিলেন। অনুবাদের ভূমিকায় তিনি একজন শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক। অনুবাদ করেও তিনি বাংলা কাব্য সাহিত্যে গতানুগতিক অবদান রেখে গিয়েছেন। যে অনুবাদ সাহিত্যে রূপ ও রস পাওয়া যায় তাও একটি মধ্যযুগের এক অনবদ্য সৃষ্টি।[৪২] আলাওল যে কাহিনী নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন তা নেজামি গাঞ্জুবির একটি উল্লেখযোগ্য কাব্য রচনার নাম। নেজামি গাঞ্জুবি এটি ৫৯৯ হিজরি মোতাবেক ১২০২ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন। কাহিনীটি পারস্যের রাজরাজড়া কেন্দ্রিক; আরব্য বা ভারতীয় কাহিনী নয়। নেজামির রচনাটি মৌলিক এবং শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের অধিকারী।

প্রাপ্ত তথ্য মতে কবি আলাওল ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে হপ্ত *পায়কার*, ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে *তোহফা*, ১৬৫৯ ও ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে *সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জমাল* এবং ১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দে *সিকান্দরনামা* রচনা করেন। তাঁর উল্লিখিত রচনাগুলোর মধ্যে সময়ের পার্থক্য রয়েছে। কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, কবি আলাওলের জীবনে রাজনৈতিক অস্থিরতা বিদ্যমান ছিল। আমরা তাঁর সম্পর্কে র্নিবিঘ্নে বলতে পারি যে, তাঁর হৃদয়ে মূলত ফারসিকাব্য সাহিত্য বিশালভাবে স্থান করে নিয়েছিল। অন্য যে কোনো বাঙালি কবির চেয়ে তাঁর রচনা একটু ব্যতিক্রমধর্মী। তাঁর *পদ্মাবতী* রচনাটি মালিক মোহম্মদ জায়সির রচিত হিন্দি *পদুমাবত* এর অনুবাদ। যদিও আলাওল সম্পর্কে গভীরভাবে গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে সত্য, তবে তিনি ফারসি কাব্যের অনুবাদ করে বিখ্যাত হয়েছেন এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কেউ কেউ তাঁকে ফারসি কবি হিসেবে অভিহিত করেছেন। *আহাদীস-উল-খওয়ানীন* রচয়িতা হামিদুল্লাহ খান বাহাদুর এরূপ মন্তব্য করেন।[৪৩] অবশ্য এ কথা সত্য যে, তিনি ভালো ফারসি জানতেন। ফারসি কাব্যগ্রন্থের সাথে তাঁর রচিত বাংলা কাব্যগুলো মিলানো হয়েছে, তাতেও এটিই প্রকাশিত হয়েছে।

ফারসি ভাষার *সিকান্দরনামে* রচনাটি বাঙালি কবি আলাওলের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। তিনি রচনাটির কাহিনী বাংলা ভাষায় পূর্ণমাত্রায় উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। এ রচনাটি তাঁর বৃদ্ধ বয়সে সম্পন্ন হয়েছে। রচনার নাম রাখা হয় *সিকান্দরনামা*। পূর্বে বা পরে বাংলা সাহিত্যে এরূপ রচনার আত্মপ্রকাশ ঘটেনি। একমাত্র আলাওল *সিকান্দরনামা* রচনা করে সাহসী ভূমিকা পালন করেন। এটি তাঁর খ্যাতিতে যথেষ্ট অবদান রেখেছে। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এ কথা স্বীকৃত যে মধ্যযুগের সাহিত্যে আলাওলের *সিকান্দরনামা* হল অন্যতম সংযোজন।

## বাংলা কাব্যের পাঠ আলোচনা

*সেকান্দরনামে* ফারসি ভাষার রচনাটি নিয়ে কোন মন্তব্য নেই। এখনো এর পাণ্ডুলিপি এবং ছাপা গ্রন্থ একই ধরণের রয়েছে। তবে ফারসি কবি নেজামির স্বহস্তে লিখিত পাণ্ডুলিপি কোথায় ও কার হাতে পড়েছে সে বিষয়টি ভিন্ন। কোন কবিতা বা কবিতার ছত্র অলিখিত রয়েছে বলে প্রশ্ন উত্তাপিত হয়নি। ফলে সহজেই ধরে নেয়া যায় যে, ফারসি ভাষার *সেকান্দরনামে* রচনা শুদ্ধ ও সঠিক। কবি আলাওলের এ নামের বাংলা রচনাটি নিয়ে সংকট কাটেনি। তাঁর হাতে লেখা রচনাটি বা শুদ্ধ রচনাটি কোথাও আবিস্কার করা সম্ভব হয়নি। এ নামে দু ধরণের রচনা প্রকাশিত হয়েছে। একটি বটতলার পুথি হিসেবে পরিচিত *দারা সেকান্দরনামা*। অপরটি সম্পাদিত আকারে *সিকান্দরনামা*। এটি ডক্টর আহমদ শরীফ তেরোটি পুথির পাঠের মাধ্যম সম্পাদনা করেন। সম্পাদিত রচনাটির সাথে ঐ নামীয় ফারসি পাঠের মধ্যে তুলনা করা হয়েছে। তাতে ব্যবধান ও পার্থক্য অনেক প্রতীয়মান হয়। অপরদিকে ফারসি পাঠের সাথে বাংলা পাঠের মিল বা সামঞ্জস্য সম্পর্কেও ফয়েজ আহমদ চৌধুরীর একটি প্রকাশিত প্রবন্ধ দেখা যায়। যা কবি নেজামির *সেকান্দরনামে* কাব্যের অনুবাদ হিসেবে প্রকাশিত হয়।[৪৪] কবি আলাওল বিরচিত *সিকান্দরনামা* কাব্যরচনাটি দীর্ঘ। তাতে ছিয়াত্তরটি শিরোনামে কাব্যটি সমাপ্ত করা হয়। শেষ শিরোনাম হল, সিকান্দরের স্বদেশ যাত্রা ও প্রথমে রয়েছে হাম্‌দ। আলাওলের *সিকান্দরনামা* থেকে নিম্নে কবিতা দেয়া হল:

হাম্‌দ

আদ্যেত নৈরূপ ছিল প্রভু নৈরাকার
চেতন-স্বরূপ যদি ইচ্ছিল প্রচার।
অতি ঘোর তমময় আকার বর্জিত
মহা জ্যোর্তিময় হৈল ঈশ্বর ইঙ্গিত।
জুতি সমুদ্রের আদি বীর্য মোহাম্মদ

ত্রিজগ বীর্য হোন্তে পাইল মুক্তিপদ।
মুঞি ক্ষুদ্রে তোমার মহিমা কি কহিব
পুরান মহিমা জানজগতে গাহিব।[৪৫]

কবি আলাওল শুরুতেই প্রশংসা ও মোনাজাত করেন। মূল কাহিনী শুরু হয় অন্যান্য বিষয় উল্লেখের পর। তিনি নিজের মত করে রচনার জন্য পারিপার্শ্বিক বিষয় কবিতায় উপস্থাপন করেছেন। এসবও ছিল ফারসি কাব্যধারার অনুরূপ। তাঁর কাব্য কাহিনীর শুরু ছিল নিম্নরূপ:

<u>কিতাবের আগায [ উপক্রম]</u>

জমকছন্দ

একদিন নিশি ছিল প্রত্যুষের প্রাএ
জাগি চাহে লোকে প্রভাত না পাএ ।
চন্দ্র জোতে কর্পুর সমান সব ক্ষিতি
অন্ধকার ভাগ ছিল কস্তুরীর রীতি ।[৪৬]

এরূপ প্রতিটি শিরোনামের উপর দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে। কাব্যের ভাষাও খাঁটি বাংলা। তিনি কোনো রূপ ভাষার মিশ্রণ ব্যতীত এটি রচনা করেন। এটি যে কোনো একটি কাব্যের অনুবাদ তা বুঝাতে দেয়া হয়নি। তাঁর ভাষায় বাংলা শব্দের যে গাঁথুনি রয়েছে খুবই শক্ত।

## নেজামি গাঞ্জুবির রচনা

নেজামি গাঞ্জুবির রচনার নাম ইস্কান্দারনামে (اسكندرنامه)। এটি দুটি খণ্ডে বিভক্ত। একটি শারফনামে (شرف نامه) অপরটি ইকবালনামে (اقبالنامه)। তাঁর রচনাটি সেকান্দরনামে বা এসকান্দরনামে উভয়রূপে পরিচিত।[৪৭] তাতে গ্রন্থটির শিরোনাম নিম্নরূপ: শুরুতে بسم الله الرحمن الرحيم শিরোনাম। তারপর تضرع نمودن بدرگاه بارى تعالى ، در نعت حضرت سيد المرسلين و خاتم النبين، در معراج حضرت سيد عالم و سرور نبى آدم، سبب نظم كتاب اسكندرنامه، حكايت بر سبيل تمثيل اندرين، در حسب حال خود و سور انجام روزگار، در رغبت نمودن نظامى بگفتن سكندرنامه ، ইত্যাদি।[৪৮] প্রতিটি শিরোনামের মধ্যে অনেকগুলো শ্লোক দিয়ে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়। গ্রন্থের শুরু নিম্নরূপ:

خدايا جهان بادشاهى تر است    زما خدمت آيد خداى تر است
پناه بلندى و پستى توى    همه نيستند و آنچه هستى توى
همه افريدى ز بالا و پست    توى افرينده هر چه هست[49]

Dhaka University Institutional Repository


হে খোদা ! জগতের বাদশাহি তোমার হাতেই। প্রভুত্ব তোমারই, আমরা তোমার খেদমত করতে পারি। তোমিই পালনকর্তা ও আশ্রয়দাতা। তোমি ছাড়া এ জগতে কিছুই নেই। সকল কিছুর সৃষ্টি কর্তা তোমি। তোমিই সৃষ্টিকর্তা পৃথিবীতে যা কিছু আছে।

## তুলনামূলক আলোচনা

দুটি কাব্যগ্রন্থের আলোচনায় দেখা যায় যে, ফারসি কাব্যের অনেক শ্লোক কবি আলাওল অনুবাদ করেননি। তিনি অনেক কথা নিজে সৃষ্টি করে কাব্যরচনা করেছেন। তাঁর রচনার 'হামদ' অংশে ষোলটি শ্লোক আছে। শ্লোকগুলো কবি নেজামির কবিতার অনুবাদ নয়। নেজামির হামদ অংশের কোনোটির অনুবাদ আছে আবার কোনোটির নেই। বাংলা কাব্যের শিরোনামগুলোর মধ্যে শ্লোকের সংখ্যা দেখেও তা বুঝা সম্ভব যে, আলাওল নিজে অনেক শ্লোক সংযোজন করেছেন। প্রথমদিকের শিরোনামগুলো হল: হাম্দ, আল্লাহর সৃষ্টি-বৈচিত্র, মুনাযাত, পয়গাম্বরের সিফৎ, চারি আসহাব প্রশস্তি, কিতাবের আগায, নিজামির স্বপ্ন, তত্ত্বকথা, খোয়াজ খিজির কর্তৃক নেজামিকে উপদেশ দান ইত্যাদি। শিরোনামগুলোর মধ্যে অনেক শ্লোক কবির নিজের।

ফারসি কবি নেজামির রচনার সাথে কবি আলাওলের রচনা সাযুজ্য থাকা স্বভাবিক। কেননা তিনি কবি নেজামির অনেক পরে জন্মলাভ করেছেন। বাংলা সাহিত্য সমালোচকদের মধ্যে এ বিষয়টি পরিষ্কার যে, বাংলা *সিকান্দরনামা* কবি নেজামির কাব্য গ্রন্থের অনুবাদ। তাঁর *সেকান্দরনামে* রচনাটি অন্য কোনো ফারসি কবির কাব্যগ্রন্থের অনুসরণে রচিত হয়নি। আলাওলের কাব্যে পরিস্কারভাবে উল্লেখ আছে যে, ফারসি কবি নেজামির কাব্যকে অনুসরণ করেই এ রচনা সৃষ্টি হয়েছে।[৫০] ফারসি কবি নেজামি গাঞ্জুবি যে পাঁচটি মসনবি কাব্য রচনা করেন তন্মধ্যে *হাপ্ত পেইকার* ও *সেকান্দরনামে* অন্যতম। এ দু'টি কাব্যগ্রন্থের রচনাকাল যথাক্রমে ৫৯৩হি./১১৯৮খ্রি. এবং ৫৯৯হি./১২০০ খ্রিস্টাব্দ। প্রথমটির মধ্যে পাঁচ হাজার এবং দ্বিতীয়টির মধ্যে দশ হাজার দ্বিপদী শ্লোক রয়েছে।[৫১] তাঁর দু'টি কাব্যই প্রসিদ্ধ ও সমৃদ্ধ।

# সয়ফুল মুলুক-বদিউজ্জামাল: দোনাগাজী

## দোনাগাজীর বাংলাকাব্য

দোনাগাজী রচিত একটি কাব্য গ্রন্থের নাম *সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল*। এটি আহমদ শরীফ সম্পাদনা করেছেন। এ গ্রন্থটি বাংলা কাব্যসাহিত্যের অন্যতম সংযোজন। কাব্যে রচয়িতার নাম ও রচনার

Dakha University Institutional Repository

তারিখ কোথাও উল্লেখ নেই। যে কারণে সম্পাদনাকালে ড. আহমদ শরীফ সংশয় প্রকাশ করেছেন। তবে তিনি বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির সাহায্যে এ কাব্যের রচয়িতা দোনা গাজীকে নির্ণয় করতে সক্ষম হন।[৫২] এ কাব্যের রচয়িতা হিসেবেও দোনা গাজীর জীবন কাল অজ্ঞাত রয়েছে। তাঁর জন্ম বা মৃত্যুকাল স্পষ্ট করে গ্রন্থের কোথাও উল্লেখ নেই। সম্পদনাকালে আহমদ শরীফ কোথাও নির্দিষ্ট করে জন্মতারিখ উল্লেখ করেননি। তাঁর আলোচনায় কবিকে আঠার শতকের পূর্বের কবি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।[৫৩] কাব্যগ্রন্থটি অনুবাদ না ভাবানুবাদ সে বিষয়টি কোথাও উল্লেখ নেই। সম্পাদনাকালে ভূমিকায় কবি দোনাগাজীর কবিত্ব, পাণ্ডিত্য এবং তাঁর কাব্যের ভাষা ও বাক্য সম্পর্কে সাহিত্যিক বিচার বিশ্লেষণ করা হয়। ফারসি বা অন্য কোনো ভাষার প্রভাব সম্পর্কে কোনো বক্তব্য নেই। তবে এরূপ কাহিনী যে, ফারসি ও তুর্কি গ্রন্থে রয়েছে তা তিনি উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত সম্পাদানেকালে ফারসি ভাষার কোনো পাণ্ডুলিপি আহমদ শরীফের সম্মুখে ছিলনা। ফলে ফারসি সাহিত্যের প্রভাবের বিষয়টি যথাভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়। বলা বাহুল্য যে, বাংলা সাহিত্যে ড. আহমদ শরীফ মধ্যযুগের বাংলা পাণ্ডুলিপি ও পুথি সম্পাদনা করে খ্যাতি পেয়েছেন। তিনিই একমাত্র গবেষক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের জটিল বিষয়গুলো উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হন। বিশেষ করে বাংলা পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করে এক অনবদ্য খ্যাতির স্বাক্ষর রেখে যান তিনি। কবি আলাওল এরূপ একটি কাব্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচনার নাম *সয়ফুল মুলুক-বদিউজ্জামাল*। রচনায় তিনি ফারসির প্রভাবের বিষয়টি উল্লেখ করে বলেছেন:

ফারসীর ভাষা এই প্রসঙ্গ পুরান।
সকলে না বুঝে এহি ফারসীর ভাব
পয়ার প্রবন্ধে রচ এই পরস্তাব।[৫৪]

তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে যে, তিনি ফারসি কাব্য অবলম্বন করে *সয়ফুল মুলুক-বদিউজ্জামাল* কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু দোনাগাজীর এ কাব্যরচনায় তেমনটি নেই। যে কারণে রচনাটি মৌলিক, ভাবানুবাদ বা অন্য কোন কবির রচনার প্রভাব সম্পর্কে জঠিলতা সৃষ্টি হয়েছে। কাব্যরচনার শুরুতেই স্তুতি, প্রেমতত্ত্ব, মিশর, রাজার পুত্র কামনা, প্রার্থনা, মিশরাজের বিবাহের উদ্যোগে– এ শিরোনামে কবিতা বিদ্যমান। শেষে সকলের মিশর যাত্রা, মিশরে পুনর্মিলন– শিরোনাম দিয়ে কাব্যরচনাটি সমাপ্ত করা হয়। রচনার ভিতরে সয়ফুল মুলুক নাম ব্যবহার করে একাধিক শিরোনাম রয়েছে। তাতে স্পষ্টত রচনাটির নাম সয়ফুল মুলুক-বদিউজ্জামাল সঠিক হওয়ার নির্দেশ করে। বাহ্যত কাহিনীর সাথে কবির নিজস্ব বক্তব্য সংযোজিত হয়েছে। যে কারণে রচনাটি অনেক দীর্ঘ হয়। শুধু মূল কাহিনীটি কাব্যাকারে বর্ণিত হলে এতটা দীর্ঘ হতনা বলেই আমাদের বিশ্বাস।

Dhaka University Institutional Repository


## আরব্য কাহিনী

*আলেফ লায়লা ওয়া লায়লা* বা *হেজার এক শাব* গ্রন্থে অনেকগুলো মজাদার গল্প ও চটকদার কাহিনী রয়েছে। বাস্তবের সাথে মিল বা অতিরঞ্জিতমূলক কাহিনী দু'টোই এ গ্রন্থে উপস্থিত। এটি রচনার উদ্দেশ্য হল, পাঠকের চরিত্র সংশোধন বা উপদেশ লাভ গ্রহণ। সে কাহিনীগুলোর ভাষা আরবি বা ফারসি হওয়া প্রধান বিষয় নয়। অনুরূপ *শুক সপ্ততি* ও *বত্রিশ সিংহাসন* নামে ভারতীয় গল্প সংস্কৃত ভাষায় বিদ্যমান রয়েছে। মুসলমান বাঙালি কবিগণ কোন্ ধারা অবলম্বন করে কাব্যরচনা করেছেন– সেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাধারণত মধ্যযুগে মুসলমান কবিগণ ফারসি ভাষার পণ্ডিত ছিলেন। তাঁরা এ ভাষা সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখতেন। এছাড়া তাঁদের অনুবাদ বা ভাবানুবাদ বুঝাটাও অনেক কঠিন। বাংলা সাহিত্যিকগণ অনেক কাহিনী অবলম্বন করে পদ্য রচনা করেছেন। দোনা গাজী চৌধুরীর একটি প্রসিদ্ধ রচনার নাম হলো সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল । তিনি কোন ধারা অবলম্বন করে বিশাল একটি কাব্য রচনা বাংলা সাহিত্যে উপহার দিয়েছেন সেটিই আমাদের নির্ণয় করা প্রয়োজন।

## ফারসি রচনা

বাংলা গ্রন্থটি সম্পাদানেকালে ড. আহমদ শরীফ এ নামের ফারসি গ্রন্থ সম্পর্কে তথ্য দিয়েছেন। ফারসি রচনার অস্তিত্ব থাকাটাই প্রমাণ রাখে যে, তখন বাঙালির নিকট কাহিনীটি অপরিচিত ছিলনা। বর্তমানে এ অঞ্চলে এ নামের তিনটি ফারসি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়েছে। দ'ুটি পাণ্ডুলিপি গদ্য ও একটি পাণ্ডুলিপি পদ্য। পদ্য পাণ্ডুলিপি দিয়েই এই বাংলা কাব্য রচনার পাঠ বিচার করা যথার্থ হবে। পদ্য পাণ্ডুলিপিতে লেখকের নাম বা রচনার তারিখ নেই। শুরুতে শুধু পাণ্ডুলিপির নাম লেখা আছে; রচয়িতার নাম নেই। প্রথম দিকের পত্রগুলোতে পর পর চারটি শিরোনাম দেয়া আছে। এই শিরোনামগুলো ঠিক এই বাংলা কাব্য রচনার প্রথম দিকের শিরোনামের ন্যায়। নিম্নে পাণ্ডুলিপি থেকে হুবহু উদ্ধৃতি হিসেবে দেয়া হল:

<u>سیف الملوک بدیع الجمال</u>

بنام خدای که بخشید کام- زبان هست از یاد او شاد کام

تن و نوش جان افرید روان- دل اوردۀ خاطر خورد دان .. [55]

সয়ফুল মুলুক বদিউল জামাল। প্রভুর অনুগ্রহে আমি কাজ শুরু করছি। তাঁর স্মরণে সবসময় আমার জিহ্বা নিয়োজিত রয়েছে।

আল্লাহর প্রশংসার শেষে নবি করীম (সা.) প্রশংসা করা হয়। সে প্রশংসার পর মূল কাহিনী শুরু হয়েছে। কাহিনীটির বর্ণনা পদ্ধতি নিম্নরূপ:

<u>نعت حضرت محمد</u>

محمد سبب ان امام رسل- شفیع امم پیشوای Í

<u>ابتداء قصهٔ سیف الملک و بدیع الجمال</u>

چنین خواندم از قول صاحب منهر- حدیثی که شیرین تر لزت شکر [56]

রসুল বর্ণনা। রসুলের ইমাম মুহম্মদ (সা.) -- তিনি উম্মতের সুফারিশদাতা --।

সায়ফুল মুলুক বদিউল জামালের কাহিনী শুরু। মনহরের কথা সেভাবেই পড়ছি।

কথামালায় রয়েছে মিষ্ট ও স্বাদ।

এভাবে রচয়িতা কাহিনীর বিষয় বর্ণনা দিয়েছেন। এর পর অপর শিরোনামটি পাণ্ডুলিপিতে অস্পষ্ট রয়েছে। তাতে শুধু - مصر শব্দটি বুঝা যায়।[৫৭] রচনার অন্যান্য পাঠগুলো খুবই অস্পষ্ট।

## বাংলা কাব্যপাঠ

দোনাগাজী চৌধুরী পাঠের ভিতর প্রভাবের বিষয়ে কোনরূপ আলোচনা করেননি। কাব্যরচনাটি ঠিক যেভাবে শুরু হয়েছে তা হল নিম্নরূপ:

**। স্তুতি।**

গুণিগন কহি শুন প্রেমের কথন     আদ্য প্রভু সৃজিয়াছে প্রেমে ত্রিভুবন
প্রথমে প্রভুর নাম করিএ বন্দন     আকাশ পাতাল ক্ষিতি যাহার সৃজন।
সৃষ্টি সৃজিয়াছে প্রভু প্রেম অনুভবি     প্রেমভাবে সৃজিয়াছে মোহাম্মদ নবী।
ততক্ষণে মনে যদি উপজিল জ্ঞান     প্রেমর ভাবিনী হৈয়া কৈলা প্রেমদান।
সেবক রসুল প্রভু ভাবকের বশ     তান প্রেমে সৃজিল ভুবন চতুর্দশ।[৫৮]

**। মিশর।**

ভুবন-দুর্লভ এক মিশর শহর     তিনলোকে নাই রাজ্য তার সমসর।
অতি রম্যস্থান সেই অতি শোভান্বিত     নিন্দিয়া অমরাপুরী তাহার বিদিত।
নানাফল জন্মে তাতে শস্য অতিশএ     যার শস্যে জগতের দুর্ভিক্ষ ছাড়এ।
তাহাত আছএ রাজা ধর্ম অবতার     গুণমন্ত জ্ঞানমন্ত বলবীর্য ধর।[৫৯]

Dakha University Institutional Repository

### রাজার পুত্র কামনা

ভাবিল মোহর জন্ম গেল অকারণ   পুত্রহীন বৃথা মোর কি ছার জীবন।
পুত্র বিনে কি লাগিয়া জিএ নরজাতি   পুত্র বিনে সংসারেতে কি সুখে বসতি।
পুত্র বিনে মিত্র নাহি পাত্র বিনে রাজা   সত্য বিনে ধর্ম নাই আস্থা বিনে প্রজা।[৬০]

## তুলনামূলক পাঠ আলোচনা

ফারসি ও বাংলা কবিতার মধ্যে স্বাভাবিক মিল রয়েছে। পাঠের শিরোনামও একই ধরনের। ফারসি কাব্যের যে আলোচনা বাংলা কাব্যের আলোচনাও তদ্রুপ। বাংলা কাব্যটি ভাবানুবাদ হিসেবে গ্রহণ করলে দোষের হবেনা। কেননা, মধ্যযুগের বাঙালি কবিগণ আক্ষরিক অর্থে সরাসরি অনুবাদ করেননি।[৬১] ফারসি *সেইফুল মুলুক ওয়া বদিউজ্জমাল* কাব্যরচনাটির সাথে সম্পর্ক, ভাব ও রসের মিল থেকে তা অনুমান করা যেতে পারে। জঙ্গনামা বা আমির হামজার ন্যায় কতক অনুবাদ বা ভাব অবলম্বনের মাধ্যমে কবি দোগাজীর রচনা সৃষ্টি হয়।

মধ্যযুগের অনুবাদে কবিদের একটি আলাদা বৈশিষ্ট্য ছিল। কোনো অনুবাদই আক্ষরিক বা সরারসরি নয়। অনুবাদে নিজস্ব স্টাইল ও ভাষার প্রয়োগ রয়েছে। তাঁরা বাংলা কাব্যে যে ভাষা বা ভাষারীতি ব্যবহার করেছেন তা বর্তমান যুগের চেয়ে ভিন্ন। এটি কেবল গুণগত মানের ভাষাশিল্পের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে। বলা যেতে পারে যে, অনুবাদকগণ প্রত্যেকেই ছিলেন সাধনাবলে পরিপূর্ণ একজন মানুষ। অনুবাদে কবির নিজস্ব বক্তব্যসহ সুন্দর ভাষা ও সাবলীলময় সাহিত্য প্রকাশ পেয়েছে।

## টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. আহমদ, ওয়াকিল, আঠারো যতকে বাংলা সাহিত্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১ (৩য় খন্ড)*, সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদক), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৩১৩।

২. আহমদ, ওয়াকিল, *বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত*, খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানী, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১৯২।

৩. শরীফ, আহমদ, বাঙলা ভাষার প্রতি সেকালের লোকের মনোভাব ॥ 'ভাষা' বিদ্বেষ ॥, *ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা*, ঢাকা, ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা, ১৩৭৫, পৃ. ৩২০।

৪. আহমদ, ওয়াকিল, *বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২২; শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ, *বাংলা সাহিত্যের কথা ২য় খণ্ড*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২য় মুদ্রণ ২০০২, পৃ. ২৩৬।

৫. শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ, *বাংলা সাহিত্যের কথা ২য় খণ্ড*, তদেব, পৃ. ২৪০।

৬. শরীফ, আহমদ, *মধ্যযুগে বাঙলা সাহিত্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৭৯।

Dhaka University Institutional Repository


৭. শরীফ, আহমদ সম্পাদিত, রোসাঙ্গ-কবি আবদুল করিম খোন্দকার বিরচিত হাজার মসায়েল ও নুরনামা, *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, বৈশাখ-আষাঢ় ১৪০৪, পৃ. ৭।

৮. সামিসা, সিরুস, *আনওয়ায়ে আদাবি*, নাসরে মিতরা, তেহরান, ১৩৮৭ হি.শা., পৃ. ১৯৯।

৯. শরীফ, আহমদ, *সাহিত্য তত্ত্ব ও বাঙলা সাহিত্য*, বিদ্যা প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ২৭।

১০. চৌধুরী, মোমেন সম্পাদিত, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী প্রথম খণ্ড*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৯৫।

১১. শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ, *বাংলা সাহিত্যের কথা ২য় খণ্ড*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২য় মুদ্রণ ২০০২, পৃ. ২৪১।

১২. হক, মুহম্মদ এনামুল সম্পাদিত, *শাহ মহম্মদ সগীর বিরচিত ইউসুফ-জোলায়খা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ২।

১৩. হক, মুহম্মদ এনামুল, *মুসলিম বাংলা-সাহিত্য*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ ২০০১, পৃ. ৪৭।

১৪. হক, মুহম্মদ এনামুল, *মুসলিম বাংলা-সাহিত্য*, তদেব, পৃ. ৪৪।

১৫. সেন, সুকুমার, *ইসলামী বাংলা সাহিত্য*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২য় সংস্করণ ১৩৮০, পৃ. ১০৮।

১৬. করিম, আবদুল, *বাংলা সাহিত্যের কালক্রম*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ২৬।

১৭. হক, মুহম্মদ এনামুল সম্পাদিত, *শাহ মুহম্মদ সগীর বিরচিত ইউসুফ-জোলেখা*, পূর্বোক্ত, পৃ. তের।

১৮. ভারতের তোতা পাখি হিসেবে খ্যাত ছিলেন আমির খসরু। তিনি একমাত্র কবি যিনি বহু শাসকের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। তিনি শাসকদের নিকট থেকে কবিতা রচনার জন্য পুরস্কার লাভ করেন। ইরানের নেজামি গাঞ্জবি এবং আবদুর রহমান জামি প্রেমমূলক কাব্যরচনা করেছেন। তাঁদের কাব্যের ভাষা ছিল সাবলীল, মধুময় ও আকর্ষণমূলক। ফলে তাঁদের ফারসি রচনা ভারতীয় উপমহাদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাঁদেরই কবিতা অনুবাদ বা ভাব অবলম্বনের মাধ্রমে বাঙালিদের মাঝে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিস্তারিত দেখুন, শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ, *বাংলা সাহিত্যের কথা ২য় খণ্ড*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৯-২৫৩।

১৯. সুলতানা, রাজিয়া, শাহ্ মুহম্মদ সগীরের কাল নির্ণয় সমস্যা, *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, ঢাকা, বৈশাখ- আষাঢ় ১৩৯৩, পৃ. ৭৫।

২০. হাপ্ত আওরাঙ্গঃ এটির অর্থ হল, সপ্ত সিংহাসন। এ শব্দের দ্বারায় আবদুর রহমান জামির সাতটি মসনবি রীতির কাব্যগ্রন্থকে বুঝানো হয়েছে। মসনবি গ্রন্থগুলো হল: *সেলসেলাতুয যাহাব*, *সালামান ওয়া আবসাল*, *তোহফাতুল আহরার*, *সাবহাতুল আবরার*, *ইউসুফ ওয়া জোলায়খা*, *লায়লা ওয়া মাজনুন* এবং *খেরাদনামে এসকান্দারি*। সাতটি মসনবি কাব্যের মধ্যে অনতম ও শ্রেষ্ঠ কাব্যের নাম হলো *ইউসুফ ওয়া জোলায়খা*। এটি তিনি পবিত্র কুরআন থেকে কাহিনী অবলম্বন করে সুফিধারার আলোকে রচনা করেছেন। –সোবহানী, তওফিক, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, এন্তেশারাতে জাওয়ার, তেহরান, ১৩৮৮ হি.শা., পৃ. ৩২৯-৩০।

২১. খানম, মাহমুদা, *মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে হিন্দী সুফী কাব্যের প্রভাব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৩৪৯।

২২. আবদুর রহমান জামির কাব্যগ্রন্থের শুরতে বার পৃষ্ঠাব্যাপী ভিন্ন আলোচনা রয়েছে। তাঁর ইউসুফ জোলেখার কাহিনী 'সাবাবে এখতিয়ার ই কিস্সায়ে ইউসুফ' শিরোনাম থেকে শুরু হয়। দ্রস্টব্য- জামি, আবদুর রহমান, *ইউসুফ ওয়া জোলায়খা* এবং *মাহাব্বাতনামে*, চ.বি/পা. নং- ২৭৬।

২৩. শাহ মুহম্মদ সগির চার পৃষ্ঠার পর কাহিনী শুরু করেছেন। কাহিনীর প্রথম শিরোনাম হল 'জোলেখার জন্ম-বৃত্তান্ত'। দ্রস্টব্য- *শাহ মুহম্মদ সগীর বিরচিত ইউসুফ-জোলেখা*।

২৪. ইউসুফ ওয়া যোলায়খায়ে ফেরদৌসি: ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসে ইরানীয় নতুন ধারার লেখকগণ ফেরদৌসির সাহিত্যকর্ম *শাহনামে* কাব্যগ্রন্থের আলোচনার পর *ইউসুফ ওয়া জোলায়খা* নিয়ে আলোচনা করতে দেখা যায়না। যদিও ইরানের পুরনো লেখক ও ইউরোপের গবেষকগণ *ইউসুফ জোলায়খা* কে তাঁর রচনা হিসেবে অর্ন্তভুক্ত করে থাকেন। –সোবহানী, তওফিক, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, এন্তেশারাতে জাওয়ার, তেহরান, ১৩৮৮ হি.শা., পৃ. ১৩৩।

২৫. যোলায়খায়েয়ে ফেরদৌসি: আবুল কাসেম ফেরদৌসিকৃত একটি ছাপানো গ্রন্থের নাম। এ নামের একটি পুরনো কপি এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগারে আছে। ডাকা সংখ্যা-৩৬।

২৬. জামি, আবদুর রহমান, *মাহাব্বাতনামে*, চ.বি/পা. নং- ২৭৬, পূর্বোক্ত, পৃ.৪৩।

২৭. হক, মুহম্মদ এনামুল সম্পাদিত, *শাহ মুহম্মদ সগীর বিরচিত ইউসুফ-জোলেখা*, পৃ. ইউসুফ জোলেখা -১০।

২৮. জামি, আবদুর রহমান, *মাহাবব্বাত নামে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫।

২৯. হক, মুহম্মদ এনামুল সম্পাদিত, *শাহ মুহম্মদ সগীর বিরচিত ইউসুফ-জোলেখা*, পৃ. ইউসুফ জোলেখা -১৪।

৩০. আহমদ, শরীফ সম্পাদিত, *দৌলত উজির বাহরাম খাঁ বিরচিত লায়লী মজনু*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ভূমিকা-৩০।

৩১. আহমদ, শরীফ সম্পাদিত, তদেব, পৃ. ভূমিকা ৪৬।

৩২. খানম, মাহমুদা, *মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে হিন্দী সুফী কাব্যের প্রভাব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৬।

৩৩. সোবহানি, তওফিক, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২০।

৩৪. সোবহানি, তওফিক, *তদেব*, পৃ. ২৮৫।

৩৫. তদেব, পৃ. ৩৩১।

৩৬. কাহিনী সৃষ্টিতে নিজ নিজ রচনার জন্য তাঁরা প্রসিদ্ধ ছিলেন। এ কথা সত্য যে, নেজামি গাঞ্জুবির প্রভাব অপর কবিদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তবে ফারসি সাহিত্যে আবদুল্লাহ হাতেফির রচনার প্রভাব সম্পর্কে কোন মন্তব্য নেই।

৩৭. গাঞ্জুবি, নেজামি, *লায়লা ওয়া মজনু*, মাতবোয়ায়ে আহমদি, বোম্বে, ১৯৬৩, বোম্বে, পৃ. ১৭।

৩৮. গাঞ্জুবি, নেজামি, *লায়লা ওয়া মজনু*, তদেব, পৃ. ১৮।

৩৯. খান, দৌলত উজির বাহরাম, *লায়লী-মজনু*, (সম্পাদক আহমদ শরীফ) বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৫৮, পৃ. ১১৮।

৪০. হক, মুহম্মদ এনামুল, কবি দৌলত উজির বাহরাম খান, *মাসিক মোহাম্মদী*, ১৩ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩৪৬, পৃ. ৩৭৬।

৪১. হক, মুহম্মদ এনামুল, কবি দৌলত উজির বাহরাম খান, পৃ. ৩৭৬।

৪২. শরীফ, আহমদ সম্পাদিত, *আলাউল বিরচিত সিকান্দরনামা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ৪।

৪৩. বাহাদুর, হামিদুল্লাহ খান, *আহাদীসুল খওয়ানীন*, মাজহারুল আজায়েব, কলিকাতা, ১৮৭১, পৃ. ৫৪।

৪৪. ফয়েজ আমদ চৌধুরী ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু ও ফারসি বিভাগের শিক্ষক। তিনি কবি আলাউলের অনুবাদ ও সিকান্দরনামার একটি তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। এটি প্রথমে বাংলা একডেমী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে আহমদ শরীফ সম্পাদিত সিকান্দরনামা আলাউল বিরচিত গ্রন্থে পরিশিষ্ট গ অংশে ছাপা হয়েছে।

৪৫. শরীফ, আহমদ সম্পাদিত, *আলাউল বিরচিত সিকান্দরনামা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. সিকান্দরনামা কাব্যপাঠ- ১।

৪৬. শরীফ, আহমদ সম্পাদিত, *আলাউল বিরচিত সিকান্দরনামা*, পৃ. সিকান্দরনামা কাব্যপাঠ- ১০।

৪৭. যারুতিয়ান, বেহরোয, *আন্দেশেহায়ে নেজামি গাঞ্জেয়ে,* তাবরিয: এন্তেশারাতে আয়েদিন, ১৩৭৬, পৃ. ২৫৬।

৪৮. নিজামি রচিত সিকান্দরনামার কয়েকটি পাণ্ডুলিপি দেখা হয়েছে। কতক পাণ্ডুলিপিতে পৃতক কবিতা বুঝানোর জন্য কবিতার শিরোনাম দেয়া হয় আবার কোনটির মধ্যে নেই। তবে পাঠে বর্ণনার ধারাবাহিকতা বিদ্যমান রয়েছে। শুধু প্রকাশিত গ্রন্থে কবিতায় শিরোনাম ভালভাবে দেয়া হয়।

৪৯. গাঞ্জুবি, নিজামি, *সেকান্দরনামে*, পাণ্ডুলিপি নং - চবি/ ৪০১১, পৃ. ১।

৫০. হক, মুহম্মদ এনামুল, *মুসলিম বাংলা-সাহিত্য*, তদেব, পৃ. ১৫৮।

৫১. নেজামির পুরো নাম হল, আবু মুহম্মদ ইলিয়াস ইউসুফ নেজাম উদ্দিন গান্‌জুবি। তিনি *সেকান্দরনামে* কাব্যটি নিজ ইচ্ছায় রচনা করে আবু বকর নসরুদ্দিনের নামে উৎসর্গ করেন। এটি তাঁর শেষ বয়সের রচনা। তাঁর *হাপ্ত পেইকার* আরসলান আলাউদ্দিন- এর আদেশে রচিত হয়। ইয়াহাকি, মুহম্মদ জাফর *তারিখ-ই-আদাবিয়াত-ই-ইরান*, তেহরান, ১৩৭৭ ইরান সাল, পৃ. ১৪৮; দ্রস্টব্য- নো'মানি, মাওলানা শিবলি, *শে'রুল আ'যম ১ম খন্ড*, 'নেজামি গাঞ্জুবি' অংশ।

৫২. শরীফ, আহমদ সম্পাদিত, *দোনাগাজী বিরচিত সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ভূমিকা-৪০।

৫৩. শরীফ, আহমদ সম্পাদিত, *দোনাগাজী বিরচিত সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ভূমিকা-৪১।

৫৪. শরীফ, আহমদ সম্পাদিত,(উদ্ধৃতি) *দোনাগাজী বিরচিত সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল*, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ঢাকা, এপ্রিল-জুন ১৯৭০, পৃ. ২৭।

৫৫. *সেইফুল মুলক বদিউল জামাল*, পাণ্ডুলিপি নং- চবি./১০৩, পৃ. ১; এর পাঠ দুঃসাধ্য। কবিতার ছত্রে পোকাক্রান্ত হওয়ায় যথাভাবে শব্দের অর্থ করা যাচ্ছে না।

৫৬. *সেইফুল মুলক বদিউল জামাল*, পাণ্ডুলিপি নং- চবি./১০৩, পৃ. ২ ও ৪।

৫৭. পাণ্ডুলিপির পাঠ অস্পষ্ট থাকায় পাঠ উদ্ধার সম্ভব হয় নি। আলোচনার জন্য অত্র পাণ্ডুলিপি থেকে শুধু কিছু নমুনা উপস্থাপন করা হয়েছে মাত্র। দেখুন–, *সেইফুল মুলক বদিউল জামাল*, চ.বি পাণ্ডুলিপি নং ১০৩, পৃ. -৫।

৫৮. শরীফ, আহমদ (সম্পাদক ও ভূমিকা ), *দোনাগাজী বিরচিত সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ. কাব্যপাঠ-১।

৫৯. শরীফ, আহমদ (সম্পাদক ও ভূমিকা), *দোনাগাজী বিরচিত সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. কাব্যপাঠ-৩।

৬০. শরীফ, আহমদ (সম্পাদক ও ভূমিকা), *দোনাগাজী বিরচিত সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল*, তদেব, পৃ. কাব্যপাঠ-৭।

৬১. খানম, মাহমুদা, *মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে হিন্দী সুফী কাব্যের প্রভাব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৩।

Dhaka University Institutional Repository


## সহায়ক গ্রন্থাবলি


১. আহমদ শরীফ সম্পাদিত : আলাউল বিরচিত সিকান্দরনামা

২. আহমদ শরীফ সম্পাদিত : দোনাগাজী বিরচিত সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল

৩. আহমদ শরীফ সম্পাদিত : দৌলত উজির বাহরাম খাঁ বিরচিত লায়লী মজনু

৪. ড. মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত : শাহ মুহম্মদ সগীর বিরচিত ইউসুফ জোলেখা

৫. নিজামি গাঞ্জুবি : লায়লা মাজনুন

৬. নিজামি গাঞ্জুবি : সেকান্দর নামা

৭. লেখকের নামহীন : সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল

৮. আবদুর রহমান জামি : মাহাব্বাত নামা

৯. মুহম্মদ এনামুল হক : মুসলিম বাংলা সাহিত্য

১০. সুকুমার সেন : ইসলামী বাংলা সাহিত্য

১১ . আবদুল করিম : বাংলা সাহিত্যের কালক্রম

Dhaka University Institutional Repository

# দশম অধ্যায়: ফারসি কাহিনীকাব্য অবলম্বনে বাংলা পদ্যরচনা

কাহিনী বর্ণনায় কবিতা আকারে প্রকাশ একটি সহজতর পদ্ধতি। গদ্য আকারেও কাহিনী প্রকাশ করা যায়। এটি ততটা সহজ ও মধুর হয়ে ওঠেনা। ফারসি সাহিত্যের কাহিনীকাব্যগুলোর মধ্যে *শাহনামায়ে ফেরদৌসি, মসনবিয়ে মা'নুভি* ও *মানতিকুত তায়ের* প্রসিদ্ধ। তদ্রুপ বহু কাহিনীমূলক কাব্যরচনা রয়েছে যা আমাদের অজানা। এরূপ কাহিনীগুলোর উপর ভিত্তি করে বাংলা ভাষায় অসংখ্য কাব্য সৃষ্টি হয়েছে।

## কাহিনীমূলক কাব্য

ফারসি সাহিত্যে প্রেমমূলক ঘটনাকে দাস্তানে আশেকানে (داستان عاشقانه) বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এরূপ প্রেমের ঘটনা প্রাচীন ফারসি সাহিত্যে উপস্থিত রয়েছে। সে সাহিত্যের বিষয়গুলো চিত্তাকর্ষক ও মধুময়। তখন প্রেমের ঘটনা মুখে মুখে উচ্চারিত হত। লিখিত আকারে চিত্র বা নক্শার ব্যবহার ছিল। সে ব্যবহার একেবারে কম হলেও স্মরণযোগ্য।[১] তবে সে সময় কাহিনী বলার প্রচলন কবিতা আবৃত্তির ন্যায় চালু ছিল কী না তা স্পষ্ট নয়। ইসলাম পূর্ব যুগের ফারসি সাহিত্য সম্পর্কে আহমদ তাফাজ্জলি *তারীখে আদাবিয়াতে ইরান পিশ আয ইসলাম* গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাতে আবেস্তা গ্রন্থের 'গাথা' অংশ ব্যতীত অন্য কোথাও কবিতা বিদ্যমান থাকার কথা পাওয়া যায়না। পাহলবি সাহিত্যেও গল্প-কাহিনী রয়েছে। কাহিনীগুলোর নমুনা বিভিন্ন প্রস্তর ফলকে ও পাহাড়-পর্বতে খোদিত আকারে থাকার প্রমাণ মিলে। বস্তুত ইসলাম পূর্ব যুগের ফারসি সাহিত্য বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল। এসব সাহিত্যের অন্যতম নমুনা হলো ইসলাম যুগের *শাহনামায়ে ফেরদৌসি* কাব্যগ্রন্থ। এ গ্রন্থের রচয়িতা আবুল কাসেম ফেরদৌসি তুসি একজন কাহিনীকার ও কাব্যকার হিসেবে অনেক পরিচিত। তাঁর *শাহনামে* (شاهنامه) রচনায় প্রাচীন ইরানের বীরত্ব ইতিহাস ব্যক্ত হয়েছে। এটি এতটাই প্রসিদ্ধ যে, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কাব্য গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম।[২] এ কাব্যগ্রন্থে প্রাচীন ইরানের কাহিনী খণ্ড খণ্ড শিরোনামের মাধ্যমে উপস্থিত রয়েছে। যেমন– সোহরাব ও রোস্তমের বীরত্ব, জেহাক

Dhaka University Institutional Repository


ও ফরিদুনের ঘটনা, এসফান্দইয়ার ও রোস্তমের যুদ্ধের কাহিনী প্রভৃতি। নিম্নে কবি ফেরদৌসির *শাহনামে* কাব্যগ্রন্থ থেকে একটি ঘটনার উদ্ধৃতি দেয়া হল:

<u>داستن ضحاک</u>

یکی مرد بود اندرآن روزگار- ز دشت سواران نیزه گذار

گرانمایه هم شاه و هم نیکمرد- ز ترس جهاندار با باد سرد...[3]

অশ্বারোহী ও বর্শাধারী মরুচারীদের মাঝে বসবাসকারী এক সময়ের প্রসিদ্ধ এক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর ছিল প্রভুর ভয়, তিনি ছিলেন নম্র বিনয়ী একজন শাসক এবং একজন ভাল মানুষ।

আবু শাকুর বালখি ছিলেন রুদাকির সমসাময়িক অন্যতম প্রসিদ্ধ কবি। এ কবির কাহিনীমূলক কাব্য রচনার নাম হলো *অ'ফরীন নামে* (آفرین نامه)। তিনি এটি ৩৩৩ হিজরি থেকে ৩৩৬ হিজরি সনের মধ্যে রচনা করেন।[৪] ফখরুদ্দিন গুরগানি ফারসি কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে ততটা পরিচিত না হলেও তার নামের সাথে *ভিস ওয়া রামিন* (وایس و رامین) কাব্য রচনাটি সম্পৃক্ত হয়ে আছে। এ রচনায় দশ হাজার শ্লোক বিদ্যমান। এটি একটি ঐতিহাসিক ও পুরনো কাহিনীমূলক রচনা। বাদশাহ শাপুরের সময়কালে ছেলে আরদেশির পাপেকানকে কেন্দ্র করে কাহিনীটি সৃষ্টি হয়। এটি ফখরুদ্দিন আসাদ গুরগানি কাব্যকারে রচনা করে ইরানিদের দৃষ্টি কাড়েন।[৫] নাসির খসরু কুবাদিয়ানি কবি হিসেবে ফারসি জগতে ততটা প্রসিদ্ধ নন। তিনি যে ধর্ম, আকায়েদ, তফসির, হাদিস, বিষয়ে একজন যুগশ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন তাঁর রচনায় সে প্রমাণ মিলে। ধর্মীয় কাহিনী ও ধর্মদর্শন তাঁর কাব্যে বিদ্যমান রয়েছে। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য মসনবি রীতির কাব্যের নাম *সাদাত নামে* (سعادتنامه) ও *রোশনায়ি নামে* (روشنای نامه)।[৬] আবু মুহাম্মদ ইলিয়াস ইবনে ইউসুফ নেজামি গাঞ্জুবি (৫৩৫হি.-৬০৮হি.) একজন কাহিনীকার কবি হিসেবে খ্যাত। তাঁর নামের সাথে যেসব কাহিনীমূলক কাব্য রচনা প্রসিদ্ধ রয়েছে-এর তুলনা হয়না। যেমন- *মাখ্যানুল আসরার* (مخزن الاسرار), *খাসরু ওয়া শিরীন* (خسرو و شیرین), *লায়লা ওয়া মাজনুন* (لیلی و مجنون), *হাপ্ত পেয়কার* (هفت پیکر), *এসকান্দার নামে* (اسکندرنامه) প্রভৃতি।[৭] ফরিদ উদ্দিন আত্তার নিশাপুরি ছিলেন এরফানি ধারায় কাব্য রচনায় একজন অদ্বিতীয় কবি। তাঁর মসনবি রীতির কবিতাগুলো সুফিধারার কাহিনীতে পরিপূর্ণ রয়েছে। যেমন- *মানতিকুত তায়ের* (منطق الطیر), *মুসিবাত নামে* (مصیبت نامه ), *আসরার নামে* ( اسرار نامه), *এলাহি নামে* (الهی نامه) ইত্যাদি।[৮] মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি ছিলেন শ্রেষ্ঠ আরেফ কবিদের একজন। তাঁর কাহিনীমূলক কাব্য *মাসনাভিয়ে মা'নাভি* (مثنوی معنوی) ও *কুল্লিয়াতে শামস তাবরিযি* (کلیات شمس تبریزی) প্রসিদ্ধ রচনা।[৯] তাঁর এই *মসনবি* গ্রন্থে সবচেয়ে উপমা ও সুফিবাদী

Dhaka University Institutional Repository

কাহিনী স্থান পেয়েছে। যেমন– দাসির প্রতি বাদশাহ'র প্রেম, তোতা পাখির গল্প, পশুদের নিয়ে গল্প, সওদাগরের গল্প প্রভৃতি। এই মরমি কবির *মসনাবিয়ে মা'নুভি* কাব্যগ্রন্থ থেকে নিম্নে একটি ঘটনা বর্ণনার কবিতা দেয়া হল:

قصۀ بازرگان که طوطی محبوس او، او را پیغام داد به

طوطیان هندوستان، هنگام رفتن به تجارت

بود بازرگان و او را طوطی – در قفص محبوس، زیبا طوطی

چون که بازرگان سفر را ساز کرد- سوی هندستان شدن آغاز کرد... [10]

অর্থাৎ– এক সওদাগরের ছিল একটি তোতা পাখি। সুন্দর তোতা পাখিটি পিঞ্জিরায় আবদ্ধ ছিল। যখন সওদাগর ভ্রমণের জন্য প্রস্তুত নিলেন। ভারতে ব্যবসার জায় জোগাড় করেন।[১০]

ফখরুদ্দিন এরাকি (৬১০ হি.-৬৮৮ হি.) ছিলেন সপ্তম হিজরি শতকের একজন কাহিনীকার কবি। তিনি 'গজল' ও 'কসীদা' রীতিতে কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য রচনার নাম হল *উশ্‌শাকনামে* (عشاقنامه)।[১১] এ রচনাটি তাঁর কাহিনীকাব্যের একটি বড় পরিচয়। ফারসি কাব্য সাহিত্যের অন্যতম খ্যাতিমান পুরুষ শেখ সাদি শিরাজি (৬০৬ হি.-৬৯১ হি.)। তিনি কাহিনী ও উপমা প্রর্দশনের ক্ষেত্রে এতটাই প্রসিদ্ধ যে, ফারসি জগতে তাঁর ন্যায় দ্বিতীয় ব্যক্তিটি জন্মেনি। তাঁর রচিত বূস্‌তান (بوستان) ও গোলেস্তান (گلستان) কাব্যগ্রন্থ দু'টি অতুলনীয়।[১২] খাজু কিরমানি সপ্তম ও অষ্টম হিজরি শতকের কাহিনীমূলক কাব্য রচনায় একজন দক্ষ কবি ছিলেন। তিনি শেখ সাদি ও হাফিজ শিরাজির কাব্যরীতির অনুসরণ করে কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর কাহিনীকাব্য মসনবিগুলো নিম্নরূপ: *সাম নামে* (سام نامه), *হুমাই ওয়া হুমায়ুন* (همای و همایون), *গোল ওয়া নোওরূয* (گل و نوروز) *রাওজাতুল আনওয়ার* (روضت الانوار), *কামাল নামে* (كمال نامه), *গাওহার নামে* (گوهر نامه), প্রভৃতি।[১৩] আবদুর রহমান জামিকেও আমরা সনাতনি ধারার শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে জানি। তাঁর মসনবি রীতির কাব্যগুলোর মধ্যে *ইউসুফ ওয়া জোলায়খা* (يوسف و زليخا) অন্যতম। যে কাহিনী পবিত্র কুরআনে বিদ্যমান রয়েছে।[১৪] মাওলানা কামাল উদ্দিন মুহম্মদ ওহাশি বাফ্‌কি (৯৩৯ হি.-৯৯১ হি.) দশম হিজরি শতকের ফারসি কাব্য সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য একজন প্রসিদ্ধ কবি। তিনি কেরমান প্রদেশের নিকটতম বাফ্‌ক নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি *খালদ বেরিন* (خلد برين), *নাজের ওয়া মানজুর* (ناظر و منظور) এবং *শিরীন ওয়া ফারহাদ* (شيرين و فرهاد) কাব্য রচনা করেন। উল্লেখ্য যে, *শিরীন ওয়া ফারহাদ* নামক মসনবি রচনা শেষ করার পূর্বেই তাঁর মৃত্যু ঘটেছে।[১৫] এটি তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যরচনা। পরবর্তীতে রচনাটি কবি বেসাল শিরাজি সমাপ্ত করেন। সাফাভি যুগের একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন মুহতাশাম কাশানি। তিনি কারবালার কাহিনী

Dhaka University Institutional Repository

কাব্যাকারে রচনা করে প্রসিদ্ধি পেয়েছেন।[১৬] নিম্নে তাঁর কারবালার কাহিনীমূলক কাব্য থকে উদ্ধৃতি দেয়া হল:

در وقایع کربلا

باز این چه شورش است که در خلق عالم است – باز این چه نوحه و چه عزاوچه ماتم است

باز این چه رستخیز عظیم است کز جهان- بی نفخ سور خاسته تا عرش اعظم است ...[17]

> পৃথিবীর এ কী অবস্থা যে চর্তুদিক গোলযোগ শুরু হয়েছে। কেনই বা এত বিলাপ, আহাজারি, ক্ষমতা, যশ, আকাঙ্খা ও শোক। পৃথিবীতে এতবড় পুনরুত্থান দিবস কেন? দাওয়াত বিহীন অনুষ্ঠান যেন এক বিড়াট জমায়েত।

শিহাব তুরশিযি আবদুল্লাহ বিন হাবিবুল্লাহ (মৃ. ১২১৬ হি.) দ্বাদশ হিজরি শতকের একজন উল্লেখযোগ্য কাহিনীকার কবি। তিনি ছিলেন একজন চিত্রকর, লিপিকর এবং একজন গণক। তিনি যুবক বয়সে ইরান থেকে হেরাতে অবস্থান করেছিলেন। এ সময় বাদশাহ ছিলেন সুলতান তৈয়মুর শাহ দুররানি। তাঁর একটি বিশাল *দিওয়ান* ব্যতীত অনেকগুলো কাব্য গ্রন্থ রয়েছে। যে কাব্যরচনাগুলো প্রেম ও বীরত্বমূলক কাহিনী দ্বারায় সমৃদ্ধ। রচনাগুলোর নাম হল: *খাসরু ওয়া শিরীন* (خسرو و شیرین ) *মুরাদনামে* (مراد نامه) , *ইউসুফ ওয়া জোলায়খা* (یوسف و زلیخا), *বাহরাম নামে* (بهرام نامه) প্রভৃতি। তন্মধ্যে *খাসরু ওয়া শিরীন* রচনাটি ১১৯৪ হিজরি সালে আলি মুরাদ খানকে উদ্দেশ্য করে রচিত হয়। তাঁর *ইউসুফ ওয়া জোলায়খা* একটি উল্লেখযোগ্য কাহিনীমূলক কাব্যরচনা।[১৮] তিনি মর্সীয়া কবিতা রচনাকারীদের মধ্যেও একজন শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি হযরত আলি (রা.) ও হযরত ইমাম রেযা (আ.) –এর উপর মর্সীয়ামূলক কবিতা রচনা করেছেন।[১৯] সাবাই কাশানি ওরফে ফতেহ আলি খান কাশানি ফতেহ আলি শাহ এর সময়কালের একজন উল্লেখযোগ্য কবি হিসেবে খ্যাত। তাঁর রচিত *দিওয়ান* ব্যতীত কয়েকটি কবিতার বই রয়েছে। তাঁর সবচেয়ে বড় কাব্যগ্রন্থের নাম হল *শাহেনশাহ নামে* (شهنشاه نامه)। এটি কবি ফেরদৌসির *শাহনামার* অনুসরণে রচিত হয়। এটি তিনি ফতেহ আলি শাহকে উৎসর্গ করেন। এ কাব্যগ্রন্থে দেশীয় রাজা-বাদশার কাহিনী রয়েছে। এ ছাড়া তাঁর *খোদাওয়ান্দ নামে* (خداوند نامه) , *এবরাত নামে* (عبرت نامه) , *গুলশানে সাবা* (گلشن صبا) অন্যতম কাব্যরচনা।[২০] এ রচনাগুলোতে বিভিন্ন কাহিনী উপস্থিত রয়েছে। কাজারি যুগের অন্যতম কবি ছিলেন মির্জা শফি বেসাল শিরাজি (১৭৭৯খ্রি.-১৮৪৫খ্রি.)। তাঁর কাব্য প্রতিভার সাথে যন্ত্রসঙ্গীতেরও খ্যাতি ছিল। তিনি যে কবিতা গেয়ে যেতেন সেখানে যন্ত্রসঙ্গীত ব্যবহৃত হত। তাঁর পনের হাজার 'বয়েত' রয়েছে। এসব বয়েতগুলো মসনবি ও গজল

রীতি আকারে রচিত। এ ছাড়া কবি ওহাশি ইয়াযদি (মৃ. ১৫৮৩ খ্রি.) রচিত *ফারহাদ ওয়া শিরীন* (فرهاد و شیرین) কাব্য রচনাটি তিনি সম্পূর্ণ করেন।[২১] তিনি ফারসি সাহিত্যে ততটা পরিচিত না হলেও ফারহাদ ও শিরীনের প্রেম কাহিনীটি কাব্যাকারে রচনার জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন।

### ফারসি কাব্যকাহিনীর উৎস

ফারসি কাব্য সাহিত্যের মধ্যে এমন একাধিক রচনা রয়েছে, যে রচনার উৎস *আবেস্তা* গ্রন্থ, হাখামানশি যুগের শিলালিপি বা প্রস্তর লিপির কাহিনী চিত্র। কাব্যের বিষয় বা ভাব অবলম্বন ঐ সব বস্তু থেকে গ্রহণ করা কোনো অযৌক্তিক ব্যাপার নয়। প্রাচীন বা তৎপরবর্তী সময়ের রচনাগুলো ইরানিদের নিজস্ব সম্পদ। তাঁদের ইসলাম যুগের অনেক কাহিনীকাব্য বহু পূর্ব থেকেই তাঁদের মাঝে বিদ্যমান ছিল। যেমন– *কালিলা ওয়া দিমনে, আলেফ লায়লা বা হেজার দাস্তান* এবং *সিন্দবাদনামে*। যদিও এসব কাহিনী ভারতীয় বা আরবীয় হিসেবে গবেষণায় প্রকাশ পেয়েছে। মূলত এগুলো ইরানে নিজেদের করে রচিত হয়।[২২] এসব রচনায় কাহিনী চিত্রনের ক্ষেত্রে ইরানীয় লেখকদের নিজস্ব ভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। ফারসি কাব্যরচনার একটি বৈশিষ্ট্য হল, চমৎকার কাহিনীতে ন্যায়, সততা ও আখলাককে জাগিয়ে তোলা। ইসলাম পরবর্তী সময়ের রচনাগুলোতে ঠিক সে বিষয়টি পরিস্কারভাবে উল্লেখ রয়েছে। এমনকি ইসলাম পূর্ব যুগের প্রেমের কাহিনীগুলো পবিত্র ও আকর্ষণীয় ছিল। কাহিনী চিত্রনের ক্ষেত্রে ফারসি কবিদের মাঝে একটি রীতি রয়েছে যে, কাহিনীর সাথে সুর ও তাল সৃষ্টি করে আদর্শমূলক একটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা। কবিতার মধ্যে যে কাহিনীটি ফুটে ওঠেছে কোনো না কোনো আদর্শ ও ধর্মমূলক ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। *আবেস্তা* ধর্মীয় গ্রন্থের গাথা অংশে কাহিনীকাব্য রয়েছে। এটি অনায়েসে সাহিত্যের মানে সমৃদ্ধ ও ধরন প্রকৃতি কোনো অংশেই কম উন্নত নয়। ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসে এমন একাধিক গদ্য রচনা রয়েছে যেখানে কবিতা উপদেশ বা দৃষ্টান্ত গ্রহণের জন্য উল্লেখ করা হয়।[২৩] এটি ফারসি সাহিত্যের পৃথক একটি বৈশিষ্ট্য। শেখ সাদির *গোলেস্তান* গ্রন্থটি সে ধারার আলোকে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।

### ফারসি কাহিনী কাব্যের বিষয়

যে সব গ্রন্থে শুধু নিছক কাহিনী রয়েছে যেমন– পাখি, শেয়াল, ভালো-মন্দ, কাক-কোকিল, বিড়াল-ইঁদুর, মুরগি ও মুরগির ডিমের গল্প প্রভৃতি। ঐ সব গল্পের মধ্যে কোনো দৈত্য, দেও-দানব বা অন্য কোনো প্রকৃতির প্রভাব বা যাদু মন্ত্রের প্রভাব নেই। গল্পগুলোতে এক ধরণের উপদেশ বা সৎ

মনোভাব ফুটিয়ে তুলাই হল লেখকের উদ্দেশ্য। এসব গল্পে পাঠক নিজেকে উৎফুল্ল বা আনন্দে রাখার জন্য বেশি মনোনিবেশ হন। সাধারণত ফারসি কাহিনী কাব্যে যে বিষয় পাওয়া যায় তা নিম্নরূপঃ

**ক. আধ্যাত্মিকতাঃ** মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমির *দীওয়ানে শামস তাবরিযির* আলোচনার বিষয়গুলো যদি একত্রিত করা হয় তার ফলাফল এটিই প্রকাশিত হবে যে, এটির বিষয় এরফান। এ বিষয়টি থেকে অন্য বিষয়ের প্রতি কখনো মনোনিবেশের কল্পনা করা যায়না। এটি ইরানি এরফানি ধারায় প্রভাবিত হয়েছে এবং কাব্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে তা বেশি করে প্রতিফলিত হয়েছে। বিষয়-বস্তুর আঙ্গিক ও রূপ এরফান ব্যতীত অন্য কোনো বিষয় যে কবির মন-চিন্তায় ছিল না তা নয়।[২৪] এ কথা সত্য যে, মাওলানা রুমি যে বিষয় দিয়ে মসনবি কাব্যরচনা করেছেন তাঁর মূলে রয়েছে এরফানি জগৎ। ভিতরের যে প্রেমের যন্ত্রণা রয়েছে সেটি এরফান ব্যতীত ভিন্ন বিষয় নয়। শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার সী মোরগের কাহিনী উল্লেখ করেছেন। তাঁর এরূপ কাহিনী উপস্থাপনের উদ্দেশ্যও একটি। তদ্রুপ খাজা হাফিজের ক্ষেত্রেও এমনটি মন্তব্য যুক্তিযুক্ত।[২৫] এরফানি জগতে তালাশ ও অন্বেষণের শেষ পূর্ণতা হল মিলন।

**খ. ইতিহাস সংস্কৃতিঃ** আবুল কাসেম ফেরদৌসি ও শেখ সাদির চিন্তা চেতনায় যে বিষয়টি পরিস্কার ভাবে দেখা যায় তা হল পুরাতন কাহিনী ও সংস্কৃতির প্রতি একটি আবেদন রেখে যাওয়া। যেন পরবর্তী গোষ্ঠী সে কাহিনী ধরে রেখে জীবন সাধনায় ব্রত হতে পারেন। একটি বাস্তবতায় উত্তীর্ণ হতে হলে জাতির কাহিনী জানার প্রয়োজন হয়। সে কাহিনী কাব্যে স্থান করে দিয়ে মূলত তাঁরা প্রাচীন ধারার চিন্তা চেতনাকে বাস্তবে পরিণত করতে চেয়েছেন। ত্যাগের চিন্তা-চেতনায় যে বিষয়টি দেখা হয় তা হল এই যে, তাদের মধ্যে আখলাক এবং এরফানি ধারা কতটুকু রয়েছে। তবে তাঁরা ইতিহাস ও ধর্মীয় সংস্কৃতির বিষয়ে বেশি কবিতা রচনা করেছেন।[২৬]

**গ. রূপকালঙ্কারঃ** খাজা হাফেজ তাঁর এশকের বর্ণনা দিতে গিয়ে নারগিস, লা'ল, ভূত, পিরে মাগান ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাঁর সমস্ত গজলে ইঙ্গিতপূর্ণ বক্তব্য রয়েছে। যে গুলো বাস্তব ও প্রকৃত অর্থের চেয়ে অর্ন্তনিহিত অর্থের গভীরতার প্রতি জাগিয়ে তুলে। মাওলানা রুমির মসনবিতে একই ভাব বিদ্যমান রয়েছে। তাঁদের কাব্যে যে উপকরণ রয়েছে সে জগৎ এক ভিন্নরূপ। কাব্যের বিষয় আল্লাহর সাথে প্রেম ভিন্ন নয়। চন্দ্র ও সূর্যের যে ইচ্ছে ঠিক তাঁদের প্রত্যাশাও খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। হাফিজ শিরাজি ও মাওলানা রুমি প্রেম বিনিময়ে যেভাবে কথোপকথন করেছেন মিলন ও

Dhaka University Institutional Repository


তৃপ্তি একেবারেই স্বাভাবিক।[২৭] কবি নেজামি প্রেমে বিরহ-বিচ্ছেদ ও হিজরতকে রাতের সাথে তুলনা করেছেন। তাঁদের রূপকালঙ্কার ফারসি কাব্যসাহিত্যের বড় বৈশিষ্ট্য।

**ঘ. ধর্ম:** ধর্ম হলো স্বাভাবিকভাবে জীবন-যাপন করার পন্থা। এটি মানুষের চলার পথকে সহজ করে তুলে। ইসলাম ধর্মে বহু ঘটনা রয়েছে। এসব ঘটনা জীবনের জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করা হয়। কুরআনে যেসব ঘটনা রয়েছে তা মানুষের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। যেমন– সুলায়মান, নূহ, ইয়াকুব, আদম, ইব্রাহিম, ইসমাইল, হাবিল, ইদ্রিস, ইউনুস, শয়তান, কাবিল, জোলায়খা, আবু লাহাব, সামেরি, হুদহুদ, কাহাফ, গাভি, মক্কা, মিসরের ঘটনা প্রভৃতি। ঘটনায় যে উপকরণ রয়েছে সেগুলো ফারসি কবিতায় ফুটে উঠতে দেখা যায়। ফারসি কাব্যে ঘটনা বিবরণের সাথে উপদেশ প্রদান করা হয় যাতে কাব্যপাঠকারী সত্য পথে চলতে পারেন। মাওলানা রুমি তাঁর মসনবিতে দৃষ্টান্ত হিসেবে ঐ সব ঘটনা ব্যবহার করেছেন।[২৮]

**ঙ. নৈতিক চরিত্র:** এরফানি জগতের ভিতরে প্রবেশের জন্য উত্তম চরিত্রের প্রয়োজন রয়েছে। গন্তব্যে পৌঁছতে হলে আখলাক বা উন্নত চরিত্র ব্যতীত পথচলা যায়না। চরিত্র সংশোধন করে পথ চলা খোদাপ্রেমিকদের একটি বড় কাজ। নিজস্ব বুদ্ধি যেরূপ পথ চলার ক্ষেত্রে সহায়ক একটি শক্তি তেমনি এরফানের জন্য উপযুক্ত বিষয় হলো উত্তম চরিত্র।[২৯] শেখ সাদি, মাওলানা রুমি, ফরিদ উদ্দিন আত্তার ও খাজা হাফেজ শিরাজির কবিতায় সবচেয়ে বেশি উত্তম চরিত্রের কথাগুলো ব্যক্ত হয়েছে। তাঁরা খোদাপ্রেমের জন্য আত্মা ও দেহ পরিস্কারে কথা বলেছেন।

**প্রসিদ্ধ ফারসি প্রেম কাহিনীকাব্য**

কাহিনী চিত্রনের জন্য যে কারণগুলো থাকা প্রয়োজন সব ক'টিই ফারসি সাহিত্যে রয়েছে। নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ করে তোলার জন্য ইরানীয়দের চেষ্টার কোন কমতি নেই। ইসলামপূর্ব যুগ ও তৎপরবর্তী সময়ের রচনাগুলো তাঁদের নিজেদের চেষ্টার একটি সুফল। একটি ক্ষেত্র হিসেবে উপযোগী করে তোলেছিল বলেই তাঁদের থেকে অসংখ্য কাহিনীকাব্যের উদ্ভব ঘটেছে। কাহিনীতে প্রভুর তালাশ, বুদ্ধি ও জ্ঞান, পবিত্র আত্মা ও সত্যের সন্ধান ব্যতীত নয়। কাব্যে প্রেমের কোনো কাহিনী অহেতুক হিসেবে উপস্থিত হয়নি। কারণ ও উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রেখে কাহিনীর অবতারণা ঘটেছে।[৩০] কাহিনী বিস্তার লাভের ক্ষেত্রে ফারসি ভাষাটির ভূমিকা অনেক গুরুত্ব রাখে। এসব কাহিনীর কতক ভিন্ন ভাষায় পাওয়া গেলেও বস্তুত ফারসি ভাষার মাধ্যমেই অনেক কাহিনী প্রাণ পেয়েছে। যেমন – লায়লা ও

মজনুনের কাহিনী আরবি ভাষায় ছিল। এ কাহিনীর প্রসার ঘটেছে ফারসি ভাষায়। তদ্রুপ *ওয়ামেক ওয়া আযরা* কাব্য রচনার কাহিনীটি গ্রীক ভাষায় প্রথম রচিত হয়ে ছিল। পরবর্তীতে এটির প্রাণ পেয়েছে ফারসি ভাষায়।[৩১] অন্য ভাষার কাহিনী সমৃদ্ধ করার জন্য নয় বরং কাহিনীটি নিজের মত করে গড়ে তোলাই হল উদ্দেশ্য।

১. *লায়লা ওয়া মাজনুন* (**ليلى و مجنون**): জামাল উদ্দিন ইলিয়াস বিন ইউসুফ যানকি বিন মোয়ায়াদ (৫৩০ হি.-৬১৪ হি.) ফারসি সাহিত্যের একজন নক্ষত্র ছিলেন। তিনি সুন্দর ও চমৎকার কবিতা আবৃত্তি করতেন। তাঁর মাধ্যমে এ ধরণের কবিতা প্রথম আবৃত্তি হয়েছিল। নেজামি গাঞ্জুবি এ ধরণের কবিতা রচনা করেছেন। কাহিনীটি আরবের হলেও ফারসি ভাষায় বিভিন্নরূপে ও ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে প্রকাশ পেয়েছে। বহু দিন ধরে আরবের আমের গোত্রের এক বাদশাহ সন্তান কামনায় ছিলেন। একদিন তাঁকে একটি সুন্দর ছেলে দেয়া হল এবং বাদশাহ ছেলের নাম রাখলেন কায়েস। কায়েস প্রতিদিন মাদ্রাসায় যেত। এখানেই অন্য গোত্রের একটি মেয়ে কায়েসের সহপাঠী ছিল। তার নাম ছিল লায়লা। কায়েস তাকে দেখে ভালবাসল এবং দিনের পর দিন তাঁদের ভালবাসা চলল। কায়েসের ভালবাসা এমনভাবে দৃঢ় হল যে, কায়েস আর লায়লাকে ছেড়ে যেতে পারেনি। কায়েস প্রেমের কারণে মজনুন অর্থাৎ পাগলে পরিণত হল। কায়েস মানুষের নিকট শুধু লায়লার প্রশংসা করলে মানুষ তাকে মজনুন বলে অভিহিত করত। এ ঘটনাটি কবির ভাষায় চমৎকারভাবে উপস্থাপন করা হয়।[৩২]

২. *শেইখে সানান* (**شيخ صنعان**): শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার রচিত *মানতিকুত তায়ের* কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতার নাম দাস্তানে শেইখে সানান। শেইখে সানান একজন দরবেশের নাম। তিনি সবসময় আল্লাহর সাক্ষাতলাভে ব্যাকুল থাকতেন। তাঁর ধর্মীয় কাজগুলো আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য বেশি নিবেদিত ছিল। নামাজ, রোজা ও হজ্জ পালন এত বেশি ছিল যে, তাঁকে একজন যুগের শ্রেষ্ঠ শরিয়তপন্থী বললেও অত্যুক্তি হবেনা। ঘটনাক্রমে তিনি এক সুন্দর নারীর প্রতি প্রেমে ডুবে যান। এমনভাবে জড়িয়ে পড়েন যে, সহকর্মী ও শাগরেদদের বিরক্তি ভাব তাঁকে অপসারণ করতে পারেনি। বরং তাঁর হৃদয়ে প্রেমের যন্ত্রণা দিনের পর দিন তীব্র হতে থাকে। অনেক শাগরেদ ও সহকর্মীরা কোনো প্রকার মুক্তির আশা না দেখে তাঁর সান্নিধ্য ত্যাগ করেছেন। অবশেষে তিনি প্রেমিকার নিকট থেকে একটি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন। সুন্দর নারী চারটি শর্ত পালনের জন্য শেখ সানানকে প্রদান করেন। সেই শর্তগুলো হল: প্রেমিকার দেবতাকে সেজদা করা ২. শরাব পান করা ৩. কুরআনকে পুড়িয়ে দেয়া ও ৪. প্রেমিকার ধর্ম গ্রহণ করা। শর্তগুলো যদিও তাঁর জন্য কঠিন ছিল।

তবুও প্রেমিকাকে পেতে শর্তপালনের চেষ্টার কোনো প্রকার কমতি দেখা যায়নি। এ প্রেমের সমাপ্তির জন্য আরো অধিক কঠিন শর্তের সম্মুখীন হতে হয় যা পালন করা তাঁর জন্য সম্ভব ছিলনা। এ সময় তিনি পাগলে পরিণত হন এবং দ্বীন-ধর্ম বলতে তাঁর কিছুই ছিলনা। এমন সময় তাঁর নিকট মুরিদরা সকলেই সমবেত হল এবং তাঁদের দেখে তিনি লজ্জিত হন। অবশেষে মুরিদদের দোয়া ও আশার কারণে তাঁর অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। এটি ছিল একটি প্রেমের কাহিনী।[৩৩]

৩. *মেহের ওয়া মাহ* (مهر و ماه): ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাহিনী কাব্যকার ছিলেন মাওলানা জামালি। তিনি যে কাহিনী রচনা করেছেন তার নাম *মেহের ও মাহ*। এ দু'টি শব্দ প্রেমিক ও প্রেমিকার নাম। এর কাহিনীটি ছিল নিম্নরূপ: এক বাদশার সন্তান ছিলনা। অনেক দিন পর এক দরবেশের দোয়ায় তিনি সন্তান লাভ করলেন। তাঁর নাম রাখা হল মাহ্ অর্থাৎ চাঁদ। চাঁদের বয়স যখন বাড়তে শুরু করে ঠিক তখনি তাঁকে প্রেমাসক্তি ঘিরে ধরে। স্বপ্নে এক প্রেমিকা তাঁকে বাহু বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে। তারপর সে স্বপ্নকে বাস্তবায়নের চিন্তায় বিভোর ও মাতাল হয়ে ওঠে। সেই প্রেমিকা হল মেহের অর্থাৎ সূর্য। এই সূর্যকে পেতে মাহের চেষ্টার কোনো প্রকার ঘাটতি ছিলনা। সূর্য ও চাঁদের প্রেম ও মিলনকে কেন্দ্র করেই কাব্যগ্রন্থটি রচিত হয়। এটি নবম হিজরি শতকের প্রেম কাহিনীমূলক একটি উল্লেখযোগ্য মসনবি রীতির কাব্য।[৩৪]

৪. *গুল ওয়া নোওরূয* (گل و نوروز): কামাল উদ্দিন খাজো ছিলেন ফারসি কাব্যকাহিনী রচনার অন্যতম কবি। এটি তাঁর অষ্টম হিজরি শতকের রচনা। এক বাদশার ছেলের নাম ছিল নোওরূয অর্থাৎ নববর্ষের প্রথম দিন। সে দিন দিন লেখাপড়া ও জ্ঞান বিদ্যায় পারদর্শী হতে থাকে। বিদ্যা অর্জনের ক্ষেত্রে তাঁর কোনো প্রকার অলসতা ছিলনা। কিন্তু যৌবনে পদার্পণ করার সময়ে আবেগ ও প্রেমাবেগ তাঁকে জ্ঞানের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। নোওরূয হঠাৎ একদিন গভীর চিন্তায় মগ্ন হলে দুটি পাখির কণ্ঠ শুনতে পান। তাঁকে উদ্দেশ্য করে এক পাখি অন্য পাখির প্রতি কটাক্ষ করে কথা বিনিময় করছে। এটি তাঁর মনে রেখাপাত সৃষ্টি করে। এভাবেই লেখক প্রেমের কাহিনীটি দীর্ঘ করে বর্ণনা করেন।[৩৫]

বাংলা প্রেমকাহিনী কাব্য

বাংলা সাহিত্যে প্রেমমূলক কাহিনী হিসেবে পরিচিত *ইউসুফ জোলেখা*, *লায়লী মজনু*, *মধুমালতী*, *হানিফা কয়রাপরী*, *বিদ্যাসুন্দর*, *সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল*, *সতীময়না লোর চন্দ্রানী*, *পদ্মাবতী*,

Dhaka University Institutional Repository

*সপ্তপয়কর, চন্দ্রাবতী, লালমতি সয়ফুলমুলুক, গুলে বকাওলী, শাহজালাল মধুমালা, জেবলমুলুক শামারোখ* প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ প্রসিদ্ধ। এসব গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের গবেষকদের দৃষ্টিতে বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপখ্যান হিসেবে পরিচিত রয়েছে। গ্রন্থগুলোতে রসের দিক দিয়ে নতুন স্বাদ পাওয়া গেলেও এ গুলোর কাহিনী নিজস্ব নয় আমদানীকৃত।[৩৬] কাব্যগুলোর নাম দেখেও অনুমান করা যায় যে, বাংলা সাহিত্যে নতুন সংযোজন করা হয়েছে মাত্র। এসব কাহিনীর দু' একটি ব্যতীত সকল কাহিনীর উৎস আরবি বা ফারসি সাহিত্য।

বাংলা কাব্যে প্রসিদ্ধ 'মধুমালতির প্রেম' কাহিনীটিও ফারসি ভাষার। কুমার মনোমহর আর মধুমালতি এক স্বপ্নের মধ্যে দেখা হয়। ঘুম ভাঙ্গার পর উভয়েরই বাসনা জাগে মিলনের। তাঁদের মধ্যে বিশাল বড় একটি সাগর ছিল। প্রেমিক তাঁর আশা পূরণে মিলনের জন্য কোনো ধরণের ত্রুটি করেনি। একটি পাখি ছিল সংবাদ আদান প্রদানের বাহক। তাঁর পর একদিন তাঁদের মধ্যে প্রেমের মিলন হল। এ ঘটনা সম্পর্কে বাংলা সাহিত্য সমালোচকগণ হিন্দি কাব্য সাহিত্যের উৎসের কথা বলেছেন। তবে এ কাহিনী যে ফারসি ভাষায় রচিত হয়েছিল– সেটিও কাহিনীর উৎস হিসেবে বিবেচনায় থাকা প্রয়োজন। মুসলমান বাঙালি কবিদের মাঝে রোমান্টিক কাব্যের উদয় হওয়া ছিল তাঁদের ফারসি ভাষার সাথে সম্পর্কের কারণ। যে সব কবি ফারসি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন সেসব কবির মধ্যে রোমান্টিক কাব্যের প্রভাব দেখা যায়। ষোল শতকের মুহম্মদ কবীর রচিত '*মনোহর মধুমালতী*'[৩৭] রচনাটি ফারসি গ্রন্থের ভাবানুবাদ। তাঁর এ কাব্যকাহিনীটি ফারসি রচনার আদলে সৃষ্টি হয়েছে।

## ধর্ম ও আদর্শভিত্তিক কাহিনীকাব্য

*কালিলে ওয়া দেমনে* (**كليله و دمنه**: প্রাণীদের বক্তব্য সম্বলিত একটি কাহিনী। কাহিনীটি প্রথমে সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছিল। এটিতে প্রাণীদের বক্তব্য ঘটনা আকারে লিখিত হয়েছে বিধায় দু'টি শৃগালের নামে নামকরণ করা হয়। সাসানি যুগে প্রথমে সংস্কৃত ভাষা থেকে পাহলবি ভাষায় এবং আবদুল্লাহ বিন মুকাফ্‌ফা পাহলবি থেকে আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন। এ কাহিনীটি সামানি যুগে কবি রুদাকি সামারকান্দি কাব্যাকারে রচনা করলে পরবর্তীকালে তা পুস্তিকারূপে পাওয়া যায়নি। আবার এটি ষষ্ঠ হিজরি শতকের মাঝামাঝি সময়ে আবুল মাআলি নাসরুল্লাহ মুনশি আরবি থেকে ফারসি ভাষায় রূপান্তরিত করেন। তবে তাঁর এটি গদ্য রচনা হওয়ায় তেমন প্রসিদ্ধি পায়নি। সপ্তম হিজরি শতকে কানায়ি তুসি এটি কাব্যে রূপ দান করেন। এটি ছিল নাসরুল্লাহ মুনশির রচনা থেকে অনুবাদ। কাহিনিটি এভাবেই ফারসি ভাষা ও সাহিত্যে জায়গা করে নেয়।[৩৮]

Dakha University Institutional Repository

*তুতি নামে(طوطی نامه)*: পাখি বিষয়ক একটি প্রসিদ্ধ গল্পের নাম তুতিনামে। গল্পটি ভারতের হিন্দু ধর্ম-সংস্কৃতির সাথে উৎপ্রোতভাবে জড়িত। ভারতীয় কাহিনীর মধ্যে পাখি বিষয়ক কাহিনীটি অন্যতম। এ কাহিনীটি প্রথমে সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়। এটি মুসলিম সমাজে ফারসি ভাষার মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে। প্রথমে এই কাহিনীটি ইরানের জনসাধারণ নিজেদের কাহিনীর ন্যায় জন-সমাজে প্রচার করতেন। ইরানের সাহিত্যিকগণ এটিকে লৌকিক কাহিনী হিসেবে উল্লেখ করলেও ফারসি সাহিত্যে সুফি সাহিত্য হিসেবে অধিক পরিচিত। ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে অনেকগুলো কাহিনী ছিল তন্মধ্যে এটি একটি। সেই কাহিনী গ্রন্থ থেকে তুতিনামার কাহিনীটি প্রথমে উম্মাদ বিন মোহাম্মদ ৭১৩ হিজরি থেকে ৭১৫ হিজরি সালের মধ্যে অনুবাদ করেন এবং কাহিনী আকারে গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেন। তাঁর কাহিনীটি সংস্কৃত ভাষার ন্যায় হুবহু থাকেনি। কাহিনীতে কুরআনের আয়াত, হাদিস এবং ফারসি ও আরবি কবিতা অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।[৩৯] তাঁর এই গ্রন্থটি *জাওয়া হিরুল আসমার* নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। ভারতের জিয়া উদ্দিন নাখশাবি যে *তুতিনামে* রচনা করেন তা ছিল মূলত উম্মাদ বিন মুহাম্মদের *জাওয়া হিরুল আসমার* রচনাকে ভিত্তি করে। তিনি এটি ৭৩০ হিজরি সনে রচনা করেন।[৪০] তাঁর রচনাটিকে তিত্তি করে ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে অপর একটি *তুতিনামে* রচিত হয়। রচয়িতার নাম মোহাম্মদ কাদেরি। তিনি সহজ করে কাহিনীটি উপস্থাপন করেন। প্রতিটি কাহিনীতে যে নতুনত্ব এসেছে তা তার রচনায় বিধৃত কাহিনী দেখে অনুমিত হয়। এ কাহিনীটি প্রথমে ফারসি ভাষায় কাব্যকারে রচিত হয়েছিল কী না বিষয়টি স্পষ্ট করা প্রয়োজন। ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসে এই কাহিনীকে ভিত্তি করে তিনটি রচনার উল্লেখ পাওয়া যায়। যা প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে রচিত হয়। সবচেয়ে শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তারের *মানতিকুত তায়ের* কাব্যরচনা প্রসিদ্ধ। সে রচনায় পাখিদের কথামালা রূপক আকারে বর্ণনা করা হয়। আত্তার এতে তাসাউফের ভাষা প্রয়োগ করে গ্রন্থটি সুফিবাদের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। গ্রন্থে পাখিদের প্রধান কে হবে সে বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়। এতে সত্যের সন্ধান ও খোদাপ্রেমের স্তর প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হয়েছে।[৪১]

## প্রসিদ্ধ বাংলা ধর্মীয় কাহিনীকাব্য

বাংলা ভাষার ধর্মীয় কাব্যগুলো ফারসি ভাষার কোনো না কোনা গ্রন্থের অনুবাদ বা ভাব অবলম্বনে রচিত হয়েছে। যেমন–*নছিয়তনামা*, *ফক্করনামা*, *রাহাতুল কুলুব*, *হয়রাতুল ফিকহ*, *মওতনামা*, *সিরাজ কুলুপ*, *মুসার সওয়াল*, *আমীর হামযা*, *শাহ পরীর কেচ্ছা*, *হানিফা কয়রাপরী* ও *শিহাবুদ্দিন নামা*। এ রচনাগুলোতে যে ভাব ও রস রয়েছে সেগুলোও ফারসি থেকে আমদানীকৃত।

Dhaka University Institutional Repository


*সিরাজ কুলুপ* : এটির রচয়িতা আলি রজা ওরফে কানু ফকির। তিনি একজন দরবেশ প্রকৃতির কবি ছিলেন। কবি পিরের পেশা গ্রহণ করেছিলেন বলে তাঁর কবিতায় সুফি ভাবধারা বিদ্যমান ছিল। গবেষক এনামুল হকের মতে, কবি ১৬৯৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন।[৪২] তাঁর এ রচনাটি মৌলিক নয়। গ্রন্থকার বলেন

ছিরাজ কুলূপ নামে য়াছিল কেতাব।
উত্তম মছল্লা তাতে সুন্দর পরস্তাব ॥
গুরু মুখে এসব জে হাদিছ পাইলু।
সভানে বুজিতে ভাল বাঙ্গালা করিলু ॥[৪৩]

ফারসি ভাষায় এ নামের গ্রন্থ পাওয়া যায়। প্রথম কাব্যাকারে কখন রচনা হয়েছিল- সেটি জানা নেই। গদ্যাকারে গ্রন্থটি বাংলা কাব্যের অনুরূপ। ফারসি গদ্য গ্রন্থে ৪৫টি বাব বা অধ্যায় রয়েছে। অধ্যায়গুলোর শিরোনাম নিম্নরূপ। যেমন–পৃথিবীর সৃষ্টিকথা, প্রথম সৃষ্টিবস্তুর গুণবর্ণনা, আসমানসমূহের বর্ণনা, জমিন সম্পর্কে বর্ণনা, বেহেশতের বর্ণনা ইত্যাদি। উক্ত বর্ণনা অনুযায়ী বাংলা কাব্যের বর্ণনা রয়েছে। বলা যেতে পারে যে, বাংলা রচনাটি ফারসি গদ্য গ্রন্থের মূল বিষয় থেকে সার সংগ্রহ করে রচিত হয়। এ বাংলা কাব্যের মূল কাহিনী এবং বিষয় ফারসির। বাংলা গ্রন্থটি ভাবানুবাদ না অনুবাদ বিষয়ে দ্বিমত থাকলেও এটি যে, ফারসি কাব্যের আদলে সৃষ্টি হয়েছে তা নিশ্চিত বলা যায়।

*রাহাতুল কুলুব*: এটি একটি ধর্ম বিষয়ক কাব্য গ্রন্থ। এতে রয়েছে কিয়ামতের ঝড় তুফান, ২. দোযখ ও দোযখের অধিবাসী, ৩. জান্নাত ও জান্নাতের অধিবাসী, ৪. পিতা মাতার কর্তব্য ইত্যাদি বিষয়। এ নামে কয়েক জন কবির রচনা রয়েছে। সৈয়দ নুরুদ্দিনের রচনায় ফারসির প্রভাব লক্ষ করা যায়। নিম্নে কবিতা থেকে দু'টি লাইন দেয়া হল:

নানামত তফসিল লেখা ছিল পরস্তাব
রাহাতুল কুলুব নামে আছিল কিতাব ॥
দেশি ভাষে কহিতেছি গুনিগনর ঠাই
ন মানিলে চাহ সবে কিতাবেত চাই ॥[৪৪]

কবির এ উক্তিতে ফারসি গ্রন্থ অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে। তিনি কোন্ কিতাব দেখেছিলেন তা স্পষ্ট নয়।

Dhaka University Institutional Repository

*রসুল বিজয়:* হজরত রসুল (সা.) অনেক যুদ্ধ তিনি নিজে করেছেন এবং নেতৃত্ব দিয়েছেন। এমন একটি যুদ্ধ ছিল যেখানে তাঁর সাথে চার খলিফা সবাই অংশগ্রহণ করেন। এ যুদ্ধে কাফের বাদশাহ পরাজয় বরণ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। রসুল (সা.) তখন তাঁর রাজত্ব ফিরেয়ে দেন। এ ছিল কাব্যের কাহিনী।

জ একুমের সৈন্য যবে     ভঙ্গ দিলা দেখি তবে
আইলেন্ত নবীর গোচর।
কমল চরণে ধরি     বহুল মিনতি করি
প্রণামিলা হই একত্তর ॥[৪৫]

*হাজার মসলা:* এটি আবদুল করিম খোন্দকারের অন্যতম কাব্যরচনা। তিনি ছিলেন আঠার শতকের প্রথমার্ধের কবি। রোসাঙ্গরাজ্যে বসবাস করতেন বলে তাঁকে রোসাঙ্গ কবি হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে।[৪৬] এ কাব্যের বিষয়টি হল অত্যন্ত চমৎকার। নবি করিম (সা.) কে এক ইহুদি এক হাজার প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি যে নতুন ধর্মের প্রচার করছেন সেটি জানার জন্য তার প্রশ্ন। তখন ইহুদি সঠিক উত্তর পেয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এ কাহিনীটি আবদুল করিম খোন্দকার কাব্যকারে বর্ণনা করেন। এটি ছিল ২০ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা। নিম্নে তাঁর পুস্তিকা থেকে 'দোজখ বর্ণনা' শিরোনাম থেকে কবিতার উদ্ধৃতি দেয়া হল।

দোজখ বর্ণনা।
রাগ: জমকছন্দ।
তা শুনি আবদুল্লারাজ হই দণ্ডবৎ
পুছিল সোয়াল আর নবীর অগ্রত।
কহ নবী এ সপ্ত দোজখ বিবরণ
কত বড় হএ সেই দুয়ার কেমন ।
রসুলে বুলিল শুন কহি একে এক
এ সপ্ত দুয়ার আছে এ সপ্ত নরক।[৪৭]

**বিচার বিশ্লেষণ:** মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের রূপটি এখানে কিঞ্চিত নিরূপিত হয়েছে। শাহ মুহম্মদ সগির খেকে শুরু করে ফকির গরিবুল্লাহ পর্যন্ত  অসংখ্য কবির কাব্যে ধর্ম, সুফিবাদ, ঘটনা-কাহিনী স্থান পেয়েছে। তাঁদের কবিতায় মানুষের জীবন-যাত্রা ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে খুব কমই বক্তব্য পাওয়া যায়। যে ক'জন মুসলিম কবি বাংলা কবিতাকে প্রাণ দিয়েছেন তাঁরা মূলত বাইরে থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন।[৪৮] প্রেমের কাহিনীগুলো যেভাবে চিত্রিত হয়েছে সেখানে পবিত্রতা ও সুন্দরের উপস্থিতি

Dhaka University Institutional Repository

সন্তোষজনক। এ কথা সত্য যে, ইরানীয় কাব্যগুলোতে সুফিবাদের বক্তব্য সবচেয়ে বেশি। অনেক কবিতায় রূপকভাবে সুফিদের বক্তব্য উপস্থাপিত হলেও কার্যত বাঙালি কবিদের সে ভাবধারা গ্রহণ করতে কোনো প্রকার অসুবিধায় পড়তে হয়নি। বাঙালি কবিরা ফারসি ভাষা ও সাহিত্যকে বুকে ধারণ করেছিলেন বলেই ফারসি কবিতার ভাব অবলম্বণে অসংখ্য সুফি কবিতা সৃষ্টি করতে পেরেছেন। কাব্য চর্চার উপযুক্ততা বা ক্ষেত্রস্থান প্রথমে ফারসিভাষী কবিরা সৃষ্টি করেছিলেন এবং সে চর্চার প্রভাব ভারত অঞ্চলে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। বাঙালি কবিরা সে থেকে পৃথক অবস্থানে ছিলেননা বরং তাঁরা যুগের চাহিদা অনুযায়ী কাব্যচর্চা করতে সক্ষম হন। সেই সাথে ইরানীয় কাব্যকাহিনী পেয়ে নিজেদের স্বার্থক করে তোলেন।[৪৯] মুহাম্মদ খানের *কেয়ামত নামা*, সৈয়দ সুলতানের *জ্ঞান চৌতিশা*, আবদুল হাকিমের *নুরনামা*, হাজি মুহাম্মদের *নুরজামাল* ও কবি আলাওলের *তোহফায়* সুফিবাদী কথামালা বিধৃত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে যে প্রভাব রয়েছে সেটি মূলত একটি সময়ের প্রভাব ছিল। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কবিরা সেভাবেই সাহিত্যকে চিরজীবি করে রেখেছেন।

এ আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম যুগের ফারসি কাব্যকাহিনীতে লোক সমাজের চিত্র অঙ্কিত হয়নি। সে সময় ইসলাম ধর্মচর্চা ছিল ইরানীয় সমাজের প্রধান বিষয়। এ কারণে কাব্যে যে কাহিনীটি চিত্রিত হয়েছে তা হল কুরআন, হাদিস, নবি, সাহাবা ও ইমাম প্রভৃতি বিষয়। সমাজকে নিয়ে কাহিনী চিত্রিত হয়েছে কম। তবে কি সুফি কবিরা সমাজ জীবনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন না? নিশ্চয় ফারসি কবিরা সমাজেরই একটি অংশ ছিলেন। হয়ত সমাজে সুফি ভাবধারায় জীবন যাপনের সময় তাঁদের ভিন্ন পরিবেশ ও কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন হতে হয়নি। সে কারণেই তাঁদের কবিতায় আল্লাহর সাথে মিলনের, মানবতা ও পবিত্রতার কথা বার বার জেগে ওঠেছে। মধ্যযুগের বাঙালি মুসলিম কবিদের মধ্যেও ধর্ম ও সুফিবাদ বিশালভাবে স্থান করে নেয়। যে কারণে তাঁদের কবিতায় ইরানীয় ভাব ধারা প্রকাশ পেয়েছে।

## টীকা ও তথ্যনির্দেশ


১. তাফাজ্জলি, আহমদ, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান পিশ আয ইসলাম*, এন্তেশারাতে সুখান, তেহরান, ১৩৮৯ হি.শা., পৃ. ১৮।

২. নিকোবাখত, নাসের, *তাহলিলে শে'রে ফার্সি*, সাযেমানে মোতালে' ওয়া তাদভিনে কুতুবে উলুমে ইনসানি দানিশগাহা, তেহরান, ১৩৮৯ হি.শা., পৃ. ৮৪।

৩. শিরাযি, মুহাম্মদ হাসান (গবেষণা ও সম্পাদনা), *কেস্সেহায়ে শাহনামে জেলদে আওয়াল*, কানুন এন্তেশারাত, তেহরান, ১৩৭৬ হি.শা., পৃ. ৯।

৪. নিকোবাখত, নাসের, *তাহলিলে শে'রে ফারসি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪।

৫. সাফা, যবিহুল্লাহ, *তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান* (জেলদে দোওম), এন্তেশারাতে ফেরদৌসী, তেহরান, ১৩৭৩ হি.শা., পৃ. ৩৭২।

৬. হায়দরি, গোলাম রেযা (ব্যাখ্যাকার ও গবেষণা), *জাভেদানেহায়ে আদাবে ফারসি*, এন্তেশারাতে সায়ে গোস্তার, তেহরান, ১৩৮৬ হি.শা., পৃ. ৪৮।

৭. নিকোবাখত, নাসের, *তাহলিলে শে'রে ফারসি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫।

৮. তদেব, পৃ. ৩৫।

৯. তদেব, পৃ. ৫৭।

১০. এস্তে'লামি, মুহাম্মদ (ভূমিকা, সংযোজন ও সম্পাদক), *মাওলানা জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ বালখি মসনবি*, এন্তেশারাতে জাওয়ার, তেহরান, ১৩৭২ হি.শা., পৃ. ৭৯।

১১. নিকোবাখত, নাসের, *তাহলিলে শে'রে ফারসি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪।

১২. তদেব, পৃ. ২০।

১৩. তদেব, পৃ. ৫৫।

১৪. ইয়াহাকি, মুহম্মদ জাফর, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান* ১-২, ওযারাতে অমুযেশ ওয়া পারওয়ারেশে ইরান, তেহরান, ১৩৭৭ হি.শা., পৃ. ২০৪।

১৫. সোবহানি, তওফিক, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, এন্তেশারাতে জাওয়ার, তেহরান, ১৩৮৮ হি.শা., পৃ. ৩৮৭।

১৬. ইয়াহাকি, মুহম্মদ জাফর, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান* ১-২, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২২; হায়দরি, গোলাম রেযা (ব্যাখ্যাকার ও গবেষক), *জাভেদানেহায়ে আদাবে ফারসি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০১।

১৭. হাকেমি, ইসমাইল, *আদাবিয়াতে গেনাঈ*, এন্তেশারাতে দানেশগাহ তেহরান, তেহরান, ১৩৮৬ হি.শা., পৃ. ৬০।

১৮. সোবহানি, তওফিক, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭৩।

১৯. তদেব, পৃ. ৪৭৩।

২০. নেসারি, সেলিম, *তারিখে আদাবিয়াত ইরান* ( জেলদে আওয়াল), শেরকাতে নাসাবি, তেহরান, ১৩৩৩ হি.শা., পৃ. ৮৮।

২১. তদেব, পৃ. ৯০।

২২ শামীসা, সিরুস, *আনওয়া ই আদাবি*, নাশরে মিতরা, তেহরান, ১৩৮৬ হি.শা., পৃ. ২০১।

২৩. তদেব, পৃ. ২০২।

২৪. আব্বাসি, হুজ্জাত ও কুব্বাদি, হোসাইন আলি, *আয়নেহায়ে কেয়হানি*, রি রা, তেহরান, ১৩৮৮ হি.শা., পৃ. ১৭।

২৫. আব্বাসি, হুজ্জাত ও কুব্বাদি, হোসাইন আলি, *আয়নেহায়ে কেয়হানি*, পৃ. ৪৩।

২৬. তদেব, পৃ. ৩৮।

২৭. তদেব, পৃ. ৪৬।

২৮. তদেব, পৃ. ৫০।

২৯. তদেব, পৃ. ৫৩।

Dhaka University Institutional Repository


৩০. এগমাঈ, ইকবাল (সংকলক), *দাস্তানহায়ে আশেকানে আদাবিয়াতে ফারসি*, এন্তেশারাতে হিরমান্দ, তেহরান, ১৩৭৩, পৃ. ৬।

৩১. এগমাঈ, ইকবাল (সংকলক), *দাস্তানহায়ে আশেকানে আদাবিয়াতে ফারসি*, তদেব, পৃ. ৬।

৩২. ঘটনাটি আরবি ভাষায় উৎপত্তি লাভ করলেও প্রসার পেয়েছে ফারসি ভাষায়। ইরানীয়রা এ ঘটনাটি বিভিন্নরূপে বর্ণনা করেছেন। শুধু প্রেম হিসেবে নয় উদাহরণ, দৃষ্টান্ত ও সুফিদের এশ্‌ক সম্পর্কেও কাহিনীটি বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে উপস্থিত আছে। ফারসি ভাষায় প্রথম দিকে *লায়লা ওয়া মাজনুন* নামের স্বতন্ত্র কাহিনীকাব্য রচনা করেন আবুল কাশেম ফেরদৌসি ও জামাল উদ্দিন ইলিয়াস যানকি।

৩৩. শেখ আত্তার রচিত *মানতিকুত তায়ের* কাব্য গ্রন্থে এ কাহিনীটি রয়েছে। এটি তাঁর গ্রন্থ ব্যতীত অন্য কোনো কবির গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এ কাহিনীটি ইরানীয়।

৩৪. দ্রষ্টব্য– এগমাঈ, ইকবাল (সংকলক), *দাস্তানহায়ে আশেকানে আদাবিয়াতে ফারসি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩-৯২; এ কাহিনিটির উৎসস্থল হিন্দুস্থান তথা ভারত। এটি একটি প্রেমের ঘটনা হিসেবে পরিচিত।

৩৫. দ্রষ্টব্য– এগমাঈ, ইকবাল (সংকলক), *দাস্তানহায়ে আশেকানে আদাবিয়াতে ফারসি*, পৃ. ১০৯-১৩৪।

৩৬. আহমদ, ওয়াকিল, *বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত*, খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানী, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ২৬৭ ; প্রেমমূলক কাহিনী কাব্য হিসেবে *ইউসুফ জোলায়খা*, *মৃগাবতী*, *যামিনীভান* ও *কালুগাজী চাম্পাবতী* প্রসিদ্ধ। এ নামের কতক রচনা আঠার শতকের পর রচিত হয়। লায়লা ও মজনুন এবং শিরীন ও ফরহাদের প্রেমের কাহিনী নিয়ে কাব্যরচনা মধ্যযুগের মুসলমানদের সৃষ্টি। এসব রচনায় ফারসি কাব্যের প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে। - আদম উদ্দিন, এ কিউ এম., পুঁথি সাহিত্যের ইতিহাস, *মাসিক মোহাম্মদী*, ঢাকা, ১৮ বর্ষ ৭ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৫২, পৃ. ২৭০।

৩৭. *মনোহর মধুমালতী*: গবেষক মমতাজুর রহমান তরফদার 'মধুমালতির কাহিনী' বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি হিন্দি ও ফারসির কাহিনীগুলো সম্পর্কে একটি ধারণা তুলে ধরে ফারসির প্রভাবের কথা স্বীকার করেন। – তরফদার, মমতাজুর রহমান, মধুমালতীর কাহিনী, *সাহিত্য পত্রিকা*, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ষা ১৩৭০। এ ছাড়া দেখুন–সরকার, জগদীশ নারায়ণ, মুগল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১ (৩য় খন্ড)*, সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদক), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৯৫।

৩৮. নোমানি, শিবলি, *শে'রুল আযম (হিস্‌সেয়ে আওয়াল)*, নজীর আহমদ তাজ ডিপু, লাহুর, ১৩৭০ হি., পৃ. ২১; সাবযওয়ারি, রেজা মোস্তাফোতি, সাহমে কালিলে ওয়া দিমনা দার এন্তেকালে ফারহাঙ্গ ওয়া তামাদ্দুনে হিন্দ ওয়া ইরান বা জাহান, *দানিশ*, পাকিস্তান, সংখ্যা ১০১ তাবিস্তান, ১৩৮৯, পৃ. ১৭১।

৩৯. কেরাগাযলো, আলি রেযা যাকাওতি, *কিস্‌সেহায়ে আমেয়ানে ইরানি*, এন্তেশারাতে সুখান, তেহরান, ১৩২২, পৃ. ৩৭।

৪০. কেরাগাযলো, আলি রেযা যাকাওতি, *কিস্‌সেহায়ে আমেয়ানে ইরানি*, পৃ. ৩৮।

৪১. পাখি বিষয়ক কাহিনীটি শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তারের *মানতিকুত তায়ের* কাব্যগ্রন্থে রয়েছে। এ কাহিনীটির উৎস হল *আবেস্তা* গ্রন্থ। এটি একটি মৌলিক রচনা।

৪২. হক, মুহম্মদ এনামুল, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ১৭৮।

Dhaka University Institutional Repository


৪৩. উদ্ধৃত, সাহিত্য বিশারদ, মুনশি আবদুর করিম সংকলিত, *পুথি-পরিচিতি*, (আহমদ শরীফ সম্পাদিত) বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮, পৃ. ২২৬।

৪৪. উদ্ধৃত, সাহিত্য বিশারদ, আবদুল করিম সংকলিত, *পুথি-পরিচিতি*, পৃ. ৪৮৭; এ নামে ফারসি গদ্য রচনা রয়েছে। ফয়জুল্লাহ রচিত ফারসি গ্রন্থের নাম *রাহাতুল কুলুব*। গ্রন্থটিতে গদ্যাকারে ধর্মীয় মাসআলাহ বিষয়ে বর্ণনা দেয়া হয়। পদ্য রচনাটি পাওয়া যায় নি।

৪৫. শরীফ, আহমদ ( সম্পাদিত), রসুল বিজয় জয়েন উদ্দীন বিরচিত, *সাহিত্য পত্রিকা*, ঢাকা, সপ্তম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা ১৩৭০, পৃ. ১৫৪।

৪৬. শরীফ, আহমদ (সম্পাদিত), রোসাঙ্গ-কবি আবদুল করিম খোন্দকার বিরচিত হাজার মসায়েল ও নুরনামা, *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, ঢাকা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৪০৪, পৃ. ৮।

৪৭. শরীফ, আহমদ সম্পাদিত, রোসাঙ্গ-কবি আবদুল করিম খোন্দকার বিরচিত হাজার মসায়েল ও নুরনামা, *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, পৃ. ৪৮।

৪৮. খানম, মাহমুদা, *মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে হিন্দী সুফী কাব্যের প্রভাব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৩৯।

৪৯. খানম, মাহমুদা, *মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে হিন্দী সুফী কাব্যের প্রভাব*, পৃ. ১৩৯।

## সহায়ক গ্রন্থাবলি


| | | |
|---|---|---|
| ১. মুহম্মদ এনামুল হক | : | মুসলিম বাংলা সাহিত্য |
| ২. লুৎফর রহমান | : | বাংলা সাহিত্যে নন্দন ভাবনা প্রাচীন ও মধ্যযুগ |
| ৩. সিরুস শামীসা | : | আনওয়ায়ে আদাবি |
| ৪. হুজ্জাত আব্বাসি, ও হোসাইন আলি, কুব্বাদি | : | আয়নেহায়ে কেয়হানি |
| ৫. সিরুস শামীসা | : | আনওয়ায়ে আদাবি |
| ৬. সেলিম নেসারি | : | তারিখে আদাবিয়াতে ইরান ( জেলদে আওয়াল) |
| ৭. আলি রেযা যাকাওতি কেরাগাযলো | : | কিসসেহায়ে আমেয়ানে ইরানি |
| ৮. আহমদ তাফাজ্জলি | : | তারিখে আদাবিয়াতে ইরান পিশ আয ইসলাম |

Dhaka University Institutional Repository

# একাদশ অধ্যায়: ফারসি কাব্য ধারায় মধ্যযুগের সাহিত্যচর্চা

মধ্যযুগে মুসলমানরা বাংলা সাহিত্যে নতুনত্ব এনে দিয়েছেন। এটি বাংলা সাহিত্যে এক অবিস্মরণীয় ও সাফল্যময় একটি দিক। হিন্দুরা যেমন *রামায়ণ* রচনা করে খ্যাতি লাভ করেছেন ঠিক তেমনি মুসলমানরা *জঙ্গনামা* তদ্রুপ রচনা লিখে সুখ্যাতি পেয়েছেন। হিন্দুদের *মহাভারত* –এর ন্যায় মুসলমান লেখকরা *কাসাসুল আম্বিয়া* রচনা করেছেন। এসব রচনা মধ্যযুগের মুসলমানদের সৃষ্টি। সেসময় ফারসি ভাষা ছিল রাজ দরবার, সাহিত্য সংস্কৃতি ও ভাব বিনিময়ের ভাষা। বাঙালি মুসলমানরা সে ভাষা রপ্ত করে বাংলা তাষায় নতুন ভাব ও নতুন সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন।[১] এ সময় মুসলমানদের মাঝে একটি পরিবর্তন ছিল।

## ১. দার্শনিক পরিবর্তন

মধ্যযুগে মুসলমান লেখকদের মাঝে যে পরিবর্তন ফুটে ওঠেছে– এর মূলে হলো ইসলাম ধর্মের চর্চা। ইসলাম ধর্ম একটি শক্তি। শক্তিটি জীবনের বিভিন্ন দিক পরিবর্তনের অন্যতম উৎস। যে কারণে মুসলমান লেখকেরা ইসলামের বিষয়গুলো বিভিন্নরূপে প্রকাশ করতে তৎপর হয়ে ওঠেন। এ শক্তিটি দ্রুত বিকাশে এদেশের হিন্দু সংস্কৃতির উপর প্রভাব রেখে ছিল। হিন্দুরাও এ শক্তির প্রভাবে ইসলামভিত্তিক রচনা তৈরি করতে সক্ষম হন। তখন তাঁদের মাঝেও চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবে এসে যায়। এটি তাঁদের নতুনভাবে সাহিত্য রচনায় বড় ভূমিকা রাখে।

### দোভাষী পুথি সাহিত্য সৃষ্টি

আঠার শতকে বাংলা সাহিত্যে নতুনত্ব সৃষ্টিতে একটি নামকরণ হয়। এটি হল–দোভাষী সাহিত্য, পুথি সাহিত্য বা মুসলমানি বাংলা সাহিত্য। এই সাহিত্য নিয়ে অনেকের কৌতুহল ছিল। তবুও এটি মধ্যযুগে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। চর্তুদশ শতকে এ সাহিত্যের উদ্ভব হলেও পুষ্টি সাধনের ক্ষেত্রে অনেক সময় অতিক্রম করতে হয়।[২] ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের সাথে পুথি সাহিত্যের কোনো মিল নেই।

Dhaka University Institutional Repository

তবে বাংলায় মুসলিম শাসনের সময় ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ঘটেছিল। সেই উন্নতি ও প্রসারকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে এই সাহিত্য। এ প্রসঙ্গে ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র একটি উক্তি উপস্থাপন যুক্তিসঙ্গত মনে করছি। তিনি বলেন

> এই পুঁথি সাহিত্যকে ঘৃণা করিলে চলিবে না। ইহাই বাঙ্গালী মুসলমানের খাঁটি সাহিত্য। সেই সময়ের কথিত ভাষায় পুঁথিগুলি রচিত হইয়াছিল। তখন পারসী রাজ-ভাষা। মুসলমানেরা বাংলা দেশে নতুন ভাব ও নতুন জিনিষ আনিয়াছিলেন। এই নতুন ভাব ও নতুন জিনিষের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পারসী নাম বাংলা ভাষায় ঢুকিয়া পড়িল। রাজ ভাষার প্রভাব কথিত ভাষার উপর হওয়া স্বাভাবিক। এখন যেমন বাঙ্গালী চলিত ভাষায় ইংরাজির বুকনি ঝড়েন, তখন ঝড়িতেন পারসীর বুকনি। মুসলমান সেই পারসীর 'আমেজ' দেওয়া কথিত ভাষাতেই পুঁথি লিখিতেন।[৩]

তাঁর এই মন্তব্যে ফারসি কাব্য সাহিত্যের প্রভাবের বিষয়টি প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্ত হয়েছে। এটির সৃষ্টির পিছনে মুসলমানদের এত সুন্দর ও উত্তম চিন্তা-ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না। তিনি মূলত কবিদের মধ্যে একটি পরিবর্তনের কথা বলে গিয়েছেন। তখনকার সময়ে মুসলমান কবিরা যে পরিবর্তনশীল সাহিত্য রচনা করে গিয়েছেন তা কোনোভাবেই পরিত্যাজ্য বিষয় নয়। কেননা, এই সাহিত্যের উদ্ভাবক মুসলমান কবি ও লেখকগণ। তাঁরা মূলত ফারসিকেন্দ্রিক বাংলা গ্রন্থগুলোর নতুন ধারা সংযোজন করেছেন। সেখানে রস ও স্বাদ ভিন্ন মাত্রায় দেয়া হয়। বাংলা সাহিত্যে *ইউসুফ জোলেখা*, *মধুমালতী* ও *জঙ্গনামা* কাব্য –এর উৎকৃষ্টতম প্রমাণ।[৪] সেসময় মুসলমানরা অসংখ্য পুথিসাহিত্য রচনা করেছিলেন। বর্তমানে দু চারটি প্রসিদ্ধ রচনা ছাড়া বাকিগুলোর আলোচনা বাংলা সাহিত্যে হয়না বললেই চলে। এটি সত্য যে, পুথি সাহিত্য যদিও বর্তমানে সম্মান জনক অবস্থানে নেই। এদেশে ইংরেজি শাসন ব্যবস্থা চালু না হলে হয়ত এটিই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হিসেবে স্বীকৃতি পেত। এ সাহিত্য বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে আরবি ও ফারসি ভাষা ব্যবহারের একটি দৃষ্টান্ত। সে আরবি-ফারসি মিশ্রিত ভাষা বাঙালি মুসলিম কবির মন মানসিকতার উপর গভীরভাবে ছাপ ফেলেছে।[৫] ফলে আঠার শতকে এই মিশ্র ভাষার নতুন এক কাব্যরীতির উদ্ভব ঘটে। যে রীতিতে শুধু মুসলমানরা কাব্য রচনা করেছেন তা নয়, বরং হিন্দুদের মধ্যেও এ ধারার রচনা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ভারত চন্দ্র রায় (১৭১২ খ্রি.-১৭৬০ খ্রি.), রাম প্রসাদ সেন (১৭২০ খ্রি.-১৭৮১ খ্রি.) ও ঘনরাম চক্রবর্তী অন্যতম। নিম্নে *জঙ্গনামা* থেকে কবিতার উদ্ধৃতি দেয়া হল:

আল্লা আল্লা বলো ভাই যতেক মোমিন।
বড়ই মাকুল দেখ মোহাম্মদী দীন ॥
করিল মাবিয়া বাদশাহ বড়ই আজারে।
এজিদায় ডাকিয়া লাগিল কহিবারে ॥

Dhaka University Institutional Repository

নবীর আওলাদ মদীনায় আছে যত ।

হুকুম মানিয়া যে থাকিবে অবিরত ॥[৬]

উল্লিখিত কবিতায় আরবি ফারসি তথা মিশ্র ভাষার প্রয়োগ রয়েছে। তখন সমাজে যে ভাষা ব্যবহৃত হত সে ভাষাই হয়েছে পুথি সাহিত্যের ভাষা। এটা সত্য যে, যুগের প্রভাব মুসলিম কবিদের মাঝে বিদ্যমান ছিল। সে থেকেই কতক মুসলিম কবিদের মাঝে দোভাষী পুথি রচনার ভাসনা জাগে। বিশেষত এ পুথি সাহিত্যের মাধ্যমে আঠার শতকে বাঙালি মুসলমান ভিন্ন একটি বিষয়ের সাথে নিবিড়ভাবে পরিচয়ের সুযোগ পেয়েছেন।

## সুন্দর ও সাবলীল ভাষার প্রয়োগ

ইসলাম মানুষকে সুন্দরভাবে চলার শিক্ষা দেয়। মুসলমানদের কর্তব্য হল, সে ধর্মের নিয়ম-নীতি মেনে চলা ও কথাগুলো অন্যের নিকট প্রচার করা। মধ্যযুগে সাহিত্য রচনার মাধ্যমে ইসলামের গুণগান ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ মুসলমান লেখকদের একটি দায়িত্ব ছিল। এ দায়িত্ব পালনে অনেক বাঙালি মুসলমান লেখক যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তাঁরা কাব্যের মধ্যে কর্কশ ও অস্পষ্ট শব্দ পরিত্যাগ করে সাবলীল সহজ ও সুন্দর ভাষার প্রয়োগ করেছেন। সাহিত্যকে উন্নত করে তুলার জন্য সহজ সরল শব্দের ব্যবহার গুণগত মানের সাহিত্যিক হওয়ার একটি লক্ষণ।[৭] হিন্দুদের রচনায় অধিকতর সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার ছিল। যাকে ‘হিন্দুয়ানি রীতি’ বলে অভিহিত করা হয়। মুসলিম আমলে ভাষা-সংস্কৃতির ব্যতিক্রম ঘটলে বাংলা ভাষায় অত্যধিক আরবি ফারসি শব্দের ব্যবহার ঘটেছে। এটি বাংলা সাহিত্যে ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে ‘মুসলিম রীতি’ হিসেবে নতুন নামকরণ হয়। এ সময় আরবি ফারসি শব্দগুলো নিজের অবস্থানকে শক্তিশালী করে নেয়। এসব শব্দ পরিত্যাগ করে মুসলমান লেখক সাহিত্য রচনা করেননি। কেননা দোয়াত, কলম, কাগজ, জামা ইত্যাদি শব্দ পরিত্যাগ করা হলে সে স্থানে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করতে হত। আরবি-ফারসি শব্দ পরিত্যাগ করে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার যা ভাষার ক্ষেত্রে সৌন্দর্য বয়ে আনেনা বরং তা প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলে। এ রীতিটি মধ্যযুগের মুসলিম কবিদের রচনায় পরিস্ফুট হয়ে আছে। তাঁরা কর্কশ ও অপরিচিত শব্দ পরিত্যাগ করে প্রচলিত মুসলিম রীতিসিদ্ধ শব্দ ব্যবহার করেছেন। সে ধারায় বাঙালি মুসলমানদের মাঝে বহু কাব্যরচনা হয়েছে।[৮] নিম্নে কবি আবদুল করিম বিরচিত *নুরনামা* থেকে একটি উদাহরণ দেয়া হল:

সোলেমানের অঙ্কুরী হইলেক যবে

হারাইয়া সমুদ্রেত পুনি পাইল তবে ।

আল্লার হুকুমে মৎস গিলিলেক জানি

Dhaka University Institutional Repository

ফিরি প্রভু যার ধন তারে দিল আনি।

হাউজ কওসর হৈল ইসামুসা নবী

পয়গাম্বরী পায় সবে বহু পুণ্য ভাবি।[৯]

কবির সুন্দর ভাষার ব্যবহার ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে এটি ছিল একটি ভিন্ন পদক্ষেপ। মুসলমানদের রচনায় এরূপ ব্যবহার হওয়া বাঞ্ছনীয়। এটি কাব্যসাহিত্য রচনায় ভাষা ও সংস্কৃতির পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। তবে পরিবর্তনের দিকটি মুসলিম কবিদের মধ্যে বহু দিন ধরেই বিদ্যমান ছিল। কার্যত তাঁদের হিন্দু সভ্যতার গণ্ডি থেকে বের হতে অনেক সময় লেগেছে।

## সুফি ভাবধারার বিকাশ

সুফিরা এদেশে এসেছিলেন শুধু ধর্ম প্রচারের জন্যে নয়। ইসলাম ধর্মকে বাস্তবে রূপদানের দায়িত্ব ছিল তাঁদের উপর। ফলে এদেশের মানুষ তাঁদের সাধনার বিষয়গুলো যথাভাবে অবলোকন করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে যে সুফি প্রভাব পড়তে শুরু করেছে এটিও ছিল এর অন্যতম কারণ। বাঙালি কবিদের মাঝে সুফি সাধনা ছিল প্রবল। যে কারণে তাঁদের রচনার মাঝে সুফি কাহিনী ও সুফি বক্তব্য ফুটে ওঠেছে। বিশেষত সুফিশ্রেণির সাহিত্যে, মুর্শিদি ও বাউল গানে কবিরা সুফি ভাবধারা বিকশিত করতে দ্রুতই সক্ষম হন।[১০] এর ফলে সমাজে সুফিবাদ তার উদার চিন্তা ও মানবতার মাধ্যমে একটি জায়গা করে নিতে পেরেছে। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি ও বিখ্যাত কবি চণ্ডিদাস এই সুফি ভাবধারার মাধ্যমে মাওলানা রুমি, শেখ সাদি ও হাফিজ শিরাজিকে জানতে আগ্রহী হয়েছিলেন।[১১] বাংলা সাহিত্যের মধ্যে সুফি ভাবধারা জাগিয়ে তোলা বাঙালিদের চিন্তা-চেতনা উর্বরতার অন্যতম দিক। সুফিবাদ বিষয়ক গবেষকগণ এ বিষয়ে একমত যে, শুধু মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে চণ্ডিদাস নয় পদাবলি সাহিত্যেও পারস্যের সুফি-সাধকদের ভাব ও রসের উপস্থিতি রয়েছে।[১২] আমরা সে কারণেই মধ্যযুগের কবিদের মধ্যে সুফিতত্ত্ব বিষয়ক কাব্যরচনা পাই। গবেষক আহমদ শরীফের মতে, মধ্যযুগে বিশটির অধিক সুফিশাস্ত্রমূলক কাব্যগ্রন্থ রয়েছে। গ্রন্থগুলো হল: *গোরক্ষবিজয়*, *যোগকলন্দর*, *জ্ঞানপ্রদীপ*, *জ্ঞানচৌতিশা*, *নুরজামাল*, *নুরনামা*, *তালিবনামা*, *সির্নামা*, *চারিমোকামভেদ*, *সিহাবুদ্দীন পীরনামা*, ও *আদ্যপরিচয়*... ইত্যাদি। এ গ্রন্থগুলো সুফিভাবধারার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত।[১৩] এ ছাড়া বহু বাঙালি মুসলমান কবি সুফিদের আলোচনা তাঁদের কবিতায় স্থান করে দিয়েছেন। যা সুফি ভাবধারা বিকাশের সহায়ক।

Dhaka University Institutional Repository

## আদর্শ কাহিনীর অবতারণা

মধ্যযুগে মুসলমান কবিগণ ইসলাম ধর্মের কাহিনীকে প্রধান বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। বলতে গেলে, তাঁরা মধ্যযুগের পুরো সময়কালে সে পরিচয় দিয়েছেন। কাব্যের বিষয়বস্তু নির্বাচন করা কাব্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। তখন 'হিন্দুয়ানি রীতি'র প্রচলন থাকায় হিন্দুশাস্ত্রীয় রচনার প্রভাব ছিল। মুসলমান লেখকরা তা বর্জন করে ইসলাম ধর্মের সত্য ও সুন্দর কাহিনীগুলোর রূপ দান করেছেন।[১৪] এটি মুসলমান লেখকদের মনের ও চিন্তা-চেতনার একটি উন্নত সাধনার ফল। নবি করীম (সা.) এর জন্ম ও যুদ্ধ ঘটনা, সাহাবিদের আচার-আচরণ, উপদেশ, ইত্যাদি বিষয় সরাসরি ইসলাম ধর্মের গুণ ও মহিমার সাথে সম্পৃক্ত। মুসলমানদের বাংলা কাব্যে এ বিষয়গুলো স্থান করে নেওয়ায় তাঁদের দর্শনগত ভাবের সাফল্য প্রকাশ পেয়েছে বলা যায়। এর ফলে তৈরি হয়েছে *রসুল বিজয়*, *জঙ্গনামা*, *নবীবংশ*, *মক্তুল হোসেন* কাব্যগ্রন্থের ন্যায় অসংখ্য বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ। তখন এসব গ্রন্থ মুসলমানদের উপজীব্য বিষয় ছিল। এর কাহিনীগুলো ইসলাম ধর্মকে কেন্দ্র করে গঠিত হয়।

## ২. সাংস্কৃতিক পরিবর্তন

বঙ্গে তুর্কি শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এ দেশের জনগণের মধ্যে আমূল পরিবর্তন দেখা দেয়। এ পরিবর্তন শুধু ধর্মীয় জীবনে ঘটেনি গোটা সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে, এ দেশের মানুষ অন্য মুসলিম দেশের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নতি লাভ করে। তাঁরা যেমন ভারত বা পাকিস্তানে যেতে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হয়নি তেমনি বিভিন্ন দেশ থেকে মুসলমানরা এখানে এসে বসতি গড়ে তুলতেও আপত্তি করেনি। যার ফলে ব্যাপকভাবে সুফি, ফকির ও ইসলাম প্রচারকগণ এদেশে এসেছেন এবং বসবাস করেছেন।[১৫] ফলে মুসলিম লেখকদের মাঝে সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে পৃথক একটি চেতনা উজ্জীবিত হয়েছিল। এটি ইসলামি সংস্কৃতির প্রভাবেই বাঙালির মন-মানসিকতায় নতুন ধারায় জীবন-যাপনের চিন্তা চেতনা প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। এটি তাঁদের সম্মুখের দিকে চলার পথকে সুগম করে তোলে। ইসলাম ধর্মের মাধ্যমে তুর্কি, ইরানি ও অন্যান্য মুসলমানদের সান্নিধ্যে এসে এ অঞ্চলের মানুষ নতুন আলো দেখতে পেয়েছে তা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই।[১৬]

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের বিষয়বস্তু প্রাচীন যুগের ন্যায় ছিলনা। প্রাচীন যুগে বৌদ্ধধর্মীয় সাধন মন্ত্রাদি, হিন্দু ধর্মীয় দেবদেবি প্রসঙ্গ বেশি আলোচিত হয়েছে। মধ্যযুগে মুসলমান কবিরা সে ধারার পরিবর্তন ঘটিয়ে ব্যতিক্রমী ধারা সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা এসময় মানবীয়, ধর্মীয় ও প্রেম বিষয়ের কবিতা রচনায় তৎপর হয়ে ওঠেন। যেসব কবিতা প্রেমের সে কবিতাগুলাতেও মানবিক বিষয়ের উপস্থিতি রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository


বস্তুত একটি পরিবর্তন তাঁদের কবিতায় লক্ষ করা যায়।[১৭] ইসলাম ধর্ম ও ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলো ছিল তাঁদের কবিতার অন্যতম বিষয়। এ অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচার পেয়েছিল বিভিন্ন মাধ্যমে। সুফিরা যেমন ধর্ম প্রচার করতেন ওয়াজ নসিহতের মাধ্যমে তেমনি মুসলিম কবি ও সাহিত্যিকরা তাঁদের লেখায় তা প্রকাশ করতেন। এ সময় কবিরা আরবি ও ফারসি ভাষার বিভিন্ন প্রকার পুস্তিকাদির উপস্থিতি অনুভব করেছিলেন। যে কারণে তাঁরা বাংলা ভাষায় ইসলামের বাণী প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে আরবি ফারসি রচনাদির সহযোগিতা নেন। ইতিহাস বর্ণনার ন্যায় তাঁদের কবিতায় ইসলাম ধর্মের বর্ণনা রয়েছে। তাঁদের সেসব কবিতাগুলো ধর্ম সাহিত্য, সুফি সাহিত্য বা জীবনী সাহিত্য হিসেবে পরিচিত।

## ধর্ম সাহিত্য

ধর্ম–সামগ্রিক জীবনের একটি পথ। সেই ধর্মের সাথে সাহিত্যের একটি সম্পর্ক থাকাটাই স্বাভাবিক। যে কারণে ধর্মের প্রভাব প্রত্যেক যুগের সাহিত্যিকদের মাঝে রেখাপাত করতে দেখা যায়। সৃষ্টি ও স্রষ্টার তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত ইসলাম ধর্ম। আল্লাহর সঙ্গে মানুষের যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে ইসলাম সে বিষয়টি নিহিত করে দিয়েছে। একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশই মানুষের কর্তব্য। আল্লাহর হুকুম মেনে চলা ও না চলার উপর রয়েছে শান্তি ও শাস্তি। কবিদের ভিতর যে আবেগ ও উচ্ছ্বাস ছিল তাই মুলত তাঁদের রচনায় প্রকাশ পেয়েছে। ইসলাম ধর্মের যুদ্ধ সংক্রান্ত রচনাগুলোতে ধর্মের মূল বক্তব্যকে সম্মুখে রেখে কাহিনীকাব্যের আশ্রয় নেয়া হয়।[১৮] ধর্মকে উজ্জীবিত করে তোলার জন্যই তাঁদের এ প্রচেষ্টা। সেই ইসলাম ধর্ম প্রচার ও প্রসার করাও ছিল মুসলমান লেখকদের একটি ঈমানি দায়িত্ব। মুসলমান কবিগণ ধর্মকে উজ্জীবিত করতে গিয়ে কাব্যসাহিত্যে ধর্মের কথা ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হন– এটি তাঁদের বড় কৃতিত্ব। যেমন– কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ্ব ও যাকাত ইত্যাদি ইসলামের মূল ভিত্তি। ওয়াজিব, সুন্নাত, পরকাল, বেহেশত, দোযখ, উপদেশ, নসিহত, সৌভাগ্য ও হালাল-হারাম– বিষয়গুলো ইসলাম ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত। উল্লিখিত বিষয়গুলো কবিরা তাঁদের রচনায় নানাভাবে ব্যক্ত করেছেন। যেমন– কবি আলাওল ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দে *তোহফা* রচনা করে ইসলামের সুমহান বার্তা প্রচার করেছেন। ১৭৩৫ খ্রিস্টাব্দে কবি হায়াত মাহমুদ *হিতজ্ঞানী* রচনা করে সে দায়িত্ব পালন করেন। একইভাবে আবদুল করিম খোন্দকার *হাজার মসলা* তদ্রুপ শেখ পরাণ *নসীয়ৎনামা* লিখে ইসলামের মর্মবাণী প্রচার করতে সক্ষম হন। এরূপ অসংখ্য বাঙালি কবি ইসলাম ধর্মের মৌলিক বিষয় নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন। ধর্মীয় ও তত্ত্বমূলক সাহিত্যের ধারায় মধ্যযুগের অনেক কবি কাব্যরচনায় উৎসাহী ছিলেন। তা না হলে ধর্মমূলক এত বেশি কাব্যরচনা বিকশিত হতনা। যেমন– *কেয়ামতনামা*,

Dhaka University Institutional Repository

*নছিয়তনামা*, *নামাজ মহাত্ম্য*, *হাজার মসলা*– এসব মধ্যযুগের কাব্যরচনা। এ রচনাগুলো সরাসরি ইসলাম ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। এ রচনাগুলো ফারসি ভাষায় রচিত ধর্মীয় গল্প ও কাব্যকাহিনীর সার সংগ্রহ।

সংস্কৃত ভাষায় ধর্মকে কেন্দ্র করে নানা রকম গ্রন্থ রচনা হয়েছে। যেমন- *বেদ*, *উপনিষদ*, *পুরাণ*, *রামায়ণ* ও *মহাভারত* প্রভৃতি। তাতে হিন্দু ধর্ম ও তাঁদের সংস্কৃতি সম্পৃক্ত ছিল। 'হিন্দুয়ানি সাহিত্য' সৃষ্টির পিছনে হিন্দুদের ভুমিকাই সবচেয়ে বেশি।[১৯] একইভাবে মধ্যযুগের মুসলমানদের সাহিত্যে ইসলাম ধর্ম প্রভাব রেখেছে। তাঁদের চিন্তা-চেতনায় ইসলাম ধর্ম উজ্জ্বল ও গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিল। কবিরাও এক একজন ইসলাম সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখতেন। বলা যায় যে, তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন ইসলাম বিশারদ ও ইসলামি জ্ঞানে আরবি ফারসি বিশেষজ্ঞ।[২০]

## সুফি সাহিত্য

বাঙালি মুসলমান কবিগণ তাঁদের মুসলিম সংস্কৃতির পরিচয় দিতে গিয়ে আধ্যাত্মিকতার কথা ভুলে যান নি। এ দেশে ইসলাম প্রচারে সুফিদের ভূমিকা রয়েছে অনেক। কবিরা যেভাবে ইসলাম ধর্মকে সমুন্নত রাখতে গিয়ে তাঁদের রচনায় সুফিভাবধারা জাগ্রত করে রেখেছেন। তাতে তাদের নিজস্ব সত্ত্বা ও জাতীয়তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।[২১] এটা নিশ্চয় সত্য যে, সুফি সাহিত্যকে আলাদাভাবে দেখার কোনো সুযোগ নেই। বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার সুফিদের দ্বারায় সংগঠিত হয়েছে। সুফিবাদের জনপ্রিয়তা ও প্রভাব বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্যের প্রতীক। মুসলিম কবিরা সুফিবাদ থেকে প্রেরণা নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন। ফারসি ভাষার সুফিবাদমূলক কবিতার সঙ্গে তাঁদের যোগসূত্রতা ছিল অনেক। সে ভিত্তিতেই তাঁদের অনেক কবিতা রচনা হয়েছে।[২২] বাঙালি মুসলিম কবিদের মাধ্যমে সুফিবাদের আত্মপ্রকাশ ঘটানো কম গৌরবের কথা নয়। আমরা জানি সুফিবাদের মূলে রয়েছে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য। ফারসি ভাষার মাধ্যমে সুফিদের সুন্দর কথা ও তাঁদের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। যেমন –*মানতিকুত তায়ের* ও *মাসনবিয়ে মানুভি* কাব্যগ্রন্থ। সুফিদের তরিকা ও মতবাদগুলোও আধ্যাত্মিকতার সাথে সম্পৃক্ত। একইভাবে তাঁরা যে সুফি সাহিত্য সৃষ্টিতে অলি-আউলিয়াদের জীবন কাহিনী রচনা করেছেন– তা কম গৌরবের কথা নয়। বাঙালি কবিরা আধ্যাত্মিকতার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন বলে তাঁদের দ্বারায় সুফি সাহিত্য সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব কিছু ছিলনা। আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ একমাত্র সুফিদের সান্নিধ্যের মাধ্যমেই সম্ভব। এটি বাঙালি কবিরা অর্জন করেছিলেন। তাঁদের *জ্ঞান প্রদীপ*, *দাকায়েকুল হাকায়েক* ও *রাহাতুল কুলুব* রচনা অন্যতম প্রমাণ।

Dhaka University Institutional Repository


## জীবনী সাহিত্য

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নবি ও রসুল (সা.)–এর জীবনী নিয়ে কাব্যরচনা ছিল মুসলিম কবিদের একটি গৌরবোজ্জ্বল বিষয়। তাঁদের কাব্য-সাধনার প্রধান একটি দিক ছিল ধর্মীয় কাহিনী প্রকাশ। নবি, রসুল, সাহাবি ও মুসলিম বীরত্বমূলক ব্যক্তিদের নিয়ে কবিতা রচনা একটি সফল উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত দেয়। হিন্দুরা যেমন সংস্কৃত সাহিত্য থেকে হিন্দু ধর্মের প্রধান ব্যক্তিদের নিয়ে কাব্যরচনা প্রকাশ করতেন তেমনি মধ্য যুগের মুসলিম কবিরা ইসলাম ধর্মের মহিমা প্রকাশে ইসলামের মহান ব্যক্তিদের নির্বাচন করে কাব্যরচনায় মনোনিবেশ হয়ে ছিলেন।[২৩] যদিও তাঁদের জন্য নবি ও রসুলদের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলোর বর্ণনা দান বাংলা ভাষায় কষ্টকর ছিল। এটি সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের একটি বড় সাফল্যময় অধ্যায়ের বার্তা বহন করেছে। মধ্যযুগের মুসলিম কবিরা ইতিহাসের আলোকে শ্রেষ্ঠ মনীষীদের জীবনী নিয়ে আলোচনা করেছেন। অনেক কবিতায় কবিদের কল্পনাও মিশানো ছিল। কবি জৈনদ্দীনের *রসূল বিজয়* কাব্যগ্রন্থে ইসলামের কাহিনী চিত্রিত হয়েছে। গল্পটি যে কোনো পুস্তক থেকে চয়ন করা হউক না কেন কাহিনীর মূলে রয়েছে ইসলামের জয়গান প্রকাশ। গল্পটির মূল বৃত্তান্তের জন্য ফারসি সাহিত্যের নিকট তিনি ঋণী ছিলেন কী না সেটি মূল বিষয় নয়। *মুসার সওয়াল* কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে একই মন্তব্য করা যেতে পারে। কবি মুহাম্মদ নসরুল্লাহ আল্লাহ তায়ালার সাথে হজরত মুসার কথোপকথনের বিষয়টি কাব্যাকারে বর্ণনা করেছেন। কবির উদ্দেশ্য ছিল, ইসলামের আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য পূর্ববর্তী নবির গুণ ও মহিমা প্রকাশ করা। *জঙ্গনামা* রচনাটিও তদ্রুপ ইসলামের অগ্রযাত্রা প্রকাশের জন্য কবি নসরুল্লাহ খান রচনা করেছেন। শেখ চাঁদের *রসুল বিজয়* বা *রসুলনামা* কাব্যগ্রন্থটি রাসুল (সা.) এর জীবন কাহিনী নিয়ে আলোচিত হয়েছে। এসব কাব্য গ্রন্থে ইসলামের চিত্র ফুটে ওঠেছে বলা যায়।

কারবালার ও ধর্মযুদ্ধের কাহিনীগুলো ইতিহাসের আলোকে কাব্যাকারে বর্ণনা প্রদান করা হলেও প্রত্যেক কাহিনীতে জীবনী আলোচনা হয়েছে। হজরত ইমাম হাসান, ইমাম হোসেন, জয়নব, তাঁদের অলোচনা গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপন করা হয়। এসব কাব্যরচনা 'মাগাজি' এবং 'মর্সীয়া' নামেও পরিচিত। আবদুন নবি, বাহরাম খাঁ ও মহম্মদ খাঁর রচনাগুলো সাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় ছিল। তাঁদের কাব্যরচনা সাধরণ পাঠক সুর করে পাঠ করতেন। যা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে জারিগান রূপে প্রচলিত।[২৪]

Dhaka University Institutional Repository



## ৩. আদর্শগত পরিবর্তন

মধ্যযুগে মুসলিম সাহিত্যিকরা তাঁদের লেখার জগতে অশ্লিল শব্দ পরিহার করে সুন্দর ও সাবলিল ভাষায় লেখার প্রবণতা সৃষ্টি করেছেন। মুসলিম আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সাহিত্যে মুসলিম ধারার প্রয়োগ বাংলা সাহিত্যের একটি বড় বৈশিষ্ট্য। সাহিত্য জীবনদর্শন ও নৈতিকতার কথা বলে। যে সাহিত্যিক মানবগোষ্ঠীর কল্যাণে মনোনিবেশ করেছেন এবং উন্নত পথে চলার জন্য সাহিত্য রচনা করেছেন সে শুধুই সাহিত্যিক নন একজন মহৎ ব্যক্তিও বটে। মহৎ ও শ্রেষ্ঠ গুণাবলি সম্পন্ন ব্যক্তিরাই মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়। মধ্যযুগের মুসলিম কবিদের মাঝে সেই মহৎ গুণাবলি ফুটে ওঠেছে তাঁদের রচনায়। এ ক্ষেত্রে ফারসি কাব্যসাহিত্যের মুসলিম দর্শন ও সাহিত্যাবলি কতটুকু প্রভাব ফেলেছে সে দিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন মনে করছি। উল্লেখ্য যে, মধ্যযুগে মুসলিম জ্ঞানচর্চার বাহন ছিল ফারসি ভাষার রচনাদি। তখন ফারসি ভাষার গ্রন্থ ব্যতীত অন্য ভাষার গ্রন্থ এতটা প্রসিদ্ধ ছিলনা। তাঁরা একটি আদর্শকে সম্মুখে রেখে সাহিত্য রচনা করেছেন।

### আল্লাহ ও রসুল প্রশংসা

আল্লাহ সৃষ্টির সেরা ও সকল গুণের অধিকারী। তাঁকে প্রশংসা না করে কোনো প্রশংসাই যে হয়না মুসলিম কবিগণ তা জানতেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে আল্লাহ ও রসুল প্রশংসায় প্রতিটি গ্রন্থের শুরুতে পৃথকভাবে শিরোনাম রয়েছে।[২৫] মুসলমান কবিদের রসুল প্রশংসা ছিল বাংলা সাহিত্যে অন্যতম পরিবর্তিত বিষয়। বাংলা কাব্যে 'নাতে রসুল' বেশি করে উল্লেখ থাকার কারণ হলো মুসলমান কবিগণ নবি করিম (সা.)- এর প্রেমিক ছিলেন। কবিগণ শুরুতেই আল্লাহর প্রশংসার পর নবি করিম (সা.)- এর প্রশংসা করেছেন। মুসলমান কবিগণের মধ্যে এ বিশ্বাস ছিল যে, রচনার মধ্যে নবি ও রসুলের প্রশংসা করা মুসলমান হিসেবে একটি বড় দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বাংলা গ্রন্থে 'নাতে রসুল' বিভিন্ন শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন– *রসূল প্রশস্তি*, *রসূল বন্দনা* ও *রাসুল চরিত* ইত্যাদি গ্রন্থ। নিম্নে একটি নমুনা দেয়া হল:

<u>আল্লাহ ও রসূল বন্দনা</u>

প্রথম প্রণাম করোঁ পরবর্দিগার।<br>
যে আল্লা বকশিন্দা খোদা করিম ছত্তার ॥<br>
বিশ্বরূপী নিরঞ্জন নহি রূপ রেখ।<br>
ঘটে ঘটে সর্বত্র আছ এ পরতেক ॥<br>
করতার ব্রম্মরূপে ধরিছে সংসার।

Dhaka University Institutional Repository


ত্রিজগত নিলক্ষ্যে রাখিছে নিরাকার ॥ [২৬]

নাত

দরুদ অকে কহোঁ যেন মুক্তাবৃষ্টি।
পাপ সব খণ্ডিবেক যেন মেঘ বৃষ্টি ॥
আরশ কুরসী যথ ভুবন ছাপান।
যথ নবী ওলী সভানের পূজ্যমান ॥[২৭]

আল্লাহর প্রশংসা ছাড়াও পিতা ও মাতার প্রশংসা করা কবিদের একটি অন্যতম বিষয় ছিল। এটিও তাঁদের কাব্য রচনার ক্ষেত্রে একটি অভ্যাসে পরিণত হয়। নিম্নে কবিতার উদ্ধৃতি দেয়া হল:

পিতা মাতার প্রশংসা

পীর গুরু মাতা পিতা প্রণমিএ পাছে।
সায়ের পণ্ডিত যথ আদি অন্তে আছে ॥
সে সকল প্রণমিএ কৌটি কৌটি বার ।
হৃদ দিতে নিজ করিব পসার ॥[২৮]

## ফারসি গ্রন্থের নামকরণ

গ্রন্থ নামকরণ একটি পরিবর্তনযোগ্য বিষয়। বাংলা কাব্যের যেসব নাম রয়েছে– তা ফারসি ভাষার নামের সাথে সম্পৃক্ত। মধ্যযুগের অনেক বাংলা কাব্যগ্রন্থই ফারসি রচনার অনুকরণে করা হয়। অনেক কবি গ্রন্থটি ফারসি রচনার ন্যায় প্রসিদ্ধি পাওয়ার জন্যই হুবহু কাব্যনাম দিয়েছেন। মধ্যযুগে বাংলা গ্রন্থের মধ্যে যেরূপ নাম ব্যবহার করা হয়েছে তা সরাসরি ফারসির অনুকরণ বললেই চলে। এ কথা সত্য যে, বাঙালি মুসলমান লেখকগণ অবলীলায় তাঁদের গ্রন্থের মধ্যে ফারসি নাম ব্যবহার করেছেন। তাঁদের পুত্র কন্যার নাম যেভাবে রাখতেন ঠিক একই কায়দায় গ্রন্থের মধ্যেও তা ব্যবহার করা হয়।[২৯] এগুলো যে সাধারণের জ্ঞান ভাণ্ডারে পরিণত হয়েছে তা বলা যায়। মুসলমান কবিগণ কর্তব্য জ্ঞান মনে করেই ফারসি গ্রন্থের নাম ব্যবহার করেছেন। এটি তাঁদের দায়িত্ব জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছে কী না বিষয়টি তদ্রুপ নয়। যেমন– সৈয়দ মুহম্মদ আকবর আলীর *জেবুল মুলুক শামারোখ* রচনাটি একটি প্রণয় উপাখ্যানমূলক কাব্য। তিনি এটি ফারসি হতে উপাখ্যানের উপাদান সংগ্রহ করেছেন এবং ১৬ বছর বয়সে তিনি এটি রচনা করেন।[৩০] মধ্যযুগে অন্য ভাষার রচিত গ্রন্থ থেকে ভাব অবলম্বন ও অনুকরণের ফলে গ্রন্থ নামকরণের বিষয়টি অধিকভাবে বেড়ে যায়।

### আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার

মধ্যযুগ ও তৎপরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যে আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার একটি লক্ষ্যণীয় বিষয়। আরবি ফারসির ব্যবহারকে মুসলিম সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ হিসেবে দেখা হয়। মুসলিম যুগে হিন্দু কবিদের মধ্যেও আরবি-ফারসি শব্দে ব্যবহার হয়েছে। এটি ছিল মূলত সংস্কৃতির উন্নতি ও বিকাশের যুগ। বিশেষ করে মুঘল যুগের পূর্বে মুসলমান ও কিছু সংখ্যক হিন্দু লেখকের রচনায় আরবি ও ফারসি শব্দের প্রয়োগ ছিল।[৩১] মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার অনেকগুলো কারণ হতে পারে। তন্মধ্যে অন্যতম হল মৌলিকত্বের প্রতি যথেষ্ট সজাগ থাকা। কোনো কোনো হিন্দু লেখক তাঁদের ভাষায় যে আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন তাতে ভাষারই সৌন্দর্য বৃদ্ধি ঘটেছে। নিম্নে একটি কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হল:

তামাম ইয়ারে কহে নবী পয়গাম্বর।
পড়িবে কোরআন দেলে রাখিয়া খবর ॥
নামাজ পড়িবে আর রাখিবেক রোজা।
এই তিন চিজ দেখ এলাহির ভেজা ॥
দোজখ উপরে সাকো রাহা বড় দুর ।
এয়ছাই সাকোর ধার যেন তেজ ক্ষুর ॥[৩২]

এরূপ অধিকাংশ কাব্যে আরবি ফারসি শব্দগুলো একটি জায়গা করে আছে। সমাজে অধিক ব্যবহারের ফলে সাহিত্যেও সে স্থান করে নেয়। বাংলা ভাষায় ব্যবহারের ফলে কখনো এগুলোকে আরবি ফারসি শব্দ বলে মনে হয়না। বাংলা পুথি সাহিত্যের ভাষা আরবি-ফারসি শব্দ মিশ্রিত। এক দল সাহিত্যিকও পণ্ডিতি বাংলার বিপরীতে আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করতেন ।

### ধর্মীয় ভাব প্রকাশ

ধর্মের সঙ্গে সাহিত্যের একটি সম্পর্ক আছে। সাহিত্য যেখানে জীবনকে প্রকাশ করে থাকে আর ধর্ম যদি জীবনের অংশ হয় সেক্ষেত্রে ধর্ম একটি সাহিত্যের বড় অংশ হওয়া স্বাভাবিক। তবে মধ্যযুগে যে সাহিত্য শুধু ধর্মপ্রকাশের জন্যই রচিত হত একথা বলা উচিৎ হবেনা। কিছু রচনা ছিল যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ধর্মের গুণগান প্রকাশ ও প্রচার করা।[৩৩] বাংলা ভাষায় সে ধর্মের ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে মুসলিম কবিরা আল্লাহর প্রশংসা, নবি করীম (সা.) এর গুণ বর্ণনা, সৃষ্টির রহস্য বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়ে শুরুতে আলোকপাত করেছেন। তবে আরবি ও ফারসি ভাষার পুস্তিকাদির মাধ্যমে ইসলামের জয়গান যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে বাংলা ভাষায় ততটা নয়। এ দু'টি ভাষাকে মূলত ইসলামি ভাষা হিসেবে

আখ্যা দেয়া হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে আমরা বাংলা ভাষার মাধ্যমে ইসলাম প্রকাশের বিষয়টি মধ্যযুগের রচনায় দেখতে পাই। কবি সৈয়দ সুলতান, কবি নসরুল্লাহ খান ও কবি আবদুল হাকিম স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, যারা আরবি ও ফারসি ভাষা বুঝতে অক্ষম তাঁদের জন্য উচিৎ বাংলা ভাষার মাধ্যমে ইসলামকে ধারণ করা।[৩৪] স্পষ্টত তাঁরা বাংলা ভাষায় ইসলাম ধর্মকে বুঝার এবং উপলব্ধি করার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। সে সময় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নে তাঁদের এরূপ বক্তব্য যুক্তিসঙ্গত ছিল। শুধু আরবি ও ফারসি ভাষার মাধ্যমে ইসলাম ধর্মকে জানা যাবে সেটি একেবারেই ভুল ধারণা। ইসলাম ধর্মের মূল ভাব প্রকাশ করতে যে ধরনের বক্তব্য থাকা প্রয়োজন বাংলা কাব্যরচনায় সেরূপ প্রকাশ পেয়েছে। সৈয়দ সুলতানের *জ্ঞান প্রদীপ* এবং হাজী মুহম্মদের *নূরজামাল* অধিকতর দার্শনিকমূলক কাব্যরচনা। এ দু'টি রচনায় আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদ এবং দার্শনিক সমস্যাবলি নিয়ে আলোচনা করা হয়।[৩৫] কবি মুজম্মিলের *ছাহাৎনামা* এবং কবি মোতালিবের *কিফায়েতুল মোছল্লিন* বই দু'টি ইসলামি হিতকথা বলে পরিচিত। সৈয়দ নুরুদ্দিনের *দাকায়েকুল হাকায়েক*, মহম্মদ কাছিমের *সুলতান জমজমার পুঁথি*, আবদুল হাকিমের *নুরনামা* কাব্যরচনা ইসলামের জয়গান প্রচারে অগ্রগামী ভুমিকা রেখেছে। অনেকে ধর্মীয় ভাব প্রকাশে আরবি ও ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন। মুসলমানগণ বাংলা সাহিত্যে বিশুদ্ধ বাংলা ভাষা ব্যবহারের পাশাপাশি আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারকে দোষের হিসেবে দেখেননি। ধর্মীয় ভাব প্রকাশের জন্যই মুসলিম কবিরা এমনটি করতেন। মুসলিম সমাজে গৃহীত হওয়ার জন্য এরূপ ব্যবহার প্রয়োজন ছিল। নিম্নে দু'টি কাব্যগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হল:

১.

যেখানে মদিনাতু আইল পয়গাম্বর
স্বপ্ন দেখি কহিলেন্ত সভার গোচর ।
বুলিল স্বপ্নেত মক্কা দেশেত আছিলুঁ
আল্লার ঘরেতে গিয়া ঈদ গুজারিলুঁ ॥
কেহ কেহ জনে মুণ্ড মুড়াইল তথাত
কেহবা কাটিল চুল যাইতে সভাত ॥[৩৬]

২.

দান কর্ম শিখ, না মাগিঅ কার ঠাঁই।
যাচকতা মন্দ দিলে অধিক ভালাই ॥
কেতাবেত কহিছেন্ত তার উপাখ্যান ।

Dhaka University Institutional Repository



লইলে যে মন্দ, দিলে যেমত কল্যাণ ॥[৩৭]

উল্লিখিত কাব্যে ধর্মীয় অনুভূতি ও সহমর্মিতা প্রকাশ ঘটেছে। এ ছাড়া প্রাঞ্জল ভাষা ও সুন্দর বাক্য ব্যবহার তখনকার সময়ে কাব্য রচনাকে অধিকতর মধুর করে তুলত।

## বিচার বিশ্লেষণ

বাংলা পুথি সাহিত্য বলতে যা বুঝানো হয়ে থাকে এক দু'টো রচনা ব্যতীত সবই ফারসি ভাবধারায় রচিত হয়েছে।[৩৮] যেসব রচনা অনুবাদ সেসবের মধ্যে পুরো ফারসির প্রভাব বিদ্যমান। *কালু গাজী চম্পাপতির* ন্যায় যেসব রচনা মৌলিক হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে তাতেও ফারসি কাব্যের ভাব ধারা বিদ্যমান। তবে যে অনুভূতি ও চেতনা তাঁদের মাঝে বিরাজমান ছিল তা একদল পাঠকের চাহিদা পূরণ করার জন্যই কী না তা জানা যায়নি। আঠার শতকে *বাহারে দানেশ* ও *তুতীনামে* হিন্দু ও মুসলমান লেখক কর্তৃক রচিত হয়েছে। এ দুই শ্রেণি লেখকের রচনার মধ্যে ভাষার প্রভেদ ছিল অত্যধিক।[৩৯] মুসলমান লেখকরা একটি পরিবর্তন খোঁজে পেয়েছিলেন। তাঁরা তাঁদের মত করে বাংলা সাহিত্য রচনা করেন। এটি ছিল মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের বড় দান।

আলোচনা থেকে যে বিষয়টি পরিস্কারভাবে ফুটে ওঠেছে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের কবিরা কাব্যরচনার ক্ষেত্রে সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। যদি সে সময় তাঁরা মুসলিম ভাবধারা বিকশিত করার ক্ষেত্রে যথা অবদান না রাখতেন পরবর্তী সময়ে মুসলিম কাব্যসাধনার বিপর্যয় ঘটত। মধ্যযুগের সাহিত্যের ভাব, রস ও চেতনা আধুনিক কবিদের মধ্যে জাগ্রত করে তোলা তাঁদেরই বড় কৃতিত্ব।

### টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ, *ভাষা ও সাহিত্য*, প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৪৯, পৃ. ৬।

২. হাসানাত, আবুল, পুথি সাহিত্য, *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, ঢাকা, গ্রীষ্ম সংখ্যা, ১৩৭৫, পৃ. ৭৯; আদম উদ্দিন, এ কিউ এম., পুঁথি সাহিত্যের ইতিহাস, *মাসিক মোহাম্মদী*, ঢাকা, ১৮ বর্ষ ৭ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৫২, পৃ. ২৬৮।

৩. শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ, *ভাষা ও সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭;

৪. হাসানাত, আবুল, *পুথি সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২।

৫. শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ, *ভাষা ও সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭।

৬. জলিল, মুহম্মদ আবদুল, *শাহ গরীবুল্লাহ ও জঙ্গনামা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ১৪৯।

৭. শহীদুল্লাহ, ডক্টর মুহম্মদ, *ভাষা ও সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮।

৮. শহীদুল্লাহ, ডক্টর মুহম্মদ, তদেব, পৃ. ১৩।

৯. শরীফ, আহমদ সম্পাদিত, রোসাঙ্গ-কবি আবদুল করিম খোন্দকার বিরচিত হাজার মসায়েল ও নুরনামা, *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, ঢাকা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৪০৪, পৃ. ৫৯।

১০. ইউসুফ, মনির উদ্দিন, *বাংলা সাহিত্যে সূফী প্রভাব*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ২৫।

১১. ইউসুফ, মনির উদ্দিন, তদেব, পৃ. ২৯।

১২. ডলি, লাভলি আখতার, *বাংলাদেশে সূফীদর্শনের রূপরেখা*, সাফা পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১৮০।

১৩. শরীফ, আহমদ, *সাহিত্য তত্ত্ব ও বাঙলা সাহিত্য*, বিদ্যা প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ২৩৬।

১৪. মধ্যযুগে হিন্দু লেখকদের মাঝে এ প্রচলন ছিল যে, তাঁরা হিন্দু ধর্মের বাহিরে কাব্য রচনায় মনোনিবেশ করবেন না। তখন যেসব রচনা প্রকাশিত হয়েছে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃত গ্রন্থের কাহিনীকে অবলম্বন করেই রচিত হয়।

১৫. ইসলাম, আজহার, *মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৫।

১৬. শরীফ, আহমদ, *মধ্যযুগে বাঙলা সাহিত্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ১০৬।

১৭. ইসলাম, আজহার, *মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০।

১৮. সাকলায়েন, গোলাম, ফকীর গরীবুল্লাহ, *বাঙলা একাডেমী পত্রিকা*, ঢাকা, ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৬৮, পৃ. ৫-৮।

১৯. গঙ্গোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ, *মধ্যযুগের ধর্মভাবনা ও বাংলা সাহিত্য*, শ্যামা প্রেস, কলিকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ২।

২০. গঙ্গোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ, তদেব, পৃ. ১৬।

২১. ডলি, লাভলি আখতার, *বাংলাদেশে সূফীদর্শনের রূপরেখা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮।

২২. হালদার, গোপাল, *বাঙালী সংস্কৃতির রূপ*, অগ্রণী বুক ক্লাব, কলিকাতা, ১৯৪৭, পৃ. ৫১; আশরাফ, সৈয়দ আলী, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য, *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, ৬ষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯, পৃ. ৭০।

২৩. সাকলায়েন, গোলাম, ফকীর গরীবুল্লাহ, *বাঙলা একাডেমী পত্রিকা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫।

২৪. গঙ্গোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৫।

২৫. নাতে রসুল: রসুলকে নিয়ে প্রশংসা করার জন্য এক ধরণের গীতি কবিতা। ফারসি ও উর্দু ভাষায় নাতে রসুলের প্রচলন রয়েছে। ফারসি ভাষার কবিরা তাঁদের কবিতা শুরুর পুর্বে রসুলকে নিয়ে যে প্রশংসাসূচক কবিতা লিখেছেন তা মূলত নাতে রসুল। ফারসি কাব্যগ্রন্থের রীতিতে বাংলা কাব্যে রসুল প্রশংসা রয়েছে। এছাড়া মধ্যযুগের অনেক কাব্যরচনায় আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রশংসায় পৃথক শিরোনামে কবিতা দেয়া আছে। বাংলা সাহিত্যে ভক্তিমূলক, প্রশংসামূলক, প্রেমমূলক ও বৈষ্ণব পদাবলি গীতি কবিতার অন্তর্ভুক্ত।- আলম, মাহবুব, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৪৭১-৭২।

২৬. হক, মুহম্মদ এনামুল সম্পাদিত, *শাহ মুহম্মদ সগীর বিরচিত ইউসুফ-জোলেখা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ইউসুফ-জোলেখা- ১।

২৭. কোরায়শী, গোলাম সামদানী সম্পাদিত, *কবি আলাওল বিরচিত তোহফা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ. ২৬।

২৮. সুলতানা, রাজিয়া সম্পাদিত, *নওয়াজীসখান গুলে বকাওলী*, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭০, পৃ. ২।

২৯. শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩।

৩০. মুহম্মদ, কাজী দীন, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ৩৪৫।

৩১. বন্দোপাধ্যায়, শ্রী অসিতকুমার, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৭৩, পৃ. ৬৮৪; শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ, পুঁথি সাহিত্যের উৎপত্তি, *প্রাচীন-দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৪১১, পৃ. ৯।

৩২. জলিল, আবদুল, *শাহ গরীবুল্লাহ ও জঙ্গনামা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ১২৭।

৩৩. গঙ্গোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪।

৩৪. আশরাফ, সৈয়দ আলী, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য, *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, পৃ. ৬৯।

৩৫. আশরাফ, সৈয়দ আলী, তদেব, পৃ. ৭০।

৩৬. শরীফ, আহমদ সম্পাদিত, *নবী বংশ দ্বিতীয় খন্ড*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮, পৃ. ৪৩৩।

৩৭. কোরায়শি, গোলাম সামদানী সম্পাদিত, *কবি আলাওল বিরচিত তোহফা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০।

৩৮. আদম উদ্দিন, এ কিউ এম., পুঁথি সাহিত্য শাখার সভাপতির অবিভাষণ, *মাসিক মোহাম্মদী*, ঢাকা, ১৭ বর্ষ ১০ ও ১১ সংখ্যা-১৩৫১, পৃ. ৪৫৫।

৩৯. আদম উদ্দিন, এ কিউ এম., পুঁথি সাহিত্যের ইতিহাস, *মাসিক মোহাম্মদী*, ঢাকা, ১৮ বর্ষ ৭ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৫২, পৃ. ২৬৯।

## সহায়ক গ্রন্থাবলি

| | | |
|---|---|---|
| ১. ইকবাল এগমাঈ (সংকলক) | : | দাস্তানহায়ে আশেকানেয়ে আদাবিয়াতে ফারসি |
| ২. আবদুল জলিল | : | শাহ গরীবুল্লাহ ও জঙ্গনামা |
| ৩. আহমদ শরীফ সম্পাদিত | : | নবী বংশ দ্বিতীয় খন্ড |
| ৪. আহমদ শরীফ | : | সাহিত্যতত্ত্ব ও বাঙলা সাহিত্য |
| ৫. গোলাম সামদানী কোরায়শী সম্পাদিত | : | কবি আলাওল বিরচিত তোহফা |
| ৬. শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় | : | মধ্যযুগের ধর্মভাবনা ও বাংলা সাহিত্য |
| ৭. আজহার ইসলাম | : | মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি |
| ৮. মনির উদ্দিন ইউসুফ | : | বাংলা সাহিত্যে সূফী প্রভাব |
| ৯. শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় | : | মধ্যযুগের ধর্ম ভাবনা ও বাংলা সাহিত্য |

Dhaka University Institutional Repository

# উপসংহার

ফারসি কাব্যসাহিত্য একটি জাগতিক শক্তি। এ শক্তির যেমন মূল কাণ্ড রয়েছে তেমনি অজস্র শিকড়। এটির প্রভাব তার সহজাতদের উপর সংগঠিত হওয়া বোধ করি অন্যায় হয়নি। ভারতীয় উপমহাদেশের 'উর্দু, পশ্‌তু ও বেলুচি'[১] ভাষায় ফারসি কাব্যের প্রভাব রয়েছে। তেমনি বাংলা সাহিত্যে ফারসি কাব্যের প্রভাব খুবই স্বাভাবিক। এ সাহিত্য থেকে যেসব উপাদান বাঙালি মুসলমান কবিগণ নিয়েছেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ভাব, রস, কাহিনী, ধরন-পদ্ধতি, বিষয় প্রভৃতি।[২] মধ্যযুগে মুসলমান কবিগণ ফারসি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব দেখে আপ্লুত হয়েছিলেন। ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বঙ্গীয় অঞ্চলে ইসলাম ধর্মকে সুন্দর ও সহজভাবে তুলে ধরেছে। বাংলাভাষী অঞ্চলে ইসলামের প্রচারের সময় ফারসি ভাষাও প্রচারিত হয়। অপরদিকে ফারসি কাব্যসাহিত্যের বিকাশ ঘটেছে ইসলাম ধর্মকে কেন্দ্র করে। সে সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারের যুগটিও ছিল বাংলা সাহিত্যের প্রাণ সঞ্চারের যুগ। মধ্যযুগেই ফারসি সাহিত্য দ্বারায় বাংলা সাহিত্য নতুন প্রাণ পায়। বলতে দ্বিধা নেই যে, বাঙালি মুসলমান কবিদের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি ঘটেছে। বাঙালি কবিরা বাংলা ভাষায় ইসলাম ধর্মকে সবার নিকট তুলে ধরতে যথেষ্ট সজাগ ছিলেন।

ফারসি কাব্যসাহিত্যের বিস্তার ঘটার পিছনে অন্যতম ভূমিকা হল চর্চা ও পাঠক চাহিদা। বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে ফারসি কাব্যসাহিত্যের অগণিত পাঠক ছিলেন। তখন বাঙালি আরবি ফারসির জ্ঞান রাখতেন। এ জ্ঞান সবার মাঝেই বিশালভাবে ছিল। ধর্ম সম্পর্কে যারা সামান্য ধারণা রাখতেন তাঁরাও ফারসি ভাষার জ্ঞান থেকে আলাদা ছিলেননা। যে বাঙালি বাংলা ভাষায় পদ্য রচনা করেছেন সে শুধু বাংলা ভাষার কবি নন অবশ্যই সে একজন ভাষা বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাঁদের অনেকগুলো ভাষা জানা থাকার কারণেই বাংলা সাহিত্য সৌকমার্য পেয়েছে। বাংলাকাব্যে ফারসি কাব্যের স্থান করে দিতে বাঙালিদের ততটা কষ্ট করতে হয়নি। কেননা ভাষার জগতে একজন মুসলিম বাঙালি কবি আরবি, ফারসি ও সংস্কৃত ভাষার বিশেষজ্ঞ ছিলেন। বহু ভাষাবিদ হওয়া সম্ভব হয়েছিল বাংলা ব্যতীত অন্যান্য ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা থাকার কারণে। জোলায়খার প্রেমকাব্য বা লায়লির প্রেমকাব্য কতটা

***Dhaka University Institutional Repository***


জনপ্রিয় ছিল বাঙালিদের মাঝে তা বোধ করি বলার অপেক্ষা রাখেনা। নিশ্চয় এটি প্রাচীন ইরানেও অধিকতর জনপ্রিয় ছিল। তা না হলে ফারসি ভাষার একাধিক কবির রচনায় সে প্রেমকাহিনী মধুময় ও প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ পেতনা। বলা যেতে পারে যে, সুদূর পারস্য থেকে এ কাহিনী এসে আরো মধুময় করে তুলেছে বাঙালির হৃদয়। বাঙালিদের মাঝে কবি নিজামি, কবি জামি ও আমির খসরু কতটুকু প্রিয় ছিলেন তা গবেষণায় যথাভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় অবদান ছিল প্রেমধর্মী সাহিত্য সৃষ্টি। ধর্মীয় সাহিত্য সৃষ্টিতে তাঁদের অবদান অনেক রয়েছে তা আমরা স্বীকার করেছি। তাঁরা ফারসি কাব্যের উপাদানকে বাংলা ভাষায় উপযোগী করে সাহিত্য রচনা করেছেন। ফলে একদিকে বাংলা ভাষার প্রাণ ফিরে পায় অন্য দিকে ফারসি ভাষারও প্রসার ঘটে। বাঙালি কবিদের মাঝে *জঙ্গনামা* ও *আমীর হামজার* কাব্য রচনার রেখাপাত সৃষ্টি করেছে মূলত ফারসি ভাষার কাহিনী প্রচারের পর। তেমনি তাঁদের মন, দেহ ও আত্মাকে জাগ্রত করার পিছনে ফারসি ভাষাটি ছিল একটি বড় চালিকা শক্তি। এর মাধ্যমে বাঙালি কবিগণ সুন্দর ও পবিত্রতার দিকে মনোনিবেশ হন।[৩]

সে সময়ে বাংলা সাহিত্যের কবিরা যে কাজটি করে গিয়েছেন তা অপূরণীয় বটে। কেননা, তখন কাগজ কলমের অভাবের সাথে উৎসাহ ও উদ্দীপনার অভাব ছিল প্রচুর। তবু তাঁদের কাব্যসাধনা থেমে থাকেনি। তাঁদের সাহিত্য আমাদের চলার পথে ও জীবনের জন্য সাহস যোগিয়েছে বলা যায়। একের পর এক বাঙালি কবিরা যেভাবে শ্রম দিয়ে ধর্ম ও প্রেম কাহিনীমূলক কাব্যরচনা তৈরি করেছেন তা মোটেও সহজ ছিলনা। এ কথা সত্য যে, তাঁরা একটি বাস্তবতার সম্মুখে পড়েছিলেন। সবারই ধর্ম নিয়ে সাহিত্য রচনা করা ছিল একটি নৈতিক দায়িত্ব। কাব্য সাহিত্যে ধর্ম উপস্থিত থাকাটাই ছিল স্বাভাবিক। তখনি তাঁরা বুঝতে সক্ষম হয়েছেন যে, ফারসি কাব্যসাহিত্যও আমাদের প্রাণ এবং আমাদের প্রয়োজনের সাথী। সবচেয়ে বড় পাওয়া হল যে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে ঘিরে ঊনিশ ও বিশ শতকে শত শত বাঙালি কবি বাংলা সাহিত্যকে প্রাণ দিয়েছেন। সে প্রাণের ছোয়া নদীর ঢেউয়ের ন্যায় দূর থেকে দূরে এগিয়ে গিয়েছে।

মুসলমান আমলে ফারসি রাজভাষা হওয়ার সুবাদে বাঙালি জনসাধারণের মাঝে ফারসি ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাগুলো সহজেই প্রবেশ লাভ করতে সক্ষম হয়। ফারসি ভাষা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারসহ সাহিত্য সংস্কৃতিতে ব্যবহার হওয়া অতি সাধারণ হয়ে পড়ে। এমনকি এ ভাষাটি ধর্মীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে

Dhaka University Institutional Repository

এসে কবি সাহিত্যিকদের মাঝে অভূতপূর্ব রেখাপাত সৃষ্টি করেছিল। যার ফলশ্রুতিতে মুসলমান কবি ও সাহিত্যিকগণ ফারসি ভাষার মাধুর্যে অনুরূপ বাংলা ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হন।[৪] পরবর্তীতে এরই ধারাবাহিকতায় ধর্ম ও সুফি বিষয়ক সাহিত্য সৃষ্টিতে তাঁদের কোনো প্রকার কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়নি। ঊনিশ শতকে মুসলমানদের বাংলা সাহিত্যে অগ্রযাত্রা মধ্যযুগের মুসলমানদের বাংলা সাহিত্যে অবদানের ফল।

কবি আলাওল, দৌলত কাজি, সাবারিদ খাঁ, মহম্মদ খাঁ প্রভৃতি মুসলমান কবিরা ইসলাম ধর্মের আলোকে কবিতা রচনা করেছেন। তাঁরা ইসলাম ধর্মের মৌলিক বিষয়গুলো জেনে ভালভাবেই জীবন যাপন করতেন। তাঁরা প্রত্যেকেই এক একজন ইসলামের জ্ঞানের অধিকারী বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন– এতে সন্দেহ নেই। একই সাথে তাঁরা আরবি ফারসির বিশাল জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁদের মাঝে যে জ্ঞান-দক্ষতার পরিচয় মিলে আধুনিক যুগের কোনো কবির সাথে তুলনীয় নয়। মধ্যযুগের মুসলিম কবিগণ যেমন শিক্ষা ও জ্ঞান দক্ষতায় পরিপূর্ণ ছিলেন তেমনি ধর্ম কর্ম পালনেও ছিলেন একজন খাঁটি মুসলমান। তাঁরা বাংলা ভাষাপ্রেমিক না হলে বিশাল কাব্যগ্রন্থগুলো তখন তাঁদের মাধ্যমে জনসমাজে উপস্থিত হত না। সাহিত্য সৃষ্টির অপূর্ব জ্ঞান দক্ষতা তাঁদেরকে সব সময় উজ্জীবিত করে তুলেছিল। ধর্মের কঠোর নিয়ম নীতির মধ্যেও তাঁরা বাংলা ভাষায় অসংখ্য ধর্মীয় কাব্যগ্রন্থ উপহার দিয়েছিলেন।

সাহিত্যে মানবতাবোধ জাগিয়ে তোলা একজন সাহিত্যিকের বড় কর্তব্য। মধ্যযুগে বাঙালি মুসলমান লেখকেরা তাঁদের সাহিত্যে সে মানবতার কথা বলেছেন। তাঁরা রস সৃষ্টি করে মানব গুণের বিষয়গুলো কাব্যাকারে উপস্থাপন করেছেন।[৫] তবে বিষয়গুলো যে একেবারেই নতুন ছিল তা নয়। এসব বিষয় বহু আগ থেকেই ফারসি কাব্যসাহিত্যে বিদ্যমান রয়েছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তা নতুনভাবে নতুন ধারায় উপস্থাপন করা হয়।

*Dhaka University Institutional Repository*

## টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. উর্দু, পশতু ও বেলুচি: তিনটি পৃথক ভাষার নাম। ভাষাগুলো ইরানীয় ও ভারতীয় ভাষার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। ভাষাগুলো ইন্দো ইরানীয় শাখার অন্তর্ভুক্ত। -হক, মহাম্মদ দানীউল, ভাষাবিজ্ঞানের কথা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৩৫৬।

২. বামরি, রমজান, রাওয়াবেতে যাবান ওয়া আদাবিয়াতে বিলুচি বা ফারসি, *দানিশ*, ইসলামাবাদ, সংখ্যা ১০১, তাবেস্তান ১৩৮৯, পৃ. ১৭৭।

৩. হবীবুল্লাহ, মুহম্মদ, আমাদের সাহিত্য, *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি*, রজত-জুবিলি: ১৯৪১, মীর্জ্জাপুর স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৯৪১, পৃ. ৭।

৪. হবীবুল্লাহ, মুহম্মদ, আমাদের সাহিত্য, *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি*, তদেব, পৃ. ৩।

৫. আহমদ শরীফ, *সাহিত্য তত্ত্ব ও বাঙলা সাহিত্য*, বিদ্যা প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ২৫১।

Dhaka University Institutional Repository

# রচনাপঞ্জি

## আলোচিত তথ্যের উৎস নির্দেশ

### ১. ফারসি পাণ্ডুলিপি


১. বাঙ্গালি, শেইখ ইজ্জত উল্লাহ, কিস্‌সেয়ে তাজুল মুলক, এশিয়াটিক সোসাইটি: পাণ্ডুলিপি নং- ফা. ২৫ ।

২. জাঙ্গে নামে মুহম্মদ হানিফ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: পাণ্ডুলিপি নং- কে এস/৪০১ ।

৩. জাঙ্গে নামে মুহম্মদ হানিফ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়: পাণ্ডুলিপি নং- চবি./৫১ ।

৪. কিস্‌সেয়ে সেইফুল মুলূক ওয়া বদিউল জামাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: পাণ্ডুলিপি নং- কে এস/৩৯৪ ।

৫. কিস্‌সেয়ে সেইফুল মুলূক ওয়া বদিউল জামাল, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়: পাণ্ডুলিপি নং- চবি./ ১০৩ ।

৬. কিস্‌সেয়ে সেইফুল মুলূক ওয়া বদিউল জামাল, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়: পাণ্ডুলিপি নং- চবি./ ৪৮ ।

৭. হেজার মাস্‌আলেহ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়: পাণ্ডুলিপি নং- চবি./ ১৩১ ।

৮. দাস্তানে আমীর হামজা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়: পাণ্ডুলিপি নং- চবি./ ৪০৭ ।

৯. রাহাতুল কুলূব, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়: পাণ্ডুলিপি নং- চবি./ ২৬৬ ।

১০. গোলে বাকাওলি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: পাণ্ডুলিপি নং- এইচ আর/৬৬ ।

১১. জামি, আবদুর রহমান, মাহাব্বাতনামে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়: পাণ্ডুলিপি নং - ৪০১২, ২৭৬ ।

১২. গাঞ্জবি, নেজামি, সেকান্দরনামে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়: পাণ্ডুলিপি নং- ৪০১১ ।

Dhaka University Institutional Repository


## ২. সহায়ক বাংলা গ্রন্থ:

অলিউল্লাহ্, মুহম্মদ, *বাংলা ছন্দ ও অলঙ্কার পরিচয়*, ঢাকা: গতিধারা, ২০০৩।

আনিসুজ্জামান, *পুরোনো বাংলা গদ্য*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৮৪।

আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ, *বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য উনবিংশ শতাব্দী*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩।

-------, মুহাম্মদ, *পশ্চিম বঙ্গে ফার্সী সাহিত্য*, ঢাকা: ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৯৪।

আলী, ইয়াকুব ও কুদ্দুস, রুহুল, *মুসলমানদের ইতিহাস চর্চা*, ঢাকা: অবসর, ২০০৬।

আলী, ইয়াকুব, *রাজশাহীতে ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২।

আলী, মো. আজহার ও বেগম, হোসনে আরা, *মুসলিম শিক্ষা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।

আলম, মাহবুবল, *চট্টগ্রামের ইতিহাস*, চট্টগ্রাম: ১ম নয়ালোক প্রকাশনী, ৪র্থ মুদ্রণ ১৯৬৫।

আল-মামুন, মো. আবদুল্লাহ, *ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা সমস্যা ও প্রসার*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৮।

আহমদ, আলী সম্পাদিত, *আবদুল হাকিম বিরচিত নূরনামা*, ঢাকা: কেন্দ্রীয় বাংলা-উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৭০।

আহমদ, আবুয যোহা নূর, *উনিশ শতকের ঢাকার সমাজ জীবন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৫।

আহমদ, ওয়াকিল, *বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫।

-------, ওয়াকিল, *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা ১ম খণ্ড*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩।

-------, ওয়াকিল, *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা ২য় খণ্ড*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩।

-------, ওয়াকিল, *বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত*, ঢাকা: খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানী, ২০০২।

-------, ওয়াকিল, *বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান*, ঢাকা: খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৯৫।

-------, ওয়াকিল, *মধ্যযুগে বাংলা কাব্যের রূপ ও ভাষা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।

Dhaka University Institutional Repository


আহসান, সৈয়দ আলী, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস মধ্যযুগ*, ঢাকা: বাতায়ন প্রকাশন, ২০০৩।

-------, সৈয়দ আলী, *আমীর হামজা বিরচিত মধুমালতী*, চট্টগ্রাম: বইঘর প্রকশনী, ১৩৮০।

-------, সৈয়দ আলী, *আমাদের আত্মপরিচয় এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ*, ঢাকা: বাড পাবলিকেশন্স, ১৯৯৬।

ইউসুফ, মনির উদ্দিন, *বাংলা সাহিত্যে সূফি প্রভাব*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪।

ইকবাল, ভূঁইয়া সম্পাদিত, *নির্বাচিত রচনা আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।

ইসলাম, আজহার, *মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯২।

ইসলাম, আমিনুল, *মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০।

ইসলাম, মযহারুল, *কবি হেয়াত মামুদ*, রাজশাহী: বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬১।

ইসলাম, সিরাজুল সম্পাদিত, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১, ৩য় খন্ড*, ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩।

করিম, আবদুল, *বাংলা সাহিত্যের কালক্রম*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।

-----, আবদুল, চট্টগ্রামে ইসলাম, চট্টগ্রাম: ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮০।

-----, আবদুল, *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩।

-----, আবদুল, *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭।

কাসেম, আবুল (সম্পাদনায়), *আমাদের ভাষার রূপ*, ঢাকা: আজিমপুর প্রেস, ১৯৭৩।

কোরায়শী, গোলাম সামদানী সম্পাদিত, *কবি আলাউল বিরচিত তোহফা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৫।

খান, ইসরাইল, *মুসলিম সম্পাদিত ও প্রকাশিত বাংলা সাহিত্য পত্রিকা(১৯৩১-১৯৪৭)*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৫।

খানম, মাহমুদা, *মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে হিন্দী সুফী কাব্যের প্রভাব*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৩।

গঙ্গোপাধ্যায়, শম্ভোনাথ, *মধ্যযুগের ধর্মভাবনা ও বাংলা সাহিত্য*, কলিকাতা: শ্যামা প্রেস, ২য় সংস্করণ ১৯৯৮।

গোস্বামি, কৃষ্ণপদ, *বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস*, কলিকাতা: ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৩।

চট্টোপাধ্যায়, শ্রী সুনীতিকুমার, *বাঙ্গলা ভাষা প্রসঙ্গে*, কলিকাতা: জিজ্ঞাসা এজেন্সিজ লিমিটেড, ১৯৮৯।

--------, শ্রী সুনীতিকুমার, *সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস*, কলিকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৯৭৬।

চৌধুরী, আবদুল হক, *চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮।

চৌধুরী, তেসলিম, *মধ্যযুগের ভারত মুঘল আমল*, কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৯৬।

চৌধুরী, মোমেন সম্পাদিত, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী প্রথম খণ্ড*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৪।

চাঁদ, তারা, *ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব*, (অনুবাদক এস. মুজিবুল্লাহ) ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭।

ছিদ্দিকী, এম আবদুর রশিদ, *চট্টগ্রামী ভাষাতত্ব*, চট্টগ্রাম: জুবলি রোড, ১৯৭১।

জলিল, মুহম্মদ আবদুল, *শাহ গরীবুল্লাহ ও জঙ্গনামা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯১।

দেওয়ান, রুস্তম আলী, *বাংলা ভাষায় ফার্সীর প্রভাব*, ঢাকা: ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস, ২০০২।

নদভি, সৈয়দ সোলায়মান, মুসলিম যুগে হিন্দুদের শিক্ষা ব্যবস্থা, (অনু. মুহিউদ্দিন খান) ঢাকা: পাকিস্তান কো- অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ১৯৫৮।

নাথান, মির্জা, *বাহারীস্তান ই গায়বী*, (বাংলা অনুবাদক খালেকদাদ চৌধুরী) ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৪।

ন্যায়রত্ন, রামগতি, *বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়কপ্রস্তাব*, কলিকাতা: চুঁ চুড়া, ১৩১৭।

ফজল, আবুল, *সাহিত্য সংস্কৃতি ও জীবন*, চট্টগ্রাম: আর্ট প্রেস চট্টগ্রাম, প্রকাশকাল নেই।

বন্দোপাধ্যায়, শ্রী অসিতকুমার, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, কলিকাতা: মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট

লিমিটেড, ১৯৭৩।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী সত্যরঞ্জন, *সংস্কৃত ভাষাতত্ত্ব*, কলিকাতাঃ সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৫।

বারটল্ড, ভি. ভি., *মুসলমান সংস্কৃতি*, (মুহম্মদ ফজলুর রহমান অনূদিত) ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬।

বিশ্বাস, নরেন, *প্রসঙ্গ : বাঙলা ভাষা*, ঢাকাঃ অনন্যা, ১৯৯৮।

ভট্টাচার্য, পরেশচন্দ্র, *সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পরিচয়*, কলিকাতাঃ জয়দুর্গা লাইব্রেরী, ১৯৯৪।

মজুমদার, অতীন্দ্র, *মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা*, কলিকাতাঃ নয়া প্রকাশ, ১৩৭৯।

মনসুর উদ্দিন, মুহম্মদ, *ইরানের কবি*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮।

মহিউদ্দিন, এ. কে. এম., চট্টগ্রামে ইসলাম, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬।

মাহ্‌ফুজ উল্লাহ, মোহাম্মদ, *বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা প্রীতি*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০।

মিয়া, মুহম্মদ মজির উদ্দীন, *বাংলা সাহিত্যে রসুল চরিত(১২৯৫-১৯৮০)*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩।

মুহম্মদ, কাজী দীন, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, ঢাকাঃ স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৮।

মুতাহ্‌হরী, শহীদ আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা, *ইসলাম ও ইরানের পারস্পরিক অবদান*, (অনুবাদক এ. কে. এম. আনোয়ারুল কবীর) ঢাকাঃ কালচারাল কাউন্সেলরের দফতর, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস, ২০০৪।

মুনশী, আবদুল করিম সংকলিত, *বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ*, কলিকাতাঃ ২৪৩/১ নং সার্কুলার রোড, ১৩২১।

মুকুল, আখতার, *পূর্ব পুরুষের সন্ধানে*, ঢাকাঃ অনন্যা, ২০০১।

মুসা, মনসুর সম্পাদিত, *মুহাম্মদ এনামুল হক-রচনাবলী (২য় খণ্ড)*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩।

মোস্তফা, গোলাম, *আমার চিন্তাধারা*, ঢাকাঃ আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৮।

রশীদ, আ. ন. ম. বজলুর, *পাকিস্তানের সূফী-সাধক*, ঢাকাঃ জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থাঃ পূর্ব পাকিস্তান,

Dhaka University Institutional Repository


১৯৬৫।

রহমান, লুৎফর, *বাংলা সাহিত্যে নন্দনভাবনা প্রাচীন ও মধ্যযুগ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৯।

রহমান, হাবিবুর, *বাঙলা ছন্দ ও অলঙ্কার*, ঢাকা: পল্লব পাবলিশার্স, ১৯৯১।

রাব্বি, খন্দকার ফজলে, *বাংলার মুসলমান*, (অনুবাদক আবদুর রাজ্জাক) ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৮।

রামেশ্বর শ', *সাধারণ বাংলা ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*, কলিকাতা: পুস্তক বিপণি, তৃতীয় সংস্করণ ১৪০৬।

লাহিড়ী, শিবপ্রসন্ন, *সিলেটী ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৩৬৮।

ডলি, লাভলি আখতার, *বাংলাদেশে সূফীদর্শনের রূপরেখা*, ঢাকা: সাফা পাবলিকেশন, ২০০১।

শরীফ, আহমদ সম্পাদিত, *আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংকলিত পুথি-পরিচিতি*, ঢাকা: বাঙলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮।

------, আহমদ সম্পাদিত, *দৌলত উজির বাহরাম খাঁ বিরচিত লায়লী মজনু*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৬৬।

------, আহমদ সম্পাদিত, *নবী বংশ দ্বিতীয় খন্ড*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭।

------, আহমদ সম্পাদিত, *আলাউল বিরচিত সিকান্দরনামা*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭।

------, আহমদ সম্পাদিত, *দোনাগাজী বিরচিত সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ।

------, আহমদ সম্পাদিত, *দৌলত উজির বাহরাম খাঁ বিরচিত লায়লী মজনু*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, চতুর্থ মুদ্রণ ১৯৮৪।

------, আহমদ, *মধ্যযুগে বাঙলা সাহিত্য*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।

------, আহমদ, *সাহিত্য তত্ত্ব ও বাঙলা সাহিত্য*, ঢাকা: বিদ্যা প্রকাশ, ২০০৪।

------, আহমদ, *সংস্কৃতি ভাবনা*, ঢাকা: উত্তরণ, ২০০৪।

------, আহমদ, *বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য*, ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০৫।

------, আহমদ, *সৈয়দ সুলতান তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০৬।

**Dhaka University Institutional Repository**


শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ, *ভাষা ও সাহিত্য*, ঢাকা: প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ১৯৪৯।

--------, মুহম্মদ , *বাঙ্গলা ভাষার ইতিবৃত্ত*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮০।

--------, মুহম্মদ, *বাংলা সাহিত্যের কথা ২য় খণ্ড*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২য় মুদ্রণ ২০০২।

--------, মুহম্মদ, *বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৩।

--------, মুহম্মদ, ঢাকা: ইসলাম প্রসঙ্গ, মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০।

শাইখ, আসকার ইবনে, মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ২০০৪।

শাহনাওয়াজ, এ কে এম, *বাংলার সংস্কৃতি বাংলার সভ্যতা*, ঢাকা: দিব্য প্রকাশ, ২০০৭।

-----------, এ. কে. এম., *মুদ্রায় ও শিলালিপিতে মধ্যযুগের বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯।

সত্যরঞ্জন, শ্রী, *সংস্কৃত ভাষা তত্ত্ব*, কলিকাতা: *সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার*, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৫।

সাকলায়েন, গোলাম, *বাংলায় মর্সীয়া সাহিত্য*, রাজশাহী: বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৪।

---------, গোলাম, *পূর্ব পাকিস্তানের সূফী-সাধক*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, পৌষ-১৩৬৮।

সাত্তার, আবদুস, *আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস*, (অনুবাদক মোস্তফা হারুন) ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪।

সুলতানা, রাজিয়া, *আবদুল হাকিম কবি ও কাব্য*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭।

--------, রাজিয়া সম্পাদিত, *নওয়াজীসখান গুলে বকাওলী*, ঢাকা: বাঙলা একাডেমী, ১৯৭০।

সেন, শ্রী দীনেশচন্দ্র, *মৈমনসিংহ- গীতি কবিতা*, কলিকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৩।

-----, শ্রী দীনেশচন্দ্র, *প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান*, ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ২০০৮।

সেন, মুরারি মোহন, *ভাষার ইতিহাস দ্বিতীয় পর্ব*, কলিকাতা: এস ব্যানার্জি এণ্ড কোং, পুনর্মুদ্রণ মহালয়া, ১৯৯১।

সেন, প্রবোধচন্দ্র, *নূতন ছন্দ-পরিক্রমা*, কলিকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৬।

সেন, শ্রী সুকুমার, *ইসলামী বাংলা সাহিত্য,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২য় সংস্করণ ১৩৮০।

-----, শ্রী সুকুমার, *ভাষার ইতিবৃত্ত,* কলিকাতা: ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, ১৯৬৪।

সেন, সুকুমার ও সেন, সুভদ্র কুমার, *বাঙালীর ভাষা,* কলিকাতা: পশ্চিম বঙ্গ বাংলা একাদেমী, ১৯৯৪।

হক, এম ওবাইদুল, *বাংলা দেশের পীর আউলিয়াগণ,* ফেনী: হামিদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৬৯।

হক, দানীউল, *ভাষাবিজ্ঞানের কথা,* ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০২।

হক, মুহম্মদ এনামুল, পূবর্ব পাকিস্তানে ইসলাম, ঢাকা: আদিল ব্রাদার্স এণ্ড কোং, পুনমুদ্রণ ১৯৪৮।

---, মুহম্মদ এনামুল সম্পাদিত, *শাহ মুহম্মদ সগীর বিরচিত ইউসুফ-জোলেখা,* ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৪।

---, মুহম্মদ এনামুল, *মুসলিম বাংলা-সাহিত্য,* ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, তৃতীয় মুদ্রণ ২০০১।

---, মুহম্মদ এনামুল, *বঙ্গে স্বূফী প্রভাব,* ঢাকা: র‌্যামন পাবলিশার্স, ২০০৬।

হক, সৈয়দ মাহমুদুল, *বাংলার ইতিহাস (প্রাচীনকাল থেকে ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত),* ঢাকা: অধুনা প্রকাশ, ২০০৩।

হাই, মুহম্মদ আব্দুল, *ভাষা ও সাহিত্য,* ঢাকা: ইষ্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, দ্বিতীয় মুদ্রন ১৩৭০।

হাই, হুমায়ুন আবদুল, *মুসলিম সংস্কারক ও সাধক,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬।

হালদার, গোপাল, *বাঙালী সংস্কৃতির রূপ,* কলিকাতা, অগ্রণী বুক ক্লাব, ১৯৪৭।

হবিবুল্লাহ, এ বি এম, *ভারতে মুসলিম শাসনের বুনিয়াদ,* (ভাষান্তর লতিফুর রহমান), ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৪।


## ৩. সহায়ক ফারসি গ্রন্থ


আনসারি, জামাল, *তারিখে ফারহাঙ্গে ইরান আয অগায তা পায়ানে আচরে পাহলভি,* তেহরান: নাশরে সোবহান নোর, ১৩৭৮ হি.শা.।

আফসাহ যাদ, এ'লাখান, (মোকাদ্দমা ওয়া তাসহি) *দিয়ানে জামি জেলদে আওয়াল,* তেহরান:

Dhaka University Institutional Repository

মারকাযে মোতালেয়াতে ইরানি, ১৩৭৮ হি.শা. ।

আমিরি, কিউমারস, *যাবান ওয়া আদাবে ফারসি দার হিন্দ*, তেহরান: শোআরায়ে গুসতারাশে যাবান ওয়া আদাবিয়াতে ফারসি, ১৩৭৪ হি.শা. ।

আসল, মোহাম্মদ কারীমি যানজানি, *হেকমাতে আশরাকি দার হিন্দ*, তেহরান: এন্তশারাতে এত্তেলাতি, ১৩৮৭ হি.শা. ।

আহমদ, কাসেম, *আদাবিয়াতে তার্তবিকি ইরান ওয়া হিন্দ*, তেহরান: এন্তেশারাতে মাদহাত, ১৩৯০ হি.শা. ।

আহমদ, মৌলভি আগা আলি, *হাপ্ত আসমান*, কলিকাতা: এশিয়াতিক সোসাইটি অফ বাঙ্গাল, ১৮৭৩ ইং।

ইউসুফি, গোলাম হোসাইন, (তাস্‌হি ওয়া তাওজীহ্) *গোলেস্তানে সা'দি*, তেহরান: এন্তেশারাতে খাওয়ারেযামি, ১৩৭৪ হি.শা. ।

ইয়াযদি, মেহদি অযার, (নেগারেশ) *কিস্‌সেহায়ে তাযেহ আয কিতাবহায়ে কূহন*, তেহরান: এন্তেশারাতে আশরাফি, ১৩৮৩ হি.শা. ।

ইয়াহাকি, মুহম্মদ জাফর, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান ১ ও ২*, তেহরান: ওযারাতে অমুযেশ ওয়া পারওয়ারেশে ইরান, ১৩৭৭ হি.শা. ।

--------, মুহম্মদ জাফর, *কুল্লিয়াতে তারিখে আদাবিয়াতে ফারসি*, তেহরান: সাযেমানে মোতালে' ওয়া তাদভিনে কুতুবে উলুমে ইনসানি দানিশগাহা, ১৩৮৯ হি.শা. ।

এগমাই, ইকবাল, (সংকলক) *দাস্তানহায়ে আশেকানে আদাবিয়াতে ফারসি*, তেহরান: এন্তেশারাতে হীরমান্দ, ১৩৮৩ হি.শা. ।

এস্তে'লামি, মোহাম্মদ, (মোকাদ্দামে, তাহলিল ওয়া তাসহি) *মাসনভি-১*, তেহরান: এন্তেশারাতে জাওয়ার, ১৩৭২ হি.শা. ।

কাদেরি, সায়্যেদ মোহাম্মদ, *তোতিনামে ফারসি*, মোম্বাই: মাতবায়ে নামি কারেমি, ১৩২৫ হি. ।

কাসেমি, মুহসেন আবুল, *তারিখে মুখতাসারে যাবানে ফারসি*, তেহরান: এন্তশারাতে তুহুরি, ১৩৭৮ হি.শা. ।

-------, মুহসেন আবুল, *শে'র দার ইরান পিশ আয ইসলাম*, তেহরান: এন্তশারাতে তুহুরি,

১৩৮৩ হি.শা.।

-------, মোহসেন আবুল, *তারিখে মুখতাসারে যাবানে ফারসি*, তেহরান: ইন্তেশারাতে তুহুরি, ৫ম প্রকাশ ১৩৮৯ হি.শা.।

-------, মুহসেন আবুল, *ওয়াযেগানে যাবানে ফারসি দারি*, তেহরান: এন্তশারাতে তুহুরি, ১৩৯০।

কারাগাযলো, আলি রেযা যাকাউতি, *কিস্‌সেহায়ে আময়ানে ইরানি*, তেহরান: এন্তেশারাতে সুখান, ১৩৮৭ হি.শা.।

কুদকানি, মুহাম্মদ রেযা শাফয়ি, *মিরাসে এরফানি বায়েযিদ বেস্তামি*, তেহরান: এন্তেশারাতে সুখান, ১৩৮৮ হি.শা.।

কুব্বাদি, হোসাইন আলি ও আব্বাসি হুজ্জাত, *আয়নেহায়ে কেয়হানি*, তেহরান: নাসরে রী রা, ১৩৮৮ হি.শা.।

খান, ইউসুফ আলি, *জামিমেয়ে তাযকিরায়ে ইউসুফি*, (সম্পাদনায় আবদুস সোবহান) কলকাতা: এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৭৮ ইং।

খানলরি, পারভেজ নাতেল, *ওয়াযনে শে'রে ফারসি*, তেহরান: এন্তেশারাতে দানেশগাহে তেহরান, ১৩৩৭ হি.শা.।

-------, পারভেজ নাতেল, *তারীখে যাবানে ফারসি*, তেহরান: এন্তেশারাতে বুনিয়াদে ফারহাঙ্গ, ২য় প্রকাশ, ১৩৪৯ হি.শা.।

খৈয়াম, হাকীম ওমার, *রোবাইয়াতে হাকিম ওমার খৈয়াম (ফারসি, এঙ্গলিসি, আরবি, আলমানি, ফারান্সে)* তেহরান: মোয়াসেসে এন্তেশারাতে নেগাহ, ১৩৮৭ হি.শা.।

গোয়ায়রি, সোযান, *আদাবিয়াতে ফারসি ওয়া তাহাবোলাতে অন*, তেহরান: এন্তেশারাতে বেহযাত, ১৩৮৬ হি.শা.।

তাফাজ্জলি, আহমদ, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান পিশ আয ইসলাম*, তেহরান: এন্তেশারাতে সুখান, তৃতীয় প্রকাশ, ১৩৭৮ হি.শা.।

তেকু, গেরদারী লাল, *ফারসি সারায়ানে কাশ্মির*, তেহরান: এন্তেশারাতে আনজুমানে ইরান ওয়া হিন্দ, ১৩৪২ হি.শা.।

দারাশিকো, মোহাম্মদ, *সাকীনাতুল আওলিয়া*, (সম্পাদনায় রেযা জালালি নাইয়ানি ও তারাচান্দ)

Dhaka University Institutional Repository

তেহরান: মাতবুআতে এলমি, ১৩৪৪ হি.শা.।

নাকভি, সৈয়দ আলী মুহম্মদ, *সিরী দার তারিখে আন্দেশে দিনী হিন্দ ১ম খন্ড*, দিল্লি: ইরান কালসারাল সেন্টার, ২০০৮ ইং।

নায়া, সাঈদ ইউসুফ, *গোযেদেয়ে গাযালিয়াতে বেদিল দেহলভি*, তেহরান: মোআসেসে এন্তেশারাতে কাদয়ানি, ১৩৮৭ হি.শা.।

নায়া, হাসান পীর; অশতিয়ানি, আব্বাস ইকবাল ও বাবায়ি, পারভেজ, *তারিখে কামেলে ইরান*, তেহরান: মোয়াসেসে এন্তেশারাতে নেগাহ, ১৩৯০ হি.শা.।

নিশাবুরি, শেইখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার, *তাযকিরাতুল আউলিয়া*, (মুদীর ওয়া তাশরীহ মোহাম্মদ এস্তে'লামি) তেহরান: এন্তেশারাতে জাওয়ার, ১৩৪৬ হি.শা.।

নিকুবাখত, নাসের, *তাহলীলে শে'রে ফারসি*, তেহরান: সাযেমানে মোতালে' ওয়া তাদভিনে কুতুবে উলুমে ইনসানি দানেশগাহা, ১৩৮৯ হি.শা.।

ফাতোহি, মাহমুদ, *নাকদে আদাবি দার সাবকে হিন্দি*, তেহারান: এন্তেশারাতে সুখান, ১৩৮৫ হি.শা.।

ফারোযানফার, বদিউযযামান, *সুখান ওয়া সুখনোরান*, তেহরান: এন্তেশারাতে খাওয়ারেযমি, ১৩৬৯ হি.শা.।

ফেরদৌসি, আবুল কাসেম, *জুলায়খায়ে ফেরদৌসি*, কানপুর: মুনশি নাওয়াল কিশোর, ১৩০৪ হি.।

ফেরেশ্তা, মুহাম্মদ কাসেম, *তারিখে ফেরেশ্তা*, কানপুর: মাতবোয়ে মাজিদি, ১৯০৮ ইং।

বায়ানি, শিরীন, *শামেগাহে আশকানিয়ান ওয়া বা এমদাদে সাসানিয়ান*, তেহরান: এন্তেশারাতে দানেশগাহে তেহরান, ১৩৮৬ হি.শা.।

বেহযাদি, রোকায়েহ, *অরইয়াহা ওয়া না অরইয়াহা দার চাশমে আন্দাযে কূহনে তারিখে ইরান*, তেহরান: ইন্তেশারাতে তুহুরী, ১৩৭৩ হি.শা.।

মাকাদ্দাম, আহমাদ সাফ্ফার, *যাবানে ফারসি-১*, তেহরান: শোআরায়ে গূসতারাশে যাবান ওয়া আদাবিয়াতে ফারসি, ১৩৮৬ হি.শা.।

--------, আহমাদ সাফ্ফার, *ফারসি উমোমি*, তেহরান: শোআরায়ে গূসতারাশে যাবান ওয়া আদাবিয়াতে ফারসি, ১৩৭৭ হি.শা.।

মাশকূর, মোহাম্মদ জাওয়াদ, (তাসহি, মোকাদ্দেমে ওয়া তা'লিকাত) *মানতিকুততায়ের শেয়েখ ফারিদুদ্দিন আত্তার নিশাবুরি*, তেহরান: কিতাব ফুরুশি, ১৩৪৭ হি.শা.।

মাহাব্বাতি, মেহেদি, *দানিশ ওয়া দানিশমান্দ দার আদাবিয়াতে ফারসি*, তেহরান: পেযোহাশগাহে উলুমে এনসানি ওয়া মোতালাতে ফারহাঙ্গি, ১৩৯১ হি.শা.।

মিনুভি, মোজতাবা, *ফেরদৌস ওয়া শেরে উ*, তেহরান: এন্তেশারাতে আঞ্জুমানে আসারে মিল্লি, ১৩৪৬ হি.শা.।

মুহাম্মদি, গূল নাসা, *তালাক্কি আয এরফান দার শে'রে মোআসিরে আফগানিস্তান*, তেহরান: পেযোহাশগাহে উলুমে এনসানি ওয়া মোতালাতে ফারহাঙ্গি, ১৩৯১ হি.শা.।

যামারাদি, হোমায়রা, *তারিখে তাহলিলি যাবানে ফারসি*, তেহরান: এন্তেশারাতে দানেশগাহে তেহরান, ১৩৯০ হি.শা.।

যায়নালি, মুহাম্মদ বাকের, *এরফান ওয়া তাসাউফ দার আসরে এলখানানে মোগল*, তেহরান: এন্তেশারাতে কারাকোস, ১৩৮২ হি.শা.।

যাররিনকোব, আবদুল হোসাইন, *জোস্তেজো দার তাসাউফে ইরান*, তেহরান: মোয়াসেসে এন্তেশারাতে আমির কাবীর, ১৩৯০ হি.শা.।

যারুতিয়ান, বেহরোয, *আন্দিশেহায়ে নেজামি গাঞ্জেয়ে*, তাবরিয: এন্তেশারাতে আয়েদিন, ১৩৭৬ হি.শা.।

লাহুরি, মনির, *মসনবি দার সিফাতে বাঙ্গলা*, করাচি, এদারেয়ে মাতবোয়াত, ১৯৬৭ ইং।

শাফাক, রেজা যাদেহ, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, তেহরান: এন্তশারাতে দানেশগাহে পাহলভি, ১৩৫২ হি.শা.।

শামিসা, সিরুস, *অশনায়ি বা আরোজ ওয়া কাফিয়া*, তেহরান: এন্তেশারাতে ফেরদৌসি, ১৩৭২ হি.শা.।

-------, সিরুস, *আনওয়ায়ে আদাবি*, তেহরান: নাশরে মিতরা, ১৩৮৭ হি.শা.।

শিরাযি, মোহাম্মদ হাসান, (তাহক্কিক ওয়া তাস্হি) *কেচ্ছেহায়ে শাহনামা*, তেহরান: এন্তেশারাতে পায়ামে মেহরাব, ১৩৭৬ হি.শা.।

শিরাযি, সায়্যেদ আবুল কাসেম আনজূভি, (গেরদ অওরি ওয়া তা'লিফ) *গূল বাহ সানোওবার চেহ*

Dhaka University Institutional Repository

*কারদ*, তেহরান: এন্তেশারাতে আমীর কাবীর, ১৩৭৭ হি.শা.।

শেকিবা, পারভিন, *শে'রে ফারসি আয অগায তা এমরোয*, তেহরান: এন্তশারাতে হীরমান্দ, ১৩৭৩ হি.শা.।

সাহলাগি, মোহাম্মদ বিন আলি (নেগারেশ) *মিরাসে এরফানিয়ে বায়েজিদ বেস্তামি*, (অনু. মোহাম্মদ রেজা শাফি' কূদকানি) তেহরান: এন্তেশারাতে সুখান, ১৩৮৮ হি.শা.।

সাফা, যাবীহুল্লাহ, *তারীখে আদাবিয়াত দার ইরান (জেলদে আওয়াল)*, তেহরান: এন্তেশারাতে ফেরদৌস, ১৩ তম প্রকাশ ১৩৭১ হি.শা.।

সাফা, যাবীহুল্লাহ, *তারীখে আদাবিয়াত দার ইরান (জেলদে দোওম)*, তেহরান: এন্তেশারাতে ফেরদৌস, ১৩ তম প্রকাশ ১৩৭৩ হি.শা.।

সাফি, কাসেম, *বাহারে আদাব*, তেহরান: এন্তেশারাতে দানেশগাহে তেহরান, ১৩৮৭ হি.শা.।

-----, কাসেম, *সাফারনামে সিন্দ করাচি তা শাহরে খামুশান*, তেহরান: এন্তেশারাতে দানেশগাহে তেহরান, ১৩৮৫ হি.শা.।

------, কাসেম, *তারিখে যাবান ওয়া আদাবিয়াতে ফারসি দার সিন্দ ওয়া পেয়োস্তাগিহায়ে অন বা ইরান*, তেহরান: এন্তেশারাতে দানেশগাহে তেহরান, ১৩৮৭ হি.শা.।

সামারকান্দি, নিযামি আরোযি, *চাহার মাকালে*, (ব্যখ্যাকার ও টীকাকার সাঈদুল্লাহ কারা বাগলো ও রেযা আনযাবি নাযাদ ) তাবরিয: এন্তেশারাতে আইদীন, ১৩৮৭ হি.শা.।

সাবেত যাদেহ, মনসুরেহ, *বাহুর ওয়া আওযানে আশআরে ফারসি*, তেহরান: এন্তেশারাতে জাওয়ার, ১৩৮৮ হি.শা.।

সিয়াকি, মোহাম্মদ দাবীর (বাহ কোশেশ) *সাফারনামে নাসির খসরু*, তেহরান: এন্তেশারাতে যাওয়ার, ১৩৮৯ হি.শা.।

সীমাদাদ, *ফারহাঙ্গে এস্তেতালাহাতে আদাবি*, তেহরান: এন্তেশারাতে মারওয়ারিদ, ১৩৮৭ হি.শা.।

সেলিমুল্লাহ, মুনশি, *তারিখে বাঙ্গালে*, ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ১৯৭৯ ইং।

সোবহানি, তওফিক, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, তেহরান: এন্তেশারাতে যাওয়ার, ১৩৮৮ হি.শা.।

--------, তওফিক, *গোযিনেয়ে মাসনবিয়ে মাওলভি*, তেহরান: নাশরে কীতরে, ১৩৭২ হি.শা.।

সাহসারামি, মুহাম্মদ কলিম, *খেদমাত গুযারানে ফারসি দার বাংলাদেশ*, ঢাকা: রায়েযানি ফারহাঙ্গি জমহুরে এসলামি ইরান-ঢাকা, ১৯৯৯ ইং।

সায়ফ, আবদুর রেযা ও মুরাকাবি, গোলাম হোসাইন, (তাশরীহ ওয়া তাদভীন) *মাসনবীহায়ে সানাই*, তেহরান: এন্তেশারাতে দানেশগাহ তেহরান, ১৩৮৯ হি.শা.।

সারোয়ার, গোলাম, *তারিখে যাবানে ফারসি*, করাচি: জিয়া প্রেস, ১৯৬২ ইং।

হালাবি, আলি আসগর, *তারিখে ফালাসিফে ইরানি আয আগাযে ইসলাম তা এমরোয*, তেহরান, এন্তেশারাতে যাওয়ার, ১৩৯২ হি.শা.।

হায়দরি, গোলামরেযা, (এন্তেখাব ওয়া শারহে) *জাভেদানেহায়ে আদাবে পারসি*, তেহরান, এন্তেশারাতে সায়েহ গূসতার, ১৩৮৬ হি.শা.

হাকিমি, ইসমাঈল, *তাহক্কিক দারবারায়ে আদাবিয়াতে গেনাঈ ইরান*, তেহরান: এন্তেশারাতে দানেশগাহে তেহরান, ১৩৮৬ হি.শা.।

------, ইসমাঈল, *সেমা' দার তাসাউফ*, তেহরান: এন্তেশারাতে দানেশগাহে তেহরান, ১৩৮৪ হি.শা.।

হামিদুল্লাহ, খান বাহাদুর, *আহাদিসুল খাওয়ানীন*, কলকাতা: মাযহার আজায়েব প্রেস, ১৮৮১ ইং।

হারুভি, মোল্লা কাতয়ি, *তাযকিরেয়ে মাজমোআয়ে শোআরায়ে জাহাঙ্গির শাহী*, (তাসহি, তালিক ও মুকাদ্দামে সেলিম আখতার) করাচি: দানিশগাহে করাচি, ১৯৭৯ ইং।

হাতেফি, আবদুল্লাহ, *লায়লা ওয়া মাজনুন*, লাক্ষনৌ: মুনশি নাওয়াল কিশোর, ১৮৬৯ ইং।


## ৪. সহায়ক উর্দু গ্রন্থ


আযাদ, মোহাম্মদ হোসাইন সাহেব, *সুখানদানে ফারস*, লাহুর: মাতবায়ে মুফিদে আম, ১৯০৭ ইং।

আবদুল্লাহ, সৈয়দ, *আদাবিয়াতে ফারসি মে হিন্দু কা হিস্‌সা*, নতুন দিল্লি: *আন্‌জুমানে তারাক্কি উরদু হিন্দ*, ১৯৯২ ইং।

Dhaka University Institutional Repository


কাদেরী, হাকিম সায়্যেদ শামসুল্লাহ্‌, *উরদুয়ে কাদিম*, করাচি: জেনারেল পাবলিশিং হাউস রোড, ১৯৬৩ ইং।

জুনায়দি, আজিমুল হক, *মাসিরে আযম*, আলিগড়: এডোকেশোনাল বুক হাউস, ১৯৮০ ইং।

বাদাখশানি, মগবুল বেগ, *তারিখে ইরান (প্রথম খণ্ড)*, লাহুর: শফিক প্রেস, ১৯৬৭ ইং।

----------, মগবুল বেগ, *আদাব নামে ইরান (জেলদে আওয়াল)*, লাহুর: ইউনিভারসিটি বুক এজেন্সি, ১৯৬৭ ইং।

----------, মগবুল বেগ, *আদাব নামে ইরান (জেলদে দোওম)*, লাহুর: ইউনিভারসিটি বুক এজেন্সি, ১৯৬৭ ইং।

শাফাক, রেযা যাদেহ্‌, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, (অনু. সায়্যেদ মোবারেয উদ্দিন) দিহলি: খাজা প্রেস, ১৯৯৩ ইং।


## ৫. সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থ


Arberry, A. J, Edited. *The Legacy of Persia,* Great Britain: Oxford at the Clarendon Press, 1968.

Arbuthnot, F. F., *Persian Portraits*, London: Bernard Quaritch, 1887.

Browne, E. G., *A Literary History of Persia V.-1*, Great Britain: Cambridge at the University Press, 1929.

............, E. G., *A Literary History of Persia V. 2,* Great Britain: Cambridge at the University Press, 1928

............, E. G., *A Literary History of Persia V. 3,* London: Cambridge at the University Press, 1956.

............, E. G., *A Literary History of Persia V. 4*, London: Cambridge at the University Press, 1959.

Boyle, J. A. (Edited), *The Cambridge History of Iran,* Great Britain: Cambridge at the University Press, 1968.

Chatterjy, Suniti Kumar, *Iranianism,* Calcutta: The Asiatic Society, 1972.

Dewan, Md. Rustam Ali, *Influence of Persian Language on Bengali,* Dhaka: Embassy of the Islamic Republic of Iran, 2002.

Encyclopaedia Board, *The New Encyclopaedia Britannica*, Encyclopaedia Britannica, inc, 1953.

Faridi, Abid Hasan, *An Outline History of Persian Literature A. D. 822-1920,* Agra: Ram Prasad & Brothers, 1928.

Ghani, Muhammad Abdul, *A History of Persian Language & Literature at the Mughal Court (Part-1),* Allahabad: The Indian Press, Ltd, 1929.

.........., Muhammad Abdul, *A History of Persian Language & Literature at the Mughal Court (Part-2),* Allahabad: The Indian Press, Ltd, 1930.

Goldsack, William, A Mussalmani Bengali-English Dictionary, Dacca: Sitara-i-Pakistan Press, 1970.

Hilali, Shaikh Ghulam Maqsud, *Iran & Islam*, Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1989.

.........., Shaikh Ghulam Maqsud, *Perso-Arabic Elements in Bengali*, Dhaka: Bangla Academy, 2002.

Ikram, S. M. (Edited), Cultural Heritage of Pakistan, Karachi: Oxford University Press, 1955.

Javadi, Dr. Hasan, *Persian Literary Influence on English Literature*, Calcutta: Iran Society, 1983.

Johnson, Edwin Lee, *Historical Grammar of the Ancient Persian Language,* New York: American Book Company, 1917.

Karim, Abdul, *Social History of the Muslims in Bengal (Down to A. D. 1538)*, Chittagong: Baitush Sharf Islamic Reserch Institute Chittagong, 2nd Edition 1985.

Khatun, Sahera, Persia's Contribution to Arabic Literature, Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1867.

Lambton, ANN K. S., Persian Grammar, London: Cambridge at the University Press, 1960.

M.R.A.S., F.F., Arbuthnot, Persian Portraits, London: Bernard Quaritch, 1887.

Rahim, Abdur, *Social & Cultural History of Bengal Vol.1,* Karachi: Pakistan Historical Society, 1963.

Storey, C.A., *Persian Literature (A Bio-Bibliographical Survey) V. 1, Part-2*, London: Luzac & Co., LTD, 1953.

Dhaka University Institutional Repository 

## ৬. সহায়ক বাংলা প্রবন্ধ (ত্রৈমাসিক)


আশরাফ, সৈয়দ আলী, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য, *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, ৬ষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯ বাং.।

করিম, আবদুল, অভিভাষণ বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলন, *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা*, ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ১৩২৫ বাং.।

-------, আবদুল, চর্তুদশ শতকে বাংলা দেশে মুসলমান সমাজ বিস্তার, *বাংলা একাডেমী*, ঢাকা, পুনর্মুদ্রিত, সন নেই।

তালিব, মুহম্মদ আবু, হায়াৎ মাহমুদ, *বাঙলা একাডেমী পত্রিকা*, ঢাকা, ৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৮বাং.।

ভূঁইয়া, সাইদুর রহমান, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির আর্য উত্তারাধিকারের ইতিকথা, *বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা*, মাঘ -আষাঢ়, একবিংশ-দ্বাবিংশ বর্ষ, ১৩৮৩ বাং.।

শরীফ, আহমদ সম্পাদিত, রোসাঙ্গ-কবি আবদুল করিম খোন্দকার বিরচিত হাজার মসায়েল ও নুরনামা, *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, ঢাকা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৪০৪ বাং.।

-------, আহমদ (সম্পাদক) রসুল বিজয় জয়েন উদ্দীন বিরচিত, *সাহিত্য পত্রিকা*, বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, শীত সংখ্যা ১৩৭০ বাং.।

শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ, বাঙ্গালা ভাষায় পারসী প্রভাব, *সাহিত্য পত্রিকা*, ঢাকা, ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, ১৩৬৫ বাং.।

সরকার, শ্রী যদুনাথ, মুঘল ভারতের ইতিহাস, *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*, ৪৫ বর্ষ ২য় সংখ্যা, ১৩৪৫। বাং.

-------- শ্রী যদুনাথ, মুলমান-যুগের ভারতের ঐতিহাসিকগণ, *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*, ৪৬ বর্ষ ২য় সংখ্যা, ১৩৪৬ বাং.।

সাকলায়েন, গোলাম, ফকীর গরীবুল্লাহ, *বাঙলা একাডেমী পত্রিকা*, ঢাকা, ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৬৮ বাং.।

সুলতানা, রাজিয়া, শাহ্ মুহম্মদ সগীরের কাল নির্ণয় সমস্যা, *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৯৩ বাং.।

Dhaka University Institutional Repository


হালীম, এস এ, সৈয়দ লোদী আমলে ফারসি সাহিত্য, *বাঙলা একাডেমী পত্রিকা*, ৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যা, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৬৭ বাং.।

## ৭. সহায়ক বাংলা প্রবন্ধ (মাসিক)

আলী, সৈয়দ এমদাদ, বাংলা ভাষা ও মুসলমান, *মাসিক মোহাম্মদী*, ঢাকা, প্রথম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৩৪ বাং.।

আলী, জোলফিকার ও আহমদ, ফকির, আরবী বর্ণমালার ইতিহাস, *মাসিক মোহাম্মদী*, ঢাকা, ২য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা, ফাল্গুণ ১৩৩৫ বাং.।

চৌধুরী, প্রমথ, বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী শব্দ, *বুলবুল*, ঢাকা, তৃতীয় বর্ষ ২য় সংখ্যা, ১৩৪৩ বাং.।

বঙ্গবাসী, খাদেমুল এনসান, বাঙ্গালীর মাতৃভাষা, *আল ইসলাম*, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩২২ বাং.।

হবীবুল্লাহ, মুহম্মদ, রিয়াজ উস সালাতীন ও পাঠান যুগের বাঙ্গলা, *মাসিক মুহাম্মদী*, ১৪শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ১৩৪৮ বাং.।

হিলালি, গোলাম মকসুদ, তুর্কীদের বর্ত্তমান বর্ণমালা, *মাসিক মোহাম্মদী*, ঢাকা, পৌষ ১৩৪২ বাং.।

-------, গোলাম মকসুদ, পারসী ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ, *মাসিক মোহাম্মদী*, ঢাকা, ১৩শ বর্ষ ১০ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৪৭ বাং.।

## ৮. বিশেষ সংখ্যা সাময়িকী

ইসলাম, নজরুল, অভিভাষণ, *বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সমিতি*, কলিকাতাঃ রজত-জুবলীঃ ১৯৪১, ১৯৪১।

বশীর, মুর্তজা, মুদ্রা ও শিলালিপির আলোকে বাঙলায় হাবশী শাসন ও তৎকালীন সমাজ, *নাজমা জেসমিন চৌধরী দ্বাদশ স্মারক বক্তৃতা*, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০১।

শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ, পুঁথি সাহিত্যের উৎপত্তি, *প্রাচীন-দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৪১১।

### ৯. সহায়ক ফারসি প্রবন্ধ

আখতার, মোহাম্মদ সেলিম, নিগাহি বা রাওয়ান্দ নাফোয়ে শাহনামে দার শিবহে কারেহ দার চান্দ কারনে আখীর, *দানেশ*, শোমারে ৯৩, ইসলামাবাদ, তাবেস্তান ১৩৮৭ হি.শা.।

ইকরাম, মোহাম্মদ ইকরাম, ফেরদৌসি ওয়া যাবানে ফারসি, *দানেশ*, ইসলামাবাদ, শোমারে ৯৮, পায়িয ১৩৮৮ হি.শা.।

খান, আলীম আশরাফ, আখি সিরাজ মোয়াসেসে সেলসেলায়ে চিশতিয়া দার বাঙ্গাল, *কান্দে পারসি*, নিউ দেহলি, শোমারে ৩৩-৩৪, বাহার-তাবেস্তান ১৩৮৫ হি.শা.।

তাফাজ্জলি, আবুল কাসেম, মাওলানা ওয়া সেমা', *কান্দে পারসি*, নিউ দেহলি, শোমারে ৩৮, পায়িয ১৩৮৬ হি.শা.।

বাগবেদি, হাসান রেজায়ি, পাঞ্জে তান্ত্রে দার আদাবিয়াতে সাংস্কৃত ওয়া আদাবিয়াতে ফারসি, *গুযিদেয়ে মাকালাতে কান্দে পারসি*, তেহরান, ১৩৮২ হি.শা.।

বামরি, রমজান, রাওয়াবেতে যাবান ওয়া আদাবিয়াতে বিলুচি বা ফারসি, *দানেশ*, ইসলামাবাদ, শোমারে ১০১, তাবেস্তান ১৩৮৯ হি.শা.।

মোযা'নি, আলি মুহম্মদ, যাবানে ফারসি যাবানে হামদেলি, *কান্দে পারসি*, নিউ দেহলি, শোমারে ৩১, পায়িয ১৩৮৪ হি.শা.।

লাগারি, গুল হাসান, মোআরাফি ওয়া বাররাসি সায়েরে কিতাবহায়ে ফারসি দার দাওরেয়ে কুলাহউরা, *দানেশ*, ইসলামাবাদ, শোমারে ৮৬, পায়িয ১৩৮৫ হি.শা.।

সাবজওয়ারি, রেজা মোস্তাফাভি, সাহমে কালেলেহ ওয়া দিমনে দার এন্তেকালে ফারহাঙ্গ ওয়া তামাদ্দুনে হিন্দ ওয়া ইরান বা জাহান, *দানেশ*, ইসলামাবাদ, শোমারে ১০১, তাবেস্তান ১৩৮৯ হি.শা.।